সাদেক হুসাইন
ভারত অভিযান

ভারত অভিযান
সাদেক হুসাইন

(মাসিক রহমতে ধারাবাহিক প্রকাশিত)

অনুবাদ
নাসীম আরাফাত

১১৪, সবুজবাগ, ঢাকা-১২১৪
মোবাইল : ০১৫৬-৩৬৭২২১, ০১৭১৭-১৭৮৮১৯

ভারত অভিযান
সাদেক হুসাইন

পৃষ্ঠা ঃ ৩২০ (ফর্মা ২০)

অনুবাদ
নাসীম আরাফাত

পরশমণি প্রকাশনা-১৪
ISBN-984-8754-00-8

প্রকাশক
মাওলানা মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন
স্বত্বাধিকারী, পরশমণি প্রকাশন
১১৪, সবুজবাগ, ঢাকা-১২১৪
মোবাইল : ০১৫৬-৩৬৭২২১, ০১৭১৭-১৭৮৮১৯

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর ২০০৬

কম্পিউটার মেকআপ
মুজাহিদ গওহার
জি গ্রাফ কম্পিউটার
মালিটোলা, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
কালার সিটি
১১৪, সবুজবাগ, ঢাকা-১২১৪
মোবাইল ঃ ০১৭১৮-৫৬৪১৪১

গ্রাফিক্স
নাজমুল হায়দার
দি লাইট
মোবাইল ঃ ০১৯১-০৩১১৮৪

মূল্য ঃ একশত আশি টাকা মাত্র

পরশমণি'র আরো বই

- ঈমানদীপ্ত দাস্তান (৮ খণ্ডের সিরিজ উপন্যাস)
- পতনের ডাক
- আল্লাহ'র সৈনিক
- কুরআন অধ্যয়নের মূলনীতি
- ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর জীবনের পাতা থেকে
- সমকালীন চ্যালেঞ্জ ও ইসলাম
- ইসলাম ও ফ্যাশনের সংঘাত
- কী করে ছেলেমেয়েকে মানুষ বানাবেন

এক.

সকালের মেঘমুক্ত নির্মল নীল আকাশ। কোমল ঝিরি ঝিরি বাতাস গায়ে আদুরে পরশ বুলিয়ে দিচ্ছে। বাগানের প্রস্ফুটিত নানা রঙের ফুলগুলোতে মৃদু কম্পন সৃষ্টি করে অজানা উদ্দেশ্যে চলে যাচ্ছে। বাগানের চারদিকে ঘাসের সবুজ কোমল বিছানায় বিন্দু বিন্দু শিশির রোদের পরশে ঝিকমিক করছে। ফুলের সৌরভে চারদিক মোহিত। রাজবাড়ির এই বিরাট বাগানটি যেনো ধরার বুকে এক স্বর্গ-উদ্যান। দর্শক মাত্রই বাগানের এই মোহনীয় দৃশ্যে বিমুগ্ধ হতে বাধ্য।

দূর বনের ডালপালার মাঝ থেকে সূর্যটি এখন উঁচুতে চলে এসেছে। সূর্যতাপও বেড়ে চলছে আর বাগানের সজীব-সতেজ ফুলের পাপড়িগুলো সজীবতা হারিয়ে বিষন্ন-মলিন হয়ে পড়ছে। মুক্তার মতো জ্বলজ্বলে শিশির বিন্দুগুলো বাতাসের কোলে আত্মবিসর্জন দিয়ে হারিয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ বাগানের একপ্রান্তে নারীকণ্ঠের মিষ্টিমধুর কলহাস্যের শব্দ শোনা গেলো, যেনো পরীরা খিলখিল করে হাসছে। সেই হাসির মধুর আওয়াজ বায়ুতরঙ্গে মিশে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। এক মোহময় আবেশে গোটা বাগান যেনো তন্ময় হয়ে আছে।

অপরদিক থেকে এক বৃদ্ধা সন্ন্যাসিনী বাগানের ঘনসন্নিবেশিত পত্র-পল্লব ভেদ করে বেরিয়ে এলো। গায়ে তার ছেঁড়া-জীর্ণ পোশাক। কপালে তিলকের চিহ্ন। বাম হাতে হরিণের চামড়ার একটি বিছানা। ডান হাতে জপমালা। ভাবগম্ভীর তার হাঁটার ভঙ্গি। হাঁটতে হাঁটতে সে সামনে এগিয়ে আসছে। মুখে তার রহস্যময় গাম্ভীর্য বিরাজমান।

সন্ন্যাসিনী স্বগতকণ্ঠে অস্ফুট স্বরে বললো, হ্যাঁ, আজই আমি বলে দেবো। আজই বলে দিতে হবে। আমি মহাবনে যাচ্ছি। শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি মথুরায় যাচ্ছি। ঈশ্বর জানেন, আবার ফিরে আসবো কি-না... আরে! ঐ তো আসছে, যাকে সোমনাথের শিশু-কিশোর সবাই চেনে। যার চেহারা পূর্ণিমার ভরা চাঁদের চেয়েও উজ্জ্বল। নির্মল নিষ্পাপ রাজকুমারী। যার প্রাণখোলা হাসি আর মোহময় বচনভঙ্গিতে সবাই মুগ্ধ। যার প্রশংসায় সবাই পঞ্চমুখ, সেই রাজকুমারী আসছে।

হ্যাঁ, আমরা এতোক্ষণ সোমনাথের আলোচনা করছিলাম। সোমনাথ কোথায় অবস্থিত, সে আবিষ্কার নিয়ে ঐতিহাসিকদের চেষ্টার কমতি নেই। কিন্তু

তারপরও তারা একমতে পৌছুতে পারেননি। কেউ বলেন, সোমনাথ গঙ্গা নদীর তীরে জগন্নাথ অবতারের জন্মভূমির অদূরে অবস্থিত। কেউ বলেন, যমুনা নদীর তীরে মথুরার নিকটে ছিলো। আবার কেউ বলেন, কাশ্মীর ও হরিদুয়ারের মাঝে অবস্থিত। সবচে' নির্মম সত্য হলো, স্বয়ং হিন্দুরাই তাদের এই প্রসিদ্ধ তীর্থভূমিটির কথা নিশ্চিতভাবে কিছুই বলতে পারে না।

এদিকে মুসলিম ঐতিহাসিকদের ভাষ্যমতে, সোমনাথ উপদ্বীপসদৃশ্য গুজরাটের ভেরাবলের অদূরে সমুদ্রের তীরে অবস্থিত। 'তারীখে ফেরেশ্তা' নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে, সোমনাথ কাথিওয়ারের নিকটে অবস্থিত।

সোমনাথের নামকরণ নিয়েও আবার নানা মুখের নানা বচন। কেউ বলেন, সোম নামক এক রাজা শহরটি আবাদ করার পর সেখানে একটি বিরাট মন্দির তৈরি করেন এবং সেখানে নাথ নামের একটি প্রতিমা স্থাপন করেন। ফলে সোম ও নাথ এই দুই মিলে শহরটির নাম হয় সোমনাথ।

কেউ কেউ উল্লিখিত যুক্তি মানতে রাজি নন। তারা বলেন, সোমরাজা শহর আবাদ করেছেন, এটা সত্য হতে পারে। তবে সংস্কৃত ভাষায় চাঁদকেও সোম বলা হয়। হিন্দুরা মহাদেবের পূজাকে সোম নামে অভিহিত করে। আর হিন্দুস্তানে নাথ শব্দকে মহান ও সম্মানিত অর্থে ব্যবহার করা হয়। তাই হতে পারে, সোমনাথ মহাদেবের সম্মানসূচক নাম। ভারতের বিখ্যাত মন্দিরগুলোতে মহাদেবের মূর্তি অবস্থিত রয়েছে। ভারতের সকল হিন্দু তার পূজা করে। তাই এটাই অধিক যুক্তিযুক্ত বলে মনে করা হয় যে, মহাদেবের মূর্তি স্থাপনের কারণে তার নাম সোমনাথ রাখা হয়েছে।

ঐশ্বর্য্য ও ধন-সম্পদে ভরা একটি শহর, দুর্ভেদ্য অপরাজেয় একটি দুর্গ ও সর্বজন পূজনীয় একটি মন্দির– এই তিনের সমন্বয়ে গড়ে ওঠেছে ঐতিহাসিক সোমনাথ।

প্রত্যেক মাসে পূর্ণিমার সময় সোমনাথে এক বিশাল মেলা বসে। লাখ লাখ হিন্দু দূর-দূরান্ত থেকে সোমনাথের সেই মেলায় আসে। সেখানে কোটি কোটি টাকার পণ্য ক্রয়-বিক্রয় হয়। হাজার হাজার রাজা-মহারাজা তখন সোমনাথে আগমন করেন।

হিন্দুদের বিশ্বাস, মৃত্যুর সময় মানুষের আত্মা শরীর থেকে পৃথক হয়ে সোমনাথে স্থাপিত মূর্তির নিকট আসে এবং এখান থেকেই তাকে আকৃতি পরিবর্তনের নির্দেশ দেয়া হয়। তাদের এই বিশ্বাস পুনর্জন্ম বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল বটে। কিন্তু আজকের পৃথিবীতে সোমানাথের কোনো অস্তিত্ব নেই। নিশ্চিতভাবে কেউ জানে না, সোমনাথ কোথায় ছিলো। তাই এখন মানুষের আত্মা কোথায় যায় এবং কার কাছ থেকে কায়া পরিবর্তনের নির্দেশ নেয় এ প্রশ্ন হিন্দু ধর্ম বিশ্বাসের বিরুদ্ধে এক কঠিন চ্যালেঞ্জ।

আল্লাহর এই বান্দাদের এই সোজা কথাটি বুঝে আসে না যে, পুনর্জন্ম এক কাল্পনিক বিশ্বাস। মূলত মানুষ মৃত্যুবরণ করলে তার আত্মা উদ্ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে ফিরে না বা কায়া পরিবর্তন করে পুর্নজন্ম লাভ করে না। বরং কেয়ামত দিবসের অপেক্ষায় ইল্লীন বা সিজ্জীনে থাকে এবং হাশরের ময়দানে তাদেরকে তাদের আমল অনুযায়ী পুরস্কৃত করা হবে।

হিন্দু জনসাধারণ এমনকি হিন্দু রাজা-বাদশাহদের অন্তরেও সোমনাথের এতো মর্যাদা ছিলো যে, কোনো রাজা সোমনাথ তীর্থে আগমন করলে কয়েক মাইল দূর থেকে পদব্রজে আগমন করতেন। সোমনাথের প্রত্যেক অধিবাসীকে হিন্দুরা মনে-প্রাণে তাজীম করতো। সোমনাথের রাজাকে 'শাহেনশাহ' বলে অভিহিত করা হতো। সারকথা, সোমনাথ ভারতের হিন্দুদের অন্তরে ইজ্জত-সম্মান, আদব-ইহতেরাম ও মহত্বের এক পুণ্যভূমি, এক তীর্থস্থান ছিলো।

সন্ন্যাসিনী দাঁড়িয়ে গেলো এবং বাগানের একদিকে চোখ তুলে তাকিয়ে রইলো। কিছুক্ষণ পরই কয়েকটি অনিন্দ্যসুন্দরী যুবতী এগিয়ে এলো। সবাই ধবধবে সাদা পোশাক পরিহিতা। যেনো হূর-পরীর দল। আকাশের তারকারাজির মতো তাদের চেহারা ঝলমল করছে আর সে তারকারাজির মাঝে যেনো এক পূর্ণিমার চাঁদ দৃষ্টিগোচর হচ্ছে।

যুবতীরা সবাই উল্লসিত, আনন্দে মুখরিত। কোমল পা ফেলে তারা সবুজ ঘাস মাড়িয়ে এগিয়ে আসছে। কলহাস্যে বাগানকে মুখরিত করছে। নীরব ফুল বাগানটি যেনো প্রাণ-প্রাচুর্য পেয়ে সরব হয়ে ওঠেছে। আনন্দের বন্যা বইছে যেনো বাগান জুড়ে।

কলহাস্যে মুখরিত যুবতীদের দৃষ্টি সন্ন্যাসিনীর উপর পড়তেই তারা থমকে দাঁড়ালো। আগ্রহের সাথে তাকে দেখতে লাগলো। তারপর তার নিকটবর্তী হয়ে কদমবুচি করলো। সন্ন্যাসিনীর ডান হাতে জপমালা। সে হাত তুলে তাদের আশির্বাদ দিলো।

যুবতীরা সোজা দাঁড়িয়ে গেলো। কারো মুখে কোনো কথা নেই। সবাই নীরব।

সন্ন্যাসিনী বললো, তোমরা কি স্নান করে এসেছো?

যুবতীরা বললো, হ্যাঁ, মাতাজী!

সন্ন্যাসিনী বললো, আমি রাজকুমারীকে কিছু কথা বলবো।

যুবতীদের মাঝে সোমনাথের রাজার কন্যা চন্দ্রামুখীও ছিলো।

চন্দ্রামুখী অনিন্দ্যসুন্দরী, উদ্ভিন্নযৌবনা। নিটোল গোলাকার চেহারা। প্রশস্ত কপাল, পটলচেরা ডাগর নয়ন। সরু উন্নত নাসিকা। ফুলের পাপড়ির মতো সুন্দর, মসৃন-কোমল ওষ্ঠাধর। উজ্জ্বল গৌর বর্ণের শরীরে যেনো রূপের জোয়ার। অত্যন্ত লজ্জাবতী, সরল সুন্দর হৃদয়ের অধিকারীনী। তাকে দেখে,

তার সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে স্বর্গের অপ্সরীরা পর্যন্ত তার প্রেমে বিমুগ্ধ হবে।

রাজকুমারী বললো, বলুন মাতাজ্বী।

ঃ দীর্ঘদিন থেকে আমি একটি কথা গোপন করে আসছি। যখন তুমি হামাগুড়ি দিয়ে চলতে, তখন থেকে আমি আমার অন্তরে বিষয়টি গোপন করে আছি।

রাজকুমারী চন্দ্রামুখীর চোখ থেকে বিস্ময় ঝরছিলো। বললো, সে আবার কেমন কথা? তবে কি সেটা আমার সাথে সম্পৃক্ত?

সন্ন্যাসিনী রাজকুমারীর প্রস্ফুটিত ফুলের সুষমাময় চেহারার দিকে তাকিয়ে বললো, তোমার সম্পর্কিত কিছু অজানা কথা আমি তোমাকে বলতে চাই...। কিন্তু আমাকে তো বারণ করে দেয়া হয়েছে। আমার থেকে কঠিন প্রতিশ্রুতি নেয়া হয়েছে।

চন্দ্রামুখীর বিস্ময় বেড়ে গেলো। বললো, কে আপনার থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছে?

ঃ যার সাথে তোমার রহস্যের সম্পর্ক বিদ্যমান।

ঃ আমার রহস্য! চন্দ্রামুখীর কণ্ঠ চিরে এক রাশ বিস্ময় ঝরে পড়লো।

ঃ হ্যাঁ, তোমার রহস্য হে রাজকুমারী!

ঃ আপনি তো আমার অন্তরে কৌতূহলের আগুন জ্বালিয়ে দিলেন!

ঃ আর আমার অন্তরে তো পনের বৎসর যাবৎ সে আগুন জ্বলছে। আমি তা এখনো গোপন করে আছি। আমি আমার অন্তরে এমন আগুন জ্বালিয়ে রেখেছি, যার তাপ-তীব্রতা উত্তরোত্তর কেবল বৃদ্ধিই পাচ্ছে। কিন্তু, আমি মথুরায় যাচ্ছি। বলতে পারি না ফিরে আসবো কিনা। হয়তো সেখানেই আমার লীলা সাঙ্গ হয়ে যাবে। তাই তোমার জীবন-রহস্যটি আমি তোমার নিকট ব্যক্ত করতে চাই।

ঃ অত্যন্ত মেহেরবানী হবে। অনুগ্রহপূর্বক আপনি তা বলে যান।

ঃ কিন্তু ভাবছি, তাহলে কি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হবে না!

ঃ সে চিন্তা এখন আর আপনি করবেন না। কারণ, আমার আগ্রহের মাত্রা তীব্র আকার ধারণ করেছে।

ঃ শোনো রাজকুমারী! এখন আমি আর তোমার জীবন-রহস্যকে লুকিয়ে রাখতে পারছি না।

ঃ তাহলে বলে ফেলুন।

ঃ এখানে নয়। নির্জনে একাকি বলতে হবে।

ঃ তাহলে এক্ষুনি আমি আমার সখীদের দূরে সরিয়ে দিচ্ছি।

রাজকুমারী তার সখীদের দিকে ফিরে তাকালো এবং ইঙ্গিতে তাদের দূরে সরে যেতে বললো। তারা সবাই দুরে গেলে রাজকুমারী বললো, এবার বলুন।

সন্ন্যাসিনী চারদিকে দৃষ্টি ফেলে দেখে নিলো। না, কেউ নেই। কেউ তাদের কথা শুনতে পাবে না। এবার সন্ন্যাসিনী চুপি চুপি বললো, তোমার এ জীবন

রহস্য লুকাতে আমি বাধ্য ছিলাম। কারণ, এতে আমার প্রাণ নাশের আশঙ্কা তো আছেই, তোমারও ভীষণ ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু আমি এখন চাচ্ছি, তোমার নিকট আমি তা প্রকাশ করে দেবো। তবে তোমাকে অবশ্যই অঙ্গীকার করতে হবে, তুমি বিষয়টি কারো নিকট প্রকাশ করবে না।

চন্দ্রামুখী বললো, হ্যাঁ, আমি অঙ্গীকার করলাম, বিষয়টি কারো নিকট প্রকাশ করবো না।

ঃ শোনো রাজকুমারী! যদি তুমি তা প্রকাশ করো, তাহলে আমার তো মরতেই হবে আর তোমার জীবনেরও ভীষণ ক্ষতি হবে।

ঃ আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি কিছুতেই তা প্রকাশ করবো না।

ঃ আশা করি অন্তত আমি মথুরায় পৌঁছা পর্যন্ত কিছুতেই তা প্রকাশ করবে না।

ঃ আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

সন্ন্যাসিনী কণ্ঠে গাম্ভীর্য এনে বললো, শোন চন্দ্রামুখী! তুমি রাজকুমারী নও।

সন্ন্যাসিনীর কথা শুনে চন্দ্রামুখী বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলো। বললো, আমি রাজকুমারী নই? তাহলে আমি কে? কী আমার পরিচয়?

ঃ শান্ত হও চন্দ্রামুখী! আমি ধীরে ধীরে তোমাকে সব কিছুই খুলে বলবো। তাতে তুমি যেমন বিস্মিত হবে, তেমনি ব্যথিতও হবে।

ঃ হ্যাঁ মাতাজ্বী! আমি এতে অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছি। দারুণ ব্যথিতও হয়েছি।

ঃ তুমি দুঃখিত ও ব্যথিত হয়ো না। তুমি রাজকুমারীই থাকবে। আমি তোমাকে বিস্তারিত সব কিছু শোনাচ্ছি।

সন্ন্যাসিনীর কথা শেষ হতে না হতেই আওয়াজ ওঠলো, মহারাণী আসছেন, মহারাণী আসছেন। উভয়ে তাকিয়ে দেখলো, দূর থেকে একদল নারী এগিয়ে আসছে। সন্ন্যাসিনী হন্তদন্ত হয়ে বললো, এখন আর বলতে পারছি না। অন্য সময় বলবো। হাসি-খুশির সাথে মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করো। তাকে কোনোরূপ সন্দেহে ফেলো না। তা না হলে আমার জীবনাশঙ্কা রয়েছে। আমি এখন যাচ্ছি।

ঃ সন্ন্যাসিনী ধীরপায়ে চলে গেলো। চন্দ্রামুখী সন্ন্যাসিনীর প্রস্থান পথের দিকে বিস্মিত নেত্রে তাকিয়ে রইলো।

দুই.

রাজকুমারী চন্দ্রামুখী যখন শুনলো, সে রাজকুমারী নয়, তখন থেকে তার অন্তরে এক অস্থিরতার ঝড় শুরু হয়ে গেলো। বার বার একটি চিন্তাই তার মস্তিষ্কে উঁকি দিতে লাগলো, আমি যদি রাজকুমারীই নই তবে আমি কে? আমি কার কন্যা? কী আমার আসল পরিচয়? রাজা আর রাণী কেনো আমাকে প্রতিপালন করছেন? কী তাদের উদ্দেশ্য? নাকি রাজা-রাণী জানেন না, আমি

তাদের সন্তান নই। আর যদি জেনেই থাকেন, তবে কেনো তারা আমার আসল পরিচয় লুকাচ্ছেন? এতে কী রহস্য আছে? এ ধরনের হাজার প্রশ্ন তাকে সারাক্ষণ অস্থির-বেচাইন করে তুলছে।

তবে সে খুব ভালোভাবে অনুভব করে, তার লালন-পালন রাজকুমারীর মতোই হচ্ছে। রাণী তাকে কন্যার মতোই আদর-সোহাগ করেন। রাজাও তাকে মেয়ের মতোই দেখেন। তার খোঁজ-খবর নেন। প্রজারা তাকে রাজকুমারীর মতো সম্মান করে। দাস-দাসি আর সখীরাও তাকে রাজকুমারীর মতো সম্মান করে। কিন্তু তারপরও সন্ন্যাসিনীর সেই একটি কথাই তাকে অস্থির করে তুলছে। এদিকে রাজা ও রাণীকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করারও দুঃসাহস নেই। নীরবে সে অস্থির-বেচাইন অবস্থায় সময় কাটাতে লাগলো।

রাজকুমারী চন্দ্রামুখী দীর্ঘদিন থেকে সন্ন্যাসিনীকে চেনে। অত্যন্ত সতী, ঈশ্বরের অনুগ্রহধন্য সন্ন্যাসিনী। দিনের অধিকাংশ সময়ই তিনি পূজা-অর্চনায় কাটিয়ে দেন। তিনি কখনো মিথ্যা কথা বলেন না। তাই রাজকুমারীর বিশ্বাস, একদিন সন্ন্যাসিনী এসে নিজেই তার এই রহস্যঘেরা জীবন কাহিনী বলে যাবেন। কিন্তু কয়েকদিন অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে, কই সন্ন্যাসিনী তো এলেন না। অথচ প্রত্যেক দিন সে তার আগমনের প্রতীক্ষায় প্রহর গুণছে। দিন দিন তার অন্তর অস্বাভাবিক উতলা হয়ে ওঠছে।

সন্ন্যাসিনী সোমনাথ মন্দিরে থাকেন। তিনি ছাড়া আরো অনেক সন্ন্যাসিনী সেখানে থাকেন। তাদের সংখ্যা দেড়শ থেকে দু'শ। তাদের সবার মাঝে এই সন্ন্যাসিনী এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারিনী। তার নাম হয়তো অন্য কিছু ছিলো; কিন্তু সবাই তাকে শোবাদেবী নামে ডাকে ও চেনে। সোমনাথ মন্দিরের সকল সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীরা তাকে অত্যন্ত ইজ্জত করে। তার কায়মনোবাক্য ধ্যান ও পূজা অর্চনার কথা সবাই নির্ধিদ্ধায় স্বীকার করে।

সোমনাথ মন্দিরে প্রায় পাঁচশ দাসি থাকে। এরা সবাই উদ্ভিন্নযৌবনা, অনিন্দ্যসুন্দরী, রূপসী। এদের বয়স পনের থেকে বিশের মাঝে। এরা নাচ-গানে দারুণ পারদর্শী। অত্যন্ত দক্ষ। তবে সাধারণ কোনো অনুষ্ঠানে এরা নাচগান করে না। সোমনাথ মন্দিরে পূজার সময় প্রতিমার সামনে নাচ-গান করাই এদের দায়িত্ব।

এরা সবাই অত্যন্ত উঁচু খান্দানের মেয়ে। আমীর-ওমরা বা শাসক পরিবারের সন্তান। শৈশবকালেই এদের পিতা-মাতা এদেরকে সোমনাথ মন্দিরে সেবার জন্য মানত করেছিলো। মন্দিরের মহাপূজারী প্রথমে এদের নাচ-গানের প্রশিক্ষণ দেন। তারা এতে পারদর্শিনী হয়ে ওঠলে তাদেরকে সোমনাথ মন্দিরের দাসিরূপে বরণ করে নেয়া হয়।

সোমনাথ মন্দিরের দাসি হওয়া অত্যন্ত সম্মান ও ইজ্জতের বিষয়। উঁচু-নীচু, রাজা-মহারাজা, সাধু-সন্ন্যাসী, যোগী-যোগিনী সবাই তাদের সম্মান করে। সম্মানের সাথে তারা মন্দিরে জীবন কাটিয়ে দেয়।

অনিন্দ্যসুন্দরী এই দাসীদেরকে সবাই 'মাতা' বলে অভিহিত করতো। তারা গোটা জীবন কুমারী থাকতো। মন্দিরের দাসি হওয়ার পর হিন্দু ধর্মবিধান অনুযায়ী তারা আর বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারতো না।

তবে তাদের জীবনেও যৌবনের জোয়ার আসতো। যৌবনের ক্ষুধা তাদের অন্তরেও তরঙ্গের সৃষ্টি করতো। মিলন কামনায় তারাও অস্থির হয়ে ওঠতো। কিন্তু তারপরও তারা বুঝতো, তারা প্রতিমার কন্যা, সকল নারী-পুরুষের মাতা। অন্যান্য পুরুষরাও তাদেরকে মাতা হিসাবেই শ্রদ্ধা করতো। তাদের বিশ্বাস ছিলো, যদি কেউ তাদের প্রতি কু-নজরে দৃষ্টিপাত করে, তবে প্রতিমা তাকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ভস্ম করে দেবেন। তাই কেউ তাদের দিকে কখনো কু-নজরে তাকাতো না আর তারাও কারো প্রতি আকৃষ্ট হতো না।

কিন্তু কালের পরিবর্তনে মানুষের চিন্তা-চেতনায়ও পরিবর্তন এসেছে। কলিযুগ শুরু হতেই মানুষের অন্তর থেকে প্রতিমার মর্যাদা দূর হয়ে গেছে। চারদিকে ভ্রষ্টতা ছড়িয়ে পড়েছে। নির্লজ্জতা বেড়ে গেছে। হিন্দুস্তান পাপের সাগরে ডুবে গেছে। প্রতিমার সেবায় উৎসর্গিত দাসিরা চরিত্রহীনা হয়ে পড়েছে। তাদের আর দেহপসারিনীর মাঝে কোনো পার্থক্য রইলো না। তারা শুধু সাধু-সন্ন্যাসীদেরই ভোগ্য রইলো না; বরং সাধারণ মানুষের যে কেউ কিছু অর্থ ব্যয় করলেই তাদের রূপ-যৌবন ভোগ করতে পারতো।

কয়েকদিন অতিক্রম হওয়ার পরও সন্ন্যাসিনী আর এলো না। রাজকুমারী চন্দ্রামুখী একজন দাসিকে তাকে ডেকে আনতে পাঠালো। শাহী প্রাসাদ থেকে সোমনাথ মন্দির কিছুটা দূরে অবস্থিত। তাই দাসি ফিরে আসতে দেরি হচ্ছিলো। চন্দ্রামুখীর অন্তরের অস্থিরতা চরম আকার ধারণ করলো। এর সাথে তার আরেকটি দুশ্চিন্তা এসে যোগ হলো। রাজপ্রাসাদে তার বিয়ের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। অথচ বরটাকে তার মোটেই পছন্দ হচ্ছে না।

আমব্রেলীর রাজকুমার শিকদেব-এর সাথে তার বিয়ে ঠিক হয়েছে। শিকদেব যদিও যুবক; কিন্তু দেখতে বেমানান। তাছাড়া তার মেজাজ খুব রুক্ষ, অন্তর পাষাণ এবং অভদ্র।

রাজকুমারী চন্দ্রামুখীর বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে অনেক যোগ্য রাজকুমারও এসেছিলো। কিন্তু রাজা তাতে সম্মত হননি। কারণ, সে সময়ে রাজা-মহারাজারা তাদের রাজকুমার-রাজকুমারীদের বিয়ের সাথে রাজনীতির কথাও ভাবতেন। যাদের সঙ্গে আত্মীয়তা করলে ক্ষমতা শক্তিশালী হবে, এমন ব্যক্তির পরিবারের

সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতেন। তারা রাজকুমার বা রাজকুমারীর মতামতের কোনো তোয়াক্কা করতেন না। একথাও ভেবে দেখতেন না যে, ভবিষ্যতে তাদের দাম্পত্য জীবন সুখী হবে কিনা।

আমব্রেলীর রাজা প্রচন্ড শক্তির অধিকারী। সোমনাথের পাশেই রাজ্য ছিলো তার। সোমনাথের রাজা সর্বদা তার আক্রমণের আশঙ্কায় থাকতেন। তাই তিনি এই আশঙ্কা দূর করার জন্য চিন্তা করলেন, রাজকুমারী চন্দ্রামুখীকে আমব্রেলীর রাজকুমার শিকদেব-এর সাথে বিয়ে দিলে চির দিনের জন্য সে আশঙ্কা দূর হয়ে যাবে।

ভারতের রাজা-বাদশাহদের ইতিহাস হলো, তারা সর্বদা যুদ্ধে লিপ্ত থাকতেন। সবলরা দুর্বলকে গ্রাস করে নিতেন। তাই দুর্বল রাজ-বাদশাহরা তাদের বোন-কন্যাদের বিয়ে শক্তিশালী রাজা-বাদশাহ বা রাজকুমারের সাথে সম্পাদন করতেন। এভাবে তারা তাদের রাজ্যকে শত্রু হামলা থেকে শংকামুক্ত করার চেষ্টা করতেন।

রাজাদের এ রীতি দীর্ঘদিন যাবৎ চলে আসছে। এমনকি মুসলমানরা যখন ভারতের বাদশাহ হলো, তখন হিন্দু রাজা-মহারাজারা তাদের মেয়েদেরকে তাদের সাথে বিয়ে দিয়ে শুধু তাদের রাজ্যই নিরাপদ রাখেননি বরং মুসলমানদের রাজ্যও তারা গ্রাস করে নিয়েছেন।

রাজকুমারী চন্দ্রামুখী এখন এই নতুন দুশ্চিন্তায় ডুবে আছে। সারাক্ষণ তার এ দুশ্চিন্তায়ই কেটে যায়। তার মন চায়, হৃদয় চিরে রাজা আর রাণীকে জানিয়ে দেয়, কিছুতেই সে এ বিয়েতে সম্মত নয়। কিন্তু লজ্জায় সে মুখ খুলে কিছুই বলতে পারছে না। অথচ অন্তর তার জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে।

সোমনাথ মন্দির থেকে দাসির ফিরে আসতে দেরি হচ্ছে। তাই রাজকুমারী চন্দ্রামুখী হৃদয়-যন্ত্রণা লাঘব করার জন্য রাজপ্রাসাদের ছাদে আরোহণ করে। রাজকুমারী প্রায়ই বিকালে রাজপ্রাসাদের ছাদে গিয়ে পায়চারি করে।

গোধূলি লগ্ন। সূর্য পশ্চিমাকাশে। চারদিকে সূর্যের সোনালী রশ্মির খেলা। রাজকুমারী দক্ষিণ দিকে তাকিয়ে দেখে, দিগন্ত বিস্তৃত সমুদ্রের বুকে তরঙ্গায়িত উর্মিমালা যেনো সূর্যের সোনালী রশ্মির পরশে উজ্জ্বল ঝলমলে বিগলিত সোনা। দিগন্ত জুড়ে তারারা ঝিলমিল করছে। সত্যিই ভারি চমৎকার এক দৃশ্য।

রাজপ্রাসাদের অদূরে সমুদ্রের তীরে ছোট-বড় অনেক নৌকা ঢেউয়ের তালে দুলছে। সমুদ্রের তীরে মাঝি-মাল্লাদের ছোট ছোট কুঁড়ে ঘর। সে ঘরগুলো থেকে কুন্ডলি পাকিয়ে ধোঁয়া ওঠছে। এরা রাজ কর্মচারি। রাজা বা রাজকর্মচারিরা কর্মক্লান্তিতে হাঁফিয়ে উঠলে বা মনের অস্থিরতা দূর করার জন্য মাছ শিকারে বেরিয়ে যায়। তারা ভাসতে ভাসতে বহু দূরে হারিয়ে যায় এবং মাছ শিকার করে

আবার নতুন কর্মস্পৃহা ও উদ্যম নিয়ে ফিরে আসে। কখনো অবসর সময় কাটানোর জন্যও নৌবিহারে বের হয়।

তবে দূরদর্শী রাজা শুধু শুধু এজন্যই এতোগুলো নৌকা তৈরি করে এর মাঝিদের ব্যয়ভার বহন করছেন না, বরং এর পেছনে তার আরেকটি গোপন পরিকল্পনা আছে।

তাহলো, যদি কখনো কোনো শত্রু রাজ্য আক্রমণ করে কেল্লা দখল করে নেয়, তাহলে যেনো রাজা রাজপরিবারের সবাইকে নিয়ে নৌকাযোগে পালিয়ে দূরে কোনো দ্বীপে গিয়ে আশ্রয় নিতে পারেন। মূলত এ জন্যই তিনি এ ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

রাজকুমারী বেশ কিছুক্ষণ সমুদ্রের বাহারি দৃশ্য উপভোগ করে অন্য দিকে দৃষ্টি ফেরালো। এদিকে বেশ দূরে সোমনাথ মন্দির অবস্থিত। দূর থেকে তাকে একটি দুর্গের মতো মনে হয়। মন্দিরের মিনারটি ঠিক গাজরের মতো সরু হতে হতে আকাশের দিকে উঠে গেছে। তার উজ্জ্বল স্বচ্ছ গায়ে সূর্যের সোনালী রশ্মি পড়ে ঝলমল করছে। তন্ময় হয়ে রাজকুমারী সে বিস্ময়কর দৃশ্য দেখছে। ইতিমধ্যে দাসি এসে উপস্থিত হলো।

চন্দ্রামুখী তাকে জিজ্ঞেস করলো, সন্ন্যাসিনী মাতা কি এসেছিলেন?

দাসি বললো, না। তবে শুনলাম, কয়েকদিন আগেই তিনি মথুরায় চলে গেছেন।

এ সংবাদে রাজকুমারী চন্দ্রামুখী দারুণ ব্যথিত হলো। ভাবলো, তাহলে শেষ পর্যন্ত তার জীবনরহস্য অজ্ঞাতই রয়ে গেলো। তার হৃদয়ে যে কাঁটাটি সারাক্ষণ বিঁধছিলো, তা সে আর তুলে ফেলতে পারলো না। যার কাছে এ রহস্য সঞ্চিত ছিলো, তিনি তো চলে গেছেন।

হয়তো তিনি আর ইহ-জনমে ফিরে না-ও আসতে পারেন। যদি তিনি সেখানে মৃত্যুবরণ করেন বা এখানে আর ফিরে না আসনে, তাহলে তো তার জীবন-রহস্য অনুদ্ঘাটিতই থাকবে। এতে তার দারুণ কষ্ট হবে। অত্যন্ত দুশ্চিন্তা ও অস্থিরতায় গোটা জীবন তার কাটাতে হবে।

বেশ কিছুক্ষণ রাজকুমারী চন্দ্রামুখী গভীর চিন্তায় বিভোর হয়ে রইলো। হঠাৎ তার মনে এক নতুন ভাবের উদয় হলো। অস্ফুট কণ্ঠে বলতে লাগলো, নিশ্চয় গুরুজী মহারাজ আমার জীবন-রহস্য সম্পর্কে জানেন। তিনি আমাকে সন্ধান দিতে পারবেন, আমি কে, কী আমার পরিচয়। কালই আমি রাণীর নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে গুরুজীর সাথে সাক্ষাৎ করতে যাবো।

একথা চিন্তা করতে করতে রাজকুমারী চন্দ্রামুখী নীচে নেমে এলো এবং রাণীর নিকট গিয়ে গুরুজীর সাথে সাক্ষাতের অনুমতি প্রার্থনা করলো। রাণীর অনুমতি নিয়ে চন্দ্রামুখী নিজ কক্ষে ফিরে এলো।

তিন.

সোমনাথের আট-দশ মাইল দূরে অবস্থিত এক গহীন ও দুর্গম বন। রাজকুমারী চন্দ্রামুখীর গুরুজ্বী সে বনে বাস করেন। নাম ধর্মপাল। গুরুজ্বী ধর্মপাল একজন বিদ্যান ব্যক্তি। রাজার নির্দেশে তিনি রাজকুমারীকে শিক্ষা-দীক্ষার গুরুদায়িত্ব পালন করছেন। ধর্মতত্ত্বসহ সংস্কৃতি ভাষার উচ্চতর জ্ঞান তাকে দিয়েছেন। গুরুজ্বী তাকে মেয়ের মতোই বরং মেয়ের চে' বেশি স্নেহ করেন। সুখে-দুঃখে তাঁর পাশে এসে দাঁড়ান। রাজকুমারী চন্দ্রামুখীও তাকে পিতা অপেক্ষা বেশি সম্মান করে। রাজকুমারীর জীবনে যখনই কোনো সংকটময় সময় এসেছে, কোনো তার বিপদ এসেছে, তখনই সে গুরুজ্বীর নিকট ছুটে গেছে। তার পরামর্শ নিয়েছে। পরামর্শ মোতাবেক কাজ করেছে।

সোমনাথে গুরুজ্বী ধর্মপালের একক প্রভাব। সোমনাথের বালক-বালিকারাও তাকে অভাবনীয় সম্মান করে। প্রতিটি মানুষ তার সম্পর্কে সুধারণা রাখে। সাধারণ মানুষেরা মনে করে, ধর্মপাল ঈশ্বরের কৃপাধন্য সন্নাসী। এক মহান দেবতা। তার শুভদৃষ্টি কামনায় সোমনাথের নারী-পুরুষ দলে দলে তার নিকট যায়। তার উপদেশ শোনে। শুধু তা-ই নয়, সোমনাথ মন্দিরের মহাপূজারীও প্রায়ই তার নিকট যায়। তার কৃপা ও আশীষ কামনা করে। রাজাও তাকে হৃদয় দিয়ে ভালোবাসেন। তার যে কোনো পরামর্শ অবলীলায় মেনে নেন।

সোমনাথের রাজা ও প্রজারা সবাই বারবার গুরুজ্বী ধর্মপালের নিকট অত্যন্ত জোরালোভাবে এই আবেদন পেশ করেছে, যেনো তিনি বন ছেড়ে কোনো মন্দিরে চলে আসেন। কিন্তু গুরুজ্বী ধর্মপাল কিছুতেই এ প্রস্তাব মেনে নেননি। বরং নির্জন গহীন বনকেই তিনি তার জীবন-সাধনার ক্ষেত্র হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছেন।

দ্বিতীয় দিনের ঘটনা। রাজকুমারী সকাল থেকেই ব্যস্ত। গুরুজ্বী ধর্মপালের নিকট যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। ইতিমধ্যে শাহী রথ রাজকুমারীর প্রাসাদের সম্মুখে এসে পৌঁছেছে। দশজন রাজপুত্রও সাথে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে।

আজ রাজকুমারী অপরূপ সাজে সজ্জিত হয়েছে। ঝলমলে রেশমি শাড়ি, মণি-মুক্তাখচিত উজ্জ্বল অলংকার আর সুদৃশ্য রাজমুকুটে সুসজ্জিতা হয়েছে। আজ যেনো সে স্বর্গের অপ্সরী, যেনো সাক্ষাৎপরী। স্বচ্ছ স্ফটিকের ন্যায় উজ্জ্বল ঝলমলে তার সুকোমল গণ্ডদেশদ্বয় আজ দারুণ মোহময় হয়ে ওঠেছে। রাজকুমারী এসে এক রথে আরোহণ করলো। দ্বিতীয় রথে তার সখীরা আরোহণ করলো আর তৃতীয় রথে কিছু দাসি আরোহণ করলো। তিনটি রথই অত্যন্ত চমৎকার ও নিখুঁতভাবে সাজানো হয়েছে। তবে যে রথে রাজকুমারী চন্দ্রামুখী আরোহণ করেছে, সেটি অভাবনীয় সাজে সজ্জিত। প্রত্যেকটি রথের সম্মুখে

শক্তিশালী সুদর্শন ঘোড়া বাঁধা। কয়েকজন অস্ত্রসজ্জিত রাজ-প্রহরী ঘোড়াসহ রথগুলোর সম্মুখে আর কয়েকজন পশ্চাতে এসে দাঁড়ালো। রথযাত্রা শুরু হলো। এভাবে সজ্জিত রথ গমনাগমন সোমনাথবাসীদের নিকট নিত্যনৈমিত্তিক বিষয়। প্রায়ই তারা রাজকুমারীকে এভাবে যেতে দেখে। তাই তারা রাজকুমারীর রথের আগমন অনুভব করেই সমস্বরে হর্ষধ্বনি করতে লাগল– রাজকুমারীর জয় হোক, অন্নদাতার জয় হোক, রাজকুমারীর জয় হোক, অন্নদাতার জয় হোক।

জনসাধারণের হর্ষধ্বনি রাজকুমারী চন্দ্রামুখীর কানে পৌছতেই সে নতুন করে চিন্তায় পড়ে গেলো। ভাবতে লাগলো, সত্যিই কি আমি রাজকুমারী? জনসাধারণও কি তাহলে ধোঁকায় পড়ে আছে? শাহী প্রাসাদ ছিলো কেল্লার মাঝে। রথের বহরটি কেল্লা থেকে বেরিয়ে উত্তরে অবস্থিত বনের দিকে চলতে লাগলো। রাজকুমারী রথের জানালার পর্দা তুলে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখছে। সবুজে ঘেরা বিস্তৃত ফসলের জমি দেখতে দেখতে অগ্রসর হচ্ছে।

আজ আকাশে প্রচুর মেঘের আনাগোনা। সারাক্ষণ সূর্যটা মেঘে ঢেকে আছে। চারদিকে উল্লসিত শীতল বায়ুর ছুটাছুটি। আনন্দদায়ক চমৎকার এক নৈসর্গিক পরিবেশ। রাজকুমারী চন্দ্রামুখী রথ চালককে ধীরে চলার নির্দেশ দিলো। রথের বহরের গতি কমে এলো। বহর ধীরে ধীরে চলতে লাগলো।

তারা দুপুর পর্যন্ত পাঁচ মাইল পথ অতিক্রম করলো। ইতিমধ্যে কোমল শীতল বায়ুর দাপট বেড়ে গেছে। প্রবল বেগে বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে। আকাশজুড়ে প্রচুর মেঘের দাপাদাপি চলছে। রথ চালকদের অফিসার রাজকুমারীর নিকট এসে বললো, রাজকুমারী! শীঘ্রই বৃষ্টি আসবে। নিকটে তো কোনো আশ্রয় দেখছি না।

রাজকুমারী বললো, তাহলে রথের গতি বাড়িয়ে দাও। নিকটে একটি মন্দির আছে। আমরা সেখানে গিয়ে আশ্রয় নেবো।

অফিসার বললো, আমিও তা-ই ভাবছিলাম। তারপর সে রথ চালক ও প্রহরীদের ইঙ্গিত করলো। অমনি রথ দ্রুত গতিতে চলতে লাগলো। কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হতে না হতেই বৃষ্টির বড় বড় ফোটা পড়তে লাগলো। বায়ু প্রবাহের তীব্রতা আরো বেড়ে গেলো। গাছের ডালের ঘর্ষণে আর পত্র-পল্লবের আওয়াজে অবস্থা এমন হলো, যেনো ঝড় এসে গেছে। রথের গতিও বেড়ে গেছে। ইতিমধ্যে তারা এক বিশাল মন্দির দেখতে পেলো। মন্দিরের ফটক অত্যন্ত বড় ও আলীশান। ফটকের মাঝেই অনায়াসে তিনটি রথ ও রাজ প্রহরীদের অশ্বের জায়গা হয়ে গেলো।

মন্দিরের পূজারীরা রথ ও অশ্বারোহীদের দেখে ছুটে এলো। শুনলো, রাজকুমারী গুরুজীর সাথে সাক্ষাতে যাচ্ছে। তারা রাজকুমারীর নিকট এসে

সবিনয় নিবেদন করলো, অন্নদাতা রাজকুমারীজী! মন্দিরের ভেতরে এসে আমাদের ধন্য করুন। রাজকুমারী সম্মত হলে রথগুলো আরো এগিয়ে একেবারে মন্দিরের পাশে এসে থামলো। দাসিরা, সখীরা একে একে সবাই রথ থেকে নেমে পড়লো। অবশেষে রাজকুমারী চন্দ্রামুখী রথ থেকে নেমে এলো এবং মন্দিরের ভেতর চলে গেলো।

সুবিশাল মন্দির। কামরাগুলো অত্যন্ত সুন্দর। এক কামরায় দাসিদের, অন্য কামরায় সখীদের নিয়ে রাজকুমারী আরাম করতে লাগলো। কিছুক্ষণ পর মন্দিরের মহাপূজারী এসে উপস্থিত হলো। চারদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে দেখলো। তারপর খাবারের আয়োজনের অনুমতি প্রার্থনা করলো।

রাজকুমারী কৃতজ্ঞতা জানিয়ে খাবারে অস্বীকৃতি জানালো। পূজারী চলে গেলো। এক সখী বললো, পূজারীর চাহনীতে আমি দারুণ ভয় পেয়েছি। আরেকজন বললো, দেখতেও কিন্তু লোকটা ভয়ানক।

তাদের কথা শুনে রাজকুমারী বললো, হয়েছে, এবার দেখো কীভাবে বৃষ্টি নামছে।

মুষলধারায় বৃষ্টি হচ্ছে। অত্যন্ত প্রবলবেগে বাতাস বইছে। যেনো বৃষ্টি আর বাতাসের তুফান চলছে। দীর্ঘক্ষণ বৃষ্টি হলো। তারপর ধীরে ধীরে তা কমে এলো। বৃষ্টি যখন একেবারে থেমে গেলো, তখন দিনের আর বেশি বাকি নেই। প্রচুর সময় চলে গেছে।

অফিসার এসে বললো, বৃষ্টি থেমে গেছে। রাজকুমারীর হুকুম হলে রথ নিয়ে আসা হবে। ঠিক তখনই মন্দিরের মহাপূজারী এসে উপস্থিত হলো। বললো, রাজকুমারী! দিবসের আর বেশি অবশিষ্ট নেই। ইতিমধ্যে চারদিকে রাতের আঁধার নেমে আসবে। বনের মাঝে পথ অত্যন্ত দুর্গম। তদুপরি কয়েকদিন যাবত দস্যুতার সংবাদ শুনছি। তাই বলছিলাম, এ সময় সফর করা ভালো হবে না।

রাজকুমারী বললো, না, আমাকে আজই যেতে হবে। এখনই রথ নিয়ে আসা হোক।

পূজারী আবার চারদিক তার তীক্ষ্ণ ও সন্ধানী দৃষ্টি ফেললো। তারপর নীরবে বেরিয়ে গেলো। অফিসার রথ আনার হুকুম দিলো। রথ এসে গেলে সবাই রথে আরোহণ করলো এবং মন্দির থেকে বেরিয়ে ধীরে ধীরে চলতে লাগলো।

বৃষ্টির কারণে পথের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়ে গেছে। তাই রথগুলো ধীরে ধীরে যাচ্ছে। ঘোড়া দ্রুত দৌড়াতে পারছে না। পশ্চিমের দূর আকাশে অস্তায়মান সূর্য দেখা যাচ্ছে। রাজকুমারী অফিসারকে ডেকে বললো, গোধূলি লগ্ন। আমাদের কিন্তু রাতের অন্ধকারে বনের পথে চলতে হবে। তাই একটু দ্রুত চালাও।

অফিসারের নির্দেশে রথ চালকরা রথের গতি বাড়িয়ে দিলো। দ্রুত পথ চলতে লাগলো। কিছুদূর অগ্রসর হলে রাজকুমারী দেখলো, উল্টো দিক থেকে কয়েকজন অশ্বারোহী এগিয়ে আসছে। রাজকুমারী অফিসারকে তাদের ডেকে আনার নির্দেশ দিলো। অফিসার অশ্বারোহীদেরকে ডেকে রাজকুমারীর নিকট উপস্থিত করলো। অশ্বারোহীরা দু'হাতে নতশিরে রাজ কুমারীকে অভিবাদন জানালো।

রাজকুমারী জিজ্ঞেস করলো, তোমরা কারা?

এক অশ্বারোহী বললো, আমরা গুপ্তচর।

রাজকুমারী বললো, কোথা থেকে আসছিলে?

গুপ্তচর বললো, আজমীর থেকে।

ঃ কী সংবাদ নিয়ে এলে?

ঃ গজনীর সুলতান মাহমূদ আবার ভারতবর্ষে আক্রমণ করেছেন।

ঃ তিনি কি ভারতবর্ষে অনুপ্রবেশ করেছেন?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ এখন কোন্ রাজ্যে আক্রমণ করবেন, এ ব্যাপারে কি কিছু জানতে পেরেছো?

ঃ এটা নিশ্চিতভাবে জানতে পারিনি। তবে তিনি পেশোয়ার হয়ে এগিয়ে আসছেন। কেউ নিশ্চিতভাবে বলতে পারে না, তিনি কোন্ রাজ্যে আক্রমণ করবেন। তবে মানুষ বলাবলি করছে...।

ঃ কি বলাবলি করছে?

ঃ মানুষ বলাবলি করছে, এবার নাকি তিনি সোমনাথ আক্রমণ করার জন্য এগিয়ে আসছেন।

রাজকুমারী চন্দ্রামুখী গুপ্তচরের কথা শুনে বিস্মিত ও হতবাক্ হয়ে গেলো। ভীতির একটা হাল্কা মেঘমালা ক্ষণিকের তরে তার ভাবনার জগতে ভেসে ওঠলো। তারপর মৃদু হেসে বললো, লোকটি পাগল নাকি! তাহলে তো সোমনাথের দেবতা তার উপর ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে ভস্মীভূত করে ফেলবে। আচ্ছা তোমরা চলে যাও।

গুপ্তচররা চলে গেলো। রাজকুমারীর রথ সম্মুখে অগ্রসর হতে লাগলো। দিনমণি আলো বিতরণ করতে করতে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে অবশেষে পশ্চিমাকাশে অস্তমিত হলো। চারদিকে অন্ধকার নেমে এলো। রাজকুমারীর রথ এখনো বনের ভেতর দিয়ে চলছে। গহীন বন। গাছের সাথে গাছ লেগে আছে। ডালের মাঝে ডাল ঢুকে গেছে। পাতায় পাতায় ছেয়ে আছে। সে এক অবিশ্বাস্য কাণ্ড। গাছ কেটে কেটে বনের মধ্যদিয়ে পথ চলে গেছে। কিন্তু পথজুড়ে সেই নিকষ কালো অন্ধকারের তাণ্ডব। চারদিকে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। রাতের কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। দিনের বেলায়ই এ পথে অন্ধকারের কারণে চলতে কষ্ট হয়।

সূর্যের আলো এসে পৌঁছাত পারে না। গাছের ডালপালা আর পাতার বাধা অতিক্রম করে সূর্যের আলো বনের এ পথকে আলোকিত করতে পারে না। তাই রাতের অন্ধকার নেমে আসতেই বনের পথে এমন অন্ধকার নেমে এলো যে, নিজের হাত পর্যন্ত দেখা যায় না। তাই মশাল জ্বালিয়ে পথ আলোকিত করে রাজকুমারীর রথের বহর নিয়ে এগিয়ে চললো।

দিবসের বৃষ্টির পানি ফোটায় ফোটায় টপ টপ করে ঝরছে। পথ খুব পিচ্ছিল, অত্যন্ত দুর্গম। তাই সম্মুখে চলতে দারুণ কষ্ট হচ্ছে। এমন ভয়াবহ ও বন্ধুর পথে চলতে গিয়ে রাজকুমারী চন্দ্রামুখী ও তার সখীদের মনে বারবার মন্দিরের মহাপূজারীর কথা মনে পড়তে লাগলো। তারা আতংকিত হয়ে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে এদিক-সেদিক তাকাতে লাগলো। ভাবতে লাগলো, এ দুর্গম গহীন বনে যদি দস্যুদল আক্রমণ করে, তাহলে যে কী ঘটবে তা বলা মুশকিল। চলার পথে ছোট-খাট আওয়াজ হলেই তারা চমকে ওঠে। হৃদয় বারবার কেঁপে ওঠে।

কিছুদূর অগ্রসর হতে না হতেই পেছন থেকে তারা অশ্বের পদধ্বনি শুনতে পেলো। রাজকুমারী চন্দ্রামুখী ও তার সখীরা ভয়ে-আতংকে হতবুদ্ধি হয়ে গেলো। কিন্তু অফিসার তাদের সান্ত্বনা দিয়ে বললো, আরে আপনারা এতো ভীত হয়ে পড়েছেন কেনো? আমার তো মনে হচ্ছে, মহারাজা আমাদের নিরাপত্তার-ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য কিছু সৈন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন, তারাই এগিয়ে আসছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই অশ্বারোহীরা একেবারে নিকটে এসে পৌঁছলো। তারা মুখোশপরা। দূর থেকেই চিৎকার করে বললো, রথ থামাও। আর এক পা-ও সামনে এগুবে না।

অফিসার ও প্রহরী সৈন্যরা তাদের দিকে তাকালো। মশালের আলোতে তাদের দেখে অফিসার বললো, আরে, এরা তো দস্যুদল। মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও।

দস্যুদের নাম শুনতেই রাজকুমারী ও তার সখীদের প্রাণ যায় যায় অবস্থা। অফিসার সকল রাজ প্রহরীকে সাথে নিয়ে দস্যুদের এগিয়ে আসার অপেক্ষা করতে লাগলো।

চার.

রাজপ্রহরীদের হাতে যেসব মশাল জ্বলছিলো, তা প্রয়োজনের তুলনায় ছিলো অনেক কম। চারদিকের ঘনীভূত চাপ চাপ অন্ধকার দূর করে আলোয় আলোকময় করে তোলা এ মশালগুলোর পক্ষে অসম্ভব ছিলো না। তাই কেউ দূরে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না।

দস্যুদল আরো কাছে এগিয়ে এলে দেখা গেলো, তারা দশ কী বারোজন। মুখোশ পরিহিত হওয়ার কারণে তাদের চেনা না গেলেও তাদের চকচকে চক্ষু থেকে যেনো হিংস্রতার আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে। তারা রাজপ্রহরীদের সামনে এসে দাঁড়ালো এবং কঠিন কণ্ঠে বললো, বাঁচার ইচ্ছা থাকলে অস্ত্র সমর্পণ করো!

অফিসার গর্জন করে ওঠলো। বললো, জানিস্ আমার নাম কড়ক সিং! বড় বড় যোদ্ধারা আমার কাছে শিশু মনে হয়। তাই বলছি, জীবনে বাঁচতে হলে দূর হয়ে যা।

দস্যু দলের সর্দার গর্জন করে তাচ্ছিল্য ভরে বললো, আরে তুমি সেই কড়ক সিং! আচ্ছা, তাহলে বলছি শোনো, আমি হলাম বল সিং। আজ পর্যন্ত কোনো বাহাদুর আমার সাথে যুদ্ধ করে প্রাণ নিয়ে বাঁচতে পারেনি। আমি অনর্থক রক্তক্ষয় পছন্দ করি না। আমি রাজকুমারী ও তার সখীদের তুলে নেয়ার জন্য এসেছি। তাদেরকে আমাদের হাতে তুলে দাও আর তোমরা প্রাণ নিয়ে ফিরে যাও।

কড়ক সিং গর্জে ওঠলো। আমি বেঁচে থাকতে কোনো নরাধম রাজকুমারীর ছায়াও মাড়াতে পারবে না। তবে আমার জিজ্ঞাসা, তুমি রাজকুমারীকে কোথায় এবং কিসের জন্য নিতে চাও।

বল সিং বললো, সে আমি বলতে পারবো না।

বল সিং বললো, হ্যাঁ, ভীরু কাপুরুষরা সত্য কথা কখনো বলতে পারে না।

বল সিং গর্জে ওঠে বললো, আমি কাপুরুষ! তুই আমাকে অপমান করলি! এখন তলোয়ারই আমাদের মাঝে ফয়সালা করবে। এ কথা বলেই দস্যু সর্দার এক টানে তরবারী কোষমুক্ত করলো। দেখাদেখি সকল দস্যু তরবারী কোষমুক্ত করলো।

রাজকুমারী চন্দ্রামুখী তাদের কথপোকথনের প্রতিটি শব্দ শুনছে আর ভাবছে, যদি রাজপ্রহরীরা মশালগুলো ধরে রাখে, তাহলে হাতে মশাল নিয়ে তারা ভালোভাবে যুদ্ধ করতে পারবে না। আর যদি যুদ্ধের প্রচণ্ডতায় মশাল পড়ে যায় বা ফেলে দিতে বাধ্য হয়, তাহলে চারদিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে যাবে। তাই সে দাসিদের হুকুম দিলো, তারা যেনো রথ থেকে নেমে মশালগুলো নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

ভয় আর আতংকে দিশেহারা দাসিরা রাজকুমারীর নির্দেশ শুনেও রথের মাঝেই গুটি মেরে বসে থাকতে চাইলো। কিন্তু রাজকুমারীর নির্দেশ অমান্য করার দুঃসাহস তাদের নেই। তাই বাধ্য হয়ে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে রথ থেকে নেমে রাজ প্রহরীদের হাত থেকে মশালগুলো নিয়ে নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে দাঁড়ালো। রাজ প্রহরীরা এবার ঢাল-তলোয়ার নিয়ে পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে অফিসারের নির্দেশের অপেক্ষায় রইলো।

দস্যুদল অত্যন্ত তীব্রতার সাথে রাজকুমারীর প্রহরী সৈন্যদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। কড়ক সিংয়ের নির্দেশে প্রহরীরাও তাদের আক্রমণ প্রতিহত করে তাদের উপর সিংহ বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়লো। মরণপণ যুদ্ধ চলছে। হাড্ডাহাড্ডি লড়াই চলছে। বীরত্ব আর রণকৌশলে যেনো কেউ কারো চেয়ে কম নয়। মশালের আলোতে তলোয়ারগুলো ঝলমল করতে লাগলো। উভয় দলই উন্মাদ হয়ে লড়ছে। একে অন্যের রক্তের পিপাসায় তৃষ্ণাতুর হয়ে আক্রমণ করে চলছে। তলোয়ারের প্রচণ্ড ঘর্ষণে, যোদ্ধাদের সিংহ-গর্জনে শান্ত-নীরব-সমাহিত বনের নিস্তব্ধতা ভেঙে খান খান হয়ে গেলো।

রাজকুমারী চন্দ্রামুখী রথের পর্দা তুলে তার পূর্ণিমাসম মুখখানা বের করে যুদ্ধের দৃশ্য দেখছে। তার উজ্জ্বল ঝলমলে চেহারায় তখন ভয়-ভীতি আর আতংকের কোনো লক্ষণই পরিলক্ষিত হচ্ছে না। নির্বিকার প্রশান্ত তার মুখমণ্ডল। রাজকুমারীর সখীরাও রথের পর্দা তুলে যুদ্ধের দৃশ্য দেখছে। তবে তাদের চেহারায় ভয়-ভীতি আর আতংকের আলামত পরিস্ফুট। এক সখী বললো, রাজকুমারী! এইতো মহা-সুযোগ। দস্যুরা এখন যুদ্ধে লিপ্ত, আপনি রথ চালকদের নির্দেশ দিন তারা দ্রুত রথটি চালিয়ে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাক।

রাজকুমারী চন্দ্রামুখী চরম তুচ্ছতায় ভরা এক পলক দৃষ্টি তার সখীর চোখে-মুখে ফেলে বললো, তুমি তো আমাকে ভীরুতার পরামর্শ দিচ্ছো। একজন রাজকুমারী কি তার প্রহরীদের যুদ্ধরত অবস্থায় রেখে নিজের প্রাণ নিয়ে রণাঙ্গন থেকে পালিয়ে যেতে পারে? রাজার মেয়ে হয়ে আমি তা করতে পারি! তুমিও তো এক রাজার কন্যা। রাজ সন্তানদের কাজ হলো শির নেয়া বা দেয়া। রণাঙ্গন থেকে ভীরুর মতো পালানোর চিন্তা কীভাবে তোমার মাথায় এলো!

রাজকুমারীর কথা শুনে সে থতমত খেয়ে গেলো। সাথে সাথেই নিজেকে সামলে নিয়ে বললো, আমি তো কথাটা আমার বা অন্যের প্রাণ বাঁচানোর জন্য বলিনি। বরং আমাদের সবার থেকে আপনার জীবনের মূল্য অনেক। দস্যুরা আমাদের ধরে নিয়ে হত্যা করুক বা অন্য কিছু করুক, তাতে আমাদের কোনো তোয়াক্কা নেই। কিন্তু আপনার একটি পশমেরও যদি কিছু হয়, তাহলে গোটা সোমনাথে হাহাকার পড়ে যাবে। চারদিক থেকে কান্নার রোল ওঠবে।

রাজকুমারী বললো, তোমরা আমার চিন্তা করো না। ঈশ্বর না করুন যদি আমাদের সিপাহীরা নিহত হয় বা পরাজিত হয়ে পলায়ন করে, তাহলে কিন্তু আমাদেরকেই দস্যুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে।

সখীরা বিস্ময়াহত ও হতবুদ্ধি হয়ে বললো, আমরা এই হিংস্র পুরুষদের সাথে যুদ্ধ করবো!

রাজকুমারী বললো, হ্যাঁ, আমাদেরই তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে হবে।

তাদের হাতে বন্দি হয়ে দাসত্বের জীবন গ্রহণ করার চেয়ে যুদ্ধ করতে করতে মৃত্যুবরণ করা অনেক শ্রেয় হবে।

এক সখী ভয়াতুর কণ্ঠে বললো, আরে, ঐ দেখো আমাদের দু'সিপাহী নিহত হয়েছে। দু'জন রাজরক্ষী আক্রান্ত হয়ে পড়েছে।

রাজকুমারী বললো, আফসোস! আমাদের সিপাহীদের সংখ্যা একে তো কম, তাদের মধ্য থেকে আবার দু'জন নিহত হলো। আরে দেখো দেখো, ঐ তো একজন দস্যুও নিহত হলো।

রাজকুমারী হঠাৎ শংকিত হয়ে বললো, আরে আমাদের রথ চালকরা কেনো দস্যুদের বিরুদ্ধে একযোগে যুদ্ধ করছে না!

এক সখী বললো, রজকুমারী আপনি সঠিক চিন্তা করেছেন। এখনই তাদের দস্যুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নির্দেশ দিন।

রাজকুমারী চন্দ্রামুখী রথ চালকদের যুদ্ধের নির্দেশ দিতেই তারা তরবারী নিয়ে রথ থেকে লাফিয়ে পড়লো। যে রাজরক্ষীরা আক্রান্ত হয়েছিলো ও যে দস্যু নিহত হয়েছিলো, তাদের পরিত্যক্ত ঘোড়াগুলো এদিক-সেদিক হাঁটাহাঁটি করতে শুরু করে। তারা ঘোড়াগুলো ধরে তাতে লাফিয়ে উঠে যুদ্ধে লিপ্ত হলো।

ইতিমধ্যে দু'জন দস্যু ও দু'জন সিপাই নিহত হয়েছে। দু'জন দস্যু নিহত হওয়ার কারণে দস্যু দলের মাঝে জিঘাংসা ও আক্রোশের অগ্নিশিখা ছড়িয়ে পড়ে। মার মার কাট কাট রবে তারা প্রবল বেগে আক্রমণ করলো। সিপাইরা তাদের আক্রমণ প্রাণপণে প্রতিহত করলেও তাদের কয়েকজন নিহত হলো।

রথ চালকরা মৃত দস্যুদের ঘোড়া ও তরবারী নিয়ে যুদ্ধ শুরু করেছে। তলোয়ারের ঝনঝনানিতে সিপাই ও দস্যুদের চিৎকারে এক বিভীষিকাময় অবস্থার সৃষ্টি হলো। শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় নিষ্পলক নয়নে রাজকুমারী ও তার সঙ্গীরা যুদ্ধ দেখছে। তারা মনে মনে সিপাইদের বিজয় কামনা করে প্রার্থনা করছে।

দস্যুদলের মাঝে মরণপণ যুদ্ধের স্পৃহা তীব্র আকার ধারণ করলো। তারা তাদের নিহত দু'সাথীর প্রতিশোধ স্পৃহায় একেবারে অধীর হয়ে লড়ছে। কিন্তু তাদের সামনে তাদের আরেকজন সাথী প্রাণ বিসর্জন দিয়ে ধরাপৃষ্ঠে লুটিয়ে পড়লে তাদের সর্বাঙ্গে যেনো আগুন ধরে যায়। তারা প্রবল বিক্রমে আক্রমণ করে একে একে রাজ সিপাইদের হত্যা করতে লাগলো। রথ চালকরাও যুদ্ধ করতে করতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে। এখন আর রাজকুমারী ও তার সখীদের রক্ষা করার কেউ অবশিষ্ট নেই। দস্যুদল এবার তাদের চারদিক থেকে ঘিরে ফেললো। দস্যু সর্দার এগিয়ে এলো। তাদেরকে একের পর এক প্রশ্ন করতে লাগলো। রাজকুমারীর সখীরা প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগলো।

হঠাৎ উত্তর দিক থেকে দু'টি ঘোড়ার এগিয়ে আসার শব্দে সবাই শংকিত হয়ে

ওঠলো। চোখের পলকে অশ্ব দু'টি খুট খুট শব্দ তুলে একেবারে তাদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেলো। অশ্বারোহী দু'জনকে দেখেই দস্যু সর্দার চমকে ওঠে বললো, আরে, এরা তো তুর্কী!

রাজকুমারী চন্দ্রামুখী ও তার সখীরাও বিস্মিত কণ্ঠে বলে ওঠলো, আরে এরা তো তুর্কী!

তুর্কী লোক দু'টি নওজোয়ান। বীরত্ব আর দুঃসাহসিকতার দীপ্তি তাদের চেহারায় পরিস্ফুট। সুশ্রী সুন্দর আকর্ষণীয় গোটা অবয়ব। তারা দস্যুদের একেবারে সামনে এসে দাঁড়ালো। তাদের একজন ভাঙা ভাঙা ভাষায় বললো, কী ব্যাপার, তোমরা এই অবলা মেয়েদের কেনো উত্যক্ত করছো?

বল সিংয়ের কপাল থেকে রক্ত ঝরছিলো। সে বললো, আমাদের কাজে তোমাদের নাক গলানোর কোনো অধিকার নেই।

তুর্কী যুবকদ্বয় আশপাশে কর্তিত লাশগুলো দেখলো। এক যুবক বললো, আচ্ছা যুদ্ধও বুঝি হয়ে গেছে? তাহলে এই মেয়েদের রক্ষীদেরই বুঝি হত্যা করা হয়েছে? তারপর বল সিংয়ের দিকে অগ্নিঝরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো, শোনো, আমরা দুর্বলদের সাহায্য করি। এরা দুর্বল, অবলা। তোমরা এদের ছেড়ে কেটে পড়ো। অন্যথায় তোমাদের শির এখনই ধরাপৃষ্ঠে গড়াগড়ি খাবে।

বল সিং ক্ষিপ্ত হয়ে বললো, আচ্ছা এ-ই যদি তোমাদের ইচ্ছে হয়, তাহলে তোমাদের শিরই এখন ধরাপৃষ্ঠে গড়াগড়ি খাবে। এই বলে সে অন্যান্য দস্যুদের যুদ্ধের প্রস্তুতির ইশারা করলো। দস্যুরা একদিকে সরে গিয়ে আক্রমণের জন্য এগিয়ে এলো। তুর্কী যুবক দু'টিও ঢাল-তলোয়ার নিয়ে প্রস্তুত হয়ে গেলো। দস্যুরা তাদের উপর আক্রমণ করতেই তারাও দস্যুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। সাতজন দস্যু আর দু'জন তুর্কী। কিন্তু তারপরও তুর্কী দু'জন এমন সাহসিকতা ও বীরত্বের সাথে আক্রমণ করলো যে, দস্যুরা রীতিমত দিশেহারা হয়ে গেলো। তরবারী চালনার এতো বিস্ময়কর কৌশল দস্যুরা কখনো চিন্তাও করেনি। সাহসিকতা, বীরত্ব আর রণকৌশলে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে দস্যুরা একের পর এক নিহত ও আহত হতে লাগলো।

বল সিং এ দৃশ্য দেখে ক্রোধে আগুন হয়ে যে তুর্কী যুবকটি কথা বলছিলো, তার উপর প্রবল আক্রমণ করলো। তুর্কী যুবক আক্রমণ প্রতিহত করে পাল্টা আক্রমণ করতেই তার মুখোশ খুলে গেলো। রাজকুমারী চন্দ্রামুখী ও তার সখীরা তাকে চিনে ফেললো। এ তো সেই মন্দিরের মহাপূজারী। বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে তারা মহাপূজারীর দিকে চেয়ে রইলো। তুর্কী যুবকের এক আঘাতে মহাপূজারীর দেহ দ্বিখণ্ডিত হয়ে পড়ে গেলো। আর সাথে সাথে তার সঙ্গী দস্যুরা পালাতে লাগলো। তুর্কী যুবক দু'টি তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে আরো দু'জনকে হত্যা করলো। অন্যান্য দস্যুরা পালিয়ে গেলো।

তুর্কী যুবকদ্বয় ফিরে এসে রাজকুমারী চন্দ্রামুখীর সামনে এগিয়ে এলো। এক যুবক বললো, তুমি কে? কোথায় যাচ্ছিলে? উত্তরে রাজকুমারী বললো, আমি সোমনাথের রাজকুমারী। গুরুজ্বী ধর্মপালের নিকট যাচ্ছিলাম। এখানে এসে পৌঁছুলে দস্যুরা আমাদের আক্রমণ করে। আমরা আপনাদের কৃতজ্ঞতা আদায় করছি। এক কঠিন মুহূর্তে এসে আপনারা আমাদেরকে উদ্ধার করলেন।

ধর্মপালের নাম শুনেই উভয় তুর্কী যুবক চমকে ওঠলো। কিন্তু রাজকুমারী তা লক্ষ্য করেনি। তুর্কী যুবক বললো, বেশ তাহলে এসো তোমাদেরকে ধর্মপালের কুটিরে পৌঁছিয়ে দেই।

রাজকুমারী বললো, কিন্তু আপনারা কারা এবং কোথা থেকে এসেছেন?

ঃ আমি সুলতান মাহমুদ গজনবীর সেনাবাহিনীর একজন সৈনিক।

রাজকুমারী অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে বললো, কিন্তু আপনি এখানে এলেন কীভাবে?

ঃ এর জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী। এর চেয়ে বেশী আর আমি বলতে পারবো না। শুধু এতোটুকুই বুঝে নাও, স্রষ্টা আমাকে এখানে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন।

ঃ কিন্তু আপনি ধর্মপালের কুটির কীভাবে চেনেন?

ঃ তিনি একজন প্রসিদ্ধ সাধু। তাকে আবার কে না চেনে! কথা বলে সময় নষ্ট করে লাভ নেই। দ্রুত প্রস্তুত হয়ে নিন। এখনই রওনা হতে হবে।

রাজকুমারী চন্দ্রামুখী যারপর নাই বিস্মিত ও হতবুদ্ধি হয়ে গেলো। বহু কিছুই তার জিজ্ঞেস করার ছিলো। কিন্তু তুর্কীদের নেতিবাচক উত্তরে সে বুঝে ফেললো, তারা কথা বলতে চাচ্ছে না। তাই সে রথে গিয়ে বসলো। সখী-দাসিঁরাও রথে গিয়ে বসলো। তুর্কী যুবকদ্বয় দু'টি মশাল হাতে নিয়ে রথ চালাতে লাগলো।

পাঁচ.

ধর্মপাল বনের মাঝে এক কুটিরে থাকেন। তার চারপাশে বহুদূর পর্যন্ত দু'চারটি গাছ এদিক-সেদিক দাঁড়িয়ে আছে। মনে হয় জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করা হয়েছে। কুটিরের অদূরে স্বচ্ছ পানির ঝরনা কল কল রবে দক্ষিণ দিক থেকে উত্তর দিকে প্রবাহিত হচ্ছে।

গভীর রাত। বিশ্বচরাচর তখন মায়াবী চাঁদোয়ার নীচে ঘুমে অচেতন। রাজকুমারী চন্দ্রামুখীর রথ তখন গুরুজ্বী ধর্মপালের কুটিরে পৌঁছলো। পূর্ব সংবাদ ছাড়াই গভীর রাতে রাজকুমারী চন্দ্রামুখীর আগমনে গুরুজ্বী ধর্মপাল বিস্মিত হলেন। অতঃপর তাকে স্বাগত জানিয়ে নিয়ে গেলেন।

বনের এই কুটিরে ধর্মপাল একা থাকেন না। পনের বিশজন সন্ন্যাসী তার সাথে থাকে। তারা তার ভক্ত, অনুরক্ত। ধর্মপালের কুটিরের আশপাশে ছোট

ছোট অনেক কুটির। এগুলোতে তারা থাকে। আর বেশকিছু খালি কুটির রয়েছে। তাতে মেহমানরা এলে থাকে। সবগুলো কুটির পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।

রাজকুমারীর সাথে দু'জন তুর্কীকে দেখে সকল সন্ন্যাসী এমনকি স্বয়ং ধর্মপালও বিস্মিত হয়ে গেলেন। তিনি সাথে সাথে তুর্কীদের বিদায় দিতে চাইলেন। কিন্তু রাজকুমারী দস্যুদের আক্রমণ এবং বিপদ মুহূর্তে উপস্থিত হয়ে তাদের উদ্ধারের ঘটনাটি বিস্তারিত শোনালো। ধর্মপাল ঘটনা শুনে অভিভূত হয়ে তাদের অতিথি হিসেবে থাকার অনুমতি দিতে সম্মত হলেন।

গভীর রাত হওয়ার কারণে সবাই খাবার খেয়ে দ্রুত শুয়ে পড়লো। শেষ রাতে সোবহে সাদেকের আলো পূর্বাকাশে ছড়িয়ে পড়তেই তুর্কী যুবকদ্বয় বিছানা ছেড়ে উঠে অজু করলো। একজন আযান দিলো। হিন্দুরা কখনো আযান-ধ্বনি শোনেনি। আযান শুনে তারা দারুণ হতবাক্ হলো। রাজকুমারী চন্দ্রামুখী, তার সখী এবং দাসিরাও আযানের আওয়াজে জাগ্রত হয়ে গেলো। তারাও অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে আযানের আওয়াজ শুনতে লাগল। রাজকুমারী চন্দ্রামুখী বিছানা ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলো। দেখলো, গুরুজ্বী ধর্মপালও তার কুটির থেকে বেরিয়ে এসেছেন। চন্দ্রামুখী জিজ্ঞেস করলো, গুরুজ্বী মহারাজ, এটা কিসের আওয়াজ?

ঃ এই তুর্কী যুবকদ্বয় মুসলমান। তারা তাদের ধর্ম অনুযায়ী উপাসনা করছে।

ঃ কী মনকাড়া কণ্ঠস্বর আর কী মোহনীয় শব্দমালা। এগুলো কোন্ ভাষার কথা?

ঃ আমি আরবী ও তুর্কী ভাষা খুব ভালো জানি। তুর্কী যুবক বলছে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ এক।

ঃ তাদের আল্লাহ কোথায় আছেন?

ঃ মুসলমানদের বিশ্বাস আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান। আকাশেও বিরাজমান, যমীনেও বিরাজমান। তারকালোকেও তিনি বিরাজমান। মুসলমানরা বলে, তাদের নবীর উপর আল্লাহর কালাম অবতীর্ণ হয়েছে। তারা তাকে কুরআন বলে। কুরআনের সর্বপ্রথম বাক্য হলো, সমস্ত প্রসংশা বিশ্বচরাচরের প্রতিপালকের জন্য। তিনি অত্যন্ত দয়ালু ও পরম দয়াময়।

রাজকুমারী বললো, আচ্ছা, তাহলে তো সেটি অত্যন্ত ভালো কালাম?

ঃ মুসলমানদের এ কালাম এমন যাদুময়, যা দ্বারা তারা অন্যদের মুসলমান বানায়। আচ্ছা, বেটী! আমি এখন পূজা করতে যাচ্ছি।

ধর্মপাল চলে গেলেন। রাজকুমারীও চলে গেলো। তুর্কী যুবকদ্বয় নামায পড়ে কুরআন তিলাওয়াতে নিমগ্ন হয়। দিনমণি পূর্বাকাশের বেশ উঁচুতে উঠে এলে রাজকুমারী চন্দ্রামুখী গুরুজ্বী ধর্মপালের কুটিরে প্রবেশ করলো। দেখলো, তুর্কী যুবকদ্বয় নিম্নস্বরে ধর্মপালের সাথে কথা বলছে। এমন ভাষায় কথা বলছে, যা সে কখনো শোনেনি, যার একটি অক্ষরও সে বুঝেনি।

রাজকুমারীকে দেখামাত্র তারা তাদের কথা বন্ধ করে দিলো। তুর্কী যুবকদ্বয় উঠে চলে গেলো। ধর্মপাল সহাস্যবদনে বললেন, এসো বেটী! কাছে এসো। রাজকুমারী তার নিকট গিয়ে বসলো। কুটিরটি খুব প্রশস্ত। প্রচুর প্রদীপের ব্যবস্থা রয়েছে। বায়ু প্রবাহের জন্য প্রচুর বাতায়নেরও ব্যবস্থা রয়েছে। সূর্যের মিষ্টি আলো আর মুক্ত বাতাসের আনাগোনায় কুটিরের আভ্যন্তরীণ পরিবেশ দারুণ মুগ্ধকর।

ধর্মপাল বললো, এ তুর্কী যদিও সুলতান মাহমুদের সৈন্যবাহিনীর একজন সিপাই; কিন্তু এখন সে হিন্দুস্তানে ভ্রমণ করছে। সৈনিক জীবন ত্যাগ করে এখন সে পরিব্রাজক হিসেবে জীবন কাটাচ্ছে। আচ্ছা যাক সে কথা, এখন বলো তুমি কেনো এসেছো? তোমাকে এতো পেরেশান দেখাচ্ছে কেনো?

ঃ আমি অনেক কথা বলতে এসেছি। আমি অত্যন্ত পেরেশান ও অস্থির। হৃদয়ের প্রশান্তি হাসিলের জন্য এসেছি।

ঃ আমি রাতেই তোমার চেহারা দেখে তা অনুমান করেছি। তখন ধারণা করেছিলাম, হয়তো দস্যুদলের উৎপাতের কারণে এমন অবস্থা হয়েছে। কিন্তু এখন অনুমান করছি, অন্য কোনো দুশ্চিন্তা তোমাকে ধাওয়া করে ফিরছে। তুমি দারুণ চিন্তাক্লিষ্ট। তোমার মন খুব অস্থির।

ঃ গুরুজ্বী! আমি কি রাজকুমারী নই?

ধর্মপাল অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন। বললেন, তুমি কীভাবে এ কথা জানতে পারলে?

ঃ আপনি সন্ন্যাসী শোবাদেবীকে চিনে থাকবেন।

ঃ এ জন্যই বুঝি সে মথুরায় চলে গেছে! সে তো দারুণ বোকামী করছে। অত্যন্ত নির্বোধ সে।

বিষণ্ন কণ্ঠস্বর রাজকুমারীর। বললো, তবে কি গুরুজ্বী মহারাজ একথা সত্য যে, আমি রাজকুমারী নই?

ঃ আমি মিথ্যা বলতে পারি না বেটী! এ কথা সত্য। কিন্তু তুমি বিষণ্ন ও চিন্তাক্লিষ্ট হয়ে না। তুমি রাজকুমারী হিসেবেই থাকবে।

ঃ তাহলে এ কথা কি মহারাজা ও মহারাণী জানেন?

ঃ হ্যাঁ, তারা অবহিত আছেন। তবে তারা তোমাকে আত্মজের চেয়ে বেশি স্নেহ ও মহব্বত করেন।

ঃ গুরুজ্বী মহারাজ! তাহলে আমি কার কন্যা? আমার পিতামাতা কারা? তারা কোথায় থাকেন?

ধর্মপাল অপ্রস্তুত ও অপ্রতিভ হয়ে গেলেন। বিষণ্নতায় ভরা তার চোখ দু'টি মেলে রাজকুমারী চন্দ্রামুখীর দিকে তাকালেন। তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, হয়তো একদিন তুমি তা স্বাভাবিকভাবেই জানতে পারবে।

ঃ আচ্ছা তাহলে কি আপনি আমার পিতা-মাতাকে চেনেন?

ঃ হ্যাঁ, আমি চিনি। তবে আমি তা বলতে পারবো না। আমার ওষ্ঠাধরে মোহর এঁটে দেয়া হয়েছে।

রাজকুমারী চন্দ্রামুখী অস্থির হয়ে রোরুধ্য কণ্ঠে বলতে লাগলো, গুরুজ্বী মহারাজ! বলে দিন, আমাকে বলে দিন আমার পিতা-মাতা কে? তারা কোথায় আছেন? তাদের দেখতে আমার মন উতলা হয়ে গেছে।

ধর্মপাল কণ্ঠে গাম্ভীর্য এনে বললেন, শান্ত হও বেটী! শান্ত হও, ধৈর্যধারণ করো। মিলনের সে সময় ঘনিয়ে আসছে। তুমি এখন তোমার পিতা-মাতাকে চিনতে পারবে। তারা তোমাকে কোলে টেনে নেবে। তুমি তোমার মায়ের কোলের প্রশান্তি লাভ করবে। যখন তোমার জীবনের আচ্ছাদিত পর্দা উঠে যাবে, তখন দুনিয়া বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে যাবে।

রাজকুমারী চন্দ্রামুখী বিস্মিত হয়ে কী যেনো জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছিলো, ঠিক তখন গুরুজ্বী ধর্মপাল বললেন, আমি তোমার গুরুজ্বী। আমার হুকুম পালন করা তোমার অবশ্য কর্তব্য। আমি নির্দেশ দিচ্ছি, তুমি কিছুদিন নীরব থাকো। তুমি এমনভাবে চলাফেরা করতে থাকো, যেনো তুমি সত্যই রাজকুমারী। কারো নিকট তুমি ভুলেও এ কথা প্রকাশ হতে দিও না যে, তুমি রাজকুমারী নও।

ঃ গুরুজ্বীর আশির্বাদ হোক। আমি অবশ্যই নীরব থাকবো। কোনো উচ্চবাচ্য করবো না। কিন্তু আমার উপর যে আরেকটি বিপদ নেমে আসছে, তার কী হবে?

ঃ সে আবার কী বেটী?

ঃ আচ্ছা, তাহলে আপনি আমার বিয়ের ব্যাপারে কিছুই শোনেননি?

ঃ শুনেছি। তবে এ বিয়ে কিছুতেই হবে না। হতে পারে না।

ধর্মপাল কেমন যেনো উল্লসিত হয়ে পড়লেন। চন্দ্রামুখী এতে দারুণ বিস্মিত হলো। কিছুক্ষণ পর চন্দ্রামুখী বেদনাতুর কণ্ঠে বললো, কিন্তু বিয়ের সব আয়োজনই তো প্রায় সম্পন্ন হয়ে গেছে!

ধর্মপাল অত্যন্ত প্রত্যয়ের সাথে বললেন, হতে দাও বেটী!

ধর্মপালের কথা উপেক্ষা করার দুঃসাহস মহারাজের নেই। দু'চার দিনের মধ্যেই আমি মহারাজের নিকট যাচ্ছি। তারপরই সব স্থগিত হয়ে যাবে। কোনো চিন্তা করো না।

ঃ আমার হৃদয় এখন প্রশান্ত হয়ে গেছে। আপনার অনুমতি হলে আমি এখনই ফিরে যাবো।

ঃ আজ নয়, কাল যেও।

ঃ বেশ ভালো, তা-ই হবে।

বলেই রাজকুমারী ধর্মপালের কুটির থেকে বেরিয়ে গেলো।

রাজকুমারী চন্দ্রামুখীর হৃদয়ের সকল দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা ও বিষণ্নতার মেঘমালা দূর হয়ে গেছে। তার চেহারায় এখন পূর্বের দীপ্তি ফিরে পেয়েছে। পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় তা এখন ঝলমল করছে। ঠোঁটের কোণে লেগে আছে তার সেই মোহময় মৃদু হাসি।

দিবসের প্রভাকর আলো বিতরণ করতে করতে ক্লান্ত-শ্রান্ত। আলো তার ফিকে হয়ে এসেছে। দুপুর গড়িয়ে এখন বিকাল। চারদিকে ফুরফুরে বাতাসের হল্লা। রাজকুমারী চন্দ্রামুখী আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলো না। বনে এই অপরিচিত নৈসর্গিক শোভা উপভোগ করতে একাকি বেরিয়ে পড়লো। ঝর্নার তীর ধরে একাকি হাঁটছে আর মৃদু কণ্ঠে গুন গুন করে গান গাইছে। হঠাৎ তার দৃষ্টি গিয়ে পড়ে সেই তুর্কী যুবকটির উপর, যে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ভারতীয় ভাষায় কথা বলতে পারে। যুবকটি সবুজ-শ্যামল কোমল পরিচ্ছন্ন ঘাসের উপর বসে আছে। যুবক রাজকুমারী চন্দ্রামুখীকে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে যায়।

তুর্কী রাজকুমারী! আমি কি আপনার নামটা জিজ্ঞেস করতে পারি?

রাজকুমারী চন্দ্রামুখী সলজ্জ দৃষ্টি তুলে ধরে বিগলিত কণ্ঠে বললো, আমার নাম চন্দ্রামুখী।

ঃ আহ্ কি মধুর নাম!

চন্দ্রামুখী লজ্জায় একেবারে এতটুকুন হয়ে গেলো। তারপর জিজ্ঞেস করলো, আপনার নামটা কি জানতে পারি?

ঃ লোকেরা আমাকে হারুন নামে ডাকে।

ঃ আপনি কি ভ্রমণের উদ্দেশ্যে এসেছেন?

ঃ সত্যই ভারত এমন এক রূপসী দেশ, যার দর্শনীয় বিষয় অশেষ। চমৎকার এই দেশটির কথা আমি ভুলবো না।

ঃ সোমনাথ চলুন। সেখানেও দেখার মতো অনেক কিছু আছে।

ঃ হয়ত কখনো সোমনাথও যাওয়া হবে। তবে এখন আর সময় নেই। শুনেছি সুলতান মাহমুদ গজনবী ভারত আক্রমণ করেছেন। তার খেদমতে উপস্থিত হতে হবে।

ঃ এখন তিনি কোন্ রাজ্য আক্রমণ করার ইচ্ছে করেছেন?

ঃ তা তিনিই বলতে পারবেন।

ঃ আপনি আমাদের প্রতি অসীম দয়া করেছেন। আমরা আপনার খেদমত করতে চাই।

ঃ বিপদে নিপতিত ব্যক্তিকে উদ্ধার করাকে দয়া বলা হয় না। আরো কিছুদিন কি তুমি এখানে থাকবে?

ঃ আমি তো আজই ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে করেছি। কিন্তু গুরুজী মহারাজ যেতে দিচ্ছেন না। আপনি এখানে কতোদিন থাকছেন?

ঠিক তখন ধর্মপাল এসে উপস্থিত হলেন। তার কণ্ঠে বিস্ময় ও আনন্দের সুর ঝরে পড়ছিলো। বললেন, ওহে! দুই মেহমান বুঝি কথা বলছে। ভারি আনন্দের কথা। রাজকুমারী! এইমাত্র মহারাজার দূত এসেছে। তিনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। সকালে তোমাদের সাথে আমিও যাবো।

চন্দ্রামুখীর চেহারা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠলো। বললো, আচ্ছা, বেশ ভালোই হবে তাহলে।

তারপর তারা তিনজন কথা বলতে লাগলো। পরদিন সকালে রাজকুমারী চন্দ্রামুখী ও গুরুজ্বী ধর্মপাল সোমনাথ চলে আসেন আর হারুন ও তার সঙ্গীরা আজমীর চলে যায়।

ছয়.

সোমানাথের ঘরে ঘরে খবর হয়ে গেছে। সকলের মুখে সুলতান মাহমুদ গজনবীর আলোচনা। সবাই বলাবলি করছে, এবার এ ঝড় সোমনাথের উপর দিয়েই বয়ে যাবে। গোটা শহরে ত্রাহি ত্রাহি ভাব। সবাই ভয়াতুর, আতংকগ্রস্ত।

৪১৫ হিজরী মোতাবেক ১০২৪ সালের কথা। এ বছর সুলতান মাহমুদ গজনবী ভারতে ষোলতম অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। সুলতান মাহমুদ ছিলেন আমীর সবুক্তগীনের পুত্র। আমীর সুবক্তগীন অত্যন্ত দুঃসাহসী ও নির্ভীক শাসক ছিলেন। তার সময় পেশোয়ারের রাজা ছিলেন জ্বীপাল। তার রাজধানী ছিলো লাহোর। রাজা জ্বীপাল বেশ কয়েকবার আমীর সবুক্তগীনের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন। প্রত্যেকবার তিনি প্রবল শক্তি নিয়ে আক্রমণ করেছেন। কিন্তু প্রতিবারই পরাজিত হয়ে ফিরে গেছেন।

আমীর সবুক্তগীনের ইন্তেকালের পর সুলতান মাহমুদ পিতার আসনে সমাসীন হন। তখন রাজা জ্বীপালের অন্তরে আবার জিঘাংসার আগুন জ্বলে ওঠে। তিনি চিন্তা করলেন, সুলতান মাহমুদের বয়স অল্প, রণ-অভিজ্ঞতা নেই। তাই আবার তিনি আক্রমণ করার পাঁয়তারা শুরু করলেন। ৩৯১ হিজরী মোতাবেক ১০০১ সালে সুলতান মাহমুদ তাকে শায়েস্তা করার জন্য পেশোয়ার আক্রমণ করেছিলেন।

ভারতের অনেক রাজা তখন জ্বীপালকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এলেন। কিন্তু হিন্দু রাজারা সম্মিলিত শক্তি প্রয়োগ করেও সুলতান মাহমুদকে পরাস্ত করতে পারলেন না। উল্টো নিজেরা পরাজিত হয়ে পালালেন।

রাজা জ্বীপালকে যে হিন্দু রাজারা সাহায্য করেছিলেন, সুলতান মাহমুদ এবার তাদের শায়েস্তা করার ইচ্ছে করলেন। প্রত্যেক যুদ্ধেই হিন্দু রাজারা একত্রিত হয়ে আক্রান্ত রাজাকে সাহায্য করতেন। ফলে সুলতান মাহমুদ একের

পর এক প্রত্যেক সাহায্যকারী রাজাকে শায়েস্তা করতে লাগলেন। তিনি ভারত আক্রমণ করে চললেন। সে কারণেই সুলতান মাহমুদ গজনবী বারবার ভারত আক্রমণ করেছিলেন।

সে সময়ে হিন্দু রাজা-বাদশাহরা অত্যন্ত দুরাচার, মিথ্যাবাদী ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী ছিলেন। তারা যখনই চাপের মুখে পড়ে নিরুপায় হয়ে যেতেন, তখনই নানা প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতিজ্ঞা করতেন। তারপর মুসলমানরা ফিরে গেলেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে বিদ্রোহ করে বসতেন।

মুসলমানরা কখনো তাদের রাজ্য দখল করে নেয়ার চিন্তা করেনি। প্রত্যেকবার আক্রমণ করে পরাজিত-পরাভূত করে তাদের প্রতিশ্রুতি ও প্রতিজ্ঞার উপর নির্ভর করে তাদের রাজ্যক্ষমতা তাদের হাতেই ফিরিয়ে দিয়ে চলে এসেছেন। এভাবে সুলতান মাহমুদ ভারতের পূর্বে কুনৌজ এবং দক্ষিণে গুজরাট পর্যন্ত- এ বিশাল অঞ্চলের রাজাদের উপর একের পর এক আক্রমণ করেছেন। পরাজিত করে তাদের রণশক্তিকে নিঃশেষ করে ফিরে এসেছেন। সুলতান মাহমুদ কখনো ভারতে স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের ইচ্ছে করেননি। কেল্লার পর কেল্লা, শহরের পর শহর পদানত করে আবার তাদের ক্ষমতা তাদেরই ফিরিয়ে দিয়েছেন।

৪১৫ হিজরীতে সুলতান মাহমুদের এই আক্রমণ ছিলো ষোলতম আক্রমণ। এ আক্রমণই সুলতান মাহমুদকে বিশ্বে প্রসিদ্ধি ও পরিচিতি দান করেছে। এখন প্রত্যেক মুসলিম তার নাম জানে, তাকে চেনে।

সোমনাথের অধিবাসীরা ভীত-সন্ত্রস্ত। তাদের জীবনীশক্তি যেনো নিঃশেষ হয়ে গেছে। আনন্দ-উল্লাস যেনো বাতাসে মিলে গেছে। সবাই চিন্তিত, বিষণ্ন। কেউ কেউ আবার ঐ রাজাদের গাল-মন্দও করতে শুরু করেছে, যারা উস্কানি দিয়ে সুলতান মাহমুদকে ভারত আক্রমণে উৎসাহিত করেছেন।

সোমনাথের মহারাজাও দারুণ ভীত হয়ে পড়েছিলেন। পরাজয়ের ভয়ে তিনি দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন। এ প্রলয়ংকরী ঝড়ের মোকাবেলায় পন্থা ও করণীয় নির্ধারিত করতে মহারাজা বিশেষ দরবার আহ্বান করলেন। ধর্মপালকেও এই দরবারে উপস্থিত হওয়ার জন্য ডেকে পাঠানো হয়েছে।

দরবার বসলো। উজীর, আমীর, মহাপূজারী, জ্ঞানী-গুণীজন সবাই এসে উপস্থিত হন। পদমর্যাদা হিসেবে সবাই নিজ নিজ আসন গ্রহণ করলেন। ধর্মপালও এসে আসন গ্রহণ করলেন। মহারাজা এবার দরবারীদের দিকে ফিরে তাকালেন।

মহারাজা মধ্যবয়সী, সুঠামদেহী সুপুরুষ। একটি রেশমি ধুতি পরিহিত। বাকি শরীর বস্ত্রহীন। হিরা-মুক্তা-মাণিক্যের মহামূল্যবান মালা পরিহিত। প্রায়

কনুই পর্যন্ত কংকন সুশোভিত। গলায় মুক্তার মালা রাতের তারার ন্যায় জ্বলজ্বল করছে। মাথায় অপূর্ব সুন্দর এক রাজমুকুট।

মহারাজা বললেন, আপনারা হয়তো ইতিমধ্যে শুনেছেন, সুলতান মাহমুদ গজনবী ঝড়ের গতীতে ধেয়ে আসছেন। যদিও কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারে না, তিনি কোন্ রাজ্যে বা কোন্ শহরে আক্রমণ করবেন। তবে গুপ্তচরের রিপোর্টে মনে হচ্ছে, এবার সোমনাথের উপর দিয়েই এ প্রলয়ংকরী ঝড় বয়ে যাবে। যদি তিনি সোমনাথ আক্রমণ করেন, তাহলে অস্পৃশ্য এই যবন মুসলমানদের দ্বারা আমাদের এই পবিত্র ভূমি অপবিত্র হবে। তবে এখনো বলা যাচ্ছে না পরিস্থিতি কী দাঁড়াবে। বুদ্ধিমান তো ঐ ব্যক্তি, যে বিপদ আসার আগেই তা প্রতিহত করার পরিকল্পনা ঠিক করে রাখে। তাই আমি আপনাদের পরামর্শ চাচ্ছি, সোমনাথকে রক্ষার জন্য কী ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

উজীর বললেন, সোমনাথের মর্যাদা ভারতের প্রত্যেক রাজার অন্তরেই বিদ্যমান। তাই সকলেই স্বেচ্ছায় এ মহাপবিত্র স্থানটি রক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবেন। সৈন্যসামন্ত পাঠিয়ে সাহায্য করবেন। রাজাদের পক্ষ থেকে এতো সাহায্য ও সৈন্য এসে সমবেত হবে যে, সুলতান মাহমুদ সোমনাথ আক্রমণের সাহসই করবেন না। যদি সুলতান মাহমুদ ফিরে না গিয়ে আত্ম অহমিকায় আক্রমণ করে বসেন, তাহলে তার বাহিনীকে চিরতরে খতম করে দেয়া হবে। বিগত দিনের সকল পরাজয়ের প্রতিশোধ এবার নেয়া হবে।

মহাপূজারী বললেন, আমার মনে হয় আমাদের দুশ্চিন্তা করা ঠিক হবে না। সোমনাথের মহাদেবতা অন্যান্য দেবতাদের মতো নন। এ পবিত্র দেশে অস্পৃশ্য যবন মুসলমানরা পা রাখলেই তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে তাদের জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ভস্ম করে ফেলবেন। তার শক্তির প্রতি আমাদের বিশ্বাস ও ভরসা রাখতে হবে। মহাদেবতা কি তার পূজারীদের লাঞ্ছিত-অপমানিত হতে দেবেন? ছবির মতো সুন্দর এই শহর, এই মজবুত কেল্লা দুশমনরা পদানত করে নেবে এটা কি মহাদেবতা মুখ বুজে সহ্য করবেন? নিশ্চয় তা হতে পারে না। কিছুতেই হবে না। মুসলমানরা এদিকে আক্রমণের জন্য এগিয়ে এলেই দেবতাদের রুদ্ররোষ তাদের উপর আপতিত হবে।

ঠিক এ সময় দরবারে কয়েকজন পূজারী প্রবেশ করে বললো, মহারাজ! আজ এখনো গঙ্গাজল আসেনি। তাই সোমনাথের মহাদেবতাকে এখনো স্নান করানো হয়নি। পুরোহিতরা এখনো অন্নজল ছাড়াই বসে আছেন।

গঙ্গা থেকে সোমনাথ ছয়'শ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। কিন্তু ব্যবস্থাপনা এমন করা হয়েছে যে, প্রত্যহ গঙ্গাজল আসে আর তদ্বারা সোমনাথের মহাদেবতাকে স্নান করানো হয়।

সোমনাথ মন্দিরে দু'হাজার পুরোহিত বসবাস করেন। প্রত্যত মহাদেবতাকে স্নান করানোর পর তারা অন্নজল নেন। খাওয়া-দাওয়া সারেন।

মহাপূজারী বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললেন, আচ্ছা, এখনো গঙ্গাজল আসেনি! এখনো মহাদেবতাকে স্নান করানো হয়নি! কেনো এসব হচ্ছে? এ তো বড়ই কুলক্ষণ।

মহারাজা বললেন, আফসোস! এখনো পুরোহিতরা অনাহারে আছে। অন্নজল কিছুই নেননি। গঙ্গাজল কেনো এখনো আসেনি? এমন তো আর কখনো হয়নি।

মহাপূজারী বললেন, হ্যাঁ, এমন আর আগে কখনো হয়নি। সূর্য অস্ত যাওয়ার আগেই গঙ্গাজল এসে যেতো। এর তদন্ত করতে হবে। নিশ্চয়ই এতে কারো কোনো ষড়যন্ত্র আছে।

রাতে সোমনাথের মহাদেবতাকে স্নান করানো হয় আর এ দরবার রাত পর্যন্ত চলে।

ঠিক তখন আরো কয়েকজন পুরোহিত এসে বললেন, অন্নদাতা! জল এসে গেছে। মহাদেবতাকে স্নান করানোর কাজ শুরু হয়ে গেছে।

মজারাজা বললেন, কিন্তু জল আসতে দেরি হলো কেনো?

এক পুরোহিত বললেন, অন্নদাতা! গঙ্গাজল যারা আনতে গিয়েছিলো, দস্যুরা তাদের উপর আক্রমণ করেছিলো। কিন্তু তারা যখন জানতে পারলো, তারা সোমনাথের মহাদেবতাকে স্নান দেয়ার জন্য জল আনতে যাচ্ছে, তখন তারা তাদের ছেড়ে দিলো।

ক্রোধে মহারাজার চোখ জ্বলে ওঠলো। বললেন, এ অভিশপ্ত দস্যুদের শাস্তি দিতে হবে। কিন্তু এখন তা সম্ভব নয়। সুলতান মাহমুদ কোন্ রাজ্যে আক্রমণ করছেন তা জেনে নেই। তারপর এদের শায়েস্তা করবো। আরে! আমাদের মহাগুরু ধর্মপাল কেনো বসে আছেন। আপনি দেখছি কিছুই বলছেন না।

ধর্মপাল বললেন, আমি শুনেছি, সুলতান মাহমুদ এবার সোমনাথ আক্রমণ করবেন। তাই আমি ভাবছি, আমরা কীভাবে তাকে প্রতিহত করবো। এর কী ব্যবস্থা নেয়া যায়?

ধর্মপালের কথা শুনে দরবারের সবাই স্তব্ধ হয়ে গেলো। অজানা একটা ভয় আর আতংকে ছেয়ে গেলো দরবার কক্ষ। মহারাজাও পেরেশান হয়ে গেলেন। বললেন, আপনি নিশ্চিতভাবে জানতে পারলেন কীভাবে?

ধর্মপাল বললেন, আমার নিকট দু'জন তুর্কী এসেছিলো। তারা সুলতান মাহমুদের ফৌজের লোক। তারা আমাকে বলেছে, এবার সুলতান মাহমুদ সোমনাথ আক্রমণ করবেন।

মহারাজার কণ্ঠ থেকে বিস্ময় ঝড়ে পড়লো। আরে! আপনি তাদের গ্রেফতার করলেন না কেনো?

ধর্মপাল বললেন, আমি তাদের এ কারণে গ্রেফতার করিনি যে, তারা মহারাজাসহ সোমনাথের সকল অধিবাসীর উপর এক বিরাট অনুগ্রহ করেছে। রাজকুমারী দুর্ধর্ষ দস্যুদলের কবলে পড়েছিলো। দস্যুরা রাজকুমারীর রক্ষী সৈন্যদের হয় মেরে ফেলেছে, না হয় পালিয়ে গেছে। ঠিক তখন এ দুই নওজোয়ান তুর্কী দৈবক্রমে সেখানে উপস্থিত হয়ে দস্যুদের পরাজিত করে রাজকুমারীকে রক্ষা করেছে।

মহারাজা বললেন, কিন্তু দস্যুদের এতো বড় সাহস কীভাবে হলো যে, তারা রাজকুমারীর প্রতি হাত বাড়ালো?

ধর্মপাল বললেন, তারা পেশাজীবী দস্যু নয়। জঙ্গলের নিকটে এক মন্দির আছে। ওখানের পূজারী ও পুরোহিতরা এ কাজ করেছে।

ধর্মপালের এ কথা শুনে দরবারের সবাই দিশেহারা হয়ে গেলো। মহারাজা অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন, এ হতভাগ্যদের ধরে এনে প্রকাশ্যে জনসম্মুখে হত্যা করা হোক!

ধর্মপাল বললেন, এখন আর তাদের কেউ জীবিত নেই। তারা সবাই এখন মৃত। যাক এখন আমার পরামর্শ হলো, সুলতান মাহমুদের আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য আমাদের যথাযথ প্রস্তুতি নিতে হবে। সকল রাজা-বাদশাহকে সংবাদ দিতে হবে, তারা যেনো এই পবিত্র স্থানটি রক্ষার জন্য অধিক সৈন্য-সামন্ত প্রেরণ করেন।

মহারাজা বললেন, আপনি অত্যন্ত বাস্তবসম্মত কথা বলেছেন। এখনই দাওয়াতনামা লেখা হোক।

সাথে সাথে দাওয়াতনামা লেখা হলো এবং দূতের মাধ্যমে ভারতের রাজা-মহারাজাদের নিকট পাঠিয়ে দেয়া হলো। মহারাজা নির্দেশ দিলেন, কেল্লার পাঁচিলে সৈন্য মোতায়েন করা হোক এবং কেল্লার হেফাজতের যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হোক!

মহারাজার এসব নির্দেশ কার্যকর হয়ে গেলে মহাগুরু ধর্মপাল আসন ছেড়ে মহারাজার নিকট গিয়ে অনুচ্চ কণ্ঠে বললেন, অন্নদাতা! এ যুদ্ধের বিষয়টি পরিষ্কার হওয়ার পূর্বে রাজকুমারীর বিয়ের বিষয়টি মুলতবি রাখা হোক।

মহারাজা বললেন, মুলতবি তো রাখতেই হবে। এ হাঙ্গামার মাঝে, এ ত্রাস আর ভয়ের মাঝে বিয়ের আয়োজন হতে পারে না।

দরবার শেষ হয়ে গেলো। মহারাজাসহ সকল দরবারি নিজ নিজ আসন ছেড়ে চলে গেলেন।

হারুন ও তার সঙ্গী মুলতানে এসে জানতে পারলো, দু'এক দিনের মধ্যেই সুলতান মাহমুদ গজনবী তাঁর বাহিনী নিয়ে মুলতান এসে পৌঁছবেন। তাই ক্লান্ত শরীর নিয়ে তারা আর সামনে অগ্রসর হলো না। বিশ্রামের জন্য তারা মুলতানে থেকে গেলো।

১০২৪ সালের ১৫ অক্টোবর সুলতান মাহমুদ গজনবী তাঁর বাহিনী নিয়ে মুলতানে এসে পৌঁছলেন। পদাতিক ও অশ্বারোহী বাহিনী মিলে প্রায় পঁচিশ হাজার সৈন্য নিয়ে তিনি এসেছেন। মুলতানের এক বিরাট ময়দানে তিনি বাহিনী নিয়ে অবস্থান করছেন। সত্যই সে এক বিস্ময়কর দৃশ্য। সর্বত্র তাঁবু আর তাঁবু। একদিন সকালে ফজরের নামায পড়ে হারুন সুলতানের তাঁবুতে গিয়ে সাক্ষাতের অনুমতি প্রার্থণা করলো।

আল্লাহ জানেন, হারুন নামে কি আকর্ষণ আছে! সাথে সাথে সুলতান তাকে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করলেন। হারুন প্রবেশ করে অত্যন্ত আদবের সাথে সুলতানকে সালাম করে। সুলতানের তাঁবুটি বেশ প্রশস্ত ও অত্যন্ত সুসজ্জিত। মূল্যবান কার্পেট বিছানো। একধারে ভারতের বিরাট মানচিত্র ঝুলানো। অপরদিকে সারি সারি অস্ত্র সাজানো।

সুলতান প্রায় বৃদ্ধ। সাতান্ন বছরের কাছাকাছি বয়স। কিন্তু গড়ন অত্যন্ত মজবুত। চলাফেরায় বাহাদুরী ভাব স্পষ্ট। চেহারায় শৌর্য-বীর্য ও দীপ্তির আলামত পরিস্ফুট। প্রত্যহ ব্যায়াম ও সামরিক কৌশল চর্চার কারণে তার দৈহিক কাঠামো এখনো অটুট। সুলতানকে দেখে কেউ বলবে না, তাঁর বয়স পঁয়তাল্লিশের বেশি হবে।

সাদা লম্বা দাড়ি, অত্যন্ত আকর্ষণীয় চেহারা। প্রশস্ত কপাল। চাহনি থেকে সর্বদা বুদ্ধিমত্তা উপচে পড়ে। সুলতানের সামনে সিপাহসালার আলতুনতাশ বসে আছেন। হারুনকে দেখেই সুলতান মৃদু হেসে বললেন, বেটা হারুন! তুমি এসেছো?

অত্যন্ত বিনয়-নম্র কণ্ঠে হারুন বললো, হ্যাঁ আলমপানাহ! আমি এসে গেছি।

ঃ বসো, তুমি কি ধর্মপালের সাথে দেখা করেছিলে?

ঃ হ্যাঁ, আপনার নেক দোয়ায় আমি তাঁর সাথে দেখা করেছি, চিঠিও দিয়েছি।

ঃ সে কি কোনো উত্তর দিয়েছে?

ঃ হ্যাঁ।

হারুন একটি চিঠির খাম বের করলো। আলতুনতাশ সেটি হারুনের হাত থেকে নিয়ে খুলে চিঠিটি সুলতানকে দিলেন। সুলতান চিঠিখানা পড়ে মৃদু হাসলেন। তারপর বললেন, সোমনাথ মন্দিরের ব্যাপারে হিন্দুদের বিশ্বাস অত্যন্ত দৃঢ়। সম্ভবত ভারতের সকল রাজা এক পতাকাতলে একত্রিত হয়ে যুদ্ধ করবে।

আলতুনতাশ বললেন, তাহলে তো ভীষণ চিন্তার ব্যাপার!

সুলতান আবেগে উদ্বেলিত হয়ে বললেন, চিন্তার কী আছে? পেশোয়ারের যুদ্ধে কি রাজা জীপালের সাথে অন্যান্য রাজারা এসে যোগ দেয়নি? বাহাতিয়ার যুদ্ধে রাজা বাজোরায়কে অন্যান্য রাজারা কি সাহায্য করেনি? নগরকোটের যুদ্ধে কি সবাই রাজা আনন্দপালকে সাহায্য করেনি? মথুরায় রাজা কালাচান্দকেও তো

সকল রাজা সাহায্য করেছিলো। কনৌজের রাজা কালিঞ্জরকেও তো তারা সাহায্য করেছিলো। আল্লাহ কি আমাদেরকে এ সকল যুদ্ধে বিজয় দান করেননি? মনে রাখবে, বিজয় সৈন্য সংখ্যা আর সামরিক শক্তি বলে হয় না। আল্লাহর সাহায্য-সহযোগিতায়ই যুদ্ধে বিজয় নিশ্চিত হয়ে থাকে। আমি কোন যুদ্ধেই– তা যতো ভয়াবহ হোক না কেনো– সৈন্য ও শক্তির উপর ভরসা করিনি। সর্বদা আল্লাহর সাহায্যের উপরই ভরসা রেখেছি। তাই আল্লাহ আমাকে সাহায্য করেছেন। আমার বিশ্বাস, আল্লাহ এবারো আমাকে লজ্জিত করবেন না। আমি ইসলামের পতাকাবাহী। ইসলামের এক নগণ্য ও নিবেদিতপ্রাণ সেবক। আমি আল্লাহর আনুগত্য করছি। আল্লাহ অবশ্যই আমাকে সাহায্য করবেন এবং দুশমনের উপর বিজয় দান করবেন।

আলতুনতাশ বললেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা এবারও আমাদের সাহায্য করবেন। আমরাই আল্লাহর রহমতে বিজয় লাভ করবো। অদূরদর্শিতার কারণেই আমি সে কথা বলেছিলাম।

সুলতান বললেন, মুজাহিদের কাজ জিহাদ করা। জিহাদের উদ্দেশ্যেই আমরা ভারত আক্রমণ করেছি। হ্যাঁ, গনীমতের লোভ আমার অন্তরে কখনো আসেনি। তবে আল্লাহ তায়ালা নিজ দয়ায় আমাদের বিজয়ও দান করেছেন আবার গনীমতও দান করেছেন।

হারুন বললো, ইনশাআল্লাহ সোমনাথও বিজয় হবে। আর এ বিজয়ের মাধ্যমে ভারতে ইসলামের পতাকা উড্ডীন হবে। মুসলমানদের ভয়ে হিন্দুরা ভীত হয়ে থাকবে, আর সুলতানের এমন খ্যাতি অর্জিত হবে, যা অন্য কারো কখনো হয়নি।

আলতুনতাশ বললেন, আল্লাহ তোমার কথায় বরকত দান করুন।

সুলতান বললেন, হারুন! একথা কি সত্য যে, সোমনাথের এই পথ অত্যন্ত বন্ধুর ও দুর্গম।

হারুন বললো, আমি এ পথে গিয়েছি ও এসেছি। অত্যন্ত দুর্গম পথ। মুলতান থেকে আজমীর পর্যন্ত তিনশ' পঞ্চাশ মাইল পথ একেবারে মরুভূমি। এ দীর্ঘ পথে পানির কোনো নাম-নিশানা নেই। এতো গরম পড়ে যে, মানুষ তো দূরের কথা পশুরা পর্যন্ত পিপাসায় হাঁফাতে থাকে। খাবার পানি, ঘাস ও গাছপালার অভাবে মানুষ, পশু সবাই মৃত্যুর মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়।

সুলতান বললেন, বেটা! তিনশ পঞ্চাশ মাইলের মরুভূমি যদি প্রত্যেক দিন বিশ মাইল অতিক্রম করা হয়, তাহলে মাত্র আঠারো দিনে এ মরু অঞ্চল অতিক্রম করা যাবে। তাহলে ধরে নেয়া যাক, আমাদের বিশদিনের খাবার-পানি সাথে নিয়ে যাত্রা শুরু করতে হবে।

আলতুনতাশ বললেন, কিন্তু জাহাপনা! আমাদের বাহিনীতে তো এতো বাহন জন্তু নেই যে, এতো দিনের খাবার- পানি নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে।

সুলতান বললেন, তা আমি জানি। আচ্ছা, তোমরা কি বলতে পারবে, মালপত্র বহনের উট কয়টি আছে?

ঃ বিশ হাজার উট আছে।

ঃ হ্যাঁ, প্রয়োজনের তুলনায় সংখ্যাটি কম বটে। আরো দশ হাজার উটের ব্যবস্থা করো।

ঃ মুলতানে এতো উট পাওয়া দুষ্কর হবে।

ঃ চেষ্টা তো করতে হবে। এখানে না পাওয়া গেলে অন্য কোথাও থেকে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

মজলিসে এক আমীর উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি বললেন, আমি পাঁচ হাজার উটের ব্যবস্থা করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

আলতুনতাশ বললেন, আমিও পাঁচ হাজার উটের ব্যবস্থা করবো।

সুলতান বললেন, দেখ, উট কিন্তু অন্যায়ভাবে সংগ্রহ করো না। রাজ কোষাগার থেকে অর্থ দিয়ে যথাযথ মূল্য পরিশোধ করে উট সংগ্রহ করবে।

আলতুনতাশ বললেন, আচ্ছা তা-ই হবে। আমরা কারো কোনো কিছু জুলুম করে নেইনি। মূল্য পরিশোধ করেই নিয়েছি।

ঃ এদিকে খুব খেয়াল রাখতে হবে। কারণ, আমরা পরদেশে আছি। বিজাতির মাঝে ভ্রমণ করছি। যদি আমরা এদেশের মানুষের উপর যুলুম- অত্যাচার করি, তাহলে ইসলামের প্রতি তাদের কু-ধারণা সৃষ্টি হবে। তারা আমাদের যাত্রাপথে বাধার সৃষ্টি করবে। তাছাড়া এটা আল্লাহর নির্দেশ। ইসলামের আদর্শ হচ্ছে, প্রজাদের উপর জুলুম করা যাবে না। ইসলামের পূর্বসূরি বিজয়ী মহাপুরুষদেরও এই ঐতিহ্য, এই আদর্শ ছিলো। আমাদেরকেও তাদের অনুসরণ করতে হবে।

ঃ আমরা পূর্ব থেকেই এ বিষয়ে খুব খেয়াল রাখছি।

ঃ আর এ বিষয়টির প্রতিও খেয়াল রাখবে, যেনো আমাদের বাহিনীর কেউ জানতে না পারে, আমরা কোন্ শহর আক্রমণ করতে যাচ্ছি। কারণ, যদি কোনোভাবে হিন্দুরা এ কথা জানতে পারে, তাহলে তাদের মাঝে আলোড়ন সৃষ্টি হবে। সোমনাথ রক্ষার্থে তারা আত্মাহুতি দিতে প্রস্তুত হয়ে যাবে। তখন পথে পথে আমরা বাধার সম্মুখীন হতে থাকবো।

ঃ হ্যাঁ, এদিকে খুব তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখা হচ্ছে।

ঃ আমাকে একটি বিষয় খুব ভাবিয়ে তুলছে। তাহলো, সোমনাথ হিন্দুদের একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। সকল হিন্দুর মনে এ পবিত্র ভূমির মর্যাদা বিরাজমান।

সুতরাং এ শহর পদানত করা সহজ নয়। তবে আমি আল্লাহর উপর ভরসা করছি। আল্লাহ তা পদানত করিয়ে দেবেন। তুমি বাহিনীর মাঝে ঘোষণা করে দাও, প্রত্যেক সৈন্য যেনো নামাযের পর বিজয়ের জন্য দোয়া করতে থাকে।

ঃ আজই এ ঘোষণা করে দেবো।

ঃ আচ্ছা, এখন তুমি যাও। উটের ব্যবস্থা করো। এর মাঝে বাহিনী প্রস্তুত করিয়ে নাও।

সুলতান মাহমুদ গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে গেলেন। মজলিসের সবাই একে একে উঠে এলো।

সাত.

সুলতানের বাহিনীতে ত্রিশ হাজার মুজাহিদ। তাদের কোনো বেতন-ভাতা দিতে হয় না। স্বেচ্ছায় সাগ্রহে তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করতে বাহিনীতে যোগ দিয়েছে। তবে তাদের যাবতীয় খরচ রাজ কোষাগার থেকে বহন করা হয়।

এ বিশাল বাহিনীর সারি সারি তাঁবু মাইলের পর মাইল জুড়ে স্থাপন করা হয়েছে। অত্যন্ত নিপুণভাবে বিন্যস্ত করে স্থাপন করা হয়েছে তাঁবুগুলো। হারুন ও তার বন্ধু– যে তার সাথে সোমনাথে গিয়েছিলো– মুজাহিদ বাহিনীর কমান্ডার। তাদের প্রত্যেকের অধীনে রয়েছে এক হাজার করে জানবাজ যোদ্ধা। হারুনের বন্ধুর নাম বুরহান। উভয়ে তাদের অধীন বাহিনী নিয়ে স্ব স্ব স্থানে অবস্থান করলেও তারা প্রায়ই একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ করে। গল্প-গুজব করে। হাসি-আনন্দ করে। উভয়ের মাঝে অনন্য এক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। একে অপরের জন্য জান দিতে সদাপ্রস্তুত। এ বিশাল বাহিনীর সাথে কেউ কেউ তাদের পরিবার-পরিজনও নিয়ে এসেছে।

সিপাহসালার আলতুনতাশ তার পরিবার-পরিজন নিয়ে এসেছেন। সাথে স্ত্রী শামসা ও এক মেয়ে। মেয়েটির নাম আনীসা। দেখতে সাক্ষাৎ পরী। রূপে-গুণে অতুলনীয়। চকিতে কারো দৃষ্টি নিপতিত হলে চটজলদি সরিয়ে আনা দায়। যে-ই তাকে দেখেছে বিমোহিত হয়েছে। সিপাহসালার আলতুনতাশ বুরহানের দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়। তাই মাঝে মাঝে বুরহান তার সাথে দেখা করতো। একদিন বুরহান আলতুনতাশের তাঁবুতে গেলো। কিন্তু আলতুনতাশকে পেলো না। ফেরার পথে দু'এক কদম ফেললো। ইতিমধ্যে হঠাৎ আনীসার সাথে দেখা হয়ে গেলো। বুরহানের পা যেনো মাটিতে গেঁথে গেলো। চোখ যেনো বিস্ময়ে স্থির হয়ে রইলো। ইতিপূর্বে বুরহান তাকে দেখেছে। সেও বুরহানকে দেখেছে। কিন্তু সামনাসামনি কখনো একে অপরকে দেখেনি। বুরহান ক্ষণকাল আত্মহারা ও

বিমোহিত হয়ে রইলো। তারপর আনীসার কণ্ঠ থেকে যেনো হাজার বীনার সুর উত্থিত হলো। বললো, ভুল করেই কি আজ আপনি এদিকে চলে এলেন!

বুরহান আত্মস্থ হয়ে বললো, চাচাজানের সাথে দেখা করতে এসেছিলাম।

ঃ তা তো আমি জানি, তবে আসার কারণ?

ঃ সুনির্দিষ্ট কোনো কারণ ছিলো না। এমনিই দেখা করতে এসেছিলাম।

ঃ শুনলাম, আপনি নাকি সোমনাথ গিয়েছিলেন?

ঃ হ্যাঁ, গিয়েছিলাম।

ঃ শুনেছি, সেখানে নাকি বহু পরী বাস করে?

ঃ পরী... কই আমি তো দেখিনি!

আনিসার গণ্ডদেশে একটি সুন্দর ছোট্ট টোল ছিলো। সে মৃদু হেসে বললো, তাহলে সোমনাথের হূরকে কি দেখেছিলেন?

ঃ সোমনাথের হূর! উহু, সোমনাথের রাজকুমারীর কথা বলছো? হ্যাঁ, তাকে দেখেছি।

আনিসা বললো, নিশ্চয়ই পরমাসুন্দরী হবে!

ঃ হ্যাঁ, সুন্দরীই বটে। হারুন ভাই তো তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

আনীসার অধরে কুটিল হাসি। বললো, আর আপনি...।

ইতিমধ্যে আনীসা বুরহানের চেহারায় তার ডাগর নয়ন দু'টি মেলে ধরলো আর বুরহান তার রূপ-সুষমায় মোহিত হয়ে ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বললো, আমি শুধু এতোটুকু বলতে পারি, হ্যাঁ, সত্যিই সে রূপসী-সুন্দরী। কিন্তু...

ঃ কিন্তু আপনার দৃষ্টিতে কি সে 'পরমা' নয়?

বুরহানের কণ্ঠে দ্বন্দ্ব। তবুও সে দ্বন্দ্বের প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে বললো, আমি তাকে পরমাসুন্দরী মনে করতে পারিনি।

আনীসার কণ্ঠে এক আকাশ বিস্ময়। বললো, কেনো?

ঃ গোস্তাখী মাফ হলে বলতে পারি।

ঃ বলুন।

ঃ আমার দৃষ্টিতে তো সর্বদা তোমার অসম্ভব রূপ সৌন্দর্যের তরঙ্গমালা ঢেউ খেলতে থাকে।

আনীসার মাথা অবনত। অভূতপূর্ব এক লজ্জার অনুভূতিতে তার গণ্ডদেশ রক্তিম হয়ে ওঠলো। ফলে তার রূপ-সুষমা আরো বিকশিত, আরো মোহময় হয়ে ওঠলো। বন্য হরিণীর দীপ্তিময় ডাগর চোখ মেলে সে বুরহানের দিকে তাকালো। তারপর বললো, আচ্ছা, এখন আবার আপনি আমাকে...

ঃ কুদরত যাকে তুলনাহীন বানিয়েছে, আমি তাকে কী বানাবো? তুমি জানো না আনীসা!

আনিসা কিছুটা আমোদিত হয়ে বললো, আমি সবকিছু জানি। যদি আপনি বলেন, তাহলে আমি আপনার মনের সব কথা বলে দিতে পারি।

ঃ তুমি যখন আমার অন্তরের গভীরে অনুপ্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছো, তখন নিশ্চয় আমার মনের কথাও বলতে পারবে। বলো তো দেখি।

ঃ আপনি তো রাজকুমারীর সৌন্দর্যের প্রশংসা করে থাকেন।

ঃ না, আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি সর্বদা তোমার রূপের, তোমার সৌন্দর্যের প্রশংসা করি। আমি হারুনকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছি, রাজকুমারী তোমার মতো রূপবতী ও সুন্দরী নয়।

ঃ তাহলে মনে হচ্ছে, আপনি আমার বদনাম করার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছেন।

ঃ উ-হু, তাহলে তো এটা আমার অবশ্যই ভুল হয়ে গেছে। দীর্ঘদিন যাবত যা অন্তরের গভীরে গোপন করে রেখেছি, আমার অসতর্কতার কারণে তা প্রকাশিত হয়ে গেলো। আমাকে মাফ করে দাও আনীসা!

আনীসার কণ্ঠে উষ্মা ছড়িয়ে পড়লো। বললো, না, আপনার থেকে তো আমার পাওয়ার কিছু নেই। সুতরাং করুন, আমার যতো বদনাম করার করুন।

আনীসার উষ্মাভাব দেখে বুরহান কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলো। তারপরই দিশেহারা হয়ে আগে বেড়ে আনীসার ডান হাতটা আলতোভাবে ধরে বিনয় বিগলিত কণ্ঠে বললো, আনীসা! আমাকে ক্ষমা করে দাও। আমার এ ভুলের কারণ, হারুন ভাই রাজকুমারীর সীমাহীন প্রশংসা করছিলো। তাই আমিও এর বিপরীত মন্তব্য করতে ব্যর্থ হয়েছি।

ঃ কিন্তু সে মনে মনে কী ভাববে, তা কি একবার ভেবে দেখেছেন?

ঃ সে হয়তো তোমাকে দেখেছে। আমি তোমার কথা বললে সেও আমার মতো বলে।

ঃ আপনি কি উপলব্ধি করতে পেরেছেন, এতে আমি কতো লজ্জা পাচ্ছি?

ঃ আমি সে সময় বুঝতে পারিনি। এখন বুঝতে পারলাম। ভবিষ্যতে আর কখনো এমন হবে না।

ঃ যদি কোনোভাবে আব্বা বা আম্মা আপনাদের এসব জানতে পারেন, তাহেলে যে কী হবে...।

ঃ শান্ত হও। নিশ্চিন্ত থাকো। হারুনকে আমি ভালোভাবে চিনি ও জানি। সে কখনো কারো সাথে এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করবে না।

ঃ আপনি কাজটি ভালো করেননি। সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে।

ঃ অবশ্যই আমি সর্তক থাকবো। আল্লাহর শুকরিয়া যে, এবার তুমি আমাকে মাফ করে দিয়েছো।

বুরহানের কথা শুনে আনীসা বিস্মিত হয়ে তার দিকে চোখ তুলে তাকালো। তারপর মিটি মিটি হেসে বললো, হ্যাঁ, আমি তোমাকে মাফ করে দিয়েছি।

ঃ 'ভবিষ্যতে ভুল হবে না' এ সতর্কবাণীসহ তো?

ঃ তা তো অবশ্যই।

ঃ তুমি এখনো অসন্তুষ্ট আছো। তা হলে তো তোমার মান ভাঙাতে হবে।

ঃ অবশ্যই।

ঃ আচ্ছা তাহলে তা-ই হবে। এই বলে বুরহান আনীসার হাত মজবুত করে ধরলো। আনীসা বুঝে ফেললো, বুরহানের মতলব খারাপ। সে হাসতে হাসতে বললো, হয়েছে, খুব হয়েছে। তবে আপনার বিনয় বিগলিত হওয়ার দরকার ছিলো। এভাবে মাফ চাওয়া ঠিক নয়।

ঃ তাহলে মাফ করে দাও।

ঃ মাফ তো আমার করতেই হবে। বলেই আনীসা হাসতে লাগলো।

বুরহান তার হাত ছেড়ে দিয়ে বললো, বহুত বহুত শুকরিয়া। আনীসা! তুমি কি জানো, তোমার অসন্তুষ্টি আমার অন্তরে কী তোলপাড় সৃষ্টি করে!

ঃ আচ্ছা, আমরা কবে এখান থেকে যাত্রা শুরু করবো, তা কি আপনি বলতে পারেন?

ঃ দু-চার দিনের মধ্যেই। উট সংগ্রহের জন্য দেরি হচ্ছিলো। আলহামদুলিল্লাহ, তার ব্যবস্থা হয়ে গেছে। সত্বরই যাত্রা শুরু হবে।

ঃ কিন্তু এতো উটের কী প্রয়োজন?

ঃ মুলতান থেকে আজমীর পর্যন্ত ৩৫০ মাইল পথ শুধুই মরুভূমি। এ দীর্ঘ পথে সবুজের কোনো ছোঁয়া নেই। ঘাস-পানির কোনো ব্যবস্থা নেই। তাই উটে করে রসদপত্র ও পানি নিয়ে যেতে হবে।

ঃ অন্য কোনো পথ নেই কি, যে পথে পানি পাওয়া যাবে?

ঃ আছে, তবে খুব দীর্ঘ। তদুপরি সে পথ অনিরাপদ। কারণ, সে পথে হিন্দুদের আবাস। হিন্দুদের রাজত্ব। হতে পারে পথেই তারা সবাই একত্রিত হয়ে এক নেতৃত্বে আমাদের বিরুদ্ধে মোকাবেলা করতে প্রস্তুত হয়ে যাবে। তখন সম্মুখে অগ্রসর হওয়া খুবই কষ্টকর হবে।

ঃ আপনি কি সোমনাথের কেল্লা দেখেছেন?

ঃ দেখেছি। এক রাতে আত্মগোপন করে আমি আর হারুন ভাই সেখানে গিয়েছিলাম। অত্যন্ত মজবুত কেল্লা। অত্যন্ত উঁচু ও প্রশস্ত। এখনো পর্যন্ত এ ধরনের কেল্লা আমি কোথাও দেখিনি। একেবারে সমুদ্রের তীরে অবস্থিত। সমুদ্রের ফেনিল তরঙ্গমালা এসে কেল্লার প্রাচীরে আছড়ে পড়ে।

ঃ কিন্তু রাজকুমারীকে আপনারা কীভাবে দেখতে পেলেন?

ঃ সে এক অলৌকিক ব্যাপার। আমি আর হারুন বনের পথ ধরে যাচ্ছিলাম। পথেই রাত হয়ে গেলো। চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। কিছুই দেখা যাচ্ছিলো না। অন্ধকারে আমরা হাতড়ে পথ চলছিলাম। হঠাৎ আর্তচিৎকার আর শোরগোল শুনতে পেলাম। আমরা সে দিকেই ঘোড়া ছুটালাম। কিছু দূর যাওয়ার পর আলো দেখতে পেলাম। কাছে গিয়ে দেখি, কয়েকজন দস্যু কয়েকটি যুবতীকে ঘিরে আছে। আমরা দস্যুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। তাদের হত্যা করার পর জানতে পারলাম, তাদের মাঝে রাজকুমারী রয়েছে। রাজকুমারী আমাদের খুব কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলো।

ঃ মনে হচ্ছে, সে দেশে দস্যুদের উপদ্রব বেশি।

ঃ আমারো তা-ই মনে হয়।

ঃ আচ্ছা আমি এখন যাচ্ছি। হয়তো আব্বাজান এখনই এসে পড়বেন।

একথা বলেই আনীসা চপল পদক্ষেপে বন্য হরিণীর ন্যায় পালিয়ে গেলো।

বুরহান পলকহীন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলো। সে আরো কিছুক্ষণ আলতুনতাশের অপেক্ষা করে ফিরে এলো। আমীর আলী ও আলতুনতাশ উট সংগ্রহে খুব ব্যস্ত ছিলেন। কয়েকদিনের প্রচেষ্টায় তারা দশ হাজার উট সংগ্রহ করে ফেললেন।

উট মরুর জাহাজ। ক্রমাগত এক সপ্তাহ পানি পান ছাড়াই মরুর পথে নির্বিঘ্নে চলতে পারে। তাই কয়েকদিন উটগুলোকে পিপাসার্ত রেখে খুব ভালোভাবে পানি পান করালো। তারপর মশক ও পাত্রে পানি ভরে তাতে চাপিয়ে দেয়া হলো। রসদ-পত্রও বোঝাই করা হলো। তারপর সুলতানের এই বিশাল বাহিনী দুর্গম মরুর পথে মুলতান থেকে আজমীরের দিকে রওনা হলো।

আট.

ভারতবর্ষের কেউ জানে না, গাজী সুলতান মাহমুদ গজনবী কোন্ রাজ্যে আক্রমণ করবেন, কোন্ দেশটি পদানত করবেন। তাই ভারত বর্ষের কোন রাজা মহারাজার চোখে ঘুম নেই, স্বস্থি নেই। সবাই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। কিন্তু সবচে' বেশি দুশ্চিন্তা সোমনাথের মহারাজার। তার মনে হচ্ছে, সুলতানের মুজাহিদ বাহিনী তার দেশের দিকেই ধেয়ে আসছে। তাই তার দুশ্চিন্তার শেষ নেই। পেরেশানির অন্ত নেই।

মহারাজা শুধু নিকটবর্তী রাজা-বাদশাহদের নিকটই সাহায্যের আবেদন করলেন না; বরং গোটা ভারতবর্ষের সকল রাজা-বাদশাহ ও শাসকদের নিকট সাহায্যের আবেদন চেয়ে দূত পাঠালেন। সবাইকে পত্র লিখে জানিয়ে দিয়েছেন, সুলতান মাহমুদ তার সৈন্য নিয়ে পবিত্র ও পুণ্যময় সোমনাথের

দিকে ধেয়ে আসছেন, যে সোমনাথের সম্মান ও মর্যাদা প্রত্যেক হিন্দু সন্তানের হৃদয়ে প্রোথিত। মৃত্যুর পর মানুষের রূহ সোমনাথ মন্দিরে স্থাপিত দেবতার নিকট আসে এবং তার হুকুম অনুযায়ী কায়া গ্রহণ করে। সুতরাং প্রতিজন হিন্দুর দায়িত্ব সোমনাথকে রক্ষা করা, হানাদার সুলতানের বাহিনীকে পরাজিত করে ধূলিসাৎ করে দেয়া।

সোমনাথের মহারাজার এই আবেদন গোটা ভারতবর্ষের হিন্দুদের অন্তরে আশা জাগিয়ে তুললো। প্রত্যেক রাজ্য থেকে দলে দলে যোদ্ধারা সোমনাথ অভিমুখে আসতে লাগলো।

ভারতবর্ষের হিন্দুরা চারটি বর্ণে বিভক্ত। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। ব্রাহ্মণরা হিন্দু ধর্মের রক্ষক। ধর্মের যাবতীয় ক্ষমতা তাদের পদপ্রান্তে অর্পিত। ক্ষত্রিয়রা শাসক সম্প্রদায়। রাজ্য শাসন করা, রাজ্যকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করা তাদের দায়িত্ব। বৈশ্যরা ব্যবসায়ি সম্প্রদায়। ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড নিয়ে থাকাই তাদের দায়িত্ব। চতুর্থ বর্ণ হলো শূদ্র। এদের দায়িত্ব উল্লিখিত তিন বর্ণের মানুষের সেবা করা এবং অম্লান বদনে তাদের নির্দেশ মেনে চলা। হিন্দুরা তাদেরকে অস্পৃশ্য মনে করে। তারা সবচে' নিচু শ্রেণীর মানুষ। হিন্দুরা তাদের থেকে অত্যন্ত নিচু মানের সেবা গ্রহণ করে। যে কোনো ধরনের সেবা করতে তারা বাধ্য। এ বর্ণ ছেড়ে সরে দাঁড়ানোরও তাদের কোনো অধিকার নেই। নিম্নবর্ণের এই অস্পৃশ্য মানুষেরা ব্রাহ্মণদের পথে চলাফেরা করারও অধিকার রাখে না। ক্ষত্রিয়দের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারে না। বৈশ্যদের সামনে বসতে পারে না। উচুঁ তিন বর্ণের সেবা করতে করতেই তাদের দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হয়।

শুধু তা-ই নয়। হিন্দু ধর্মে বর্ণ বিভেদ প্রথাটি এতো মারাত্মক যে, প্রত্যেক উচুঁ বর্ণের হিন্দুরা নিচু বর্ণের হিন্দুদের তুচ্ছতার দৃষ্টিতে দেখে, ঘৃণা করে। ক্ষত্রিয়রা বৈশ্যদের একারণে তুচ্ছতার দৃষ্টিতে দেখে যে, বৈশ্যরা সুদখোর মহাজন। ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষিকাজ করে থাকে। এরা আখলাক-চরিত্র, রুচি-পছন্দ ও সাহসিকতার ক্ষেত্রে নিম্ন স্তরের। তারা দেশ ও রাজ্য রক্ষার জন্য তরবারী ধরতে ভয় পায়।

ধর্মীয় ক্যারিশমা ব্রাহ্মণদের হাতে থাকার কারণে তারা নিজেদেরকে সবচে' উচু বর্ণের মনে করে। তারা ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য উভয় বর্ণের লোকদের তুচ্ছতার দৃষ্টিতে দেখে। বাস্তবেও ব্যাপারটি এমনই। সকল বর্ণের লোকরাই ব্রাহ্মণদের ইজ্জত ও সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে। তাদের সেবায় আত্মোৎসর্গ করাকে সৌভাগ্য মনে করে।

হিন্দুদের এই বর্ণবিভেদ তাদের মাঝে হিংসা-বিদ্বেষ ও পাপ-অন্যায়ের পথ

খুলে দিয়েছে। ইতিহাসের পাতা উল্টালেই দেখা যায়, ক্ষত্রিয়রা ব্রাহ্মণদেরকে হত্যা করেছে। ব্রাহ্মণরা ক্ষত্রিয়দের পদপৃষ্ঠ করেছে। ক্ষত্রিয়রা বৈশ্যদের ধন-সম্পদ ছিনিয়ে নিয়েছে আর বৈশ্যরা ক্ষত্রিয়দের ধরে ধরে যবাই করেছে। আর অসহায় অস্পৃশ্য শূদ্রদের সবাই নির্মম নির্যাতন করেছে। চতুস্পদ জন্তুর মতো তাদের হত্যা করেছে।

হিন্দু ধর্মের ভিত্তিই হলো হিংসা-বিদ্বেষ, মারামারি-হানাহানির উপর। ঝগড়া আর বিভক্তির উপর। তাই প্রত্যেক বর্ণের প্রথা হলো, ব্রাহ্মণরা ক্ষত্রিয়দের নিকট কন্যা বিয়ে দেবে না আর ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণরা বৈশ্যদের কন্যা বিয়ে করতে পারবে না। এ ছাড়া প্রত্যেক বর্ণের মন্দিরও আলাদা।

ভারতবর্ষে মুসলমানদের আগমনের পর হিন্দুরা দেখলো, মুসলমানদের কোনো বর্ণভেদ নেই। তারা সবাই সমান। উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণ এ ধরনের কোনো ঝামেলাই নেই। বিয়ে-শাদীতেও কোনো ভেদাভেদ নেই। কোনো বাধা নেই। বিত্তহীন মানুষের মেয়েকে আমীরের ছেলে বিয়ে করতে পারে। আমীরের মেয়েকে বিত্তহীন মানুষ বিয়ে করতে পারে। তখন থেকেই এ সমতাময় ধর্মের প্রতি তাদের আকর্ষণ বাড়তে থাকে। তারা বুঝে ফেলে, এই বর্ণভেদ, এই শ্রেণী বিন্যাস মানবতার প্রতি জুলুম। এ কোনো ধর্মীয় বিধান হতে পারে না। তাই হিন্দু ধর্মের প্রতি মানুষ বীতশ্রদ্ধ হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে আরম্ভ করে।

সোমনাথের মন্দিরের দেবতার মর্যাদা হিন্দুদের এই চার বর্ণের প্রতিটি লোকেরই অন্তরে বিদ্যমান। তাই কোনো হিন্দুই সোমনাথের পতনের চিন্তা করতে পারলো না। জীবনের বিনিময়ে সোমনাথ রক্ষার জন্য তারা তৈরি হয়ে গেলো। প্রত্যেক বর্ণের লোকেরা পৃথক পৃথকভাবে রণসাজে সজ্জিত হয়ে গেরুয়া রঙের পোশাক পরে বেরিয়ে এলো। সবারই এক প্রতিজ্ঞা, যে কোনো মূল্যে সোমনাথকে রক্ষা করতেই হবে।

হিন্দুদের প্রথা ছিলো, যারা গেরুয়া রঙের পোশাক পরে রণাঙ্গনে বেরিয়ে যেতো, তারা বিজয়ের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে কোনো পরোয়া করতো না। জীবন দিয়েই তারা বিজয় ছিনিয়ে আনতো।

গোটা ভারতবর্ষ থেকে যোদ্ধারা সোমনাথে আসতে লাগলো। প্রতিদিন যোদ্ধারা আসছে। কোনো রাজা বা বাদশার পতাকা নিয়ে তারা সোমনাথ রক্ষায় যোগ দিচ্ছে।

সোমনাথের কেল্লা বিশাল। কয়েক লাখ মানুষেরা তাতে অনায়াসে থাকা সম্ভব। তাই যারাই আসছে, তাদেরই কেল্লার ভেতরে থাকার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে সর্বক্ষণ কেল্লার প্রাচীর প্রহরা দিচ্ছে।

বিভিন্ন অঞ্চলের রাজারা এসে যোগদানের ফলে সোমনাথের মহারাজা কিছুটা স্বস্তিবোধ করতে লাগলেন। তার মনের অস্থিরতা দূর হয়ে প্রশান্তি ফিরে এসেছে।

সোমনাথের রাজপ্রাসাদে যখন যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে সবাই ব্যস্ত, তখন আমব্রেলীর রাজা পরমদেব সোমনাথের মহারাজার উপর চাপ সৃষ্টি করতে লাগলোন, যেনো সত্বর তার ছেলে শিকদেব-এর সাথে রাজকুমারীর বিয়ের আয়োজন করা হয়। সোমনাথের মহারাজা অবশ্য পত্র লিখে তাকে জানিয়ে দিয়েছেন, এখন সবাই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত; যুদ্ধের ব্যস্ততায় সবাই বেচাইন। সুতরাং এ সময়ে রাজকুমারীর বিয়ের আয়োজন করা সম্ভব নয়। সোমনাথের আকাশ থেকে এই অশনি দূর হয়ে গেলেই বিয়ের আয়োজন করা হবে।

পরমদেব ও শিকদেব-এর নিকট মহারাজার এই জবাব অপছন্দনীয় হলেও এখন মেনে নেয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই। কারণ, সোমনাথ রক্ষার জন্য এখন লাখ লাখ যোদ্ধা সেখানে উপস্থিত। তাই সোমনাথের মহারাজার শক্তি এখন অনেক বেশি। কিছুতেই এখন তাকে কাবু করা যাবে না।

রাজকুমারী চন্দ্রামুখী অত্যন্ত রূপসী। শুধু এ কারণেই রাজা পরমদেব রাজকুমারীর সাথে তার ছেলের বিয়ে দিতে চান এটা ঠিক নয়। বরং এর পেছনে আরেকটি সুপ্ত কারণ আছে। তাহলো, সোমনাথের মহারাজার আর কোনো সন্তান নেই। তাই মহারাজার মৃত্যুর পর সোমনাথের রাজ-ক্ষমতা অবলীলাক্রমেই তার হাতে চলে আসবে। এতে তার মর্যাদা বহুগুণ বেড়ে যাবে। সোমনাথের মহারাজা হওয়ার কারণে গোটা ভারতবর্ষের রাজা-মহারাজা ও রাজন্যবর্গ তাকে সম্মান করবে। ইজ্জত দেবে।

রাজপুত্র শিকদেব উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রের যুবক। লাল পানীয় আর কোমল নারী-দেহের প্রতি তার আকর্ষণ সীমাহীন। লাগামহীন এ উচ্ছৃঙ্খল জীবন-ঘোড়া নিয়ে সে কতো অলি-গলিতে ছুটেছে তার কোনো হিসাব নেই। তারপরও রাজকুমারী চন্দ্রামুখীকে দেখার পর সে এমন পাগলপারা হয়ে গেছে, যা অচিন্তনীয়। তার বিরহ আগুনে সে সর্বদা জ্বলছে। তার সারা দিনের ভাবনা, হয় দ্রুত তার বিয়ের ব্যবস্থা করা হোক, অন্যথায় যে কোনোভাবে রাজকুমারী চন্দ্রামুখীকে তুলে নিয়ে আসা হোক। এ নিয়ে তার ভাবনার অন্ত নেই।

রাজপুত্র শিকদেব এর এক বোন আছে। নাম কামিনী। সে রাজকুমারী চন্দ্রামুখীর ঘনিষ্ঠ বান্ধবী। শিকদেব তার বোনকে বলে দিলো, সে যেনো অবশ্যই কথার ফাঁকে ফাঁকে তার সম্পর্কে রাজকুমারীর মনোভাব জেনে নেয়। সে তাকে পছন্দ করে কি-না, তার প্রতি তার আকর্ষণ আছে কি-না এ সবকিছুই যেনো তাকে জানায়।

কামিনী অত্যন্ত রূপবতী যুবতী। তবে রূপ সুষমার সাথে সাথে সে দারুণ চালাক ও অত্যন্ত কূট-কৌশলী। সে রাজকুমারী চন্দ্রামুখীর সাথে ভাব জমিয়ে কথার ফাঁক গলিয়ে জেনে নেয়, রাজকুমারী তার ভাই শিকদেবকে পছন্দ করে

না। তার প্রতি তার অনুরাগের চে' বিরাগই বেশি। সে আরো জেনে নিলো, রাজকুমারী হারুন নামের ঐ তুর্কী যুবকের মোহে মোহাবিষ্ট, যে দস্যুদের হাত থেকে তাকে রক্ষা করেছিলো।

একদিন শিকদেব সোমনাথ এসে তার বোন কামিনীর সাথে সাক্ষাৎ করলো। কামিনী বললো, দাদা, আমি রাজকুমারীর মনোভাব জেনে ফেলেছি। রাজকুমারী আপনাকে পছন্দ করে না।

শিকদেব-এর চরিত্রে আরেকটি খারাপ গুণ এটাও যে, সে নিজেকে এমন সুশ্রী সুন্দর ও মার্জিত চরিত্রের যুবক মনে করে, যাকে দেখে, যার কথা শুনে যে কোনো যুবতী জীবন সঙ্গীরূপে নির্বাচন করতে দ্বিধা করবে না। তাই রাজকুমারী চন্দ্রামুখীর কথা শুনে সে দারুণ বিস্মিত হলো। বললো, চন্দ্রামুখী আমাকে পছন্দ করে না, এটা তো বিস্ময়কর কথা। নিশ্চয় এর কোনো কারণ আছে কামিনী।

ঃ হ্যাঁ, কারণ আছে বৈকি। আমি তা জানি।

ঃ তোর জানা থাকলে দেরি কেনো? জল্দি বল্।

ঃ আপনি হয়তো শুনেছেন, রাজকুমারী মহাগুরু ধর্মপালের সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলো। পথে দস্যুরা আক্রমণ করেছে। তখন দু'জন তুর্কী এসে দস্যুদের হত্যা করে তাকে রক্ষা করেছিলো।

ঃ হ্যাঁ, আমি সে ঘটনা শুনেছি। সে সময় তো তুমিও রাজকুমারীর সাথে ছিলে।

ঃ হ্যাঁ, ছিলাম। রাজকুমারী সেই দুই তুর্কী যুবকের একজনের খুব প্রশংসা করে। তার নাম হারুন। রাজকুমারী মহাগুরুর কুটিরে তার সাথে কথাবার্তা বলেছে। হাসি-উল্লাসও করেছে।

এ কথা শুনেই শিকদেব-এর অন্তরে ক্রোধের আগুন জ্বলে ওঠলো। অত্যন্ত রুক্ষ কণ্ঠে বললো, বরং এ কথা বলো যে, রাজকুমারী এক ম্লেচ্ছকে, এক যবনকে ভালোবাসে!

ঃ হ্যাঁ, তা-ই।

ঃ তুমিও তো সেই তুর্কীকে দেখেছিলে। সে কি এতোই সুদর্শন যে, রাজকুমারী তার প্রেমে পড়ে গেলো?

কামিনী বললো, ভাইজান, তুর্কীদের গড়ন এমনিতেই আকর্ষণীয়। তদুপরি হারুন অত্যন্ত সুপুরুষ, স্বাস্থ্যবান ও মার্জিত স্বভাবের যুবক।

ঃ আমি বুঝে ফেলেছি। কিন্তু সে তুর্কী মহাগুরুর নিকট কেনো এসেছিলো?

ঃ তা ঈশ্বরই জানেন। তবে শুনেছি, সে ভ্রমণ করতে করতে এদিকে এসেছিলো।

ঃ আমার মনে হচ্ছে, এতে কোনো রহস্য লুকিয়ে আছে। আমি শুনেছি, মহাগুরু মহারাজাকে বলে বিয়ের ব্যাপারটি স্থগিত করে দিয়েছেন। আজই আমি তার সাথে দেখা করে বিষয়টি জেনে নেবো। তবে আমার মনে হয়, এ

বিয়ে চিরদিনের জন্য স্থগিত করা হয়েছে। এটা আমব্রেলী রাজপরিবারের জন্য এক দূরপনেয় কলঙ্ক। আগামীকাল পূর্ণিমার রাত। রাতে সোমনাথের মহাদেবতাকে স্নান করানো হবে। তুমি অবশ্যই সংবাদ নেবে, রাজকুমারী এ অনুষ্ঠানে যাবে কিনা।

ঃ তাতে কী হবে ভাইয়া!

ঃ আমি চন্দ্রামুখীকে মাঝ পথ থেকে তুলে নিয়ে আসবো।

ঃ কিন্তু যদি মহারাজা জানতে পারেন, তাহলে তো খুনের দরিয়া বয়ে যাবে।

ঃ সে চিন্তা তোমার করতে হবে না। সুলতান মাহমুদ সোমনাথ আক্রমণ করার জন্য এগিয়ে আসছেন। তাই এ পরিস্থিতিতে তিনি কিছুই করতে পারবেন না। নীরবে সবকিছুই তাকে হজম করতে হবে। তাছাড়া রাজকুমারী তো আমারই বাগদত্তা। তাই আমি যদি তাকে নিয়ে আসি, এতে কারো কিছু বলার থাকবে না।

ঃ আমি তথ্য জেনে আগামীকাল আপনাকে জানাবো।

কামিনী চলে গেলো আর চিন্তাক্লিষ্ট শিকদেব বীর পদক্ষেপে ফিরে এলো।

নয়.

সোমনাথের অধিবাসীরা গুরুজ্বী ধর্মপালকে শুধু এ কারণেই সম্মান করে না যে, তিনি রাজকুমারীর শিক্ষক, রাজকুমারীকে উচ্চতর জ্ঞান দান করছেন। বরং তারা তাকে ঈশ্বরের নৈকট্যশীল সাধু পুরুষ মনে করে। সোমনাথের সাধারণ মানুষেরা বিশ্বাস করে, তিনি যা প্রার্থনা করেন, ঈশ্বর তা-ই কবুল করেন। তাঁর বুদ্ধিমত্তা-দূরদর্শিতারও বেশ প্রসিদ্ধি আছে। সোমনাথের মহারাজা যে কোনো সঙ্কট মুহূর্তে তার পরামর্শ গ্রহণ করেন, তার নির্দেশনা মতো চলেন।

রাজকুমারী চন্দ্রামুখীর শিক্ষাজীবন শেষ হওয়ার পর থেকে তিনি গহীন বনে বসবাস শুরু করেছেন । মহারাজা ডেকে পাঠালে বা পূর্ণিমার রাতে মহাদেবতার স্নানে অংশগ্রহণের জন্য ছাড়া অন্য কখনো সোমনাথে আসেন না। প্রত্যেক রাতেই সোমনাথে মন্দিরের দেবতাদের স্নান করানো হয়। স্নানের জন্য ছয় মাইল দূর থেকে গঙ্গার পানি আনা হয়। এ কাজের জন্য কিছু দূরে দূরে চৌকি স্থাপন করা হয়েছে। প্রত্যেক চৌকিতে ব্রাহ্মণরা থাকে। এই পানি আনার কাজে তারা অংশগ্রহণ করে। প্রত্যেক চৌকির ব্রাহ্মণরা তাদের চৌকি থেকে অন্য চৌকি পর্যন্ত পানি বয়ে আনে। এভাবে ছয়মাইল দূর থেকে ক্রমাগত গঙ্গার পানি আসতে থাকে। আর সে পানি দিয়েই স্নানের কাজ করা হয়। সোমনাথের মহারাজা এ কাজে নিয়োজিত ব্রাহ্মণদের পর্যাপ্ত অর্থকড়ি দিয়ে থাকেন। সোমনাথের অধিবাসীরা তাদের সম্মান করে। সোমনাথ মন্দিরের বিশেষ পূজারী হিসেবে তাদের বিভিন্ন সম্মানীও দিয়ে থাকে।

প্রত্যহ রাতে সাধারণ স্নান দেয়া হয়। পূর্ণিমার রাতে হয় মহা-আয়োজন। সেদিন দূর-দূরান্ত থেকে লোকেরা আসে। বিরাট মেলা বসে। বিচিত্র পণ্যসামগ্রীর পসরা নিয়ে ব্যবসায়ীরা দোকান খুলে বসে। ক্রয়-বিক্রয়ের ধুম পড়ে যায়।

সোমনাথ মন্দিরের দেবতাদের সম্পর্কে মানুষের এমনই বিশ্বাস যে, সাধারণ মানুষ ছাড়াও নামকরা সর্দার, জমিদার, ব্যবসায়ী, শাসক ও রাজা-বাদশাহরা পর্যন্ত পথব্রজে সোমনাথে এসে উপস্থিত হয় এবং নিজেদের সামর্থ অনুযায়ী মণিমুক্তা ও জহরতখচিত মহামূল্যবান কাপড় মহাদেবতাকে পরিধান করায়। প্রত্যেক মাসের পূর্ণিমার রাতে হাজার হাজার স্বর্ণমুদ্রা, রৌপ্যমুদ্রা ও হিরা-পান্না ও অন্যান্য অলংকার দেবতাদের পদপ্রান্তে উৎসর্গ করা হয়। আর চন্দ্রগ্রহণ লাগলে যে কী অবস্থা হয়, তা বলাই বাহুল্য। লাখ লাখ স্বর্ণ-রৌপ্যমুদ্রার স্তূপ পড়ে যায়। একাধিক মণি-মুক্তা-পান্নাখচিত কাপড় দেবতাদের পরিধান করানো হয়।

সোমনাথ মন্দিরে দু'হাজারের অধিক ব্রাহ্মণ থাকেন। মহারাজার ধনসম্পদ থেকেই তাদের পর্যাপ্ত পরিমাণের অর্থকড়ি প্রদান করা হয়ে থাকে। ফলে সোমনাথ মন্দিরের প্রতিজন ব্রাহ্মণ অত্যন্ত সম্পদশালী। ইহজীবনে তাদের কোনো অর্থ সংকট নেই।

সোমনাথের মহারাজা মন্দিরের প্রধান পরিচালক। ফলে তাকে অপরসীম সম্মান করা হয়। মানুষ তার সম্মানার্থে অবনত মস্তকে পদচুম্বন করে। রাজা-বাদশাহ ও বীরযোদ্ধারা পর্যন্ত তার সামনে নতশিরে দাঁড়িয়ে থাকেন।

পূর্ণিমার রাতের আর মাত্র এক দিন বাকি। সোমনাথে পূজারীদের সমাগম শুরু হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে প্রচুর পূজারী এসে গেছে। মন্দিরের ব্রাহ্মণরা স্নানের কাজে ব্যস্ত। তারা এদিক-সেদিক ছুটাছুটি করছে।

ধর্মপাল সোমনাথে এলে শাহীমহলে এক নির্জন কক্ষে অবস্থান করেন। তবে অধিকাংশ সময় একটি মন্দিরের এক কামরায় কাটান। সে মন্দিরে একটি ঝুলন্ত মূর্তি আছে। বহু দূর-দূরান্ত থেকে লোকেরা সে মূর্তিটি দেখতে আসে। মন্দিরটির বাইরের অংশ ধবধবে সাদা। কিন্তু ভেতরের সবকিছুই কুচকুচে কালো। বিছানা কালো, দেয়াল কালো, ছাদ কালো। তার মাঝে এক জমকালো মূর্তি। মূর্তিটি কোনো বেদীতে স্থাপন করা হয়নি বা কোনো কিছুর উপর ভর দিয়েও দাঁড়িয়ে নেই। তাকে শূন্যে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। তবে তা বুঝার বা ধরার কোনো উপায় নেই। তাই স্বাভাবিক দৃষ্টিতে সবাই তাকে শূন্যে দণ্ডায়মান মনে করে বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। সাধারণ মানুষেরা মনে করে, মূর্তিটি নিজ শক্তিবলে শূন্যে দাঁড়িয়ে আছে। তাই সবাই অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে মূর্তিটির পূজা করে। বিগলিত নেত্রে কেঁদে কেঁদে হাজত পূরণের প্রার্থনা করে।

শিকদেব ধর্মপালের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য প্রথমে সেই মন্দিরে গেলো। সেখানে তাকে না পেয়ে রাজপ্রাসাদে গেলো। রাজকুমারীর ভাবী পতি হওয়ার কারণে রাজপ্রাসাদে প্রবেশের জন্য তার কোনো ঝুটঝামেলা পোহাতে হলো না।

শিকদেব রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করে কিছুদূর অগ্রসর হতেই হঠাৎ রাজকুমারীকে যেতে দেখলো। রাজকুমারীর সাথে কয়েকজন সখী ও দাসি আছে। শিকদেব রাজকুমারীকে দেখে আর স্থির থাকতে পারলো না। দৌড় গিয়ে রাজকুমারীর নিকট পৌঁছলো। তাকে দেখেই সখী ও দাসিরা সম্মানার্থে মাথানত করে সরে দাঁড়ালো। আর শিকদেব-এর মাথা অনিচ্ছায় অবলীলায় রাজকুমারীর সামনে অবনত হয়ে গেলো।

রাজকুমারী চন্দ্রামুখী তখন উজ্জ্বল ঝলমলে কারুকার্যখচিত রেশমি শাড়ি পরিহিতা। কানে ঝলমলে রঙিন মুক্তার দুল। সারা পিঠজুড়ে ছড়িয়ে আছে কালো কুচকুচে কেশদাম। সত্যই তাকে তখন দারুণ চমৎকার দেখাচ্ছিলো। শিকদেবকে দেখেই রাজকুমারী দাঁড়িয়ে গেলো। রাজকুমারীরূপ-সৌন্দর্যের প্রভাবে শিকদেব একেবারে হতবুদ্ধি ও হতবাক্ হয়ে গেলো। বিস্ফারিত নয়নে হা করে রাজকুমারীকে দেখতে লাগলো। খানিক পর আত্মস্থ হয়ে বললো, ক্ষমা করবেন। আমি... আমি... একটি প্রয়োজনে...।

রাজকুমারী বন্য হরিণ ডাগর নয়ন মেলে তার দিকে তাকিয়ে বীনার ঝংকার তুলে বললো, হয়তো কোনো বিশেষ প্রয়োজনে এসেছো।

শিকদেব বললো, হ্যাঁ, একটি জরুরি কাজে আসতে হলো। গুরুজীর সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছি।

রাজকুমারী বললো, তিনি তো সোমনাথ মন্দিরে গিয়েছিলেন। তবে এখন হয়তো নিজ কামরায় বিশ্রাম করছেন।

শিকদেব বললো, নির্জনে আমার দু'টি কথা শুনবে কি?

রাজকুমারী গম্ভীর কণ্ঠে বললো, এখন আমার সময় নেই।

শিকদেব বললো, তাহলে আমি কখন আসবো?

রাজকুমারী বললো, গুরুজী ধর্মপালের নিকট জিজ্ঞেস করো।

শিকদেব বললো, বেশ ভালো।

শিকদেব অত্যন্ত ভগ্নহৃদয় নিয়ে পা টানতে টানতে চলে এলো আর রাজকুমারী চন্দ্রামুখী তার শোভা-সৌন্দর্য চারদিক ছড়িয়ে ও সুবাসিত করে সখী ও দাসী পরিবেষ্টিতা হয়ে চলে গেলো।

শিকদেব জানে ধর্মপাল রাজপ্রাসাদের কোন্ কামরায় থাকেন। তাই সে সেদিকে অগ্রসর হলো। সে সময় ধর্মপালের নিকট তার তিনজন শিষ্য বসা ছিলো। শিকদেব গিয়ে আদাব জানিয়ে নত হয়ে তার পদচুম্বন করলো। ধর্মপাল তাকে আর্শিবাদ জানিয়ে ইঙ্গিতে বসতে বললেন।

শিকদেব অত্যন্ত ভদ্রতার সাথে একপাশে বসে পড়লো।

ধর্মপাল জিজ্ঞেস করলেন, রাজকুমার! কেনো এসেছো?

শিকদেব উত্তরে কোনো ভূমিকা না রেখে বললো, আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করতে এলাম যে, আপনি কেনো রাজকুমারীর বিয়ে স্থগিত করে দিলেন?

ঃ সোমনাথের আকাশে যুদ্ধের ঘনঘটা দেখা দিয়েছে। সবাই এ নিয়েই ব্যস্ত। এ পরিস্থিতিতে বিয়ে হতে পারে না। বিয়ে তো আনন্দ-উল্লাস ও ফূর্তির ব্যাপার। এখন তো গোটা সোমনাথ দুশ্চিন্তার আঁধারে ডুবে আছে।

ঃ কিন্তু আমার মনে হয় এতে অন্য কোনো রহস্য আছে।

ঃ তোমার ধারণা মিথ্যা নয়।

ঃ তাহলে সেটা কী?

ঃ মনে হয় তুমি স্পষ্টভাবে শুনতে চাচ্ছো। তাহলে শোনো, রাজকুমারীর সাথে তোমার বিয়ে হবে না।

শুনে শিকদেব-এর মাথায় আগুন ধরে গেলো। ক্ষিপ্ত হয়ে বললো, কেনো?

ঃ কারণটা দিন কয়েক পরই তুমি জানতে পারবে।

ঃ তবে আমি মনে করি, মহারাজার জন্য উচিত হবে না আমাদের বংশের অপমান হয় এমন কিছু করা।

ঃ আমি জানি, আমব্রেলীর রাজবংশের অপমানজনক কোনোকিছু করার সাহসিকতা না দেখানোই উচিত। কিন্তু তবুও মাঝে-মধ্যে এমন কিছু সমস্যা দেখা দেয়, যার কারণে...।

শিকদেব ধর্মপালের কথা পূর্ণ করতে না দিয়ে অত্যন্ত অভদ্র ও শিষ্টাচারহীন কণ্ঠে বললো, হ্যাঁ, আমি সেই অক্ষমতার কথা জানি। তাহলো, রাজকুমারী হারুন নামের এক তুর্কী যুবকের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে।

ধর্মপাল শিকদেব-এর এ কথা শুনে অসহ্য হয়ে ধমক দিয়ে ওঠলেন। কিন্তু শিকদেব তার কথা বন্ধ করলো না। বললো, আপনি রাজকুমারীর গুরু। হয়তো আপনি সোমনাথকে ম্লেচ্ছ মাহমুদের হাত থেকে রক্ষার জন্য রাজকুমারী চন্দ্রামুখীকে মুসলমানদের হাতে অর্পণ করতে মনস্থ করেছেন।

ধর্মপাল ক্রোধান্বিত। তার চোখ দু'টি লাল। অগ্নিঝরা কণ্ঠে বললেন, রাজকুমার! তুমি একই সাথে আমাকে এবং মহারাজাকে অপমান করেছো? তোমার কি জানা নেই, এর পরিণতি কী হতে পারে?

শিকদেব-এর কণ্ঠে এবার ভাটার লক্ষণ। শান্তভাবে বললো, ভারতবর্ষের রাজা-মহারাজা ও রাজন্যবর্গের নিকট আপনার কি সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে তা আমি জানি। আমি এ কথাও স্বীকার করি, আপনার ইশারায় যে কোনো সময় গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যেতে পারে।

ধর্মপাল গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, যদি জেনেই থাকো, তাহলে যবান বন্ধ রাখো। রাজকুমারীর কথা ভুলে যাও। আমিও ভুলে যাবো, তুমি আমাকে এবং মহারাজাকে অপমান করেছো।

শিকদেও-এর কণ্ঠ খাদে নেমে এলো। তার চোখের তারায় ছলচাতুরী আর ধূর্তামির আভাস ফুটে ওঠলো। বিনয় বিগলিত কণ্ঠে বললো, কিন্তু... কিন্তু...গুরুজী আমার হৃদয়ে যে রাজকুমারীর প্রেমের আগুন লেগে গেছে, এ কারণেই আমি অনিচ্ছায় এ অসৌজন্যমূলক আচরণ করে ফেলেছি।

ঃ আমি তোমার এ অসৌজন্যমূলক আচরণের কথা কারো কাছে বলবো না। আমি তোমাকে মাফ করে দিলাম।

ঃ আমি আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকবো।

ঃ রাজকুমার! তুমি রাজকুমারী চন্দ্রামুখী সম্পর্কে কিছুই জানো না। শোনো, তার জীবনের সাথে এক রহস্য মিশে আছে, যা সত্বর প্রকাশিত হবে। আমার ধারণা, সে রহস্য প্রকাশিত হলে এ গ্রহের সবকিছুই বিস্ময়ে-বিমোহিত হবে।

শিকদেব ধর্মপালের কথার দিকে মনোযোগ না দিয়েই উঠে চলে গেলো।

দশ.

পূর্ণিমার রাতে সোমনাথ মন্দিরের দেবতাদের স্নান করানো হয়। তাই আশপাশের প্রায় সবাই মন্দিরে চলে এসেছে। যারা দূর-দূরান্ত থেকে এসেছিলো, তারা সবাই উপস্থিত আছে। স্নানের কাজে সহায়তার জন্য কিছু সিপাই এসে পৌঁছেছে। মন্দিরের আশপাশে তাই মানুষের প্রচণ্ড ভিড়। আশপাশে অস্থায়ী বাজার বসেছে। মেলা বসেছে। বিচিত্র পণ্যদ্রব্যের পসরা খুলে বসেছে বিভিন্ন অঞ্চলের ব্যবসায়ীরা। বাজার আর মেলায় মানুষের অভাব নেই। নারী-পুরুষ, যুবক-যুবতী, পৌঢ়-বৃদ্ধ, হাজারো মানুষ আসা-যাওয়া করছে। ডাক-চীৎকার আর শোরগোলে মুখরিত হয়ে আছে গোটা অঞ্চল।

হাজারো মানুষের এই সমারোহে কিছু উচ্ছৃঙ্খল, পকেটমার ও সুযোগ সন্ধানী যে আসেনি, তা নয়। তারা মানুষের ভিড়ে মিশে অত্যন্ত সাবধানতার সাথে বিত্তবানদের পকেট খালি করছে। নারীদের ভিড়ের মাঝে ফেলে কৌশলে হাতিয়ে নিচ্ছে তাদের গয়না-অলংকার সামগ্রী। উঠতি বয়সের উচ্ছৃঙ্খল ছেলেরা তরুণীদের সাথে ঠাট্টা-মশকারা করছে। উত্তক্ত করছে।

এ ধরনের কাজে অবশ্য রাজপুত্র বা উচ্চশ্রেণীর লোকদের কোনো সম্পর্ক নেই। তারা সর্বদা পূজারীদের সেবায় তটস্থ। তাদের চলাফেরা মার্জিত, আচার-আচরণ প্রশংসনীয়। সোমনাথের পবিত্রতা রক্ষা করাই যেনো তাদের প্রধান দায়িত্ব।

এদিকে সোমনাথ মন্দিরের ব্রাহ্মণরা বসে নেই। তারাও সমাগত সম্পদশালী ও বিত্তবান পূজারীদের নিয়ে ব্যস্ত। বিভিন্ন কৌশলে তাদের থেকে যে যা পারছে হস্তগত করছে। পরলোকের সুখ-শান্তি ও ঈশ্বরের বাণী শুনিয়ে বিদায় দিচ্ছে।

সোমনাথ মন্দিরের সামনে বিরাট খোলা প্রাঙ্গন। তাতে একসাথে অনায়াসে লাখের বেশি মানুষ সমবেত হতে পারে। মন্দিরের চারপাশে রয়েছে উঁচু মজবুত প্রাচীরের বেষ্টনী। যারা দূর-দূরান্ত থেকে স্নান কাজে যোগদান করার জন্য এসেছিলো, তারা এসে মন্দিরের খোলা প্রাঙ্গনে সমবেত হয়েছে।

সোমনাথের মন্দিরটি কেল্লার পশ্চাতে সমুদ্রের কোল ঘেঁষে অবস্থিত। মন্দিরের দক্ষিণ দিকটি সমুদ্রের তরঙ্গমালার বুকে দাঁড়িয়ে আছে। এদিকের সকল প্রাসাদ ও ভবনগুলোর জানালা ও বেলকনি সমুদ্রমুখী করে তৈরি করা হয়েছে।

সাধারণ মানুষের এদিকে আসার কোনো অনুমতি নেই। সোমনাথের মহারাজা, রাণী ও তাদের বংশের লোকজন আর রাজকুমারী ও তার সখী-দাসীরাই এদিকে আগমন করে থাকে। কখনো কখনো মহারাজার অনুমতিতে অন্যান্য রাজা-রাজকুমাররাও এ স্থানে আসে। তারা নৈসর্গিক সৌন্দর্য উপভোগ করে।

সমুদ্রের তীরে গড়ে ওঠা প্রাসাদ ও ভবনগুলোর জানালার কপাট খুলে দিলে ছুটে আসে সমুদ্রের মুক্ত বাতাস, যার ছোঁয়ায় শরীর ও মন প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে; হৃদয় জুড়ে কোমল প্রশান্তির নৃত্যলীলা শুরু হয়। দৃষ্টির সীমা ছাড়িয়ে দিগন্তের শেষপ্রান্তে আকাশ আর সমুদ্রের কোলাকুলি দেখতে দেখতে মন আত্মহারা হয়ে যায়।

মন্দিরের পূর্বদিকে দীর্ঘ গহীন বন। বিভিন্ন জাতের গাছ পরস্পর জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে। সকাল-সন্ধ্যায় পাখপাখালির কলকাকলিতে চারদিক মুখরিত হয়ে ওঠে। মাঝে-মাঝে পায়ে চলা সরুপথ। কাঠুরেরা এ পথে গমনাগমন করে। তারা কাঠ কেটে এনে বাজারে বিক্রি করে। শিকারীরাও এ পথে যাতায়াত করে।

গোধূলী লগ্ন। ক্লান্ত সূর্য পশ্চিমাকাশে যাই যাই করছে। কিছুক্ষণ পরই চারদিকে রাতের অন্ধকার নেমে আসবে। ঠিক তখন শিকদেব তার বাহিনীর পাঁচশ' সৈন্য নিয়ে এসে বনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলো। সবাই ছদ্মবেশী। শিকদেব তাদের ঘন গাছ আর পত্রপল্লপের পশ্চাতে লুকিয়ে রেখে বনের এক সরুপথ ধরে বেরিয়ে এলো। এখানেই সে তার বোন কামিনীর সাথে সাক্ষাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

মানুষের যাতায়াতের কারণে বনের মাঝে বেশকিছু গলিপথ সৃষ্টি হয়েছিলো। শিকদেব সেসব পথে পায়চারি করতে লাগলো। মানুষের আনাগোনার আলামত পেলেই সে গাছের বা পত্রপল্লবের আবডালে লুকিয়ে থাকে। মানুষ চলে গেলে আবার বেরিয়ে আসে। কেউ যেনো তাকে না দেখে

তাই সে সদাচকিত ও চৌকান্না। তার গায়ে সাদা পোশাক। সে যে রাজকুমার, দেহে তার কোনো আলামত নেই। বেশিক্ষণ দেরি করতে হলো না। কামিনী তার সন্ধানে এদিকে আসলো।

শিকদেব তাকে দেখে অধৈর্য হয়ে বেরিয়ে এসে বললো, অনেক দেরি করে ফেললি কামিনী। চন্দ্রামুখী কি মন্দিরে এসেছে?

ঃ হ্যাঁ, এসেছে। তার সাথেই এসেছি। তাই তো দেরি হয়েছে।

শিকদেব-এর চেহারায় প্রফুল্লতার আভা ছড়িয়ে পড়লো। সে জিজ্ঞেস করলো, তার সাথে কী পরিমাণ সৈন্য এসেছে?

ঃ অনেক কম। মাত্র পঞ্চাশজন।

ঃ আমার সাথে পাঁচশ লোক আছে। কিন্তু কামিনী! রাতে কি তাকে এদিকে আনতে পারবে না?

ঠিক তখন তাদের নিকটবর্তী এক সরুপথে কারো অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বিড়ালের মত পা ফেলার ক্ষীণ আওয়াজ হলো। কিন্তু শিকদেব ও কামিনী তা অনুভব করতে পারলো না। তারা কথায় নিমগ্ন রইলো। সতর্ক লোকটি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাদের দেখলো।

কামিনী বললো, আমি চাই, আমার যে এতে হাত আছে, তা প্রকাশিত না হোক।

ঃ না কামিনী, তা হয় না। যেভাবেই হোক তাকে এদিকে নিয়ে আসার চেষ্টা করো।

ঃ আচ্ছা, আমি চেষ্টা করবো। তবে মনে হয় না সে রাতে এই গহীন বনের দিকে আসতে সাহস করবে।

ঃ যদি না আসে, তাহলে আমি অন্য কোন পথ বের করবো।

ঃ আমাকে তাহলে এখন যেতে হয়।

ঃ যাও, তবে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে কাজ করে এ অভিযানে আমাদের সফল হতে হবে।

কামিনী তার পথে চলে গেলো। শিকদেব অন্যপথ ধরে মন্দিরের দিকে এগিয়ে গেলো। তখন মন্দিরের উঁচু চূড়ায় উজ্জ্বল স্বর্ণখচিত নকশার উপর অস্তাচলগামী সূর্যের আলো পড়ে ঝিলমিল করছিলো। অপরূপ সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে সে মন্দিরের দিকে এগিয়ে চললো। শিকদেব যখন মন্দিরে পৌঁছলো, তখন সূর্য অস্তমিত হয়ে গেছে। মন্দিরের পুরোহিত ও ব্রাহ্মণরা চারদিকে প্রদীপ জ্বালিয়ে দিচ্ছে।

পূজার সময় অতি নিকটে। তাই পুরোহিত ও ব্রাহ্মণরা দ্রুততার সাথে অন্যান্য কাজ সমাধা করছে। মন্দিরের সামনে অবস্থিত বিরাট চত্বরটি লোকে লোকারণ্য। মন্দিরের যে ভবনে প্রতিমা আছে, সেটি যেমন বিরাট, তেমন প্রশস্ত। এ ভবনের কয়েকটি ফটক। প্রত্যেক ফটক প্রশস্ত, উঁচু ও বিরাট। উঁচু

উঁচু স্তম্ভের উপর বিরাট ছাদ। প্রত্যেকটি স্তম্ভ উজ্জ্বল ঝলমলে মহামূল্যবান পাথরে সজ্জিত-অলংকৃত। ফটকের পর সর্বোচ্চ ভবনে সোমনাথের প্রতিমাকে স্থাপন করা হয়েছে। সেখানে বাইরের কোনো আলো প্রবেশ করতে পারে না। আর ভেতরেও আলোর ব্যবস্থা করা হয়নি। বরং হীরা-পান্না, মণিমুক্তা ইত্যাদি মূল্যাবান পাথর যা তার ছাদে, দেয়ালে ও স্তম্ভগুলোতে স্থাপন করা হয়েছে, তার আলোতেই তা আলোকময় হয়ে থাকে।

সোমনাথের প্রতিমাটি পাঁচ গজ লম্বা। তাকে উঁচু এক বেদীতে স্থাপন করা হয়েছে। অত্যন্ত নিপুণ শিল্পীর হাতে তার ডাগর চোখ দু'টি তৈরি করা হয়েছে এবং চোখে লাল টকটকে ঝলমল দু'টি পাথর স্থাপন করা হয়েছে। তা থেকে এমন আলো ঠিকরে বেরুতে থাকে, যা দেখলে দর্শকের পিলে চমকে যায়।

প্রতিমার এই ভবনগুলোতে স্বর্ণের এক লম্বা বিরাট শিকল টানান হয়েছে, যার ওজন প্রায় দু'শ মণ। এ শিকলে হাজার হাজার স্বর্ণ ও রূপার ছোট ঘন্টা ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে। পূজা বা প্রতিমার স্নানের সময় হলে একশ পুরোহিত একই সাথে স্বর্ণের এই শিকল ধরে টানতে থাকেন। ফলে হাজার হাজার ছোট ছোট ঘন্টা বাজতে থাকে। ঘন্টাসমূহের এ গুঞ্জন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকাকে মোহিত করে তোলে।

ঘন্টাসমূহের এ ধ্বনি শুনে সবাই বুঝতে পারে, এখনই পূজা বা প্রতিমার স্নান শুরু হবে। ফলে সবাই ব্যস্ততা ফেলে দৌড়ে আসে।

সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর চারদিকে অন্ধকার ছড়িয়ে যায়। পূর্ব দিগন্ত থেকে পূর্ণিমার চাঁদ হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসে। তখন প্রায় একশ পুরোহিত স্বর্ণের শিকল ধরে টানতে থাকে। ফলে হাজার হাজার ঘন্টা একই সাথে বেজে ওঠে। ঘন্টাগুলোর আওয়াজে মন্দির, মন্দিরের সম্মুখের প্রশস্ত চত্বর, কেল্লা, সমুদ্র ও গহীন বন পর্যন্ত মোহিত হয়ে ওঠে। দূর-দূরান্ত পর্যন্ত তার আওয়াজ ছড়িয়ে যায়।

যারা মন্দিরে ছিলো, তারা আদবের সাথে সোজা দাঁড়িয়ে গেলো। যারা বাইরে ছিলো, দৌড়ে দৌড়ে মন্দিরে আসতে লাগলো। নারী-পুরুষ, যুবক-বৃদ্ধ সবাই মন্দিরে প্রবেশ করতে লাগলো।

চারদিকে ঘন্টাসমূহের আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ছে। লোকেরা ছুটে এসে মন্দিরের ভেতর সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সবাই নীরব নিস্তব্ধ। কারো মুখে কোনো কথা নেই। ধীরে ধীরে চাঁদ উপরে উঠে আসছে আর দুনিয়ার বুকে গলে গলে পড়ছে তার শুভ্র সুন্দর জ্যোৎস্না। মন্দিরের চারপাশের আলোর সাথে জ্যোৎস্নার মিলনে এক অপূর্ব নৈসর্গিক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। আকাশে চাঁদের মুখে নিটোল হাসি আর ধরাপৃষ্ঠ জ্যোৎস্নার আলোয় উদ্ভাসিত।

এমনি মোহময় মুহূর্তে যারা মন্দিরের বাইরে অবস্থান করছে, তারা বারবার আক্ষেপ করছে, হায়! সকাল সকাল কেনো মন্দিরে আসলাম না। তাহলে তো সোমনাথ প্রতিমার দর্শনে সৌভাগ্যবান হতে পারতাম আর তার স্নানের পানিরও ভাগ পেতাম।

হিন্দুরা প্রতিমার স্নানের এই পানিকে অত্যন্ত বরকতময় মনে করে। স্নানের এক ফোঁটা পানিও তারা নষ্ট হতে দেয় না। সোনা ও চাঁদির বিনিময়ে তারা এ পানি ক্রয় করে থাকে। যে নালা দিয়ে এ পানি প্রবাহিত হয়, হাজার হাজার মানুষ তা থেকে পানি নেয়ার জন্য লাইন ধরে দাঁড়িয়ে থাকে।

সোমনাথ মন্দিরের পুরোহিত ও ব্রাহ্মণরা স্বর্ণের শিকল ধরে টানছে আর চারদিকে ঘন্টাসমূহের আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ছে। সবাই বুঝতে পারলো, সোমনাথ দেবতার স্নানকর্ম শুরু হয়ে গেছে। যেদিন আগে স্নান করানো হয়, সেদিন সন্ধ্যার পর থেকেই দেবতার পূজা-অর্চনা শুরু হয়ে যায়। ঘন্টাসমূহের আওয়াজে চারদিক গুঞ্জরিত হচ্ছে। সবাই নীরবে নতশিরে দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক তখন কিছু মানুষ ধ্বনি দিতে লাগলো– 'সোমনাথের জয় হোক, সোমনাথের জয় হোক।' যারা ধ্বনি শুনলো, তারা পশ্চাতে ফিরে দেখতে লাগলো।

এগারো.

পূর্ণিমার চাঁদ তখন মধ্য গগনে। গোটা মন্দির জ্যোৎস্নার আলোর বন্যায় ভেসে যাচ্ছে। যেনো আকাশ থেকে নূরের ধারা ক্রমাগত গলে গলে পড়ছে। জ্যোৎস্নালোকে মন্দিরের উঁচু উঁচু চূড়াগুলো তারার মতো জ্বলছে।

মন্দিরের খোলা চত্বরে অবস্থানরত সবাই জ্যোৎস্নার নির্মল আলোয় অবগাহন করছে। গায়ের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সাদা বা রঙিন কাপড়গুলো আলোয় উজ্জ্বল হয়ে ওঠেছে। নারী আর রূপসী যুবতীদের পোশাক-পরিচ্ছদ আর শরীরের অলংকারগুলো ঝলমল করছে। দেখতে মনে হচ্ছে, যেনো অপ্সরীরা দল বেঁধে মন্দির প্রান্তরে নেমে এসেছে।

রাজকুমারী চন্দ্রামুখী তখন তার অপরূপা সুন্দরী সখী ও দাসীদের নিয়ে মন্দির অভিমুখে রওনা হয়। তার আগে-পিছে প্রহরীও রয়েছে। তারা রাজকুমারীর নিরাপত্তা বিধান করছে ও তার আগমনের ঘোষণা দিতে দিতে সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছে।

রাজকুমারীর আগমন সংবাদ শোনামাত্র সবাই একধারে সরে দাঁড়ায়। উন্মীলিত নয়নে বিমোহিত হৃদয়ে চেয়ে থাকে সবাই। রাজকুমারীর রথ নিকটে এসে পৌঁছুলে তার সম্মানে তাদের শিরগুলো অবনত হয়ে যায়। নারীরা হাতজোড় করে প্রণাম জানায়।

চন্দ্রামুখী এখন কালো রেশমি শাড়ি পরিহিতা। শাড়ির আঁচল স্বর্ণের কারুকার্য খচিত। গলায় মূল্যবান উজ্জ্বল অলংকার। কানে ধবধবে সাদা মুক্তার বালি। জ্যোৎস্নার আলোয় তা যেনো জ্বলছে, প্রদীপ্ত হয়ে ওঠছে। মনে হচ্ছে, আকাশের পূর্ণিমার চাঁদের সাথে সৌন্দর্য্য ও রূপ সুষমায় পাল্লা দিয়ে পৃথিবীতেও আরেকটি পূর্ণিমার চাঁদ বিকশিত হয়েছে, আত্মপ্রকাশ করেছে। রাজকুমারীর সখীরাও আজ অপরূপ সাজে সজ্জিত হয়েছে। পোশাক-পরিচ্ছদ আর অলংকারে তারাও যেনো এক একজন পূর্ণিমার চাঁদ। জনসমুদ্রের মাঝ দিয়ে অতিক্রমকালে সকলের দৃষ্টি তাদের দিকে বিমুগ্ধ বিমোহিত হয়ে আটকে থাকে। নিষ্পলক নয়নে বিস্ফারিত নেত্রে তাকিয়ে থাকে।

রাজকুমারী চন্দ্রামুখীকে দেখার ঔৎসুক্য সবার অন্তরে প্রবল। কিন্তু রাজকুমারী এগিয়ে এলে তার সৌন্দর্য্যের অকল্পনীয় প্রভায় সবার দৃষ্টি অবনমিত হয়ে আসে। চোখ তুলে কেউ তার দিকে তাকাতে সাহস পায় না।

চন্দ্রামুখী সোমনাথ মন্দিরে প্রবেশের সময় সোমনাথ প্রতিমার জয়ধ্বনি উত্থিত হলো। আকাশে-বাতাসে গুঞ্জরিত হয়ে ওঠলো সেই ধ্বনি। যে ব্রাহ্মণরা কাঁধে করে গঙ্গা থেকে জল এনেছেন, তারাই এ ধ্বনি দিয়েছেন। এরা প্রায় দেড়শ। প্রত্যেকের কাঁধে ছোট ছোট দণ্ড। দণ্ডের দু'পাশে দু'টি চাঁদির সোরাহি। গঙ্গার পানিতে ভরা সোরাহিগুলো।

এদের এগিয়ে আসতে দেখলেই লোকেরা সরে দাঁড়ায়। তারা দ্রুত মন্দিরের বিশাল চত্বর অতিক্রম করে মন্দিরে প্রবেশ করে। পানি গ্রহণ করার জন্য চাঁদির খড়ম পরে মন্দিরের মহাপূজারী শীর্ষস্থানীয় ব্রাহ্মণদের নিয়ে এগিয়ে আসেন এবং হাতে হাতে পানির সোরাহি নিয়ে সোমনাথ প্রতিমার দিকে এগিয়ে যান।

শিকল টেনে যে ঘন্টা বাজানো হয়েছিলো, তা এখন বন্ধ হয়ে গেছে। ঘন্টার গুরুগম্ভীর আওয়াজও মিলিয়ে গেছে। মানুষ বুঝে ফেলেছে, স্নানকার্য শুরু হয়েছে। ব্রাহ্মণরা পানির সোরাহিগুলো নিয়ে চাঁদির এক বিরাট পাত্রে রাখতে শুরু করেছে।

ঠিক তখন প্রায় তিনশ সুশ্রী নিটোল দেহের যুবক বাদ্যযন্ত্র নিয়ে এগিয়ে এসো ভদ্রতা ও শিষ্টাচারের সাথে বসে পড়লো। তারপর বাজনার তালে তালে সোমনাথ প্রতিমার স্তুতিমালা পরিবেশিত হতে লাগলো। বাজনার সুর-মূর্ছনায় সবাই মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে রইলো। বাজনার তালে তালে সকলের মাথা দুলতে লাগলো। ওষ্ঠাধর কেঁপে ওঠতে লাগলো। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ সুরের জগৎ যেনো স্তব্ধ হয়ে গেলো। গভীর নীরবতা আর নিস্তব্ধতায় সবাই সমাচ্ছন্ন।

এরই মাঝে এগিয়ে এলো পাঁচশ উদ্ভিন্নযৌবনা যুবতী। প্রতিজনই এক একটি সৌন্দর্যের প্রতিমা। নিটোল-নিখুঁত রূপ-সুষমার অধিকারিনী। ঈশ্বরের হাতে

গড়া মর্তের অপ্সরী। গায়ে তাদের ঝলমলে চিত্তহারী পোশাক। গলায় উজ্জ্বল মুক্তা খচিত মূল্যবান অলংকার। এদের সাজ ও রূপের কথা বর্ণনাতীত।

এরা সবাই সোমনাথ মন্দিরের দাসী। এদের অনেকেই শাসক পরিবারের সন্তান। কেউ কেউ রাজকুমারীও বটে। হিন্দুধর্ম মতে, কোনো মেয়েকে মন্দিরের দাসী নিযুক্ত করা হলে সে বিয়ে করতে পারে না। তাদের যারা সতী, তারা যৌবনের জোয়ারে উত্তাল তরঙ্গের ন্যায় ভেসে যায় না। তারা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সুনাম-সুখ্যাতিসহ সতীত্ব বজায় রেখে যৌবনকাল কাটিয়ে দেয়। তারপর যোগিনী হয়ে যায়।

আর যারা যৌবনের স্রোতাবর্তে নিজের দেহ সুষমাকে ভাসিয়ে দেয়, মুক্ত বিহঙ্গের মতো সর্বত্র গমনাগমন করে, প্রদীপ্ত জীবনকে পাপ-পঙ্কিলতার গভীরে নিকষ কালো অন্ধকারে নিমজ্জিত করে, তারা তাদের পাপের ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার ভয়ে কেউ আত্মহত্যা করে বা কারো হাত ধরে সোমনাথ মন্দির থেকে পালিয়ে যায়। তাই মাঝে-মধ্যেই মন্দিরের পশ্চাৎ দিকে সমুদ্রের বুকে যুবতীর মৃত ভাসমান লাশ পাওয়া যায়। সেগুলোকে অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে তুলে এনে চিতায় পুড়ে ফেলা হয়।

সোমনাথ মন্দিরের এসব দাসীর সকল প্রয়োজন রাজ কোষাগার থেকেই পূরণ করা হয়। তাদের মূল্যবান কাপড়-অলংকারও রাজ কোষাগারের খরচে তৈরি করে দেয়া হয়। তাছাড়া সোমনাথ মন্দিরের প্রয়োজন পূরণের জন্য দু'হাজার গ্রাম মন্দিরের নামে অর্পণ করা হয়েছে। এ গ্রামগুলো থেকে যা আয় হয়, তার অধিকাংশ মন্দিরের সেবক, দাসী, ব্রাহ্মণদের জন্য খরচ করা হয়।

মন্দিরের এই পাঁচশ দাসী অপূর্ব সাজে সজ্জিত হয়ে এসে একসাথে নাচতে শুরু করলো। বাজনার সুর আবার ভেসে এলো। সুরের তালে তালে তাদের নৃত্যকলা ক্রমশ ফুটে ওঠতে লাগলো। বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে সবাই তাকিয়ে রইলো।

তারপর সমস্বরে গান গাইতে শুরু করলো। সুরেলা সুমিষ্ট কণ্ঠের গানের সাথে যেনো মধু ঝরতে লাগলো। আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠলো সুরের মূর্চ্ছনায়। স্নিগ্ধ সুরেলা গানের স্পর্শে শিরা-উপশিরার রক্ত কণিকায় জাগে বিপুল মত্ততা। স্তব্ধ বিস্ময়ে উন্মিলিত নেত্রে সবাই চেয়ে থাকে।

তাদের গানের মর্ম হলো– হে মহান দেবতা! যার পূজার জন্য সমুদ্র রাতের স্তব্ধতায় উপচে পড়ে, যার নিকট এসে মৃত ব্যক্তিদের আত্মারা কায়া পরিবর্তনের সদয় অনুমতি প্রার্থনা করে, যার দিকে আকাশের চাঁদ-সুরুজ আর তারকারা নিষ্পলক নেত্রে তাকিয়ে থাকে। আপনার সন্তুষ্টি ও করুণা লাভে ধন্য হোক তারা, যারা আপনার দর্শনের জন্য দূর-দূরান্ত থেকে এসেছে, যারা ফিরে গেছে তারা আর যারা আসবে তারাও। যারা আপনার চরণতলে আত্মসমর্পণ করে

তারা আপনার করুণা ও সন্তুষ্টি লাভে ধন্য হোক। আজকের এই জ্যোৎস্নাময় স্বপ্নীল রাত কতোই না সুন্দর। পূর্ণিমার চাঁদ থেকে আজ অঝোর ধারার জ্যোৎস্না গলে গলে পড়ছে। গোটা দুনিয়া আজ নূরে উজালা। আপনার সেবক-সেবিকারা আপনার পূজারীরা আজ ধন্য হোক। আমরা আপনাকে স্নান করানোর জন্য উপস্থিত হয়েছি। গঙ্গার জল দ্বারা আপনাকে স্নান করাবো। আপনি আমাদের মনের তামান্না পূরণ করুন। আমাদের দুঃখ-বেদনা, মনের কালিমা দূর করুন। সন্তুষ্টচিত্তে স্নান সেরে আপনি আমাদের ধন্য করুন।

গান শেষ করে দাসীরা নতশিরে দাঁড়িয়ে রইলো। তখনো ইথারে গানের মধুর সুরলহরী যেনো গুঞ্জরিত হচ্ছে। বিস্ময়কর তরঙ্গ তুলে যেনো মানুষের কানে কানে মধু বর্ষণ করছে।

এরপর ব্রাহ্মণরা সম্মুখে অগ্রসর হয়ে দুর্বোধ্য ভাষায় কী যেনো পাঠ করলো। মহাপূজারীও চক্ষু বন্ধ করে বিড় বিড় করে কী যেনো পাঠ করলেন এবং সকলের সম্মুখে এগিয়ে গেলেন। ব্রাহ্মণদের মুখ জুড়ে ঘন দাড়ি। বিভিন্ন বয়সের হওয়ার কারণে তাদের দাড়ির রংও ভিন্ন। কারো কালো, কারো সাদা, কারো সাদা-কালোর মিশ্রণ।

রাজকুমারী চন্দ্রামুখী তার সখী ও দাসী পরিবেষ্টিত হয়ে দাঁড়িয়ে নীরবে সবকিছু অবলোকন করছে।

যে কামরায় সোমনাথ প্রতিমাকে রাখা হয়েছে, সে কামরায় কোনো আলোর ব্যবস্থা না থাকলেও মুক্তা-মাণিক্য আর হিরা-জহরতের উজ্জ্বল আলোয় তা সর্বদা আলোকিত থাকে। রাতের অন্ধকারেও সে কামরাটি ফকফকা থাকে।

ব্রাহ্মণরা কিছুক্ষণ গুন গুন করে কী যেনো পাঠ করলেন। তারপর চাঁদির সোরাহি তুলে নিলেন। কয়েকজন ব্রাহ্মণ প্রতিমার বেদীতে উঠে পড়লেন। তারপরই স্নান দেয়া শুরু করলেন।

প্রতিমা ধোয়া পানি সংগ্রহের জন্য ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়ে গেলো। একের উপর আরেকজন গিয়ে লুটিয়ে পড়তে লাগলো। ব্রাহ্মণরা পানি সংগ্রহে বাধা দিতে লাগলো আর লোকেরা তোষামোদ করে বা উৎকোচ দিয়ে পানি সংগ্রহ করতে লাগলো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই স্নানকার্য সমাপ্ত হলো। মহাপূজারী সিংগায় ফুঁৎকার দিলেন। সিংগার আওয়াজ চারদিকে ছড়িয়ে পড়তেই সবাই সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গেলো। সিংগার আওয়াজ থেমে যাওয়ামাত্র যে যেখানে ছিলো সেখানেই সেজদায় লুটিয়ে পড়লো। এভাবে সোমনাথ প্রতিমার পূজা ও স্নান সমাপ্ত হলো। তারপর লোকেরা মন্দির থেকে দলে দলে বেরিয়ে স্ব স্ব গন্তব্যে প্রস্থান করতে লাগলো।

বারো.

মন্দিরজুড়ে প্রায় ষাট-সত্তর হাজার মানুষ অবস্থান করছিলো। তাদের বেরিয়ে যেতে অনেক সময় লাগলো। ভিড় একটু কমে এলে মহাপূজারী রাজকুমারী চন্দ্রামুখীর নিকট এগিয়ে এসে তার কপালে তিলক এঁটে দিলেন। রাজকুমারী তার গলা থেকে একটি মুক্তার অত্যন্ত মূল্যবান হার মহাপূজারীর হাতে অর্পণ করলো।

হারটি গ্রহণ করে মহাপূজারী তার জন্য প্রার্থনা ও আশীর্বাদ করলেন। তারপর তার উজ্জ্বল গণ্ডদেশের দিকে তির্যক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। রাজকুমারী মহাপূজারীকে তার দিকে এভাবে চেয়ে থাকতে দেখে লজ্জিত হয়ে মাটির দিকে তাকিয়ে রইলো।

মহাপূজারী কামিনীর দিকে এগিয়ে গেলেন এবং তার কপালেও তিলক এঁটে দিলেন। কামিনীও কালবিলম্ব না করে মহাপূজারীকে একটি মুক্তার মালা উপহার দিলো। কামিনীর পর মহাপূজারী রাজকুমারীর সকল সখীকেই তিলক লাগিয়ে দিলেন এবং সবাই সাধ্যমত তাকে পুরস্কৃত করলো।

মহাপূজারী রাজকুমারীর দাসীদের কপালেও তিলক এঁটে দিতে ভুল করলেন না। তারাও তাকে কিছু না কিছু উপঢৌকন দিলো। মুহূর্তের মধ্যে মহাপূজারী বহু সম্পদের মালিক হয়ে গেলেন।

এবার ফেরার পালা। রাজকুমারী মন্দিরের চত্বরে এসে পৌঁছুলে কামিনী এসে কানে কানে বললো, এখন কি ঐ বনের দিকে যেতে পারবে?

রাজকুমারী তার দিকে ফিরে তাকিয়ে বললো, এই সময়?

ঃ হ্যাঁ এখন।

ঃ কেনো?

ঃ এক সন্ন্যাসিনী আপনার সাক্ষাৎ প্রার্থী।

রাজকুমারীর কণ্ঠ থেকে বিস্ময় ঝরে পড়লো। বললো, এক সন্ন্যাসিনী আমার সাথে দেখা করতে চায়! তারপরই হঠাৎ মনে পড়ে গেলো, তাহলে কি সেই শোবাদেবী তার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করছে!

দীর্ঘদিন থেকেই রাজকুমারী শোবাদেবীর সাক্ষাতের জন্য অস্থির হয়ে আছে। শোবাদেবীই বলতে পারবে, সে কি রাজকুমারী? তার আসল পরিচয় কী? কেনো তাকে সোমনাথের মহারাজা মেয়ের মতো লালন-পালন করছেন?

কামিনী অবশ্য রাজকুমারীর এ রহস্যময় বিষয় জানতো না। তার জানাও ছিলো না যে, রাজকুমারী সন্ন্যাসিনী শোবাদেবীর সাক্ষাতের আশায় অস্থির হয়ে আছে। কামিনী জানতো, রাজকুমারী সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে। তাদের সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখে। তাই সন্ন্যাসিনীর কথা বললেই সে বনের দিকে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হবে।

কিন্তু রাজকুমারী যখন বিস্ময়ভরা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, সন্ন্যাসিনী আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে চায়! তখন কামিনীর সন্দেহ হলো, হয়তো কোনো সন্ন্যাসিনীর সাথে রাজকুমারীর কোনো গোপন রহস্য রয়েছে। কামিনী বললো, সন্ধ্যায় আমি এমনিই হাঁটতে হাঁটতে বনের দিকে গিয়েছিলাম। আশা ছিলো হয়তো সৌভাগ্যক্রমে এমন কোনো সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসিনীর সাক্ষাৎ পাবো, যে দিন-রাত ঈশ্বরের ধ্যানে নিমগ্ন থাকে।

রাজকুমারীর নিটোল গণ্ডদেশে তখন একটি ছোট টোল বিকশিত হলো। মৃদু হেসে বললো, আর তার থেকে তোমার বিয়ে সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করে নেবে, তাই না!

কামিনী লজ্জায় লাল হয়ে গেলো। একে তো সে অত্যন্ত সুন্দরী, তদুপরি দেখতে তাকে সরল নিষ্পাপ প্রকৃতির মনে হয়। তার কথাবার্তা-চলাফেরায় একটা সাধু সাধু ভাব বিরাজমান। দেখে কেউ বুঝবে না, সে কতো মারাত্মক কুটিল ও দুষ্ট মেয়ে।

কামিনী তার লজ্জাজড়িত দৃষ্টি তুলে বললো, আমার নয় রাজকুমারী, আপনার বিয়ে সম্পর্কে কিছু জানতে চেয়েছিলাম।

রাজকুমারী কিছুক্ষণ নীরব থেকে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, কামিনী! কেউ বলতে পারবে না কী হতে যাচ্ছে আর কী হবে। সুলতান মাহমুদের আক্রমণের সংবাদ শোনার পর থেকে দারুণ অস্থির ও বেচাইন অবস্থায় আছি।

ঃ অস্থির হওয়ার তো কিছুই নেই রাজকুমারী! আপনি কি দেখছেন না, সোমনাথ প্রতিমার জন্য জীবন উৎসর্গ করতে কতো রাজা-মহারাজা ও স্বেচ্ছাসেবক যোদ্ধারা এসে সমবেত হয়েছে? আমার তো মনে হয় যখন এ ম্লেচ্ছ সুলতান আমাদের বিপুল সৈন্যের সংবাদ পাবে, তখন সে এদিকে আসতেই সাহস পাবে না।

ঃ আমিও এমন চিন্তা করে মনকে প্রবোধ দেয়ার চেষ্টা করি। কিন্তু মন আমার স্থির হচ্ছে না। উত্তরোত্তর তা অশান্তই হচ্ছে। তাছাড়া মহারাজা ও মহারাণীকেও ভীষণ চিন্তিত মনে হচ্ছে।

ঃ আমি জানি, গোটা জাতিই দুশ্চিন্তায় নিমজ্জিত। কিন্তু মাঝে-মাঝে চিন্তা করি, সোমনাথের প্রতিমা কি তার সেবক ও পূজারীদের সাহায্য করবে? সুলতান মাহমুদ কি এই কেল্লা আর নগরীকে পদানত করে ফেলবেন?

ঃ শুধু এই একটি কারণেই ভয় হচ্ছে। কিন্তু... আচ্ছা যা হবার হবেই। তুমি চলে যাওয়ার পর...।

কামিনী রাজকুমারী কথা শেষ হতে না দিয়েই বললো, আমি ভুলবশত একপথে ঢুকে গিয়েছিলাম। পথের দু'পাশে অসংখ্য বৃক্ষসারি। আকাশে তখনো সূর্য থাকা

সত্ত্বেও সে স্থানটি অন্ধকার। আমি ভয় পেয়ে গেলাম এবং পশ্চাতে ফিরে এলাম। কিন্তু ভাগ্যক্রমে অপর এক গলিপথে এসে পৌঁছলাম। তারপর যখন বুঝতে পারলাম, আমি পথ হারিয়ে ফেলেছি, তখন আমার দারুণ ভয় হচ্ছিলো।

ঃ এ বনে তো কেউ থাকে না। তাছাড়া ঘন অন্ধকার। ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চাই। এ বনে আমার যেতে ভয় হচ্ছে।

ঃ কিন্তু তারপরও সেখানে এমন চিত্তাকর্ষী কিছু বিষয় আছে, যা দেখলে মন জুড়িয়ে যায়।

ঃ আচ্ছা তুমি ভয় পাওয়ার পর কী করেছিলে?

ঃ সে ঈশ্বরের এক লীলা। সাথে সাথে আমি এক সন্ন্যাসিনীর সাক্ষাৎ পেলাম। তিনি আমাকে দেখে সবকিছু বুঝে ফেললেন। আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, তুমি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ো না। চিন্তিত হয়ো না। এ বনের প্রায় প্রতিটি স্থানেই ঈশ্বরের সান্নিধ্যপ্রাপ্ত সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীরা ছড়িয়ে আছে। তারপর তিনি আমাকে নিকটবর্তী এক পথ ধরে বনের বাইরে নিয়ে এলেন। বিদায় জানানোর প্রাক্কালে বললেন, রাজকুমারীকে গিয়ে বলবে, আজ রাতেই সে যেনো তার কল্যাণের অনুসন্ধানে আমার সাথে এসে সাক্ষাৎ করে। আমি তাকে এমন কথা বলবো, যা শুনে সে দারুণ বিস্মিত হবে।

ঃ সত্যি, তাহলে তো আমাকে যেতেই হবে।

ঃ তাহলে চলুন। তবে একা যেতে হবে।

রাজকুমারী তার সখী ও দাসীদের বললো, তোমরা মন্দিরের বিশ্রাম কক্ষগুলোতে বিশ্রাম করো। আমি এক্ষুনি আসছি।

সখী ও দাসীরা চলে গেলে রাজকুমারী ও কামিনী মন্দিরের বনের দিককার দরজার দিকে এগিয়ে গেলো। বড় দরজার নিকটবর্তী হলে কামিনী বললো, এ দরজা দিয়ে এভাবে বের হওয়া ঠিক হবে না। চলুন, ঐ ছোট দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাই।

মন্দিরে তিনদিকে বিরাট বিরাট দরজা। একদিকে নদী। বড় দরজাগুলো ছাড়াও ছোট ছোট কিছু দরজা আছে। তারা একটি ছোট দরজা অতিক্রম করে বনের দিকে চলতে লাগলো। চারদিক জ্যেৎস্নার আলোয় আলোকিত। মনে হচ্ছে, গোটা দুনিয়া নূরের সাগরে ভেসে যাচ্ছে। গাছপালাগুলো নীরব-নিস্তব্ধ দাঁড়িয়ে আছে।

মন্দির থেকে বন বেশি দূরে নয়। অল্প কিছুক্ষণ চলার পর তারা বনে গিয়ে পৌঁছলো। চারদিকে সুনসান নীরবতা। তারা একটি পথ ধরে বনে প্রবেশ করলো। ঘন পত্রপল্লবের কারণে জ্যোৎস্নার আলো বনের মাঝে প্রবেশ করতে পারছে না। যেদিকে হাল্কা গাছপালা, সেদিকে পত্রপল্লব ভেদ করে জ্যোৎস্নার আলো গলে গলে পড়ছে।

বনে প্রবেশ করে কয়েক পা অগ্রসর হতেই রাজকুমারী ভীত হয়ে গেলো। দেহ-মন তার ছমছম করে ওঠলো। ভয়ার্ত কণ্ঠে বললো, চলো কামিনী ফিরে যাই।

তারা মাত্র কয়েক পা অগ্রসর হলো, অমনি বৃক্ষের অন্ধকারে কিসের যেনো নড়াচড়ার শব্দ শুনতে পেলো। উভয়ের পা ভয়ে কাঁপতে লাগলো। ভয়ার্ত দৃষ্টি ফেলে বৃক্ষের অন্ধকারের দিকে দৃষ্টি ফেললো।

এদিকে গাছগুলো পাতলা, হাল্কা। তাই পত্রপল্লবের ফাঁক দিয়ে জ্যোৎস্না পড়ছে। অন্ধকারও একটু কম। অকস্মাৎ দেখলো, কালো পোশাক পরিহিত এক দীর্ঘ মানব অন্ধকারে গাছপালা ভেদ করে এগিয়ে আসছে।

এ দৃশ্য দেখে তারা ভয়ে কাঁপতে লাগলো। আর্তচিৎকারের সাহস পর্যন্ত হারিয়ে ফেললো।

আগন্তুক এগিয়ে এসে বললো, রাজকুমারী! শুকরিয়া, অবশেষে তুমি এলে।

সাথে সাথে উভয়ে বুঝে ফেললো, আগন্তুক শিকদেব। রাজকুমারী কামিনীর দিকে অগ্নিদৃষ্টিতে তাকালো। কামিনী লজ্জায় মাথানত করে ফেললো।

রাজকুমারী দুঃসাহসিকতার সাথে বললো, হ্যাঁ এসেছি। তবে তোমার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য নয়।

ঃ আমি জানি। আমার মতো মানুষের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য আসবে না। তবে আমার হৃদয়ের অস্থিরতা, আমার প্রাণের আকর্ষণ তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছে।

ঃ আমি এক সন্ন্যাসিনীর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য এসেছি।

ঃ কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আমার সাথে সাক্ষাৎ হয়ে গেলো। এখন তোমাকে আমার সাথে আম্রবেলীতে যেতে হবে।

রাজকুমারীর কণ্ঠ চিরে ক্রোধের আগুন ঝরে পড়লো। বললো, অসম্ভব। আমি আমি কিছুতেই সেখানে যাবো না।

শিকদেব বললো, আমি জানি, তুমি স্বেচ্ছায় আমার সাথে আম্রবেলী যাবে না। তাই আমি তোমাকে শিকার করার জন্য এ ফাঁদ পেতেছি আর তুমি তাতে আটকা পড়েছো।

রাজকুমারী এতোক্ষণ পর্যন্ত বুঝেনি যে, কামিনী ষড়যন্ত্র করে তাকে ধোঁকা দিয়ে এখানে নিয়ে এসেছে। এখন সে সবকিছু বুঝে ফেললো। কামিনীকে লক্ষ্য করে বললো, কামিনী! তুমি কেনো ষড়যন্ত্র করে আমাকে এখানে নিয়ে এসেছো?

কামিনী কোনো উত্তর দিলো না। তবে শিকদেব বললো, না, কামিনী এ ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত নয়।

রাজকুমারী বললো, তার নীরবতাই তার অপরাধের স্বপক্ষে সাক্ষ্য দিচ্ছে।

শিকদেব বললো, অনর্থক কথা বলে আমি সময় নষ্ট করতে চাই না। বলো, তুমি সন্তুষ্টচিত্তে আমার সাথে যাবে, না কি জোর করে...।

রাজকুমারী গুরুগম্ভীর কণ্ঠে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বললো, শোনো শিকদেব! আমি তোমার সাথে যেতে পারবো না। আর যদি তুমি বোকামী করো, তাহলে তার শাস্তি তোমাকে ভোগ করতে হবে। আম্রবেলী ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। এটা কিন্তু আত্মকলহের সময় নয়।

ঃ আমি জানি, সহজে তুমি আমার বশে আসবে না।

এ কথা বলেই সে রাজকুমারীর দিকে হস্ত প্রসারিত করলো। নিষ্পাপ রাজকুমারীর শরীরে কম্পন দেখা দিলো। কিন্তু সাথে সাথে হৃদয়ের সকল ভয় ঝেরে ফেলে দিয়ে এক নতুন শক্তিতে যেনো শক্তিমান হয়ে ওঠলো। সে রুখে দাঁড়ালো। শিকদেব তাকে ঝাঁপটে ধরে তার মুখ বন্ধ করে কাঁধে তুলে নেয়ার চেষ্টা করলো। ঠিক তখনই নিকটবর্তী এক ঝোঁপ থেকে কারো বেরিয়ে আসার আওয়াজ উত্থিত হলো। তারপরই আগন্তুক চিৎকার করে উঠলো, খবরদার!

শিকদেব দ্রুত মোড় ঘুরে দাঁড়ালো। কামিনী ও রাজকুমারীর দৃষ্টিও সেদিকেই ছুটে গেলো। তারা দেখলো, সন্ন্যাসিনী শোবাদেবী হাতে জপমালা নিয়ে এদিকেই এগিয়ে আসছে। তার চেহারায় আনন্দের দীপ্তি, বিজয়ের তৃপ্তি।

রাজকুমারী তাকে দেখেই চিৎকার করে বলে ওঠলো, মাতাজ্বী শোবাদেবী! আমাকে এ জালিমের হাত থেকে রক্ষা করুন।

শোবাদেবী দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে এসে রাজকুমারী ও শিকদেব-এর মাঝে দাঁড়ালো। গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বললো, বেটি! ভয় পেও না। আমার উপস্থিতিতে সে তোমার কোনো ক্ষতি করতে সাহস করবে না।

শিকদেব অত্যন্ত ক্ষীপ্ত কণ্ঠে বললো, মাতাজ্বী! আমার কাজে অন্তরায় সৃষ্টি করবেন না।

শোবাদেবী অত্যন্ত শান্ত ও মার্জিত কণ্ঠে বললো, তুমি রাজকুমারীর সাথে এ অসদাচরণ না করলে আমি কিছুতেই এখানে আসতাম না। তুমি সন্ধ্যায় ষড়যন্ত্রের এ জাল বিছিয়েছো। ঘটনাক্রমে আমি তা জেনে ফেলেছি। তাই আমি সব ব্যবস্থা করে এসেছি। শিকদেব, তোমার জন্য এখন এটাই ভালো যে, তুমি নীরবে নির্বিবাদে এখান থেকে চলে যাও। আমি রাজকুমারী থেকে এ প্রতিশ্রুতি নিয়ে নেবো, সে এ ঘটনার কথা কারো কাছে বলবে না।

ঃ আর যদি আমি আপনার কথা না মানি?

ঃ তাহলে তোমাকে এবং তোমার বোন কামিনীকে বন্দি হয়ে মহারাজার সম্মুখে উপস্থিত হতে হবে।

ঃ তাহলে আপনার সাথে আরো মানুষ আছে?

ঃ হ্যাঁ আছে। তারা আমার ইঙ্গিতের অপেক্ষায় আছে। আমি চাই না তুমি এবং তোমার বোন কামিনী অপমানিত হও। তুমি যখন সন্ধ্যায় তোমার বোনের

সাথে কথা বলছিলে আর ষড়যন্ত্র আঁটছিলে, তখন ঘটনাক্রমে আমি তোমার অদূরেই ছিলাম। আমি সবকিছু জেনে তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি।

শিকদেব কিছুক্ষণ চিন্তায় নিমগ্ন থাকলো। শোবাদেবী বললো, এখন আর চিন্তা করার সময় নেই। হয় নীরবে সরে পড়ো, অন্যথায় গ্রেফতার হওয়ার জন্য প্রস্তুত হও।

ঃ কিন্তু চন্দ্রামুখী...।

ঃ হ্যাঁ, সে কাউকে কিছু বলবে না। বেটি চন্দ্রামুখী! তুমি প্রতিশ্রুতি দাও, কাউকে এ ঘটনা বলবে না।

ঃ হ্যাঁ, আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

ঃ আর কামিনী...।

ঃ সে আগের মতোই আমার সখী হিসেবেই থাকবে।

শিকদেব নতশিরে নীরবে-নিঃশব্দে চলে গেলো। সেবাদেবী রাজকুমারী চন্দ্রামুখী ও কামিনীকে নিয়ে মন্দিরের দিকে রওনা হলো। দরজায় পৌছলে শোবাদেবী বললো, আমি গতকাল সোমনাথে এসেছি। দু'-এক দিনের মধ্যেই আমি তোমার সাথে দেখা করবো।

এ কথা বলে সেবাদেবী ফিরে গেলো। রাজকুমারী ও কামিনী মন্দিরে প্রবেশ করলো।

তেরো.

সুলতান মাহমুদ গজনবী ভারতবর্ষে তার বিশাল মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে প্রবেশের পর ভারতবর্ষের রাজা-বাদশাহ ও রাজপুত্রদের দৃষ্টি এখন তাঁর গতিবিধির উপর নিবদ্ধ। তিনি এখন কোথায় অবস্থান করছেন, কী করছেন, কোন্‌দিকে অগ্রসর হবেন, কোন্ রাজ্যে আক্রমণ করবেন- এ ধরনের চিন্তা ভাবনা আর কল্পনায় তাদের সময় কাটতে লাগলো।

কারণ, ইতিপূর্বে তিনি পনেরবার ভারতবর্ষে আক্রমণ করেছেন। যেদিকেই তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন, ভারতবর্ষের নামকরা দুঃসাহসী ও দুর্ধর্ষ যোদ্ধারা তার পথে বাধা দিয়েছিলো। কিন্তু কেউ টিকে থাকতে পারেনি। প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গেছে। তাই গোটা ভারতবর্ষের হিন্দুরা তাঁকে ভয় করে। তার নামে নিদ্রা উধাও হয়ে যায়। পানাহার বিস্বাদ মনে হয়।

সুলতানের বাহিনী মুলতান থেকে আজমীরের দিকে রওনা হলে অন্যান্য দিকের হিন্দু রাজা-বাদশাহরা স্বস্থির নি:শ্বাস ফেলে শান্ত হয়। জীবন প্রবাহে প্রশান্তি ফিরে আসে।

এদিকে সোমনাথের মহারাজা গোটা ভারতবর্ষে এ সংবাদ পৌঁছে দিলো, সুলতান মাহমুদের মুজাহিদ বাহিনী ঝড়ের বেগে সোমনাথের দিকে এগিয়ে আসছে। ভারতবর্ষের রাজা-বাদশাহ, রাজপুত্ররা নতুন চিন্তায় পড়ে গেলো।

সোমনাথ তাদের ধর্মের সর্বোচ্চ পবিত্র স্থান। প্রত্যেক হিন্দুর অন্তরে তার ইজ্জত ও আযমত বিদ্যমান। সোমনাথ রক্ষার জন্য তারা জীবন দিতে প্রস্তুত। তাই ভারতবর্ষের আনাচে-কানাচে বীর যোদ্ধারা জেগে ওঠলো। রাজা-বাদশাহরা আরেকবার সুলতান মাহমুদ গজনবীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে প্রস্তুত হয়ে গেলো। গোটা ভারতবর্ষে সাজ সাজ রব পড়ে গেলো। রণসাজে সজ্জিত হয়ে সবাই সোমনাথের দিকে ছুটে আসতে লাগলো। গায়ে তাদের গেরুয়া পোশাক। মাথায় সাদা কাপড়ের আচ্ছাদন। হিন্দু ধর্মের বিধান মতে, কেউ এ ধরনের পোশাক পরিধান করার অর্থ, এ যোদ্ধা যুদ্ধে পিছপা হবে না। হয় বিজয়ী হবে, না হয় যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দেবে। তাই এ ধরনের পোশাক কেউ পরে যুদ্ধে রওনা হলে সাধারণ হিন্দুরা তার যথেষ্ট সম্মান ও ইজ্জত করে। হৃদয় দিয়ে তাদের প্রয়োজন পূরণের চেষ্টা করে।

সুলতান মাহমুদ গজনবী গোটা ভারতবর্ষের এ রণপ্রস্তুতির সংবাদ জানতেন না। তার সাথে মাত্র ত্রিশ হাজার বীর যোদ্ধা, আল্লাহর রাহে নিবেদিতপ্রাণ মুজাহিদ। সংখ্যায় নগণ্য হলেও জীবন নেয়া আর দেয়ার খেলায় তারা অত্যন্ত দক্ষ ও দুঃসাহসী। ভীষণ দুর্ধর্ষ। তারা আল্লাহর উপর ভরসা করে, আল্লাহর সাহায্যের প্রত্যাশায় নিবেদিত হয়ে মুলতান আর আজমীরের মাঝে অবস্থিত সুদীর্ঘ রুক্ষ মরুর বুক চিরে আজমীরের পথে রওনা হয়েছে।

তারা যতোই সামনে অগ্রসর হচ্ছে, মরুর রুক্ষতা ততোই বাড়ছে। তাদের চিন্তা ও পেরেশানী ততোই বৃদ্ধি পাচ্ছে। মরুর বুকে যেদিকেই দৃষ্টি যায় শুধু বালু আর বালু। দিগন্তজুড়ে বালুর সাগর অতিক্রম করে তারা চলতে লাগলো।

দিনে সূর্য এতো উত্তপ্ত রৌদ্র বর্ষণ করে, মনে হয় যেনো দুনিয়াজুড়ে আগুনের হল্কা ঝরছে। দিনের এক চতুর্থাংশ যেতে না যেতেই সম্মুখে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব হয়ে যায়। উপর থেকে সূর্য আগুন বর্ষণ করতে থাকে আর নীচে তপ্ত বালুর উত্তাপ। মরুর দুরন্ত বায়ু আগুনের হল্কা বুকে নিয়ে ছুটতে থাকে।

আল্লাহর রাহে নিবেদিতপ্রাণ এই মুজাহিদরা সকল প্রতিকূল, সকল অমানুষিক কষ্ট সহ্য করে সুলতানের অনসুরণ করে এগিয়ে চলছে। সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত আগুনের হল্কা চিরে সম্মুখে এগিয়ে যেতে হয়। রাতে আবহাওয়া কিছুটা ঠান্ডা হয়ে এলে দেহ-মনে কিঞ্চিত প্রশান্তির ছোঁয়া লাগে।

পুরুষদেরকে তো আল্লাহ তায়ালা শক্ত-সুঠাম দেহের অধিকারী করে সৃষ্টি করেছেন। ফলে দুঃখ-কষ্ট, বিপদাপদ সহ্য করার স্বাভাবিক শক্তি তাদের মাঝে বিদ্যমান। কিন্তু কোমল-দেহ অবলা নারীদের অবস্থা ছিলো মারাত্মক।

তারা ফুলের মতো শুকিয়ে নেতিয়ে পড়ছে। সুলতানের পক্ষ থেকে তাদের আরাম-আয়েশের ব্যাপক ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাদের বাহনের উপর মোটা

চাদরের আবরণ দেয়া হয়েছে। যেনো মরুর তপ্ত বায়ুর ঝাপটা তাদের দেহে না লাগে। তবুও প্রচন্ড গরমে তারা এতো অস্থির ও বেকারার হয়ে পড়েছিলো, যা ভাষায় ব্যক্ত করার মতো নয়। সর্বক্ষণ পাখা দিয়ে বাতাস দেয়া হচ্ছে। তবুও তারা যেনো বারবার ঘামে ডুবে যাচ্ছে।

এতো কষ্ট সত্ত্বেও তাদের কারো মুখে কোনো অভিযোগ নেই। অকৃতজ্ঞতার কোনো আভাস নেই। অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে তারা সম্মুখে এগিয়ে চলছে।

সুলতান মাহমুদ গজনবী অত্যন্ত দূরদর্শী ও বুদ্ধিমান সিপাহসালার। বিপদ আসার বহু আগেই তিনি তার আভাস-ইঙ্গিত পেয়ে যান। রুক্ষ এ মরুর পথে যাত্রার পূর্বেই তিনি যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। ত্রিশ হাজার উটের পিঠে তিনি পানি, রসদপত্র, পশুর খাদ্য ইত্যাদি অতিপ্রয়োজনীয় সামান সাথে নিয়ে এসেছেন।

দীর্ঘ সফরের কারণে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পানি ব্যয় করা হয়। আবহাওয়ার তাপমাত্রা এতো প্রচন্ড ছিলো যে, পানি পান করার পরই গলা শুকিয়ে যেতো। তিনশ পঞ্চাশ মাইলের সুদীর্ঘ পথ তাদের অতিক্রম করতে হবে। দিনে পনের মাইলের বেশি অতিক্রম করা যায় না। এভাবে ক্রমাগত ত্রিশ মাইল চলতে পারলে তবেই এ রুক্ষ মরুপ্রান্তর অতিক্রম করে সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা এলাকার বুকে পৌঁছা সম্ভব হবে।

এ সফরে মানুষ, পশু-পাখি সবই দুর্বল হয়ে পড়েছে। কিন্তু মুজাহিদদের হৃদয়ের শক্তি বহু গুণে বেড়ে গেছে। ধৈর্য ও সহনশক্তি এতো বেড়ে গেছে যে, সারাদিন পানি পান না করেই কাটিয়ে দিতে লাগলো। রোযার তাৎপর্যের প্রতিফলন যেনো তাদের মাঝে ঘটছে। পানাহার ছাড়া শরীর দুর্বল হয়ে পড়লেও রূহানী শক্তি তাদের ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

সুলতান মাহমুদ গজনবী প্রত্যেক নামাযের পর বিনয় বিগলিত নেত্রে কেঁদে কেঁদে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেন, হে আল্লাহ! হে পরওয়ারদেগারে আলম! আমি আপনার পথে জীবন উৎসর্গিত মুজাহিদদের আপনার নামের বুলন্দির লক্ষ্যে এ মরুর বুকে নিয়ে এসেছি। হে আল্লাহ! আপনি তাদের ধ্বংস করে দুনিয়া ও আখেরাতে আমাকে অপমান করবেন না। আমাকে লাঞ্ছিত করবেন না। হে আল্লাহ! আমি যদি ভুল করে এদের মরু সাগরের মাঝে নিয়ে এসে থাকি, তাহলে আমাকে মাফ করে দিন আর এদেরকে উদ্ধার করুন। রক্ষা করুন।

হে আল্লাহ! একনিষ্ঠ হৃদয়ে আপনার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ঘরবাড়ি, আরাম-আয়েশ ছেড়ে শত্রুর দেশে চলে এসেছি। হে রহমান! হে রহীম! আমাদের প্রতি করুণার বৃষ্টি বর্ষণ করুন। আমাদের প্রতি রহম করুন। আমাদের বিজয় দান করুন।

বুরহান ও হারুন খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে। তাতে হবে কী! শিরা-উপশিরায় জিহাদের স্পৃহা। চোখে বিজয়ের নেশা। তাই শরীর-স্বাস্থ্যের প্রতি তাদের কোনো খেয়াল নেই। কোনো গুরুত্ব নেই।

মুজাহিদ বাহিনীর যে অংশে মহিলারা থাকে, সেদিকে ঘটনাক্রমে একদিন বুরহান চলে গেলো। ফেরার পথে আনীসার সাথে দেখা হয়ে গেলো। আনীসাকে দেখেই চমকে ওঠলো। তার উজ্জ্বল ঝলমলে চোখ দু'টি নিষ্প্রভ, রক্তিম ওষ্টাধর সাদা ফ্যাকাশে। নিটোল গণ্ডদেশ বিশুষ্ক ফুলের পাঁপড়ির ন্যায় কুচকে গেছে। বাক-চঞ্চল আনীসার কণ্ঠ যেনো কাকছানার ন্যায় অস্ফুট।

বুরহানের কণ্ঠে বেদনার সুর ফুটে ওঠলো। বললো, আনীসা! তুমি এতো শুকিয়ে গেলে!

মৃদু হাসার চেষ্টা করে আনীসা বললো, তবে আপনার মতো শুকাইনি।

ঃ আমার মতো রাখো। আমরা সবল, আমরা কষ্টসহিষ্ণু। তোমরা নারী। সাথে না এলেই তোমাদের ভালো হতো।

ঃ যদি না আসতাম, তাহলে তীব্র পিয়াসার কষ্টের অনুভূতি কখনো উপলব্ধি করতে পারতাম না। পানির মর্যাদা বুঝতে সক্ষম হতাম না।

ঃ আচ্ছা, তোমার নিকট কি পানি নেই?

ঃ ছিলো। তবে আজ সকালে শেষ হয়ে গেছে।

ঃ আহা! এখনো তো তোমাদের সফর বহু বাকি রয়ে গেছে।

ঃ আল্লাহই মদদ করবেন?

ঃ তুমি একটু দাঁড়াও। আমার নিকট কিছু পানি আছে। তা এক্ষুনি নিয়ে আসছি।

ঃ তাহলে তোমার অবস্থা কী হবে?

ঃ আমার জীবনের চেয়ে তোমার জীবনের মূল্য অনেক বেশি। সুতরাং আমার চিন্তা করো না।

একথা বলেই বুরহান ছুটে গিয়ে তার নিকট রক্ষিত পানিটুকু এনে আনীসাকে দিলো। আনীসা বুরহানের দিকে কৃতজ্ঞভরা দৃষ্টিতে তাকালো, যার প্রত্যাশ্যা বুরহান কখনো করেনি।

বুরহান ফিরে গেলো।

পরদিন বাহিনী দূরে– বহু দূরে সবুজের চিহ্ন দেখতে পেলো। গাছপালাও দৃষ্টিগোচর হলো। তাদের অন্তরে এক অভাবনীয় আনন্দের প্রবাহ বয়ে গেলো। মন তাদের আল্লাহর কৃতজ্ঞতায় অবনমিত হলো। আনন্দ আর উল্লাসের অনুভূতি ছড়িয়ে পড়লো দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে।

চলার গতি তাদের বেড়ে গেছে। সময়ের আগেই তারা সবুজ-শ্যামল অঞ্চলে পৌঁছে গেলো। আরো একদিন পথ চলার পর তারা আজমীরের অদূরে

পৌঁছে গেলো। তারা সবাই সীমাহীন দুর্বল হয়ে পড়েছিলো। তাই বিশ্রামের জন্য সেখানেই যাত্রাবিরতি করলো। রুক্ষ মরুর তুলনায় এ স্থানটি তাদের নিকট জান্নাত মনে হতে লাগলো।

চৌদ্দ.

মুজাহিদ বাহিনীর মাঝে পূর্বের সেই শক্তি ও স্বতঃস্ফূর্তত, চেহারায় সজীবতা ও প্রাণপ্রাচুর্যও ফিরে এসেছে। বাহিনীর সাথে আগত নারীরাও প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে পেয়েছে।

বিশাল মরুভূমি, যার শুরু আছে তো শেষ নেই। যেখানে মৃত্যুরা সারাক্ষণ হল্লা করে ফিরে। ভয়াবহতার কথা শুনে পিলে চমকে ওঠে। সে মরুভূমি অতিক্রম করে এলো সুলতান মাহমুদ গজনবীর মুজাহিদ বাহিনী। আল্লাহর বিশেষ রহমতে কোনো সৈনিক মৃত্যুবরণ করেনি। কোনো পশুও মারা যায়নি। সবাই নিরাপদে মরুভূমি অতিক্রম করে এসেছে।

সুলতান মাহমুদ গজনবী ১৯২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রাজধানী গজনী থেকে বেরিয়েছিলেন। অক্টোবর মাসে মুলতান গিয়ে পৌঁছেন। নভেম্বরের শেষ দিকে তিনি আজমীরের উপকণ্ঠে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

সুলতান একদিন ছোট-বড় সকল অফিসারকে ডাকলেন। জিজ্ঞেস করলেন, এখন তো আর কোনো সিপাহী অসুস্থ বা দুর্বল নেই?

অফিসাররা বললো, না মহামান্য সুলতান! কেউ আর অসুস্থ বা দুর্বল নেই। সবাই সুস্থ। সবার মাঝে স্বতঃস্ফূর্ততা ও প্রাণপ্রাচুর্য বিদ্যমান।

সুলতানের চেহারায় কৃতজ্ঞতার মৃদু রেখা ফুটে ওঠলো। বললেন, আল্‌হামদুলিল্লাহ। তাহলে সবাইকে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হতে নির্দেশ দাও।

মুজাহিদদের মাঝে যাত্রার আয়োজন শুরু হয়ে গেলো। ইতিমধ্যে একদিন বিকেল বেলা সুলতান বিশেষ বিশেষ অফিসারদের ডেকে পাঠালেন। বললেন, এখন আমরা এমন অঞ্চল দিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হবো, যার বাঁকে বাঁকে দুশমনরা দলবদ্ধ হয়ে ওঁত পেতে থাকবে। তাই প্রত্যেক দল, প্রত্যেক সৈন্য, প্রত্যেক সিপাইকে পূর্ণ সতর্ক থাকতে হবে। আমার ধারণা, আমাদের বাহিনীর সাথে শত্রুর চরও থাকবে। আমরা একটু অসচেতন হলেই তারা আমাদের ক্ষতি করতে তৎপর হয়ে ওঠবে। তাই সৈন্যরা যেনো বিক্ষিপ্ত না হয়ে যায়। একাকি যেনো কেউ কোথাও না যায়। দুশমনদের মতিগতির প্রতিও আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। সোমনাথ ভারতের হিন্দুদের নিকট মহা পবিত্র পুণ্যভূমি। মহা দেবালয়। তাকে হেফাজতের জন্য ভারতবর্ষের সকল হিন্দু ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। সুতরাং আমরা অত্যন্ত স্পর্শকাতর স্থানের দিকে অগ্রসর হচ্ছি। এ যুদ্ধ

মহাযুদ্ধ। এ যুদ্ধের কথা মানুষ কেয়ামত পর্যন্ত স্মরণ রাখবে। ইতিহাসের পাতায় এ যুদ্ধের কথা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

মনে রাখবে, প্রত্যেক সিপাইকে, প্রত্যেক অফিসারকে অত্যন্ত বীরত্ব, সাহসিকতা, জোশ ও মরণপণ প্রতিজ্ঞা নিয়ে যুদ্ধ করতে হবে। আমি গোটা বাহিনীকে মনে মনে বিন্যাস করে ফেলেছি। অগ্রবাহিনীতে হারুন ও বুরহান থাকবে। ডান পার্শ্বে আনতুনতাশ। বাম পার্শ্বে আমীর আলী। সবার মাঝে থাকবো আমি। এ বিন্যাসে কারো কোনো মতামত থাকলে বলতে পারো।

অফিসাররা বললো, অত্যন্ত সুন্দর ও বিজ্ঞোচিত বিন্যাস হয়েছে। এর মাঝে পরিবর্তনের কোনো প্রয়োজন নেই।

সুলতান বললেন, হারুন! আমি তোমাকে অগ্রবাহিনীর অফিসার বানিয়েছি। কারণ, তুমি সব অঞ্চলের হিন্দুদের ভাষা বুঝো, বলতে পারো। চলার পথে কোনো কেল্লা বা শহর এলে কেল্লার অফিসারকে বা শহরের শাসককে বুঝাতে চেষ্টা করবে, আমাদের যাত্রাপথে যেনো তারা বাঁধা সৃষ্টি না করে। আমরা তাদের কোনো ক্ষতি করবো না। যদি তারা আমাদের কথা না শোনে, বাধা সৃষ্টি করার চেষ্টা করে, তাহলে সাথে সাথে তাদের উপর আক্রমণ করে পথের কাঁটার মতো তাদের সমূলে উপড়ে ফেলবে।

বিনীত কণ্ঠে হারুন বললো, মহামান্য সুলতান! আপনার ইচ্ছাই বাস্তবায়িত হবে।

সুলতান বললেন, আমাদের বাহিনীতে যে সব মহিলা আছে, তাদের একত্রিত করে বাহিনীর মাঝে রাখা হবে। তাদের হেফাজতের জন্য পাঁচশ সৈন্যকে নিযুক্ত করা হবে।

আরো কয়েকটি বিষয়ে পরামর্শের পর বৈঠক মুলতবি হয়ে গেলো। মাগরিবের নামায পড়ে সবাই খাবার তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

বুরহান বাহিনীর সারি সারি তাঁবুর মাঝ পথ দিয়ে আনমনে হাঁটছে। অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে তাঁবুর সারি। কয়েক মাইল চলে গেছে তাঁবুর এই সারি।

মুজাহিদ বাহিনীতে বিশেষ কোনো আলোর ব্যবস্থা নেই। কিন্তু সৈন্যরা সবাই যখন রান্না-রান্নায় ব্যস্ত থাকে, তখন প্রত্যেক তাঁবুর সামনেই আগুন জ্বলে। তখন চারদিক আলোকিত থাকে। বিশাল বাহিনীর শুরু-শেষ দেখতে তেমন কষ্ট হতো না। প্রত্যেক তাঁবুর মাঝে কিছু জায়গা ফাঁকা রাখা হয়েছিলো। এটা একটা যুদ্ধ কৌশল। সুলতান চেয়েছিলেন, দুশমনরা যেনো বিস্তৃত তাঁবুর সারি দেখে বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা নির্ধারণ করতে না পারে, ভয়ে ভীত হয়ে পড়ে এবং আক্রমণ করার সাহস হারিয়ে ফেলে। সবাইকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো। যেনো ফাঁকা ফাঁকা করে তাঁবু স্থাপন করে এবং প্রত্যেক বাহিনী প্রহরী বাহিনীর যেনো এক মুহূর্তের জন্যও অন্যমনস্ক না হয়ে পড়ে।

বুরহান আনমনে হাঁটছে। হঠাৎ তার মনে হলো, কে যেনো আস্তে আস্তে পা ফেলে তার পিছু পিছু আসছে। কালবিলম্ব না করে বুরহান পশ্চাতে দৃষ্টি ফেরালো।

আকাশে তখন ভরা পূর্ণিমা। গোটা তাঁবু জুড়ে আকাশ থেকে গলে গলে জ্যোৎস্না পড়ছে। বুরহান দেখলো, তার পেছনে পেছনে এক নারীমূর্তি আসছে। প্রথম দৃষ্টিতেই সে তাকে চিনে ফেললো।

বুরহান দাঁড়িয়ে ছিলো। আনীসা সামনে অগ্রসর হয়ে অস্থির কণ্ঠে বললো, ওহো আপনি!

বুরহানের মনে হলো, হয়তো সে অন্য কাউকে খুঁজছে। তাই সে একটু ব্যথিত হলো। বললো, মনে হচ্ছে, তুমি অন্য কাউকে খুঁজছিলে।

ঃ না, আমি কাউকে খুঁজছিলাম না। কিন্তু আপনি কাকে খুঁজতে যাচ্ছিলেন?

ঃ আমি তো তোমাকেই খুঁজতে এসেছিলাম।

বুরহানের উত্তর শুনে আনীসা হেসে ফেললো। জ্যোৎস্নার আলোয় তখন তার চেহারা ঝলমল করে ওঠলো। বললো, আমি আপনাকে খুব চিনি।

ঃ দুষ্ট মেয়ে।

ঃ মতলবী ছেলে।

ঃ তুমি আমাকে যা-ই বলবে, আমি সে নিয়ে গর্ব করবো।

ঃ আচ্ছা, থাক সে কথা। কোথায় যাচ্ছিলেন তাই বলুন।

ঃ আল্লাহ সাক্ষী। আমি তোমার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্যই এদিকে আসছিলাম।

আনীসা কণ্ঠে একটু অস্থিরতা এনে বললো, আচ্ছা আচ্ছা! কেনো আসছিলেন?

ঃ তোমাকে না দেখলে মনটা ভালো লাগে না তাই।

আনীসা অবজ্ঞার স্বরে বললো, আচ্ছা! তাই নাকি।

ঃ তোমার বিশ্বাস হয় না? কেনো হয় না? তুমি কি প্রাণহীন মূর্তি, হিন্দুরা যে মূর্তির পূজা করে?

আনীসা বিস্ময়ভরা কণ্ঠে মৃদু হেসে বললো, ভেবে দেখেছো বুরহান! হিন্দুরা নিজ হাতে পাথরের মূর্তি বানিয়ে কীভাবে তার পূজা করে?

বুরহান বললো, ওরা বোকা, নির্বোধ। ওদের তোমাকে পূজা করার দরকার ছিলো।

আনীসা দারুণ লজ্জা পেলো। বললো, আপনি এখন চলে যান।

ঃ আনীসা! পাথরের মূর্তির চেয়ে তোমার হৃদয় বেশি পাষাণ।

ঃ এটা আপনার ধারণা মাত্র।

ঃ ভালোবাসা যে কী জিনিস, তুমি তা বুঝতে চাও না।

ঃ আল্লাহ যেনো কাউকে এর চক্করে না ফেলেন।

ঃ ইস্ কি নিষ্ঠুর কথা!

আনীসা খিল খিল করে হেসে ফেললো। বললো, আচ্ছা, এখন আসি।

আনীসা চলে যেতে লাগলো। বুরহান একটু উচ্চকণ্ঠে অস্থির হয়ে বললো, আনীসা! একটু দাঁড়াও।

আনীসা দাঁড়িয়ে গেলো। বললো, আচ্ছা, বলুন।

বুরহান তার নিকট গিয়ে বললো, আচ্ছা, তোমার এ হেয়ালিপনা আর কতোনদিন থাকবে?

আনীসার কণ্ঠ ভয়াতুর। বললো, ঐ দেখেন কে যেনো আসছে।

এ কথা বলেই এক লাফে দূরে সরে গিয়ে বিদ্যুতের ন্যায় চলে গেলো। বুরহান নির্বাক কণ্ঠে তার প্রস্থান পথের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলো। তারপর পায়ে পায়ে হেঁটে চলে গেলো। আনীসাকে সে হৃদয় দিয়ে ভালোবাসে। অপরিসীম মহব্বত করে। তাই তার সাথে কথা বলতে, তাকে একটু দেখতে তার মন দারুণ অস্থির হয়ে পড়ে।

পর দিনই বুরহান ও হারুন অগ্রবাহিনী নিয়ে যাত্রা শুরু করলো। তাদের সাথে পাঁচ হাজার মুজাহিদ। এ পাঁচ হাজার মুজাহিদকে তারা দু'ভাগে ভাগ করে নিল। হারুনের নেতৃত্বে রইলো তিন হাজার আর বুরহানের অধীনে দু'হাজার। পাঁচ মাইলের ব্যবধান রেখে আগে-পেছনে হয়ে তারা চলতে লাগলো।

দ্বিতীয় দিনে আলতুনতাশ ও আমীর আলী প্রত্যেকে পাঁচ হাজার করে মুজাহিদ নিয়ে ডান ও বাম পার্শ্বে চলতে লাগলেন। তারাও তাদের সৈন্যদের পাঁচ ভাগে বিভক্ত করে নিলেন। প্রত্যেক দলে এক হাজার করে সৈন্য ছিলো। প্রত্যেক দল এক মাইল ব্যবধান রেখে চলতে লাগলো। এভাবে ডান ও বাম পার্শ্বের সৈন্যরা সুলতানের অধীন বাহিনীর ডানে ও বামে পাঁচ মাইল ছড়িয়ে পড়লো।

সুলতানের সাথে দশ হাজার সৈন্য। তাদের পাঁচশকে নারীদের প্রহরা ও হেফাজতের জন্য নিয়োগ করা হয়েছে। ৯ হাজারকে ৯ ভাগে ভাগ করা হয়। এ ৯ ভাগ তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে একেক মাইল ব্যবধান রেখে চলতে লাগলো। এভাবে সুলতানের অধীন সৈন্যরা তিন মাইল স্থান জুড়ে ছড়িয়ে পড়লো। এর ডান ও বাম পাশে আলতুনতাশ ও আমীর আলী পাঁচ মাইল আগে-পেছনে হয়ে অগ্রসর হচ্ছে।

সবার পশ্চাতে রয়েছে পাঁচ হাজার অশ্বারোহী বাহিনী। তারা বিক্ষিপ্তভাবে আছে, যেনো পশ্চাৎ দিক থেকে এসে শত্রুরা ডান, বাম বা মধ্যবর্তী বাহিনীকে আকস্মিভাবে আক্রমণ করতে না পারে।

সুলতান মাহমুদের দূরদর্শিতার কারণে তাঁর অল্প কিছু সৈন্য আট-দশ মাইল অঞ্চল জুড়ে অগ্রসর হতে লাগলো। ফলে কেউ সুলতানের বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা নির্ধারণ করতে পারলো না। যারাই দেখলো, মনে করলো সুলতান মাহমুদ

বিশাল বাহিনী নিয়ে আসছেন। তাঁর সৈন্য সংখ্যা অগণিত, অপরিসীম।

সুলতান মাহমুদের অগ্রবাহিনী সর্বপ্রথম আজমীরে গিয়ে পৌঁছলো। আজমীরের রাজা আগেই সংবাদ পেয়েছিলেন, সুলতান মাহমুদ বিশাল বাহিনী নিয়ে ঝড়ের গতিতে এগিয়ে আসছেন। আজমীরের গুপ্তচররা রাজাকে সংবাদ দিয়েছে, সুলতানের বাহিনীর সৈন্য অসংখ্য। তাই আজমীরের রাজা মোকাবেলা করার সাহস পেলেন না। ভয়ে তিনি রাজধানী ছেড়ে পালিয়ে এক দুর্গম পাহাড়ে আশ্রয় নিলেন।

হারুন আজমীরে গিয়ে যখন কেল্লায় প্রবেশ করলো, তখন সে হতবাক্ হয়ে গেলো। সেখানে কোনো মানুষ নেই। সবাই পালিয়ে গেছে। জনশূন্য অবস্থায় খা খা করছে বিশাল কেল্লা। মুজাহিদ বাহিনীর ভয়ে পালিয়ে যাওয়ার কারণে তারা দুঃখিত হলো। মর্মাহত হলো। সাথে সাথে হৃদয়ের গহীনে আনন্দের দোলাও লাগলো। কারণ, দুমশনদের উপর তাদের এমন প্রভাব পড়েছে যে, তারা যুদ্ধ করতে সাহসও করেনি। হারুন আজমীরে প্রবেশ করলো এবং আজমীরের সার্বিক অবস্থা সুলতান মাহমুদকে জানালো।

এ সংবাদ শুনে সবাই আনন্দিত হলো। হারুন মাত্র একদিন আজমীরে থেকে দ্বিতীয় দিনই আজমীর ছেড়ে সামনে অগ্রসর হতে লাগলো। কয়েক দিন সফর করার পর তাড়াঘরে পৌঁছলো।

তাড়াঘরের বিরাট কেল্লা। যেমন বিরাট তেমন মজুবত। সেখানেও বাধার কোনো আলামত দেখা গেলো না। আরো অগ্রসর হয়ে হারুন গুজরাটের সীমান্তে গিয়ে পৌঁছলো। পথে পথে কেবল কয়েকটি কেল্লা ও শহর পেয়েছে। কিন্তু কেউ তাদের বাধা প্রদান করতে অগ্রসর হয়নি। অবশেষে আমব্রেলীর নিকট গিয়ে পৌঁছলো।

পনেরো.

হারুনের সাথে অল্প কয়েকজন সৈন্য। তাই আমব্রেলীর মহারাজা পরমদেব বিষয়টাকে আমলে নিলেন না। এমনকি কেল্লার ফটকও বন্ধ করেননি।

আমব্রেলীর কেল্লার বেশ নাম-ডাক। যেমন মজুবত, তেমন বিশাল। অত্যন্ত উঁচু। রাজপুত ও সৈন্যরা নগর প্রাচীরে অবস্থান নিয়ে মুসলমানদের যুদ্ধের আহ্বান করতে লাগলো। ফটকে ফটকে কড়া প্রহরা। হারুন একটি ফটকে পৌঁছুলে তাকে বাধা দেয়া হলো। তার আগমনের সংবাদ মহারাজা পরমদেবকে জানানো হলো।

পরমদেব চটজলদি দরবার ডেকে সভাসদদের নিয়ে বৈঠকে বসলেন। তারপর হারুনের প্রবেশের অনুমতি প্রদান করলেন।

হারুন কেল্লায় প্রবেশ করে সম্মুখে অগ্রসর হতে লাগলো। প্রথম দৃষ্টিতেই সে বুঝতে পারলো, এ কেল্লা সহজে পদানত করা যাবে না। যেমন মজবুত তেমনি মানুষে পরিপূর্ণ। মনে হয় সবাই যোদ্ধা।

রাজপুতও সিপাইরা মুসলমানদের দেখে তুচ্ছতার দৃষ্টিতে তাকায়। টিপ্পনী কাটে। অত্যন্ত বীরত্বের সাথে চলাফেরা করে।

হারুন ও তার সঙ্গী মুজাহিদরা হিন্দু সিপাইদের দেখতে দেখতে অগ্রসর হচ্ছে। এ অঞ্চলের হিন্দুরা মুসলমানদের নাম বহু শুনেছে। কিন্তু কখনো মুসলমান দেখেনি। তাই যখনই হিন্দুরা শুনতে পেলো, মুসলমানরা এসেছে, তখনি তারা মুসলমানদের দেখতে ছুটে এলো। নারীরা এলো। পুরুষরা এলো। যুবক-যুবতী ও কিশোর-কিশোরীরা এলো। ভিড় করে তারা হারুন ও তার সঙ্গীদের দেখতে লাগলো। তুর্কী এই বীরদের তারা অত্যন্ত বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে দেখতে লাগলো।

রাহবরদের সাথে হারুন ও তার সাথী বীরদর্পে পা ফেলে অগ্রসর হচ্ছে। রাজ প্রাসাদের নীচ দিয়ে দরবারে যাতায়াতের পথ। রাজপরিবারের নারীরাও প্রাসাদের ঝুল বারান্দায় দাঁড়িয়ে গেলো। কামিনী-মহারাণীও সেখানে উপস্থিত। তারাও মুসলমানদের দেখতে গভীর আগ্রহে তাকিয়ে আছে।

কামিনী পূর্বেও হারুনকে দেখেছিলো। সে তাকে দেখামাত্র চিনে ফেললো। ব্যস্ত হয়ে মাকে বললো, মা! মা!! ঐ যে তুর্কীটি আগে আগে যাচ্ছে, সে-ই রাজকুমারী চন্দ্রামুখীকে ডাকাতদের হাত থেকে রক্ষা করেছিলো।

মা বললো, এতো একেবারে যুবক ছেলে। কিন্তু তাকে অত্যন্ত নির্ভীক ও নির্ভয় মনে হচ্ছে। আমাদের সিপাই আর সৈন্যদের দেখে সে কোনোই ভয় পাচ্ছে না।

অপর এক মহিলা বললো, শুধু কি তাই? মহারাণী! দেখুন তো কী চমৎকার তার স্বাস্থ্য-চেহারা। তাছাড়া পরনের কাপড়টিও কিন্তু তাকে বেশ মানিয়েছে।

মহারাণী বললেন, অস্ত্রটিও দেখো। আরো বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, তারা সবাই একই ধরনের পোশাক পরিহিত। কামিনী তো সত্যই বলেছিলো, এ যুবক অত্যন্ত বাহাদুর। কিন্তু সে মহাগুরুর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য কেনো গিয়েছিলো?

কামিনী বললো, মহাগুরু বলেছিলেন, সে নাকি ভ্রমণ করতে এদিকে এসেছিলো। তবে আমার মনে হয় সে গুপ্তচর হিসাবেই এসেছিলো।

ইতিমধ্যে হারুন ও তার সঙ্গীরা রাজপ্রাসাদ অতিক্রম করে রাজ দরবারের দরজায় গিয়ে পৌছলো। সেখানে শত শত রাজপুত ও সিপাই ঢাল-তলোয়ার আর তীর-ধনুক নিয়ে সুসজ্জিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

হারুন ও তার সাথীদের দরবারে প্রবেশের অনুমতি ছিলো। তারা নির্বিঘ্নে বীর দর্পে দরবারে প্রবেশ করলো। বিরাট দরবার কক্ষ। অত্যন্ত উঁচু তার ছাদ। স্তম্ভগুলো অত্যন্ত মজবুত ও কারুকার্যখচিত। দরবারে উপস্থিত সভাসদরা প্রায় বিবস্ত্র বললেই চলে। তবে তাদের সারা গায়ে বিভিন্ন প্রকার অলঙ্কারের ছড়াছড়ি। অলঙ্কারেই যেনো গোটা শরীর আবৃত হয়ে গেছে। তারাও সবাই অত্যন্ত মূল্যবান হালকা অস্ত্রে সজ্জিত।

মহারাজা পরমদেব-এর সিংহাসন দরবার কক্ষের মধ্যখানে অবস্থিত। প্রায় বারো ফুট উঁচু। সেও প্রায় বিবস্ত্র। অত্যন্ত উন্নত মানের মূল্যবান রেশমী ধুতি পরে আছে। বাকি শরীর বস্ত্রহীন হলেও মূল্যবান দুর্লভ মুক্তা আর মাণিক্যখচিত মালা পরে আছেন। তার প্রশস্ত বুকখানা তাতে ঢেকে আছে। তবে, কোমর একেবারে খোলা। হাতের কনুই পর্যন্ত বিস্তৃত রূপার কারুকার্যখচিত দস্তানা। আর বাযুতে স্বর্ণের নির্মিত বাযুবন্দ। মাথার মুকুটটি অত্যন্ত বিস্ময়কর। হিরা-পান্না আর মণি-মুক্তা দ্বারা এমনভাবে তৈরি, মনে হয় যেনো তা থেকে তীব্র আলো বিকিরিত হচ্ছে।

মহারাজা পরমদেব মধ্য বয়সী পুরুষ। তবে বেশ শক্তিশালী। তার চেহারায় বীরত্ব আর দূরদর্শিতার আলামত খুঁজে পাওয়া যায়। অদূরে একটি রূপার চেয়ারে তার পুত্র শিকদেব বসে আছে।

হারুন পায়ে পায়ে এগিয়ে একেবারে মহারাজার সন্নিকটে গিয়ে পৌঁছলো। পরমদেব একজন দোভাষী ঠিক করে রেখেছিলেন। সে সিংহাসনের নীচে অবস্থান করছে।

হারুন ও তার সঙ্গীদের কেউ মহারাজা পরমদেবকে সালাম করলো না। সম্মানসূচক কোনো আচরণ দেখালো না। পরমদেব দোভাষীকে বললেন, এই বর্বর মুসলমানরা কেনো আমার নিকট এসেছে জিজ্ঞেস করো।

ভারতবর্ষের সার্বিক অবস্থা তখন অত্যন্ত নাজুক। সাধারণ জনগণের কথা না হয় নাই বলা হলো, রাজা-বাদশাহরাও প্রায় বন্য পশুদের মত হয়ে গিয়েছিলেন। পশু আর মানুষের মধ্যকার তফাৎটুকু তাদের মাঝে ছিলো না। এ শিক্ষাও তাদের ছিলো না যে, মানুষকে অর্ধনগ্ন থাকা উচিত নয়। শিক্ষা-সংস্কৃতি, সভ্যতার নাম-গন্ধও তাদের মাঝে ছিলো না। কিন্তু তবুও তারা নিজেদের খুব শিক্ষিত, সভ্য ও সংস্কৃতিবান মনে করে গর্ববোধ করতেন। আত্মশ্লাঘায় বিভোর থাকতেন আর মুসলমানদের অসভ্য মনে করতেন।

দোভাষীর প্রশ্নের উত্তরে হারুন বললো, আমাদের আসার কারণ আমাদের সুলতান সোমনাথ আক্রমণ করতে যাচ্ছেন। আমরা ইতিমধ্যে যে রাজ্য, যে শহর অতিক্রম করে এসেছি কেউ আমাদের বাধা দেয়নি। আমাদের উপর

আক্রমণের ব্যর্থ চেষ্টাও করেনি। তাই আমাদের আশা, আপনিও আমাদের যাত্রাপথে বাধা দেবেন না। আমরাও আপনার কোনো ক্ষতি করবো না।

মহারাজা তিরস্কার করে মুখ ভেংচিয়ে বললেন, তোমরা যে সব কেল্লা বা শহর অতিক্রম করে এসেছো, তার শাসকরা ছিলো ভীরু। আমি কিন্তু তাদের মতো নই। আমার অন্তরে সোমনাথ মূর্তির ইজ্জত-সম্মান বিদ্যমান। সুতরাং আমি কিছুতেই তোমাদেরকে সোমনাথের দিকে যেতে দেবো না।

হারুন অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বীরত্বের সাথে বললো, বেশ তাহলে আপনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যান। তবে একথাটা মাথায় রাখবেন, আপনি লাহোরের রাজা জ্বীপালের চেয়ে বেশি শক্তিশালী নন। আপনার বাহিনীতে বাহাতিয়ার রাজা বিজি রায়ের চেয়ে বেশি সৈন্য নেই। পেশোয়ারের রাজা শিকপালের চেয়ে বেশি প্রভাব-প্রতিপত্তি আপনার নেই। নারায়ণের রাজার চেয়ে আপনি বেশি আত্মমর্যাদার অধিকারী নন। তানদুনার পাহাড়ি রাজ্য আন্দরভীমের চেয়ে বেশি বীর আপনি নন। রাজা বিনমীনের রাজ্য কাশ্মীরের চেয়ে তো দুর্গম গিরিময় আপনার রাজ্য নয়। মথুরার রাজা কালাচন্দ্রের দুর্গের চেয়ে আপনার দুর্গ বেশি মজবুত নয়। কনৌজের রাজা জ্বীপালের চেয়ে বেশি সৈন্য আপনার নেই। এসব রাজাদের আমরা পরাজিত ও পদানত করেছি। তাদের অহঙ্কার আর শক্তির প্রবচঞ্চনা যেনো আপনাকে ধোঁকায় না ফেলে। নিজের ও রাজ্যের ধ্বংস ডেকে আনবেন না। যুদ্ধের চেয়ে সন্ধিই উত্তম হবে। আমরা তো আপনার রাজ্য দখল করে নিচ্ছি না। আপনার থেকে কর চাচ্ছি না। আমরা শুধু নির্বিঘ্নে সম্মুখে যাওয়ার সুযোগ চাচ্ছি। আশা করি আমার অনুরোধটুকু উপেক্ষা করবেন না।

হারুন যে রাজাদের নাম উল্লেখ করেছে, তারা সবাই সুলতান মাহমুদ গজনবীর সাথে অত্যন্ত অহংকারের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কিন্তু তাদের কেউ বিজয়ের মুখ দেখেননি। সকলেই চরমভাবে পরাজিত হয়েছেন। কর দেয়ার চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে সন্ধি করেছেন। এখনো কর দিচ্ছেন।

আসল কথা হলো, সুলতান মাহমুদ গজনবী কখনো ভারতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার চিন্তা করেননি। চেষ্টাও করেননি। তা না হলে আস মুদ্রহিমাচল পদানত করে তাতে এক মজবুত ও বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা তাঁর জন্য কোনো ব্যাপার ছিলো না। সে সময়ে ভারতবর্ষে যতো বড় বড় রাজা-বাদশাহ ছিলেন, সবাইকে তিনি পদানত ও পরাজিত করে তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তি ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

হারুনের নির্ভীক কথা-বার্তা শুনে পরমদেব ক্ষিপ্ত হলেন। বললেন, তুমি যেসব রাজার নাম বলেছো, তারা তো ভীরু ও আত্মমর্যাদাহীন। তাই তারা পরাজিত হয়ে তোমাদের সুলতানের কর্তৃত্ব মেনে নিয়েছেন। কিন্তু আমব্রেলীর রাজা তেমন নন। আমার নাম পরমদেব। তোমার নাম কী?

আমার নাম হারুন।

পরমদেব ঝাঁঝালো স্বরে বললেন, আমি তোমার বেআদবীমূলক আচরণ মাফ করে দিলাম। যাও তোমার সুলতানকে গিয়ে বলো, পথ দেয়া হবে না। যদি সাহস থাকে, তাহলে যেনো তিনি রাস্তা তৈরি করে নেন।

হারুন দৃঢ়তার সাথে বললো, ইনশাআল্লাহ। আমরা রাস্তা তৈরি করেই অগ্রসর হবো। ইসলামের শার্দূল যোদ্ধাদের দেখলে পথ ছেড়ে দেয়া ছাড়া তোমার কোনো উপায় থাকবে না।

হারুন আর দেরি করেনি। বীরদর্পে হন হন করে দরবার কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসে। কিছুদূর যেতে না যেতেই শিকদেব এসে তার সাথে সাক্ষাৎ করে। বলে, খানিক দাঁড়িয়ে কি আমার একটি কথা শুনবে?

হারুন তাকে চেনে না। সে তাকে রাজা পরমদেব-এর নিকট উপবিষ্ট হয়ে কথা বলতে দেখেছে। সে মনে করলো হয়তো রাজা তাকে পাঠিয়েছেন। তাই বললো, বলো কী বলবে।

ঃ আমি নিরালায় কিছু কথা বলতে চাই।

ঃ বলো, কিন্তু তুমি কে? কী তোমার পরিচয়?

ঃ আমি রাজকুমার। আপনার সঙ্গীদের বিদায় করে দিন। আপনি আমার সাথে কথা বলো পরে যাবেন।

ঃ না, তা হয় না। আমি আমার সাথীদের এভাবে বিদায় করতে পারি না।

ঃ আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। আমি রাজকুমারী চন্দ্রামুখীর দূত। তার সংবাদ নিয়ে এসেছি।

হারুন জানতো না, শিকদেব-এর সাথে চন্দ্রামুখীর বিয়ের আলোচনা হচ্ছে। চন্দ্রামুখী তার বাগদত্তা। রাজকুমারী চন্দ্রামুখীর নাম ও তার সংবাদ এ দু'টি কথাতেই সে শিকদেব-এর ফাঁদে পড়ে গেলো। হারুন তার সাথীদের বিদায় করে দিয়ে শিকদেব-এর সাথে চলে গেলো।

শিকদেব তার সাথে বন্ধুসুলভ কথা বলতে বলতে নিয়ে এলো। রাজপ্রাসাদের নিকটে পৌঁছতেই হঠাৎ অনেকগুলো সশস্ত্র সৈন্য তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে বন্দি করে ফেললো। ঝুল বারান্দায় দাঁড়িয়ে কামিনী এসব কিছু দেখলো। হারুনকে শক্ত করে বেঁধে ফেললে শিকদেব অট্টহাসি হেসে বললো, হারুন! তুমি প্রেমের খেলায় আমার প্রতিদ্বন্দ্বি হয়েছিলে। তুমি জানো না, রাজকুমারী চন্দ্রামুখী আমার বাগদত্তা। আমি তোমাকে গ্রেফতার করে হত্যা করার ইচ্ছে করেছিলাম। গ্রেফতার করেছি। হত্যা করা এখন সময়ের ব্যাপার।

হারুনের চোখ-মুখ লাল হয়ে গেলো। ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বললো, দাগাবাজ! কমীনা! গাদ্দার! বিশ্বাসঘাতক! এই প্রতারণার শাস্তি তোকে পেতে হবে।

শিকদেব সৈন্যদের ইঙ্গিত করতেই তারা হারুনকে টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে গেলো।

ষোলো.

শিকদেব কামিনী রাজকুমারী চন্দ্রামুখীকে অপহরণ করে আবব্রেলীতে নিয়ে আসার যে গভীর ষড়যন্ত্র করেছিলো, শোবাদেবী তা ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিলো। ব্যর্থ ও অপমানিত হয়ে সে আমব্রেলীতে ফিরে গিয়েছিলো।

রাজকুমারী চন্দ্রামুখী যদিও কামিনীকে তার সখীদের অন্তর্ভুক্ত রেখেছিলো এবং তার সাথে স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করেছিলো, কিন্তু কামিনী লজ্জায় এমনি মরে যাচ্ছিলো যে, শেষ পর্যন্ত সে আর সোমনাথ থাকতে পারেনি। কয়েকদিন পরই চন্দ্রামুখীর পিতার নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে আবব্রেলীতে পিত্রালয়ে চলে আসে।

রাজকুমারী চন্দ্রামুখী প্রায়ই আফসোস করে বলে, কামিনীর মতো সরল-শান্ত পবিত্র হৃদয়ের অধিকারিনী মেয়ে কীভাবে ভাইয়ের পাল্লায় পড়ে ষড়যন্ত্র করতে পারে! কিন্তু তারপরও কখনো চন্দ্রামুখী তার এ জঘন্যতম কাজের কারণে তার সাথে দুর্ব্যবহার বা কটু কথা বলেনি।

চন্দ্রামুখী এতোই সরল ও হৃদয়বান যে, কামিনী চলে যাওয়ার কারণে সে আফসোস করতো। তবে সে তাকে পুনরায় ডেকে আনার কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। এখন রাজকুমারী চন্দ্রামুখী শোবাদেবীর আগমনের অপেক্ষায় অধীর হয়ে আছে।

তার অন্তরে এখন প্রায়ই একটি বিষয় আনাগোনা করছে ও তাকে অস্থির করে তুলছে যে, যদি সে সোমনাথের মহারাজার কন্যা না হয়ে থাকে, তাহলে সে কার কন্যা? তার পিতামাতা কারা? তারা কোথায় থাকেন? সোমনাথের মহারাজাই কেনো তাকে প্রতিপালিত করছেন? কীভাবে সে রাজকুমারী হয়ে গেলো?

তার বিশ্বাস– দৃঢ় বিশ্বাস যে, শোবাদেবী কখনো মিথ্যা কথা বলে না। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে না। তাই সে শোবাদেবীর আগমনের অপেক্ষায় অধীর হয়ে আছে।

রাজকুমারীকে বেশিদিন অপেক্ষা করতে হলো না। একদিন সকালের সূর্য পূর্ব দিগন্ত ছেড়ে যখন একটু উপরে ওঠে চারদিকে সোনালী আলো ছড়িয়ে নিজ আগমন বার্তা ঘোষণা করেন, ঠিক তখন শোবাদেবী এসে উপস্থিত হলো। রাজকুমারী চন্দ্রামুখী তখন স্নান সেরে পূজাপাঠ করে নির্মল হৃদয়ে রাজপ্রাসাদের ফুল বাগানে সখীদের নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো।

চন্দ্রামুখী শোবাদেবীকে হৃদয় দিয়ে শ্রদ্ধা করে। মনে-প্রাণে শ্রদ্ধা করে। শোবাদেবীকে দেখেই তার নির্মল চেহারায় প্রফুল্লতার আলো ছড়িয়ে পড়লো। ছুটে গিয়ে নত হয়ে তার পা স্পর্শ করলো। শোবাদেবী তার জন্য দু'আ করলো।

রাজকুমারীর সখী-দাসীরাও একে একে তার পা স্পর্শ করে প্রার্থনা করলো। শোবাদেবী সবার জন্য দু'আ করলো।

চন্দ্রামুখী জিজ্ঞেস করলো, মাতাজ্বী! আপনি কি মহাবন হয়ে এসেছেন?

শোবাদেবী বললো, না আমি সেখানে গিয়ে পৌঁছুতে পারিনি। পথেই শুনতে পেলাম, সুলতান মাহমুদ ঝড়ের গতিতে সোমনাথ আক্রমণের জন্য ছুটে আসছেন। তাই আমি তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছি। চন্দ্রামুখী! আমি তোমার সাথে নির্জনে কথা বলতে চাচ্ছি!

শোবাদেবীর কথা শুনে চন্দ্রামুখীর সখী ও দাসীরা দূরে সরে গেলো। চন্দ্রামুখী বললো, মাতাজ্বী! আপনি বলেছিলেন আমি রাজকুমারী নই। তাহলে...

চন্দ্রামুখীর কথা পূর্ণ না হতেই শোবাদেবী বললো, আমি এখনো ঐ কথাই বলছি। আমি জানি, তুমি তোমার পিতামাতার অবস্থা জানার জন্য অস্থির-বেচাইন হয়ে আছো।

ঃ হ্যাঁ মাতাজ্বী! আমি দারুণ অস্থির ও বেচাইন হয়ে আছি। দয়া করে আমার এ অজ্ঞতার আবরণ দূর করে দিন। বলে দিন, আমি কে? কী আমার পরিচয়?

ঃ চন্দ্রামুখী! এখনো এ রহস্যের পর্দা উন্মোচনের সময় হয়নি। তোমাকে আরো কিছুদিন ধৈর্যধারণ করতে হবে। তবে সে দিন অতি নিকটে এসে পড়েছে, যেদিন তুমি তোমার আত্মপরিচয় খুঁজে পাবে। তোমার পিতামাতার সন্ধান পাবে। এখন আমি তোমাকে কয়েকটি সংবাদ দিতে এসেছি। আমার বিশ্বাস এ সংবাদগুলো শুনে তুমি চিন্তিত হয়ে পড়বে না। তবে সে সব সংবাদ বলার পূর্বে তোমাকে আমার কয়েকটি বিষয় জিজ্ঞেস করতে হবে।

শোবাদেবীর কথা শুনে রাজকুমারী চন্দ্রামুখী বিস্ময়ভরা ডাগর চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর বললো, আচ্ছা, জিজ্ঞেস করুন।

শোবাদেবী বললো, তুমি আমাকে তোমার অন্তর খুলে মনের প্রকৃত উত্তরটি দেবে, এ প্রতিশ্রুতি দিলেই আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করবো।

চন্দ্রামুখীর বিস্ময় বোধ আরো বেড়ে গেলো। বিস্ফারিত নেত্রে শোবাদেবীর দিকে তাকিয়ে রইলো।

শোবাদেবী বললো, চন্দ্রামুখী! এতে বিস্ময়ের কী আছে? আমি ইতিমধ্যে এমন কিছু বিষয় জানতে পেরেছি, যা শুধু তোমার সাথেই সম্পৃক্ত। তাই তোমার থেকে এ প্রতিশ্রুতি নিচ্ছি। আমাকে তোমার মাতা মনে করো। আর আমি যা জিজ্ঞেস করবো, তার সঠিক উত্তর দেবে। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, আমি কাউকে তোমার এসব কথা বলবো না। আর তোমার সম্পর্কে আমার কোনো খারাপ ধারণাও সৃষ্টি হবে না। বরং তুমি যা চাও তা-ই যেনো হয়, তারই প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবো।

রাজকুমারী চন্দ্রামুখীর বিস্ময়ের অন্ত রইলো না। সে বুঝতেই পারছে না, শোবাদেবী তাকে এমন কী প্রশ্ন করতে পারে, যার জন্য এ প্রতিশ্রুতির প্রয়োজন। এ ভূমিকার প্রয়োজন। সে বললো, হ্যাঁ মাতাজ্বী! আমি সত্য সত্যই উত্তর দেবো।

ঃ তোমার ব্যাপারে আমার এই-ই ধারণা। তবে প্রশ্ন করার পূর্বে আমি তোমাকে এ কথা বলে দেয়া জরুরি মনে করছি যে, সুলতান মাহমুদ গজনবী শুধু তোমার কারণেই সোমনাথ আক্রমণ করতে আসছেন।

বিস্ময়ের আতিশয্যে রাজকুমারী চন্দ্রামুখীর চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেলো। বিস্ময়ে টইটুম্বর তার কণ্ঠ। বললো, শুধু আমার কারণে...

ঃ শুধু তোমার কারণে।

ঃ ভেবে দেখেছেন কি মাতাজ্বী!

শোবাদেবীর কণ্ঠ একেবারে শান্ত। বললো, আমার জানা মতে সুলতান মাহমুদ নিকৃষ্ট অসচ্চরিত্র রাজাদের মতো নন। তিনি তোমার রূপলাবণ্যের কোন প্রশংসা শোনেননি। তোমাকে মহব্বতও করেন না। এ ধরনের কোনো খারাপ ধারণা তার ব্যাপারে করা যায় না।

চন্দ্রামুখী বললো, তাহলে... তাহলে তিনি শুধু আমার জন্য সোমনাথ আক্রমণ করতে আসছে কেনো? কী তার প্রয়োজন?

ঃ এটাও এক রহস্যময় বিষয়। সুলতান এখানে এলেই সে রহস্য উন্মোচিত হয়ে যাবে।

ঃ মাতাজ্বী! আপনি সব কিছু জানা সত্ত্বেও আমাকে কেনো কিছুই বলছেন না?

ঃ বেটী! তোমাকে কী বলবো? এখনো আমার মুখে তালা লাগানো আছে। তাই কিছুই বলতে পারছি না।

ঃ এ তালা কে লাগিয়েছে? ঈশ্বর?

ঃ হ্যাঁ, ঈশ্বর। শোনো মেয়ে! আত্ম রহস্য উৎঘাটনের প্রচেষ্টায় নিজেকে কষ্টে ফেলো না। হ্যাঁ, এখন আমি তোমাকে কয়েকটি প্রশ্ন করবো। প্রথমে বলো, তুমি যখন গুরুজ্বী ধর্মপালের সাক্ষাতে গিয়েছিলে, সেখানে কি কোনো তুর্কীর সাক্ষাৎ পেয়েছিলে?

ঃ একজন নয়, দু'জন তুর্কীর সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিলো। তারা দু'জন আমাকে, আমার সখীও দাসীদেরকে দস্যুদের কবল থেকে রক্ষা করেছিলো।

ঃ সে দুই তুর্কীর একজনের নাম হারুন?

ঃ হ্যাঁ।

শোবাদেবী অত্যন্ত তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে চন্দ্রামুখীর মুখের দিকে তাকালো। যেনো সে মুখের আবরণ ভেদ করে হৃদয়ের অন্তস্থলে পৌঁছে হৃদয়ের কথা কুড়িয়ে আনার চেষ্টা করছে। তারপর বললো, আচ্ছা, হারুনকে কি তুমি ভালোবেসে ফেলেছো?

চন্দ্রামুখীর চেতনা ফিরে এলো। সে দ্বিধায় পড়ে গেলো। কোনো উত্তর দিতে পারছে না। এদিকে শোবাদেবী তীক্ষ্ম মর্মভেদী দৃষ্টিতে তাকে দেখছে। সে কোমল কণ্ঠে বললো, উত্তর দাও বেটী!

ঃ মাতাজ্বী! আমি বংশের কলঙ্ক।

ঃ এটা তো আমার প্রশ্নের উত্তর নয়। তুমি তো আগেই স্বীকার করেছো, আমার প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেবে।

ঃ হ্যাঁ, আমি এখনো সে কথা স্বীকার করছি।

ঃ তাহলে সঠিক উত্তর দাও।

ঃ হ্যাঁ, এটা সত্য কথা মাতাজ্বী! তবে আফসোস, একজন ম্লেচ্ছের সাথে আমার...।

ঃ হ্যাঁ, যদিও এটা একটা মন্দ কথা, তবু ভালোবাসা জাত আর জাতি দেখে না। আচ্ছা, তাতে তেমন দোষের কিছু নেই। এবার বলো, তোমার অন্তরে কি শিকদেব-এর জন্য একটুও স্থান নেই।

চন্দ্রামুখীর স্পষ্ট উত্তর, না, নেই।

সেবাদেবী বললো, তাহলে শোনো! শিকদেব হারুনকে প্রতিপক্ষ মনে করে ধোঁকা দিয়ে তাকে গ্রেফতার করেছে। তাকে হত্যা করা এখন সময়ের ব্যাপার।

শুনে চন্দ্রামুখীর প্রাণ যেনো ওষ্ঠাগত হয়ে গেলো। দুশ্চিন্তা আর হতবুদ্ধিতায় পাথর হয়ে সে ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টিতে শোবাদেবীর প্রতি তাকিয়ে রইলো। তার উজ্জ্বল চেহারা যেনো হঠাৎ অন্ধকার হয়ে গেছে। শোবাদেবী সান্ত্বনার ভাষায় বললো, চন্দ্রামুখী! দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ো না। নিশ্চয় ঈশ্বর তার হেফাজত করবেন। সুলতান মাহমুদ মরুঝড়ের তীব্রতা নিয়ে ধেয়ে আসছেন। তিনি আমব্রেলীতে এসে পৌঁছে গেছেন। হারুনকে তিনি হৃদয় দিয়ে ভালোবাসেন। অত্যন্ত স্নেহ করেন। যদি শিকদেব নির্বুদ্ধিতাবশত তাকে বিন্দুমাত্র কষ্ট দেয়, তাহলে মুসলমানরা আমব্রেলীর দুর্গের প্রত্যেকটি ইট খুলে ফেলবে। নির্বিশেষে নির্বিচারে সবাইকে নির্মমভাবে হত্যা করবে। নিশ্চিন্তে থাকো। শিকদেব হারুনের কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না।

দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনাক্লিষ্ট রাজকুমারী চন্দ্রামুখীর কণ্ঠ। বললো, কিন্তু মাতাজ্বী! আপনি হয়তো শিকদেব-এর দুশ্চরিত্রের কথা জানেন না। সে অত্যন্ত হিংসুটে। আমি তো হারুনের ব্যাপারে দারুণ ভয় পাচ্ছি। যদি সে...।

ঃ বেটী! দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ো না। আমি এখনই আবব্রেলী যাচ্ছি। তোমার জন্য আমি হারুনকে বাঁচানোর চেষ্টা করবো।

কৃতজ্ঞতায় অশ্রু ছল ছল করে ওঠলো চন্দ্রামুখীর চোখ দু'টি। কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বললো, আপনি... আপনি আমার প্রতি কতো মেহেরবান। কতো দয়ালু। সারা জীবন আপনার মেহেরবানী, দয়া ও অনুগ্রহের কথা ভুলবো না।

ঃ যখন তোমার নিকট আমার অজানা রহস্য উন্মোচিত হয়ে যাবে, যখন তুমি তোমার জীবনের অজানা বিষয়গুলো জানতে পারবে, তখন কিন্তু... না, না, সময় আসার পূর্বে আমি কিছুই বলবো না।

ঃ আপনার কথায় আমার অনুসন্ধিৎসু হৃদয়ে আগুন ধরে গেছে। হায়, যদি আজই আপনি আমাকে আমার জীবনের অজানা রহস্য বলে দিতেন!

ঃ আর কিছু দিন ধৈর্য ধরো চন্দ্রামুখী! নির্ধারিত সময়ে সব রহস্য উন্মোচিত হয়ে যাবে। সব কিছুই জানতে পারবে।

চন্দ্রামুখীর কণ্ঠে হতাশার সুর ফুটে ওঠলো। বললো, আপনার ইচ্ছে...।

চন্দ্রামুখীর কণ্ঠ সেবাদেবীর হৃদয়কে অস্থির করে তুললো। বললো, তুমি কি অতিষ্ঠ হয়ে যাচ্ছো, বেটী! আচ্ছা, এসো আমি তোমাকে তোমার জীবন রহস্যের কথা বলে দিচ্ছি, তবে তার জন্য একটিমাত্র শর্ত। তা হলো...।

ইতিমধ্যে তৃতীয় একটি কণ্ঠের আওয়াজ ভেসে এলো। কে যেনো অত্যন্ত গম্ভীর কণ্ঠে বলছে– জীবন রহস্য প্রকাশের ক্ষেত্রে কোনো শর্ত থাকতে পারে না।

সাথে সাথে শোবাদেবী আর চন্দ্রামুখীর দৃষ্টি সেদিকে নিপতিত হলো। তারা দেখলো, মহাগুরু ধর্মপাল ধীর পদবিক্ষেপে এগিয়ে আসছেন। তারা এগিয়ে গিয়ে ধর্মপালের পা ছুয়ে প্রণাম করলো। ধর্মপাল তাদের আশীর্বাদ দিলেন। বিনীত দৃষ্টিতে শোবাদেবী মহাগুরু ধর্মপালের দিকে তাকিয়ে বললো, আমাকে ক্ষমা করে দিন, আমি চন্দ্রামুখীর অস্থিরতা আর হতাশা সহ্য করতে না পেরে তার জীবন রহস্য বলে দিতে উদ্যত হয়েছিলাম।

ঃ তুমি কি জানো না, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা মহাপাপ?

ঃ পরমাত্মা, আমাকে মাফ করে দিন। ক্ষমা করে দিন।

ঃ চলো চন্দ্রামুখী, রাজপ্রাসাদে ফিরে যাই। জীবন রহস্য তখনই জানা যাবে, যখন তা জেনে হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠবে। যদি মর্মাহত হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তাহলে অপেক্ষা করাই উত্তম।

রাজকুমারী চন্দ্রামুখী কিছু বললো না। সে নীরবে গুরুজী ধর্মপালের পেছনে পেছনে চলতে লাগলো। এ দিকে শোবাদেবীও ফল বাগানের ঝোপ-ঝাড়ে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

সতেরো.

হারুনের সাথে যে অল্প কয়েকজন মুজাহিদ গিয়েছিলো, তারা কেল্লার বাইরে এসে তার অপেক্ষা করতে লাগলো। হঠাৎ তারা কেল্লার প্রাচীরে রাজপুতদের হট্টগোল শুনতে পেলো। সাথে সাথে কেল্লার ফটক সশব্দে বন্ধ হয়ে গেলো।

অপেক্ষামান মুজাহিদরা বুঝতে পারলো, হিন্দুরা প্রতারণা করে হারুনকে বন্দি করে ফেলেছে। তারা ক্রোধে অধীর হয়ে কেল্লায় আক্রমণ করতে প্রস্তুত হয়ে যায়। অমনি কেল্লার প্রাচীর থেকে শাঁ শাঁ করে বৃষ্টির মতো তীর ছুটে আসতে শুরু করে। মুজাহিদরা ঢাল দ্বারা তা প্রতিহত করে।

ঠিক তখন বুরহান সেখানে এসে উপস্থিত হলো। সঙ্গে অল্প কয়েকজন মুজাহিদ। হারুনের ফিরে আসতে দেরি দেখে তার খবর নিতে বুরহান এসেছে। বুরহান শুনলো, হারুন কেল্লায় বন্দি হয়েছে। হিন্দুরা তার সাথে গাদ্দারি করেছে। বুরহান এ সংবাদে দারুণ দুঃখিত ও মর্মাহত হলো। দুশ্চিন্তার কালো রেখা তার চোখে-মুখে ফুটে ওঠলো।

বুরহান চারদিকে দৃষ্টি ফেললো– চৌকস যোদ্ধার দৃষ্টি। নিখুঁত পর্যবেক্ষণের দৃষ্টি। তারপর সাথী মুজাহিদদের দিকে তাকালো। তির তির করে তার মাথাটা দুলে ওঠলো। এতো অল্প যোদ্ধা নিয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া আত্মহত্যার শামিল। এদের চরম শিক্ষা দিতে হবে। গাদ্দারীর স্বাদ আস্বাদন করাতে হবে। তবে একটু পরে। সে মুজাহিদদের নিয়ে ফিরে এলো।

বাহিনীতে ফিরে এসেই বুরহান দ্রুত চারদিকে সংবাদ পাঠালো। আলতুনতাশ, আমীর আলী এবং সুলতানের নিকট সংবাদ পাঠালো। হারুনের সংবাদ শুনে সবাই দুঃখ-ভারাক্রান্ত হলো, ক্ষিপ্ত ও ক্রোধান্বিত হলো। সুলতান সাথে সাথে আমব্রেলীর কেল্লা অবরোধ করার নির্দেশ দিলেন।

সুলতানের নির্দেশ সাথে সাথে বাহিনীর সকল অফিসারের নিকট পৌছে গেলো। অফিসাররা নির্দেশ পাওয়ামাত্র কেল্লার দিকে ঝড়ের গতিতে ছুটে চললো।

মহারাজা পরমদেব বেশকিছু রাজপুতকে গুপ্তচর হিসেবে সুলতানের বাহিনীর চারপাশে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাদের দায়িত্ব সুলতানের বাহিনীর খবরাখবর সংগ্রহ করে মহারাজার নিকট প্রেরণ করা। রাজপুতরা গুপ্তচর হলেও তাদের অবয়ব ভিন্ন। পোশাক-পরিচ্ছদ ভিন্ন। আচার-আকৃতিও ভিন্ন। তাই তারা সুলতানের বাহিনীতে অনুপ্রবেশ করতে পারলো না। বাহিনীর আশপাশে থেকে সংবাদ সংগ্রহ করতো। এ ধরনের কিছু গুপ্তচর মুজাহিদদের হাতে বন্দি হয়েছে। তাদের মাধ্যমে মুসলমানরা জেনে ফেলেছে, মহারাজা পরমদেব বিশ হাজার সৈন্যকে সোমনাথ রক্ষার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন। বর্তমানে আমব্রেলীতে ত্রিশ হাজার সৈন্য আছে। তাছাড়া আমব্রেলীর দক্ষিণে সমুদ্রের তীরে এক সুরক্ষিত কেল্লায় বিশ হাজার দুর্ধর্ষ সৈন্য প্রস্তুত আছে। মহারাজার নির্দেশ মাত্র পাঁচ-সাত দিনে তারা আমব্রেলীতে এসে পৌছতে পারবে। গুপ্তচরদের এসব তথ্যে সুলতানের বাহিনীতে কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়নি। বরং তারা দ্রুত আমব্রেলীর দিকে ধাবিত হতে লাগলো।

মহারাজা শিকদেব-এর চররা নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে মুজাহিদ বাহিনীকে পর্যবেক্ষণ করে তাদের সংখ্যা অনুমান করে আমব্রেলীতে ফিরে গেছে। তারা দেখে গেছে, মুজাহিদ বাহিনী দৈর্ঘ্য-প্রস্থে বহু মাইল ছড়িয়ে আছে। তাদের সংখ্যা অগণিত। তারা আমব্রেলীতে গিয়ে মহারাজাকে জানালো, মুজাহিদ বাহিনী দৈর্ঘ্য-প্রস্থে পনের মাইল ছড়িয়ে আছে। তারা ঝড়ের গতিতে এগিয়ে আসছে। তাদের সংখ্যা এক লক্ষের কম নয়।

মুসলমানদের এতো বিশাল বাহিনীর সংবাদ শুনে শিকদেব ভড়কে গেলেন। ভয়ে তার চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। কাঁপা কাঁপা স্বরে বললেন, তাই নাকি! এতো বিশাল বাহিনী নিয়ে আসছে? তিনি আর কিছু বলতে পারেননি।

পরমদেব-এর বিশ্বাস হয়ে গেলো, মুসলমানরা আমব্রেলী পদানত করেই ছাড়বে। ভয়ে তিনি এতো অধীর ও অস্থির হয়ে ওঠলেন যে, রাজ ঘোষকের মাধ্যমে ঘোষণা করে দিলেন, রাতের অন্ধকারে সবাইকে অবশ্যই কেল্লা ছেড়ে চলে যেতে হবে। কেল্লা খালি করে দিতে হবে। আর সৈন্যদেরও কেল্লা ত্যাগ করার নির্দেশ দিলেন।

রাজার নির্দেশ পাওয়ামাত্র কেল্লার অধিবাসীদের মাঝে দৌড়-ঝাঁপ শুরু হয়ে গেলো। অত্যন্ত দ্রুততার সাথে সবাই প্রস্তুতি নিতে লাগলো। কিন্তু সূর্য পশ্চিম আকাশে আর কয়েক ঘন্টা থাকবে মাত্র। এর মধ্যে পূর্ণ প্রস্তুতি নেয়া অসম্ভব। তাই প্রত্যেকে মূল্যবান জিনিসপত্র নিয়ে অপ্রয়োজনীয় ও কমদামি আসবাবপত্র ফেলে কেল্লা ছেড়ে চলে যেতে লাগলো। আসন্ন বিপদের আগে নিরাপদ স্থানে পৌঁছার জন্য সবাই অস্থির-বেকারার।

পরমদেব রাজকীয় মহামূল্যবান আসবাবপত্রগুলো দিনে দিনেই নিরাপদ স্থানে পাঠিয়ে দিলেন। সৈন্যদের গাড়ি, হাতি, খচ্চর, ঘোড়া ইত্যাদির মাধ্যমে রাজপ্রাসাদের আসবাবপত্রও সরিয়ে ফেললেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমব্রেলীর অবস্থা করুণ হয়ে গেলো। কোলাহলময় শহরে কবরের নীরবতা নেমে এলো। নির্জন, নীরব এক ভূতুড়ে পরিবেশ। গা ছমছম করে ওঠে।

কেল্লাবাসীরা যখন নিজেদের সামানপত্র নিয়ে ব্যস্ত, চারদিক দৌড়-ঝাঁপ আর ছুটাছুটি চলছে, ঠিক তখন শিকদেব-এর মাথায় এক চিন্তা উঁকি দিলো। আরে, হারুনকে এখানে ভূগর্ভস্থ কক্ষে ফেলে যাচ্ছি কেনো! হত্যা করে তার লীলা শেষ করে দিলেই তো হয়!

শিকদেব দু'দিন পূর্বে হারুনকে গ্রেফতার করে এক ভূগর্ভস্থ কক্ষে বন্দি করে রেখেছে। এখানে আলো-বাতাসের কোনো চলাচল নেই। তাই ইচ্ছে ছিলো, কবরের ন্যায় এ অন্ধকার প্রকোষ্ঠে পিপাসা আর ক্ষুধায় কাতরাতে কাতরাতে হারুন মরে যাবে।

কিন্তু দু'দিনেই অবস্থা পাল্টে গেছে। সে সময় কেউ ভাবেনি, কেল্লা ছেড়ে তাদের চলে যেতে হবে। অথচ এখন তা-ই করতে হচ্ছে। তাই শিকদেব তাকে হত্যা করাকেই উত্তম মনে করলো। সে একজন অফিসারকে ডেকে হারুনকে নিয়ে আসার হুকুম দিলো। সে কয়েকজন সৈন্য নিয়ে চলে গেলো। ভূগর্ভস্থ প্রকোষ্ঠে পৌঁছে প্রহারারত সৈন্যদের নির্দেশ দিলো, তারা যেনো এক্ষুনি বন্দিকে বের করে আনে। কিন্তু তারা সংবাদ শুনে দারুণ বিস্মিত হলো যে, বন্দি অজ্ঞাতভাবে উধাও হয়ে গেছে। সকাল থেকেই অনুসন্ধান করা হচ্ছে; কিন্তু কোথাও তাকে পাওয়া যাচ্ছে না।

অফিসার এ সংবাদ শুনে একেবারে থ হয়ে গেলো। ভূগর্ভস্থ প্রকোষ্ঠ তো সাধারণ বন্দিখানা নয়। এখানে অতিশয় ভয়ংকর লোকদের বন্দি করা হয়। এখনো পর্যন্ত এখান থেকে কেউ পালিয়ে যেতে পারেনি। অফিসার বললো, এটা তো এক অসম্ভব-অবিশ্বাস্য কথা। কিন্তু তোমাদের এখন শিকদেব-এর ক্রোধ থেকে কে রক্ষা করবে? তিনি তো নির্দ্বিধায় তোমাদের হত্যা করবেন।

প্রহরীরা ভয়ে বিচলিত হয়ে কাঁদতে লাগলো। অফিসার বললো, তোমাদের এ কান্না, এ অনুনয়-বিনয় কোনো কাজে আসবে না। আমাকে এখন অপারগ হয়েই তোমাদের গ্রেফতার করে তার কাছে নিয়ে যেতে হবে। অফিসার প্রহরীদের গ্রেফতার করে শিকদেব-এর নিকট নিয়ে এলো। বললো, রাজকুমার! এ প্রহরীদের উদাসীনতার কারণে বন্দি পালিয়ে গেছে। আমি এদের সবাইকে গ্রেফতার করে নিয়ে এসেছি।

শিকদেব এ সংবাদ শুনে বিস্ময়ে থ হয়ে গেলো। ক্ষিপ্ত হয়ে রক্তচোখে প্রহরীদের দেখতে লাগলো। বললো, নিমকহারামের দল! তোরা এ বন্দিকে ইচ্ছে করে ছেড়ে দিয়েছিস্। এ কাজ কেনো করলি বল্। তার হুংকারে চারদিক থর থর করে কাঁপতে লাগলো।

দিশেহারা প্রহরীরা তার পায়ে লুটিয়ে পড়ে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলো। বললো, রাজকুমার মহোদয়! আমরা নিরপরাধ। সোমনাথ মূর্তির কসম করে বলছি, আমরা বন্দিকে মুক্তি দেইনি। আমরা এ ব্যাপারে কিছুই বলতে পারবো না। ঈশ্বরই জানেন সে কীভাবে পালিয়ে গেছে।

শিকদেব বললো, তোমরা কি ভূগর্ভস্থ প্রকোষ্ঠগুলো তন্ন তন্ন করে তালাশ করে দেখেছো? সে কোথাও লুকিয়েও থাকতে পারে।

এক প্রহরী বললো, গোস্তাখী মাফ করবেন শাহজাদা। আমরা তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি। কিন্তু সে লাপাত্তা। সবচে' বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, তাকে অত্যন্ত শক্ত শিকলে বেঁধে রাখা হয়েছিলো। আমরা দেখলাম, শিকল পড়ে আছে আর সে উধাও।

শিকদেব-এর কণ্ঠে ক্ষোভের মিশ্রণ। বললো, তাহলে তোমরা বলতে চাও সে জিন কিংবা জিন তাকে উড়িয়ে নিয়ে গেছে?

অন্য একজন প্রহরী বিনীত কণ্ঠে বললো, অন্নদাতা! সে মানুষ। আমাদের মতোই মানুষ। তবে কীভাবে সে অদৃশ্য হয়ে গেলো, তা আমরা বলতে পারছি না।

শিকদেব বললো, আমি তোমাদের এসব কথা মানতে পারছি না। নিশ্চয় তোমরা লোভের শিকার হয়েছো। তোমরা অর্থের টোপ গিলে তাকে ছেড়ে দিয়েছো। যদি আসল ঘটনা আমার নিকট বলো, তাহলে হয়তো আমি তোমাদের ক্ষমা করে দেবো। অন্যথায় শুনে নাও, আমার নাম শিকদেব। বিশ্বাসঘাতকদের আমি সামান্যও ক্ষমা করি না।

প্রহরীরা কাঁদতে কাঁদতে বললো, অন্নদাতা! আমরা নিরপরাধ। আমরা নিষ্পাপ। আমরা লোভের শিকার হয়নি। আমরা তাকে ছেড়ে দেইনি। আমরা কিছুই জানি না। আপনি আমাদের বিশ্বাস করুন।

ক্রোধে শিকদেব-এর চোখ দু'টি লাল হয়ে গেলো। হুংকার দিয়ে তাদের হত্যার নির্দেশ দিলেন। যে সৈন্যরা তাদের ধরে নিয়ে এসেছিলো, তারা তাদের হত্যার প্রস্তুতি নিলো। প্রহরীরা মৃতপ্রায় হয়ে কেঁদে কেঁদে ক্ষমা ভিক্ষা চাইতে লাগলো। কিন্তু শিকদেব-এর পাষাণ হৃদয় তাতে গললো না। একে একে সবাইকে হত্যা করা হলো।

শিকদেব অত্যন্ত রক্তপিপাসু মানুষ। দয়া-মায়ার বাষ্পও তার চরিত্রে নেই। পেশাদার খুনীর ন্যায় মানুষকে খেলনার পুতুল মনে করে নির্দ্বিধায় হত্যা করে থাকে। নিহতদের লাশ তার পরিজনের নিকট ফিরিয়ে দিয়ে হুকুম দিলো, কেউ যেনো তাদের বিয়োগ বেদনায় না কাঁদে। যদি কাঁদে, তাহলে তাকেও সে পথেরই পথিক করা হবে।

এতোকিছু করার পরও শিকদেব-এর মনে এক বিস্ময় ঘুরপাক খাচ্ছে। সে বুঝতেই পারছে না, হারুন পালালো কীভাবে? যদি প্রহরীরা তাকে ছেড়েই দিতো, তাহলে সে অবশ্যই কেল্লার দরজা দিয়েই বের হয়ে যেতো। আর কেল্লার প্রহরী তো তাকে কিছুতেই যেতে দেবে না।

আমব্রেলীতে চারটি বিরাট ফটক আছে। চারটি ফটকেই সর্বদা কড়া প্রহরা আছে। শিকদেব চারটি ফটকে গিয়ে প্রহরীদের কথা বললো। হারুন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করলো। কিন্তু প্রহরীরা কিছুই বলতে পারলো না। তারা বললো, এ ধরনের কোনো লোকই ফটক দিয়ে বের হয়নি। পরিশেষে শিকদেব নিজেরই উপরই আক্ষেপ করতে লাগলো, হায়! কেনো সে হারুনকে গ্রেফতার করার পরই হত্যা করলো না। কেনো সে তাকে ভূগর্ভস্থ প্রকোষ্ঠে বন্দি করে রাখলো।

এ দুশ্চিন্তায় রাত হয়ে গেলো। পরমদেব-এর নির্দেশ ছিলো, রাতের শুরুতেই যেনো প্রত্যেকে শহর ছেড়ে চলে যায়। তবে কেউ কোনো শোরগোল করতে পারবে না, ডাক-চীৎকার করতে পারবে না। অত্যন্ত নীরবে, অত্যন্ত সতর্কতার সাথে শহর ছেড়ে চলে যাবে। প্রত্যেকে নীরবে শহর ছেড়ে চলে যেতে লাগলো। শুরুতে সাধারণ মানুষ দলে দলে বের হয়ে গেলো। তারপর সৈনাবাহিনীর লোকেরা বের হলো। অর্ধরাতের পূর্বেই কেল্লা সম্পূর্ণ জনশূন্য হয়ে গেলো।

আঠারো.

সুলতান মাহমুদ গজনবীর সেনাবাহিনী তখন আমব্রেলী থেকে এক মাইল দূরে। ডান, মধ্যম, অগ্রগামী ও পশ্চাৎ বাহিনীর সৈন্যরা সেনাপতিদের নির্দেশে ঝড়ের গতিতে এগিয়ে আসছে। তবে সৈন্যদের প্রতিটি দলই পরস্পর যোগাযোগ রক্ষা করে পৃথক পৃথক অগ্রসর হচ্ছে।

যে রাতে পরমদেব আমব্রেলী থেকে পলায়ন করেন, সে রাতে বুরহান অগ্রগামী বাহিনীর একটি দল নিয়ে একেবারে সামনে চলে এসেছিলো। বন্ধু হারুনের গ্রেফতারের কারণে সে ছিলো দারুণ মর্মাহত, অত্যন্ত ব্যথিত ও ভারাক্রান্ত। তার ইচ্ছা, কোনোভাবে কেল্লায় প্রবেশ করে হারুনকে মুক্ত করে আনতে হবে। তাই সে শেষ রাতে কেল্লার একেবারে নিকটে পৌছে গেলো।

অন্ধকার রাত। চারদিক ঘুটঘুটে অন্ধকার। এতো অন্ধকার যে, কয়েক হাত আগের বা পেছনের কোনো বস্তু পর্যন্ত দেখা যায় না। যেনো চারদিকে নিকষ কালো অন্ধকারের চাঁদর টানিয়ে দেয়া হয়েছে। আকাশে হাজার হাজার তারার মেলা। পিট পিট করে যেনো তারাগুলো ঘুমন্ত পৃথিবীকে দেখছে।

শীতের মৌসুম কেবল শুরু হয়েছে। ঠাণ্ডা বাতাস এখনো প্রবাহিত হয়নি। তাই শীত জেঁকে বসেনি। তবে চারদিকে যে হাল্কা শীতের আনাগোনা, তাতে শরীর মাঝে-মাঝে কেঁপে ওঠছে। অন্ধকারে কেল্লাটাকে এক বিরাট কালো পাহাড় মনে হচ্ছে। চারদিক নীরব -নিস্তব্ধতায় ঘেরা। যেনো এক মায়াপুরী, এক স্বপ্নপুরী। কেল্লার প্রাচীরের উপরও কোথাও আলোর চিহ্ন নেই। প্রহরীদের আনাগোনারও কোনো আলামত দেখা যাচ্ছে না।

বুরহান তার সঙ্গীদের বললো, কেল্লার লোকেরা একেবারে নীরব। মনে হচ্ছে, তারা উদাসীনতার গভীর ঘুমে নিমজ্জিত। যদি এ সুযোগে আমরা কেল্লায় প্রবেশ করতে পারি, তাহলে...।

এক সৈন্য বললো, কিন্তু আমরা তা করতে রাজি নই। আপনি কি ভুলে গেছেন, সুলতান নির্দেশ দিয়েছেন তার হুকুম ছাড়া কেউ যেনো কেল্লার নিকটবর্তী হতে চেষ্টা না করে?

বুরহান সাথে সাথে দাঁড়িয়ে গেলো। বললো, দুঃখিত, আমি সুলতানের এ নির্দেশের কথা ভুলে গিয়েছিলাম। তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে বেশ ভালো করেছো। আমি তোমাদের শুকরিয়া জানাচ্ছি। হারুনের অকৃত্রিম ভালোবাসা আমাকে সুলতানের নির্দেশের কথাও ভুলিয়ে দিয়েছে। চলো, আমরা ফিরে যাই।

সাধারণ মুসলমান সৈন্যরা অফিসারদের কথা পদে পদে মেনে চলে। তাদের নির্দেশে মৃত্যুগহ্বরে ঝাঁপিয়ে পড়তে দ্বিধা করে না। দুর্গম গিরি কান্তার মরুতে পথ চলতে ভয় পায় না। উত্তাল তরঙ্গময় সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে চিন্তা করে না। আকাশচুম্বী কেল্লার প্রাচীরে আরোহণে চিন্তা করে না। মোটকথা,যখন যে হুকুমই আসে, তা অবলীলাক্রমে ও নতশিরে মেনে নেয়। অফিসারের অবাধ্য হওয়ার কথা চিন্তা করা যায় না। কখনো ভুলে কোনো কাজ করে ফেললে দীর্ঘদিন পর্যন্ত তার অনুশোচনায় ভুগতে থাকে, আক্ষেপ করতে থাকে।

তাই বুরহান যখন ফিরে আসছিলো, তখন তার হৃদয়ে আক্ষেপের ঝড় বইছিলো। ধীরে ধীরে সে তার সঙ্গী একশ সৈন্যকে নিয়ে ফিরে আসছে আর মনে মনে ভাবছে, এভাবে সুলতানের নির্দেশ ভুলে যাওয়া ঠিক হয়নি। হারুনের উপর দিয়ে যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে যায়, তাহলে সুলতানের দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি ছাড়া আর কী হবে? চিন্তার ঝাঁপি মাথায় নিয়ে হারুন ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে। সঙ্গীরা তার অনুসরণ করছে। ঠিক তখন একটি আওয়াজে তার কান সচকিত হয়ে ওঠলো। উৎকর্ণ হয়ে আওয়াজটি শোনার চেষ্টা করে সাথীদের বললো, তোমরা কি কোনো শব্দ শুনেছো?

কয়েকজন বললো, হ্যাঁ, শুনেছি।

বুরহান বললো, মনে হচ্ছে, বনের পশুরা আমাদের নিকটে চলে এসেছে।

একজন বললো, পশু হোক বা মানুষ হোক একটা কিছু যে অদূরে আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বুরহান বললো, নীরবে দাঁড়াও। কান খাড়া করে শুনতে চেষ্টা করো।

সবাই নীররে দাঁড়িয়ে গেলো। সবাই উৎকর্ণ, সচকিত। শুনতে পেলো, শুকনো পাতা আর ঘাস মাড়িয়ে কে যেনো আস্তে আস্তে পা ফেলে এগিয়ে আসছে। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে এগিয়ে আসছে।

বুরহান নিম্নকণ্ঠে বললো, মনে হচ্ছে, কোন্ মানুষ অত্যন্ত সতর্কতার সাথে এগিয়ে আসছে।

এক সৈন্য বললো, আমাদের একেবারে নিকটে পৌছে গেছে মনে হচ্ছে।

ইতিমধ্যে আওয়াজ শোনা গেলো, তোমরা কি মুসলমান? বুরহার কণ্ঠস্বরটি চিনে ফেললো। আনন্দে বিহ্বল হয়ে বললো, হারুন! তুমি এখানে? আল্লাহর কসম আমি তোমার কণ্ঠ চিনে ফেলেছি!

বিপরীত দিক থেকে আওয়াজ ভেসে এলো, বুরহান! তুমি এখানে? আমারও ধারণা ছিলো তুমি এখানেই থাকবে।

সাথে সাথে বুরহান ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে উত্থিত আওয়াজের দিকে ছুটে গেলো। বললো, আল্লাহর লাখ শুকরিয়া যে, তুমি মুক্তি পেয়েছো। আমরা সবাই তোমার সংবাদ শুনে পেরেশান হয়ে আছি।

রাতের অন্ধকার আবরণ ভেদে করে এক ব্যক্তি ছুটে এলো। বুরহানের নিকটে এসেই তাকে উষ্ণ আবেগে জড়িয়ে ধরলো।

বুরহান বললো, হারুন! শুনলে হয়তো বিশ্বাস করবে, তোমার বন্দি হওয়ার কথা শুনে সুলতান কি যে চিন্তিত ও দুঃখিত হয়েছেন!

হারুন বললো, আমি সারাজীবন সুলতানের এই মমতা ও মহানুভবতার কৃতজ্ঞতা আদায় করবো। আমার বিশ্বাস ছিলো, আমার অনুসন্ধানে তুমি কেল্লা পর্যন্ত আসবে।

বুরহান বললো, আমি রাতের অন্ধকারে অবশ্যই কেল্লায় অনুপ্রবেশ করতাম। কিন্তু সুলতানের নির্দেশ ছিলো, কোনো মুসলমান যেনো একাকি কেল্লার নিকটবর্তী না হয়। তাই এসেও প্রবেশ করলাম না। সুলতানের নির্দেশ শিরোধার্য করে ফিরে চলছিলাম।

হারুন বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বললো, তাহলে... তাহলে তুমি সুলতানের নির্দেশ কেনো লঙ্ঘন করে কেল্লার নিকট এসেছিলে?

ঃ আমি তোমার চিন্তায় এমন বিভোর ছিলাম যে, সুলতানের নির্দেশের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। আত্মভোলার মতো এখানে চলে এসেছিলাম। কেল্লার পাঁচিলের উপর সুনসান নীরবতা দেখে কেল্লার ভেতর প্রবেশের ইচ্ছে করেছিলাম। ঠিক তখন একজন সৈন্য আমাকে সুলতানের হুকুমের কথা স্মরণ করিয়ে দিলো। তাই এখন ফিরে চলেছি।

ঃ বন্ধু! তোমার স্থানে যদি আমি হতাম, তাহলে কী করতাম জানো?

ঃ কিন্তু আমার দারুণ বিস্ময় লাগছে, তুমি দুশমনের পাতা ফাঁদে কীভাবে আটকে গেলে!

ঃ আমি নিজেই বিস্মিত। তাই এটাই মনে করো যে, আল্লাহর হুকুম ছিলো আর তা-ই ঘটেছে। যদি তা না হতো, তাহলে আমি কেনো আমব্রেলীর রাজকুমারের ফাঁদে পা দিতে যাবো। অথচ রাজকুমার এসে যখন আমার গতিরোধ করে দাঁড়ালো এবং আমার সাথে আলোচনা করার প্রস্তাব দিলো। তখন আমি বুঝেছিলাম, সে আমাকে ধোঁকা দিতে এসেছে। কুদরতের এই সতর্কবাণী পাওয়া সত্ত্বেও আমি সতর্ক হলাম না। আমি আমার সাথীদেরকে বাইরে অপেক্ষা করতে বললাম।

ঃ সবাই বিস্মিত হয়েছে যে, তোমার মতো একজন চতুর ও চৌকস মানুষ কীভাবে দুশমনের ধোঁকায় পড়ে গেলো।

ঃ বুরহান! আসল কথা হলো, প্রেম মানুষকে অন্ধ, মূক, বধির এমনকি নির্বোধও বানিয়ে ছাড়ে।

বুরহানের কণ্ঠ চিড়ে রাজ্যের বিস্ময় ঝড়ে পড়ে। বললো, তাহলে আমব্রেলীতে পৌঁছে কি তুমি কারো প্রেমে পড়েছিলে?

ঃ না, তা নয়। দাগাবাজ রাজকুমার এসে আমাকে বললো, সে রাজকুমারী চন্দ্রামুখীর দূত। সে আমাকে চন্দ্রামুখীর পয়গাম শুনাতে চায়।

ঃ চন্দ্রামুখী! সেই সোমনাথের রাজকুমারীর কথা বলছো?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ ওহ হো। আমি বুঝে ফেলেছি। তাহলে দাগাবাজ এই রাজকুমার চন্দ্রামুখীর প্রেমে পাগল।

ঃ শুধু পাগলই নয়। চন্দ্রামুখী তার বাগদত্তা।

ঃ সে জন্যই এ ফন্দি এঁটেছিলো। কিন্তু তুমি মুক্তি পেলে কীভাবে?

ঃ আল্লাহর মেহেরবানীতে।

ঃ এতে তো কোনো সন্দেহ নেই। তবুও কীভাবে মুক্তি পেলে!

ঃ একটু অপেক্ষা করো। সুলতানের নিকট বিস্তারিত বর্ণনা করবো। তখনই শুনতে পাবে।

ঃ তুমি কি সোজা কেল্লা থেকে বেরিয়ে চলে এসেছো?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ বন্ধু! কেনো যে আমরা নীরবে কেল্লায় ঢুকে গেলাম!

ঃ এখন আর কেল্লায় ঢুকে লাভ নেই।

বুরহান বিস্ময়ভরা দৃষ্টি মেলে হারুনের দিকে তাকালো। বললো, কেনো।

ঃ কারণ, কেল্লা এখন জনশূন্য। কোনো মানুষ সেখানে নেই।

বুরহান আরো বিস্মিত হয়ে বললো, কেনো? কেল্লার অধিবাসীরা কোথায় গেছে?

ঃ তারা কেল্লা ছেড়ে পালিয়ে গেছে।

ঃ এরা তো দেখছি দারুণ ভীতু।

ইতিমধ্যে সুবহে সাদিক হয়ে গেছে। পূর্বাকাশে আলোর কলি বিকশিত হচ্ছে। অন্ধকারের মাঝে আলোর স্ফূরণ দেখে মনটা দারুণ চনমনে হয়ে ওঠলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই চারদিক আলোর পরশে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠলো। এরা যখন মুসলিম বাহিনীর শিবিরের নিকটে পৌঁছলো, তখন ফজরের নামাযের আযান হচ্ছিলো। কয়েকজন মিলে সম্মিলিত কণ্ঠে আযান দিলো।

সুলতানের বাহিনী-মুজাহিদরা আযানের আওয়াজ শুনেই তাঁবু থেকে বেরিয়ে পড়লো। সবাই নিজ নিজ প্রয়োজন সেরে অযু করে ফিরে আসছে।

মুক্ত আকাশে আলোরা যেনো দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে। আকাশ একেবারে ফর্সা হয়ে গেছে। মনে হয়, আকাশটা হাসছে আর তার উজ্জ্বল প্রাণখোলা হাসির আলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। রাতে শিশির পড়েছিলো। তার ছোঁয়ায় সবুজ ঘাসের প্রাকৃতিক বিছানা যেনো আরো সবুজ-সতেজ হয়ে ওঠেছে। পৃথিবীর সর্বত্র যেনো নতুন প্রাণের স্পন্দনে আনন্দিত ও হিল্লোলিত।

মুজাহিদরা জামাতের সাথে ফজরের নামায আদায় করছে। পাঁচ হাজার মানুষের সম্মিলিত রুকু-সিজদা আর কিয়ামের অপূর্ব দৃশ্য দেখে তাদের মন উতলা হয়ে ওঠলো।

নামাযের পর সবাই হারুনের ফিরে আসার খবর পেলো। সবাই আনন্দিত ও উল্লসিত হয়ে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলো।

বুরহান ও হারুন নামায আদায় করে সুলতানের সাথে দেখা করতে রওনা হলো।

উনিশ.

সুলতান মাহমুদ হারুন ও বুরহানের বাহিনী থেকে কয়েক মাইল পেছনে মধ্যবর্তী বাহিনীতে অবস্থান করছিলেন। গোটা মুজাহিদ বাহিনী তখন সুলতানের নির্দেশে যার যার স্থানে অবস্থান করছিলো। সৈন্যরা নিশ্চিন্তে এদিক-সেদিক ঘোরাফেরা করছিলো। ডান বাহিনীর সৈন্যরা বাম ও পার্শ্ব বাহিনীতে, অগ্রগামী বাহিনীর সৈন্যরা পশ্চাৎগামী বাহিনীতে এসে বন্ধু-বান্ধব ও প্রিয়জনদের সাথে সাক্ষাৎ করছিলো। বিরাট বিস্তৃত এলাকাজুড়ে মুজাহিদ বাহিনী অবস্থান করছিলো। তাই ঘোরাফেরা করতে তেমন অসুবিধা হচ্ছিলো না।

হারুন ও বুরহান যখন সুলতানের সাথে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছিলো, তখন পথে অনেক মুজাহিদের সাথে দেখা হলো। তাদের অনেকেই হারুনকে পূর্ব থেকে চেনে। অনেকে বন্দি হওয়ার সংবাদ শুনে তার সম্পর্কে জানতে চাচ্ছে। প্রত্যেকেই তাকে দেখে দারুণ বিস্মিত হয়েছে। তারপর আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করেছে ও মুবারকবাদ জানিয়েছে।

চলার পথে এতো মুজাহিদের উষ্ণ আবেগমণ্ডিত দেখা-সাক্ষাৎ ও কোলাকুলিতে হারুন অত্যন্ত বিস্মিত হলো। সে যখন সুলতানের অধীন বাহিনীর মাঝে প্রবেশ করলো, দেখতে পেলো প্রত্যেকে অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে নিজ নিজ কাজে মগ্ন হয়ে আছে। কেউ তলোয়ার ধারাচ্ছে। কেউ যুদ্ধের পোশাক তৈরি করছে। কেউ রান্না করছে। অনেকে গাছের নীচে গোলাকার হয়ে বসে গল্প করছে।

দুশমনের রাজ্যে যুদ্ধের ময়দানে দুশমনদের সামনে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও তারা অত্যন্ত প্রশান্ত ও নিশ্চিন্ত। আনন্দে টইটুম্বর। হারুন ও বুরহান তাদের দেখতে সামনে অগ্রসর হচ্ছে। তারা সৈন্যদের শিবিরে প্রবেশ করলো। চারদিকে

তাঁবু আর তাঁবু। যেনো তাঁবুর শহর। দৃষ্টির সীমা ছাড়িয়ে ছোট-বড় তাঁবুর সারি উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে চলে গেছে। দু'টি সারির মাঝে বিশ ফিট ফাঁকা। প্রতিটি তাঁবুর মাঝে এতোটুকু ফাঁকা বিদ্যমান, যেনো চারজন অশ্বারোহী সেপথে অনায়াসে যাতায়াত করতে পারে।

সুলতানের তাঁবু ঠিক মধ্যখানে বিদ্যমান। তাই তাদের দীর্ঘপথ অতিক্রম করতে হলো। অবশেষে তারা সুলতানের তাঁবুর অদূরে গিয়ে পৌঁছলো। তাঁবুতে একটি উঁচু পতাকা পত্ পত্ করে উড়ছে আর সুলতানের উপস্থিতির কথা ঘোষণা করছে। তারা ঘোড়া থেকে নেমে পড়ে। সুলতানের জন্য বেশ ক'টি তাঁবু স্থাপন করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রয়োজনে তা করা হয়েছে। কোনো তাঁবু পানাহারের জন্য স্থাপন করা হয়েছে। কোনোটি ঘুমানোর জন্য, কোনটি খাস দরবারের জন্য, কোনোটি উপদেষ্টাদের সাথে পরামর্শ করার জন্য স্থাপন করা হয়েছে।

তবে সুলতানের তাঁবুর উপর পত্ পত্ করে উড়ছে একটি সুন্দর কারুকার্যখচিত পতাকা। এ পতাকা ইতিপূর্বে পনেরবার ভারতবর্ষে এসেছে। সর্বদা মাথা উড্ডীন থেকে হিন্দুদের হৃদকম্পন সৃষ্টি করেছে। আর মুজাহিদরা এ পতাকা দেখে আত্মোৎসর্গ ও আল্লাহর রাহে জান কুরবান করার প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়েছে ও বারবার বীরদর্পে দুশমনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

সুলতানের এ অবস্থান ক্ষেত্রের চতুর্পার্শ্বে সর্বদা নিশ্ছিদ্র প্রহরার ব্যবস্থা রয়েছে। আড়াইশ মুজাহিদ নাঙ্গা চকচকে তলোয়ার হাতে নিয়ে একটি নির্দিষ্ট বৃত্তে ঘুরছে।

প্রহরীরা হারুন ও বুরহানকে দেখামাত্র সামরিক কায়দায় সালাম দিলো। তারা দাঁড়িয়ে গেলো। কয়েকজন প্রহরী সুলতান থেকে অনুমতি আনার জন্য চলে গেলো।

সুলতান হারুনের নিরাপদে ফিরে আসার সংবাদ শুনে বেজায় আনন্দিত হলেন। হারুনের সাথে তাঁর আন্তরিক মহব্বত আছে। তাই তিনি আত্মসংবরণ করতে না পেরে তাকে স্বাগতম জানানোর জন্য শশব্যস্তে বাইরে বেরিয়ে এলেন।

হারুন অগ্রসর হয়ে অনুগত সন্তানের ন্যায় সুলতানকে সালাম জানালো। সুলতান মাহমুদ গজনবী তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, তোমার বন্দি হওয়ার সংবাদ শুনে আমি এতো দুঃখিত ও বিষণ্ন হয়েছিলাম, যা ব্যক্ত করা অসম্ভব। আল্লাহর শুকরিয়া, তুমি নিরাপদে ফিরে এসেছো। আল্লাহর আমার ও সকল মুসলমানের উপর এক বিশেষ অনুগ্রহ করলেন।

হারুন বললো, আপনার মতো মহান ব্যক্তি আমার ন্যায় এক তুচ্ছ গোলামকে মনে-প্রাণে ভালোবাসা এক সৌভাগ্যের বিষয়। আর এ কারণেই প্রত্যেক মুজাহিদ আপনার বিশ্বস্ত, অনুগত ও ফরমাবরদার।

সুলতান বললেন, আমি তোমার গ্রেফতার হওয়ার সংবাদ শুনে বুরহানের ব্যাপারে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। ভাবলাম, বুরহান বন্ধুত্বের টানে দিশেহারা হয়ে আরেক অঘটন না ঘটায়। সেও যদি গ্রেফতার হয়ে যায়, তাহলে তো আমাদের বাহিনীতে এমন এক শূন্যতা সৃষ্টি হবে, যা পূরণ করা অসম্ভব। তাই আমি সঙ্গে সঙ্গে তার নিকট ফরমান পাঠালাম, যেনো আমাদের পৌঁছার আগে সে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ না করে।

বুরহান বললো, সুলতানের এ নির্দেশই আমাকে আমার ইচ্ছা বাস্তবায়নে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। তা না হলে আমি হিন্দুদের কেল্লায় আক্রমণ করে বসতাম।

সুলতান বললেন, আমি জানি, বন্ধুদের মাঝে আপন ভাইয়ের চেয়ে বেশি মহব্বত সৃষ্টি হয়। ভাইয়ের জন্য যেভাবে ভাই জীবন উৎসর্গ করে, ঠিক তেমনি বন্ধুর জন্য বন্ধু জীবন উৎসর্গ করে। অনেক সময় বন্ধু ভাইয়ের আগে অগ্রসর হয়ে বন্ধুর জীবন রক্ষা করে। ঐ ব্যক্তি কতোই না ভাগ্যবান, যে পৃথিবীতে মনের মতো একজন বন্ধু পেয়েছে। এ হিসেবে তোমরা দু'জন অত্যন্ত ভাগ্যবান। এসো, তাঁবুতে এসে বসো।

সুলতান ঘুরে তাঁবুতে প্রবেশ করলেন। হারুন ও বুরহান অনুগত ভৃত্যের মতো তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করলো।

সুলতান মাহমুদ গজনবী তাঁর আলীশান তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসলেন। হারুন ও বুরহান তার সামনে বসা। তাঁবুতে চিত্তাকর্ষী মোটা ফরাশ বিছানো। তাঁবুর এক পার্শ্বে ভারতবর্ষের বিরাট মানচিত্র। তার পাশে ঝুলে আছে কিছু অস্ত্র।

সুলতান বললেন, হ্যাঁ, এবার তোমার বন্দি হওয়া ও মুক্তি পাওয়ার ঘটনাটি বিস্তারিত বর্ণনা করো।

ঃ জাহাপনা! আমি পরমদেব-এর দরবারে পৌঁছলাম। ইসলামী রীতি অনুযায়ী তাকে সত্যের পয়গাম দিলাম। ফেরার পথে পরমদেব-এর পুত্র শিকদেব আমার সাথে সাক্ষাৎ করলো। আমাকে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করলো। আমি বুঝতে পারলাম, সে আমাকে ধোঁকা দিতে চাচ্ছে। হঠাৎ তার অনুগত কিছু সৈন্য পশ্চাৎ দিক থেকে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে মজবুত করে বেঁধে ফেলে। আমি তখন ক্রোধে অধীর। কিন্তু হাত-পা হেলানোর ক্ষমতাও তখন আমার নেই। পাষাণ চরিত্রের এ পশুগুলো আমাকে এক ভূগর্ভস্থ প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ করে। প্রকোষ্ঠটি অত্যন্ত সংকীর্ণ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন। আলো-বাতাস প্রবেশের কোনো পথ নেই। স্যাঁতস্যাঁতে আর এক প্রকার অসহনীয় দুর্গন্ধে ভরা। সেখানে অল্প কিছুক্ষণ থেকেই আমার শ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলো। দুর্গন্ধ, অন্ধকার আর বায়ুহীনতার কারণে আমি হাঁপিয়ে ওঠলাম। আমার ধারণা

ছিলো, অল্প কিছু সময়ের ব্যবধানে আমাকে হত্যা করা হবে। আমাকে ভূগর্ভস্থ প্রকোষ্ঠে বন্দি করার পূর্বে শিকদেব তারই ইঙ্গিত করেছিলো।

সুলতান গভীর তন্ময়তায় হারুনের কথা শুনছিলেন। তিনি উত্তেজিত হয়ে বললেন, হারুন! ঐ নরপশুগুলো যদি তোমাকে হত্যা করতো, তাহলে আল্লাহর কসম করে বলছি, যে হিন্দুকেই আমি সামনে পেতাম, নির্বিচারে হত্যা করতাম। যে রাজ্যই আমার সামনে পড়তো, তাকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করতাম। তবে এখনো আমি ঐ নরপশুদের ক্ষমা করবো না, যারা আমার সন্তান হারুনকে কষ্ট দিয়েছে।

ঃ কিন্তু জাহাপনা! আমি তো এক ব্যক্তিকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছি।

ঃ তোমার প্রতিশ্রুতির মর্যাদা রক্ষা করা হবে। এখন তুমি তোমার কাহিনী বলে শেষ করো।

ঃ এ অবস্থায় কতোটুকু সময় চলে গেছে আমি তা বলতে পারবো না। হঠাৎ দেখলাম, কয়েকজন লোক মশাল হাতে প্রকোষ্ঠে এসে প্রবেশ করলো। প্রকোষ্ঠটি সর্বদা অন্ধকার থাকার কারণে রাত-দিন কিছুই বুঝা যায়নি। লোকগুলো মশাল নিয়ে এলে বুঝলাম, এখন রাত। তারা আমার জন্য কিছু খাবার ও একটি প্রদীপ রেখে চলে গেলো। আমি তাদের জিজ্ঞেস করলাম, এখন রাত না দিন? তারা আমার কথা বুঝলো না। ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো। তাদের একজন কী যেনো বললো। আমি তার কথা বুঝলাম না। নির্বোধের মতো আমিও নিষ্পলক দৃষ্টিতে শুধু তাদের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

তারা চলে যাওয়ার পর আমি খাবারের দিকে দৃষ্টি ফেললাম। ছোট ছোট শুষ্ক কয়েকটি রুটি আর একটি গোল পিতলের পাত্রে সামান্য পানি। তখন আমার অসম্ভব ক্ষুধা ছিলো। কিন্তু আমার মন মুশরিকদের হাতে তৈরি খাবার খেতে সায় দিলো না। আমি খাবার স্পর্শও করলাম না। খাবার যেভাবে রেখে গিয়েছিলো, সেভাবেই পড়ে রইলো। পিপাসায় গলা শুকিয়ে গিয়েছিলো অনেক আগে। তাই পানিটুকু পান করার ইচ্ছে করলাম। কিন্তু মন আবার প্রতিবাদী হয়ে ওঠলো। বললো, এ পানিও তো মুশরিকরাই এনেছে। তাদেরই পাত্রে করে এনেছে। তাই পানি পান করতেও মন সায় দিলো না।

সুলতান বললেন, শাবাশ হারুন! শাবাশ! তুমি ভালো কাজই করেছো। মুশরিকরা অপবিত্র। তারা পাক-পবিত্রতার কী জানে। তাছাড়া মুশরিকদের খাবার গ্রহণে হৃদয়ের আলো ম্লান হয়ে যায়। তাই মুসলমানের জন্য মুশরিকদের তৈরি খাবার খাওয়া কিছুতেই উচিত নয়।

ঃ এ চিন্তা করেই আমি তাদের দেয়া খাবার ও পানিতে হাত পর্যন্ত দেইনি।

ঃ আচ্ছা, তারপর কী হলো?

ঃ প্রদীপের আলোর কারণে অন্ধকারের কষ্ট থেকে কিছুটা মুক্তি পেলাম। কিন্তু অন্যান্য কষ্টগুলো দূর হলো না। আমি শুয়ে ছিলাম। কখন যে ঘুমের রাজ্যে হারিয়ে গেছি, বলতে পারবো না। হঠাৎ এক অস্বাভাবিক আওয়াজে ঘুম ভেঙে যায়। দেখি, এক সন্ন্যাসিনী বিরাট এক তীর হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার বাম হাতে বড় এক মশাল দাউ দাউ করে জ্বলছে। আমি উঠে বসলাম। দেখলাম, সন্ন্যাসিনীর পেছনে এক যুবতী দাঁড়িয়ে আছে। যুবতীকে আগে কখনো দেখিনি। সন্ন্যাসিনী বললো, নওজোয়ান! রাজকুমারী কামিনী তোমার নিকট এসেছে। যদি তুমি একটি প্রতিশ্রুতি দাও, তাহলে সে তোমাকে মুক্তি দেবে। আমি বললাম, এ সময় আমাকে কী প্রতিশ্রুতি দিতে হবে? সন্ন্যাসিনী বললো, এ সময় তুমি আমব্রেলীর কেল্লায় আক্রমণ করবে না আর সুলতানকেও আক্রমণ করতে নিষেধ করবে। আমি তাদের কথা মেনে নিলাম। সন্ন্যাসিনী আমার শিকল খুলে দিলো। তারপর আমাকে এক গোপন দরজা দিয়ে কেল্লার বাইরে নিয়ে এলো। ভূগর্ভস্থ প্রকোষ্ঠ থেকে বের হওয়ার পরই কামিনী চলে গেলো। অবশ্য আমি সেই সন্ন্যাসিনীকে চিনতে পারিনি এবং বুঝতে পারিনি, কেনো আমাকে মুক্তি দিলো?

ঃ আল্লাহই ভালো জানেন। আচ্ছা, তুমি যখন আমব্রেলীতে আক্রমণ না করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছো, আমি তা-ই করবো। আমি আমব্রেলীর অধিবাসীদের ক্ষমা করে দিলাম। মুজাহিদ বাহিনীকে নির্দেশ দাও, তারা যেনো কেল্লায় আক্রমণ না করে। কেল্লার পাশ থেকে যেনো সামনে চলে যায়।

হারুন এবং বুরহান সুলতানকে সালাম দিয়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলো।

বিশ.

ইতিমধ্যে সোমনাথে বেশ ক'জন রাজার প্রেরিত সৈন্য এসে পৌঁছেছে। এখনো আসছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, ভারতবর্ষের সকল রাজার সৈন্যরা সোমনাথ এসে সমবেত হবে।

জাফরান রঙের পোশাক পরিহিত রাজপুতদের সংখ্যা প্রচুর। সাধারণ হিন্দুরা এদের অত্যধিক সম্মান করে। তারা যে পথে চলাফেরা করে, পথচারি হিন্দুরা তাদের সম্মানার্থে পথ ছেড়ে অবনত শিরে দাঁড়িয়ে থাকে। কাউকে দেখা যায় তাদের পায়ের ধুলো তুলে নিজের ও সন্তানদের কপালে স্পর্শ করতে। তারা মন্দিরে প্রবেশ করলে তাদের সম্মানার্থে ভিড়ের মাঝেও পথ করে দেয়া হয়। তারাই সর্বাগ্রে গিয়ে প্রতিমার দর্শন লাভে ধন্য হয়। তাদের ছাড়াও সেসব সৈন্য সোমনাথ রক্ষার্থে যুদ্ধ করতে এসেছে, হিন্দুরা তাদেরও যথেষ্ট সম্মান ও ইজ্জত করে।

সোমনাথের মহারাজা বিশাল এ বাহিনী দেখে দারুণ মুগ্ধ, অত্যন্ত আনন্দিত। তার মনে এখন আর দুশ্চিন্তার মেঘমালা নেই। একেবারে প্রশান্ত হয়ে গেছেন। তার দৃঢ় প্রত্যয় ও বিশ্বাস জন্মেছে, এ বিশাল বাহিনীকে সুলতান মাহমুদ গজনবী কিছুতেই পরাজিত করতে পারবেন না। তাছাড়া গজনবী সোমনাথ থেকে অনেক দূরে অবস্থিত। দুর্গম দুস্তর মরুকান্তার গজনবী আর সোমনাথের মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি করে আছে। পরাজিত সুলতান কিছুতেই তার বাহিনী সাথে নিয়ে পালাতে পারবে না। ভারতবর্ষ আক্রমণের স্বাদ এবার তার মিটে যাবে। এরপর থেকে ইতিহাস তাকে ধিক্কার দেবে। ইতিহাসের এ কলঙ্ক সে কিছুতেই মুছতে পারবে না।

সাধারণ হিসাব-নিকাশে সোমনাথের মহারাজার চিন্তা-ই বাস্তব। কারণ, সুলতান মাহমুদ গজনবী মাত্র ত্রিশহাজার মুজাহিদ সাথে নিয়ে এসেছেন। এদের একজনও সুলতানের নিয়মিত সৈনিক নয়। এরা সবাই স্বেচ্ছাসেবী মুজাহিদ। এদের কাউকে বেতন-ভাতা দেয়া হয় না। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য, আল্লাহর পথে জীবন বিলিয়ে দেয়ার জন্য এরা সুলতানের মুজাহিদ বাহিনীতে যোগ দিয়েছে।

রাজপুতদের বাহিনীতে সৈন্যের সংখ্যা ইতিমধ্যে দেড় লাখ ছাড়িয়ে গেছে। এরা সবাই তাজাদম, শক্তিশালী। স্বদেশী সাধারণ হিন্দুরা সবাই সাহায্যের জন্য প্রস্তুত। তাদের প্রয়োজন পূরণে উদগ্রীব।

কিন্তু তারপরও হিন্দুদের মাঝে সুলতান বাহিনীর বিশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। সোমনাথ মন্দিরের সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীরাও মুসলিম নাম শুনে কাঁপছে।

সোমনাথ মন্দিরের মাসিক স্নানানুষ্ঠানে যোগ দেয়ার জন্য দূর-দূরান্ত থেকে যারা এসেছিলো, তারা যুদ্ধের নাম শোনামাত্রই তাড়াতাড়ি সোমনাথ ছেড়ে চলে গেছে। সুলতান মাহমুদ গজনবীর সৈন্য আসছে এ সংবাদ শুনে হিন্দুদের হৃদকম্পন শুরু হয়ে গেছে।

হিন্দুরা জানতো, আমব্রেলীর রাজা পরমদেব অত্যন্ত আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মানুষ। তাছাড়া বীরযোদ্ধা হিসেবেও তার প্রচুর খ্যাতি আছে। তার সেনাবাহিনীতে সৈন্যের সংখ্যাও প্রচুর। তার শক্তি ও বীরত্বের কথা হিন্দু সমাজে কিংবদন্তীর মতো ছড়িয়ে ছিলো। তাই সবার বিশ্বাস ছিলো, আমব্রেলীর মহারাজা পরমদেব কিছুতেই সুলতানের বাহিনীকে তার রাজ্য মাড়িয়ে আসতে দেবেন না। আমব্রেলীতে এসেই তার অগ্রযাত্রা থমকে যাবে। সেখানেই যুদ্ধ শুরু হয়ে সেখানেই শেষ হয়ে যাবে।

কিন্তু অবাক বিস্ময়ে সবাই দেখলো, মহারাজা পরমদেব যুদ্ধ এড়িয়ে গেছেন। আমব্রেলীর কেল্লা ছেড়ে সমুদ্র তীরবর্তী কেল্লায় গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। আর সুলতানের মুজাহিদ বাহিনী বীরদর্পে নির্বিবাদে সোমনাথের দিকে এগিয়ে আসছে।

এ সংবাদ শুনে হিন্দুদের সর্বাঙ্গ কেঁপে ওঠলো। ভয়ে হৃদয়ের ধুকধুকানি বেড়ে গেলো। সোমনাথের মহারাজাও ভড়কে গেলেন। খাবার-দাবার তার হ্রাস পেলো। মেজাজ খিটখিটে হয়ে গেলো।

সোমনাথ রাজ্যের আকাশে বিপদের ঘটঘটা এগিয়ে আসছে। সুলতান মাহমুদ গজনবীর বাহিনী তীব্রগতিতে ছুটে আসছে। এসব সংবাদ রাজকুমারী চন্দ্রামুখীর জানা আছে। তাই তারও চিন্তার শেষ নেই। তার গোলাপী গণ্ডদেশ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। কোমল পাপড়ীর সৌন্দর্য বিজড়িত ওষ্ঠাধর বিশুষ্ক-মলিন হয়ে গেছে। চাঁদের ন্যায় দীপ্তিময় চেহারা নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। তার সখী ও দাসীরা তাকে আনন্দিত ও উৎফুল্ল করতে চেষ্টা করে। কিন্তু সে আনন্দিত ও উৎফুল্ল হতে পারছে না। তার সেই প্রাণচাঞ্চল্য ভুবনজয়ী হাসি কোথায় যেনো হারিয়ে গেছে। বারবার সে যেনো কোনো অচিনপুরের চিন্তায় হারিয়ে যায়। নির্নিমেষ দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। শোবাদেবীর মুখ থেকে যেদিন সে শুনেছে, শিকদেব হারুনকে গ্রেফতার করেছে, সেদিন থেকেই তার দুশ্চিন্তা ও পেরেশানী বহুগুণ বেড়ে গেছে।

রাজকুমারী চন্দ্রামুখী প্রত্যহ সকালে মহারাজা ও মহারাণীর সাথে সাক্ষাৎ করতে যায়। তাদের আশির্বাদ গ্রহণ করে। এক সকালে সে মহারাণীর নিকট গেলে মহারাণী তাকে দেখে চমকে ওঠে বললেন, বেটী! তোকেও তো ভারী চিন্তিত মনে হচ্ছে। কারণ কী?

চন্দ্রামুখী নতশিরে বিনীত কণ্ঠে বললো, বিশেষ কোনো কারণ নেই। কেনো যেনো আমার মনটা অস্থির লাগছে।

ঃ এই ম্লেচ্ছ সুলতানটার আক্রমণের ভয়ে সবাই চিন্তিত হয়ে পড়েছে। তোমার পিতাও দারুণ চিন্তিত। খাওয়া-দাওয়া প্রায় ছেড়েই দিয়েছেন। আমিও চিন্তিত। তোমারও দেখছি সেই একই অবস্থা। মেয়ে আমার! তুমি কোনো চিন্তা করো না। নিশ্চয় সোমনাথ প্রতিমা এই ম্লেচ্ছকে চরম শাস্তি দেবেন। রাজ্যের ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে চিন্তা করা তো তোমার কাজ নয়। তুমি হাসি-আনন্দে থাকো। তোমাকে মলিন মুখে দেখলে আমি ও তোমার পিতা দারুণ চিন্তিত হয়ে পড়ি।

ঃ মাতাজী! আমি হাসি-খুশি থাকার চেষ্টা করবো।

ঃ হ্যাঁ, চন্দ্রামুখী! তুমি আনন্দিত থাকো। তোমার হাসিমুখ দেখে আমরাও কিছুটা আনন্দিত হবো, সুখ পাবো।

চন্দ্রামুখী মহারাণীর পদধূলি নিয়ে চলে এলো। ফেরার পথে তার অন্তর দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে গেলো। চাপা কান্নায় সে উদ্বেলিত হয়ে ওঠলো। নিজ কামরায় ফিরে না গিয়ে সোজা বাগানে চলে গেলো। মর্মর পাথরের এক বেঞ্চে বসে উদাস দৃষ্টিতে একটি ফুলের কলির দিকে তাকিয়ে রইলো।

বাগানজুড়ে ফুলের বাহার। বিভিন্ন রঙের ফুলে বাগানটি হাসছে, দুলছে। সতেজ সুপুষ্ট ফুলের গন্ধে চারদিক বিমোহিত হয়ে আছে। বাতাসের গায়ে গায়ে ফুলের সুগন্ধি। হাল্কা বাতাসের ছোঁয়ায় ফুলগুলো তির তির করে কাঁপছে। রঙিন প্রজাপতির দল উড়ে উড়ে এ ফুল থেকে সে ফুলে যাচ্ছে। পূর্বাকাশ নবারুণের কোমল আলোতে উদ্ভাসিত। বাগানের শিশির বিন্দুতে সূর্যের আলো পড়ে মুক্তার মতো ঝলমল করছে। সে এক স্বর্গীয় দৃশ্য। এক মোহময় পরিবেশ। কিন্তু রাজকুমারী চন্দ্রামুখীর সেদিকে কোনো খেয়াল নেই। সে যেনো গভীর দুশ্চিন্তায় হারিয়ে গেছে।

তার মনের জগতে কিসের তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে, তা আল্লাহই ভালো জানেন। অকস্মাৎ দেখা গেলো, তার দু'চোখ বেয়ে অশ্রুর ধারা নেমে আসছে। সে তার দু'হাতে মুখ লুকিয়ে অঝোরে কাঁদছে। আবেগে-উচ্ছ্বাসে মাঝে-মাঝে তাঁর শরীর কেঁপে ওঠছে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। কাঁদতে কাঁদতে সে আপন মনে বলতে লাগলো, ঈশ্বর! এখন আমি কী করবো? আমি তো দুঃখের সাগরে ভেসে যাচ্ছি। ঈশ্বর! তুমি আমাকে রক্ষা করো। আমাকে উদ্ধার করো। হায় শিকদেব! তুই এ কী করলি... হারুন...।

প্রচণ্ড আবেগ আর উচ্ছ্বাসে তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। সে শুধুই কাঁদছে। বিরামহীনভাবে কাঁদছে। হঠাৎ অনুভব করলো, কে যেনো তার পিঠে পরম স্নেহের কোমল হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। চমকে ওঠে পেছনে তাকাতেই ধর্মপালকে দেখতে পেলো।

ধর্মপাল অত্যন্ত বেদনার্ত দৃষ্টিতে তাকে দেখছেন। চন্দ্রামুখী নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে ও কান্না থামাতে চেষ্টা করছে। কিন্তু পারলো না। তার গণ্ডদেশ বেয়ে মুক্তার মতো অশ্রু ঝরে পড়ছে।

ধর্মপালের কণ্ঠচিরে সান্ত্বনার বাণী উচ্চারিত হলো। বললেন, বেটী! এতো কাঁদছো কেনো? থামো। আর কেঁদো না। আমি তোমার দুঃখের কারণ জানি।

চন্দ্রামুখী বিস্ময়ভরা নেত্রে ধর্মপালের দিকে তাকিয়ে বললো, আপনি কি সত্যিই আমার দুঃখের কারণ জানেন?

ঃ হ্যাঁ, জানি। এতে বিস্মিত হওয়ার কী আছে। ...সাধু-সন্ন্যাসিদের কোনো বিষয় অজানা থাকে না।

চন্দ্রামুখী হয়রান হয়ে বললো, গুরুজী! তারপরই আবার চন্দ্রামুখীর অন্তরে দুঃখ-বেদনার উচ্ছ্বাস উথলে ওঠলো। সে কাঁদতে লাগলো। ধর্মপাল তার নিকটে উপবিষ্ট উপবিষ্ট। বললেন, নারী প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে রক্তের অশ্রুতে ভাসে আর পুরুষ প্রেমের আকর্ষণে উতলা হয়ে পাগল হয়ে ঘুরে। রাজকুমারী! হারুনের প্রেমের আকর্ষণে অধীর হয়ে এভাবে কাঁদছো কেনো?

ঃ সবকিছুই যখন জানেন, তাহলে...।

ঃ লজ্জা পেও না। স্পষ্ট বলে ফেলো।

ঃ আপনি জানেন না, শিকদেও হারুনকে গ্রেফতার করেছে?

ঃ হ্যাঁ, জানি।

ঃ আর আপনি তো এ কথাও জানেন, শিকদেব কতো নিষ্ঠুর, কতো নির্দয়।

ঃ হ্যাঁ, তাও জানি। আমি এ-ও জানি, শিকদেব হারুনের পশমটিও স্পর্শ করতে পারবে না।

ঃ এ কথায় আমি সান্ত্বনা পাবো না।

ঃ মনে রাখবে, তোমার গুরুজ্বী কখনো মিথ্যা বলে না।

ঃ আমি তাও জানি।

ঃ চন্দ্রামুখী তুমি জানো না, যদি তোমার ভালোবাসার কথা জানাজানি হয়ে যায়, তাহলে তুমি কি ভয়াবহ বিপদে নিপতিত হবে। আজ যে তোমাকে ভালোবাসে, সে তোমাকে ঘৃণা করবে। তোমাকে বন্দি করা হবে। অন্ধকার কারা প্রকোষ্ঠের দুর্ভোগ তোমাকে পোহাতে হবে। ধৈর্য ধরো বেটী! অধৈর্য হয়ে নিজের পায়ে নিজেই কুঠার মেরো না।

ঃ কিন্তু মনকে কীভাবে সান্ত্বনা দেবো?

ঃ তুমি কী চাও?

ঃ হারুনের মুক্তি।

ঃ সে মুক্তি পেয়ে যাবে।

ঃ কবে?

ঃ ঈশ্বর যেদিন ইচ্ছে করবেন।

ঃ এ কথায় আমার অশান্ত হৃদয় শান্ত হতে পারে? আমি কি নিজেকে শান্ত করতে পারবো?

ঃ তা না পারলে তোমার বদনাম হবে, মহাবিপদ হবে।

ঃ গুরুজ্বী! তাহলে আমি কেনো আপনার নিকট গেলাম আর কেনই বা তারা আমাকে ডাকাত দল থেকে রক্ষা করেছিলো। গুরুজ্বী! এ সবকিছু তাহলে কেনো ঘটেছে?

ঃ চন্দ্রামুখী আবার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

ঃ ঈশ্বরের এটাই মঞ্জুর ছিলো, তাই এসব ঘটেছে।

ঃ তাহলে এরপর ঈশ্বর কেনো আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন না? আমার অন্তরে কেনো এতো ঝড়, এতো অস্থিরতা! না, হারুন মুক্তি পাবে না! মুক্তি পাবে না!

এমন সময় নেপথ্য থেকে কে যেনো বলে ওঠে, হ্যাঁ, সে মুক্তি পেয়ে গেছে। শুনে চন্দ্রামুখী ও ধর্মপাল চমকে উঠে। তারা পেছনে ফিরে তাকায়। দেখে

শোবাদেবী বীর পদবিক্ষেপে এগিয়ে আসছে। চন্দ্রামুখী দাঁড়িয়ে যায়। তার চোখ দু'টো তখন অশ্রুতে ছল্ ছল্ করছে। এ অশ্রু আনন্দের, এ অশ্রু বিহ্বলতার।

ঃ মাতাজ্বী! সত্যই কি ও মুক্তি পেয়েছে?

শোবাদেবী নিকটে এসে বললো, হ্যাঁ, সত্য। আমি কি তোমাকে প্রতিশ্রুতি দেইনি?

ঃ হ্যাঁ, দিয়েছিলেন। কে তাকে মুক্তি দিয়েছে?

ঃ আমি কামিনীর সহায়তা নিয়ে তাকে মুক্ত করে দিয়েছি।

চন্দ্রামুখীর কণ্ঠে বিস্ময় ভাব। বললো, কামিনীর সহায়তায়!

ঃ হ্যাঁ, হারুন এখন তার বাহিনী নিয়ে সোমনাথ আসছে।

ইতিমধ্যে চারদিকে হট্টগোলের আওয়াজ শোনা যায়। যেনো হঠাৎ কোনো বিপদ এসে পড়েছে, আর সোমনাথের জনগণ তা দেখে চীৎকার করছে।

হট্টগোল আর চীৎকারের আওয়াজ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এরা বিস্মিত ও হয়রান হয়ে যায়। ধর্মপাল বললেন, কী হলো? কেনো লোকেরা এতো হট্টগোল ও চীৎকার করছে? আমি দেখে আসি।

ধর্মপাল দ্রুত বাগান থেকে বেরিয়ে শাহী প্রাসাদের ঐদিকে চলে গেলেন, যেখানে তিনি অবস্থান করেন। শাহী প্রাসাদ থেকে বেরিয়েই দেখতে পেলেন, প্রত্যেকেই দিশেহারা হয়ে ছুটাছুটি করছে। চীৎকার-হট্টগোল করছে। সবার চেহারায় এক ভয়ার্ত ভাব। ধর্মপাল শাহী প্রাসাদের প্রহরীদের এ অবস্থার কারণ জিজ্ঞেস করে জানতে পেলেন, সুলতান মাহমুদ গজনবীর বাহিনী এসে গেছে। তাই ভয়ার্ত মানুষের মাঝে এই দৌড়াদৌড়ি, ছুটাছুটি। সংবাদ শুনে ধর্মপাল অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। দৌড়ে কেল্লার পাঁচিলে গিয়ে উঠলেন। দেখলেন, মুজাহিদ বাহিনী বীরদর্পে এগিয়ে আসছে। সুলতানের কারুকার্যখচিত পতাকাটি অত্যন্ত দর্প ও গাম্ভীর্যের সাথে পত্ পত্ করে উড়ছে।

একুশ.

মুজাহিদ বাহিনীর আক্রমণ থেকে সোমনাথের মূর্তি ও মন্দিরকে রক্ষার জন্য যে রাজপুত ও সৈন্যরা এসেছে, তারা মুজাহিদ বাহিনীর আগমনের সংবাদ শুনে দ্রুত কেল্লায় প্রবেশ করে। সোমনাথের কেল্লা বিরাট-বিস্তৃত। তার পাঁচিল যেমন উঁচু, তেমনি প্রশস্ত। অনায়াসে সকল সৈন্য তাতে আশ্রয় নিলো।

মুজাহিদ বাহিনীর আগমন সংবাদ বিদ্যুদ্বেগে কেল্লার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত, শহরের উপকণ্ঠে এবং সোমনাথ মন্দিরে পৌঁছে যায়। হিন্দুরা বেশকিছু দিন থেকে মুজাহিদ বাহিনীর আগমনের জল্পনা-কল্পনা করছিলো। অবশেষে তারা বিদ্যুদ্বেগে এসেই পড়লো।

রাজপুতরা মুজাহিদ বাহিনীকে দেখার জন্য কেল্লার পাঁচিলের উপর এসে দাঁড়ায়। উৎসাহী জনতাও ভিড় করে দাঁড়ায়। কেল্লার পাঁচিলের চারদিকে মানুষের তীব্র ভিড়।

কেল্লার পাঁচিলের প্রত্যেক দিকে অসংখ্য বুরুজ। সে বুরুজগুলোতে বেশকিছু রাজা ও সেনাপতি আরোহণ করে। স্বয়ং মহারাজাও একটি প্রশস্ত মজবুত বুরুজে তাঁর কয়েকজন সভাসদকে নিয়ে আরোহণ করেন। সবাই নিষ্পলক ও বিস্ফারিত চোখে মুজাহিদ বানিহীর দিকে তাকিয়ে আছে। রাজা, মহারাজা, রাণী, রাজকুমারী, সাধারণ জনতা ও সাধারণ সৈন্যরাও এসে পাঁচিলের নিকট দাঁড়ায়। ভয়, আতংক, বিস্ময় ও অনুসন্ধিৎসা সবাইকে স্থানুর মতো নির্জীব-নিশ্চল বানিয়ে ফেলেছে।

মুজাহিদ বাহিনী এগিয়ে আসছে। মুক্ত বাতাসে পত্ পত্ করে উড়ছে তাদের কালিমা-খচিত পতাকা। সর্বপ্রথম যে ফৌজ এগিয়ে এলো, তার নেতৃত্বে রয়েছে বুরহান ও হারুন। মুজাহিদদের সংখ্যা মাত্র পাঁচ হাজার। সবাই উন্নত মানের আরবী ঘোড়ায় চেপে আসছে। এ অল্পসংখ্যক মুজাহিদকে হারুন এমনভাবে সাজিয়ে নিয়ে আসছে যে, দর্শক তার সংখ্যার অনুমান করতে ব্যর্থ হলো। মনে হলো, যেনো অসংখ্য সৈন্য এসে মুক্ত ময়দানে ছড়িয়ে পড়ছে।

মুজাহিদ বাহিনী যতোই এগিয়ে আসছে, তাদের চেহারা-সুরত ততোই স্পষ্ট হয়ে ওঠছে। মেঘমুক্ত খোলা আকাশ। রৌদ্রের উজ্জ্বল আলোয় চারদিক উদ্ভাসিত। রৌদ্রের আলোয় মুজাহিদ বাহিনীর অস্ত্রগুলো ঝলমল করতে লাগলো।

যে বুরুজে সোমনাথের মহারাজা কয়েকজন সভাসদকে নিয়ে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছিলেন, গুরুজী ধর্মপাল সেখানে উপস্থিত হলেন। ধর্মপালকে দেখেই মহারাজা আনন্দের সাথে স্বাগত জানিয়ে বললেন, আদাব, আদাব, আসুন। আপনার শূন্যতা এতোক্ষণ তীব্রভাবে অনুভব করছিলাম। আচ্ছা গুরুজী ধর্মপাল মহাশয়! দেখুন তো, এই ম্লেচ্ছদের কাউকে আপনি চেনেন কিনা?

গুরুজী ধর্মপাল এক পার্শ্বে বসে বিনীত কণ্ঠে বললেন, মহারাজা! আপনি জানেন, আমি এক সময় পর্যটক ছিলাম। আমার নেশাই ছিলো দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়ানো। আমি যখন কাশি ও মথুরা গিয়েছিলাম, তখন সংস্কৃতসহ বেশকিছু ভাষা শিখেছিলাম। তাছাড়া আমি কাশ্মীর, পেশোয়ার, লাহোর, মুলতান, এমনকি গজনীতেও গিয়েছিলাম। তাই সুলতান মাহমুদের বাহিনীর কিছু অফিসারকে আমি চিনি।

'গুরুজী ধর্মপাল গজনীও ভ্রমণ করে এসেছে' এ সংবাদ শুনে সবাই বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেলো। মহারাজা বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললেন, আপনি তাহলে গজনীও সফর করে এসেছেন?

ধর্মপালের কণ্ঠ জড়তাহীন। বললেন, হ্যাঁ, আমি সেখানে কয়েক মাস কাটিয়েছি। আমি মুসলমানদের বেশ ধারণ করে তাদের সাথে মিশে গিয়েছিলাম। তাদের বহু কিছু ঘুরে ফিরে দেখে এসেছি। মুসলিম পর্যটক ভেবে সবাই আমাকে সম্মান করেছে, ইজ্জত দিয়েছে। মুসলমানরাও হিন্দুদের বেশ ধরে আমাদের দেশে এসে অনেক কিছু দেখে যায়। জেনে যায়।

গুরুজী ধর্মপালের শেষ কথাটি বুরুজের সবাইকের সচকিত করে তুললো। মহারাজার কণ্ঠচিরে রাজ্যের বিস্ময় ঝরে পড়লো। বললেন, তাহলে কি আমাদের দেশেও আমাদের বেশে মুসলমান আছে, আমরা যাদের চিহ্নিত করতে পারছি না?

ধর্মপাল বললেন, হ্যাঁ, হয়তো অনেক আছে। আমাদের বেশ ধরেই আছে। আমরা তাদের চিনতে পারছি না। অসম্ভব কি, হয়তো সোমনাথেও তারা আমাদের সাথে মিশে আছে। খবরাখবর সংগ্রহ করছে। মহারাজা! আপনি হয়ত জানেন না, ম্লেচ্ছ এই মুসলমানরা অত্যন্ত বদমেজাজী ও কূটবুদ্ধির অধিকারী। সেই সঙ্গে তারা অত্যন্ত দুঃসাহসী ও মৃত্যুঞ্জয়ী। তাদের বিজয় কাহিনী ইতিহাসে বর্ণিত আছে। তারা যখন বিশ্বের অদ্বিতীয় শক্তি ইরানে হামলা করেছিলো, তখন মাঝপথে ছিলো দজলা নদী, যা অত্যন্ত তরঙ্গবিক্ষুব্ধ ও ভয়ংকর। দুনিয়ার ভয়ংকর নদীগুলো মধ্যে দজলা অন্যতম। কিন্তু নদীর তীরে পৌঁছেও তারা যাত্রা থামায়নি। ঘোড়া নিয়ে তরঙ্গবিক্ষুব্ধ দজলায় ঝাঁপিয়ে পড়লো। নদীর অপর তীরে তখন অসংখ্য ইরানী সৈন্য দাঁড়িয়ে ছিলো। তাদের বিশ্বাস ছিলো, বিশাল নৌকা বা জাহাজ ছাড়া এ নদী পার হওয়া সম্ভব নয়। মুসলিম বাহিনীর এই দুঃসাহসী ও অবিশ্বাস্য পদক্ষেপে ইরানী সৈন্যরা ভড়কে গেলো। ভয়-আতংক তাদের চোখে-মুখে ছড়িয়ে পড়লো। তারা চিৎকার করতে লাগলো– দৈত্য আসছে, দৈত্য আসছে। ব্যস, এরপর আর কেউ নদী তীরে রইলো না। অজানা এক ভয় তাদের কেথায় তাড়িয়ে নিয়ে গেলো।

মহারাজা! আপনার হয়তো বিশ্বাস হবে না, সিরিয়া ও মিসরে খৃষ্টানরা তাদের জিন মনে করে। আসলে ওরা জিন-দৈত্য কিছুই না। এরা অত্যন্ত দুঃসাহসী, মৃত্যুঞ্জয়ী। এদের প্রতিটি কাজই বিস্ময়কর।

মহারাজা কাঁপা কণ্ঠে বললেন, আপনার তথ্য শুনে তো আমার মনে হচ্ছে, আমাদের মাঝেও আমাদের বেশে কোনো ম্লেচ্ছ মুসলমান মিশে আছে।

ঃ আমি সত্য বলছি, মহারাজ! হতে পারে আমিই তাদের একজন কিংবা মহাপূজারী বা সোমনাথের অন্য কোনো পূজারী তাদের হয়ে আমাদের মাঝে মিশে আছে।

ঃ তাহলে তো আমাকে প্রত্যেক ব্যক্তি সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে। সবার কাজ-কর্ম ও চলাফেরার প্রতি নজর রাখতে হবে।

ঃ এটা খুব কঠিন ব্যাপার। তবে যাকে-তাকে সন্দেহ করা যাবে না। আমাদেরকে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকতে হবে।

ঃ আপনি ঠিক বলেছেন, আমাদের সবাইকে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে। আচ্ছা, আপনি যাদের চেনেন, তাদেরকে আমায় দেখিয়ে দিন। ঐ তো ম্লেচ্ছ মুসলমান যোদ্ধারা একেবারে নিকটে এসে গেছে। তাদের অধিনায়ক কে? আর এরাই কি সব, না আরো সৈন্য আছে?

ঃ না। মুসলমানরা কখনো বাধ্য না হয়ে কোনো কেল্লায় আক্রমণ করে না। এটা তাদের সাধারণ রীতি। ঐ যে হাতে পতাকা নিয়ে একজন সৈন্য ঘোড়ায় চড়ে আসছে, সে তাদের একজন অধিনায়ক।

সবার চোখ যেনো তখন মুজাহিদ বাহিনীর উপর ঠিকরে পড়ছে। মহারাজার কণ্ঠে বিস্ময়। বললেন, ঐ ছোকড়াটা তাদের অধিনায়ক!

ঃ হ্যাঁ, আপনি কি তাকে চিনতে পেরেছেন?

ঃ না, চিনতে পারিনি।

ঃ সে-ই হারুন। শিকদেব আমব্রেলীতে একেই বন্দি করেছিলো। এখন সবাই বলাবলি করছে, সে নাকি এক অবিশ্বাস্য পন্থায় বন্দি অবস্থা থেকে পালিয়ে গেছে।

মহারাজার কণ্ঠে বিস্ময়ের ঝড়। বললেন, আচ্ছা, তাহলে এ-ই সেই হারুন! তাকে তো একেবারে অল্পবয়সী মনে হচ্ছে।

ঃ তার সঙ্গে তার বন্ধুও আছে। তার নাম বুরহান। এরা দু'জনই আমার নিকট এসেছিলো। তারা নাকি পর্যটক। এ বলেই আমাকে তাদের পরিচয় দিয়েছিলো।

হারুনের হাতে মুজাহিদ বাহিনীর কালেমাখচিত পতাকা পত্ পত্ করে উড়ছে। তার পাশে অন্য ঘোড়ায় আসছে তার বন্ধু বুরহান। নির্ভীক চিত্তে অত্যন্ত বীরত্বের সাথে তারা মুজাহিদ বাহিনীর আগে আগে এগিয়ে আসছে।

রাজকুমারী চন্দ্রামুখী এখন রাজপ্রাসাদে নেই। সেও তার সখীদের নিয়ে কেল্লার পাঁচিলের এক বুরুজে এসে উঠেছে। মুসলমানদের আগমন প্রত্যক্ষ করছে। সূর্যের উজ্জ্বল আলোয় সে হারুনকে দেখতে পেলো। তার চেহারায় লালিমা ছড়িয়ে আছে। গণ্ডদেশ চিকচিক করে ওঠলো। চোখে মন্ত্রমুগ্ধ চাহনি। আবেগে তার হৃদস্পন্দন বেড়ে যায়। দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে থাকে।

এখনো একে একে মুসলিম বাহিনীর সৈন্যরা এগিয়ে আসছে আর ময়দানের এক দিকে অবস্থান নিচ্ছে। ঠিক তখন দূর-দিগন্তে আরেক দল মুজাহিদ বাহিনীর অভ্যুদয় হলো। এ বাহিনীর সাথে হাজার হাজার উট আসছে। উঁচু মাথা হেলিয়ে দুলিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে।

এ বাহিনী সামনে এলে ধর্মপাল বললেন, মহারাজ! এই যে বাহিনীটি এগিয়ে আসছে, এরা আলতুনতাশের নেতৃত্বে এগিয়ে আসছে। সুলতান মাহমুদের এই অধিনায়ক অত্যন্ত ফন্দিবাজ, কূট কৌশলী ও দুঃসাহসী। তার হাতে ঐ যে একটি পতাকা পত্ পত্ করছে।

সঙ্গে প্রচুর উট থাকার কারণে বাহিনীটি ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে এবং ময়দানে ছড়িয়ে পড়ছে। এ দু'বাহিনী আসতে আসতেই গোটা দিন পেরিয়ে গেলো।

পড়ন্ত বিকেলে সূর্যের ম্রিয়মান আলোর মাঝে দাঁড়িয়ে মহারাজা ধর্মপালকে জিজ্ঞেস করেন, মুসলমানদের কি এ-ই সৈন্য?

ঃ না মহারাজ! মাত্র দু'জন অধিনায়ক এসে পৌঁছেছে। অন্যান্য বাহিনী পেছনে আছে। তারাও এগিয়ে আসছে। এখনো তো সুলতান মাহমুদ গজবী আসেননি।

মহারাজা বললেন, আপনার ধরণায় মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা কতো হবে?

ঃ নিশ্চিতভাবে তো বলা মুশকিল। তবে শুনেছি হারুন ও আলতুনতাশের অধীনে দশ হাজার করে বিশ হাজার সৈন্য রয়েছে।

ঃ আমার ধারণাও তাই। আচ্ছা, একটা কথা বলবো?

ঃ আমি বুঝে ফেলেছি, আপনি অতর্কিত আক্রমণের চিন্তা-ভাবনা করছেন।

ঃ হ্যাঁ, তাই ভাবছিলাম। অল্পসংখ্যাক সৈন্য; তদুপরি ক্লান্ত-শ্রান্ত। রাতে নিঃসন্দেহে বেঘোরে ঘুমাবে। আমরা সহজেই তাদের পরাভূত করতে পারবো।

ঃ মহারাজ! আপনি হয়তো জানেন না, মুসলমানরা যখন জিহাদের জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে, তখন দুঃখ-কষ্ট সহ্য করার মানসিকতা নিয়েই বের হয়। আরাম ও স্বস্তির কথা ভুলে যায়। একটু রাত হলেই আপনি বুঝতে পারবেন, কীভাবে তারা আগুন জ্বালিয়ে বিনিদ্র রাত্রি যাপন করে। আমার ধারণামতে তারাই রাতের আঁধারে কেল্লার নিকটে আসার চেষ্টা করবে। বরং আপনি সেনানায়কদের নির্দেশ দিয়ে দিন, তারা যেনো রাতে কেল্লার পাঁচিলে প্রহরার ব্যবস্থা করে। মুসলমানরা পাঁচিলের নিকটবর্তী হলে আমাদের উপস্থিতির কথা অনুভব করে যেনো ফিরে চলে যায়।

ঃ বেশ ভালো পরামর্শ। তারপরই মহারাজা সেনানায়কদের ডেকে নির্দেশ দিয়ে দিলেন, যেনো রাতে কেল্লার পাঁচিলে প্রহরার ব্যবস্থা করা হয়। তারপর তিনি রাজমহলে চলে গেলেন। রাতে রাজপুতরা কেল্লার পাঁচিলের উপর শোরগোল করে প্রহরা দিলো।

পরদিন কাকডাকা ভোরে যখন পূর্বাকাশে সোবহে সাদেকের আলো ছড়িয়ে পড়লো, তখন মুজাহিদ বাহিনীতে ফজরের আযান হলো। মুজাহিদরা জামাতের সাথে নামায আদায় করলো।

সোমনাথের পূজারীরাও অন্যান্য দিনের তুলনায় আরো বেশি ঢাকঢোল পিটিয়ে পূজার আয়োজন করলো। সোমনাথ মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি ও সিঙ্গার আওয়াজ এতো তীব্র হলো যে, সেই শব্দ মুজাহিদ বাহিনীর কানেও গিয়ে পৌঁছলো।

আলো বিকিরণ করতে করতে সূর্য কিছুটা উপরে চলে এলে হঠাৎ পাঁচিলে অবস্থানরত রাজপুতরা চিৎকার করতে লাগলো। হিন্দুরা বুঝলো, নতুন মুজাহিদ বাহিনী আসছে। তাই তারা ছুটে এসে পাঁচিলের পাশে দাঁড়ালো না। বুরুজে উঠে গেলো। তারা দেখলো, মুসলমান সৈন্যরা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। ততোক্ষণে মহারাজাও পাঁচিলে এক উঁচু বুরুজে এসে পৌঁছেছেন। ধর্মপাল এসে তার পাশে বসলেন। রাজকুমারী এবং রাণীও এসে উপস্থিত হলো। মহারাজা ধর্মপালকে বললেন, আমার মনে হচ্ছে, মুসলমানদের সকল যোদ্ধা এসে পৌঁছেছে এবং তারা কেল্লায় আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

ঃ তাদের রণপ্রস্তুতির অবস্থা দেখে হয়তো আপনি এ ধারণা করেছেন। আসলে ব্যাপার তা নয়। আমার মনে হচ্ছে, আজ সুলতান মাহমুদ গজনবী নিজে এসে উপস্থিত হবেন। তাই এই আয়োজন। মুসলিম মুজাহিদরা তাকে স্বাগত জানানোর জন্য প্রস্তুতি হচ্ছে।

ঃ ইশ্বর জানেন এ সুলতান কেমন মানুষ। যার জন্য মাঠে নামেন, তা পূরণ না করে ঘরে ফেরেন না।

ঃ আপনার স্মরণ থাকার কথা, তার দূত প্রথম যখন এসেছিলো, তখনই আমি বলেছিলাম, তার প্রস্তাব মেনে নিন।

মহারাজার চোখে রাজ্যের বিস্ময়। বললেন, এ কেমন কথা বললেন ধর্মপাল! আমি জীবিত থাকতে কি রাজকুমারী চন্দ্রামুখীকে তার হাতে অর্পণ করতে পারি! না, না, ধর্মপাল! না, কিছুতেই এ হবার নয়। কিছুতেই এ হতে পারে না।

ধর্মপাল একটু নীরব থাকার পর বললেন, মহারাজা! একটু ভেবে দেখুন! একেবারে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার চেয়ে অল্প ক্ষতিতে ধ্বংসের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া কি উত্তম নয়? বিষয়টি যদিও কঠিন; কিন্তু তবুও ভেবে দেখার বিষয়। তা ছাড়া সুলতানের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এটিই। আর এজন্যই তিনি কেল্লা আক্রমণ করতে আসছেন।

ঃ গুরুজী ধর্মপাল! আমি পিতা– আমি রাজকুমারীর পিতা। আমি সবকিছু দিতে পারি, কিন্তু ম্লেচ্ছ যবন ঐ সুলতানের হাতে রাজকুমারীকে তুলে দিতে পারি না। এর চেয়ে তো আমার মরণই শ্রেয়। কোনো চিন্তা নেই ধর্মপাল! আসতে দিন ঐ ম্লেচ্ছ যবনকে। আমি তাদের এমন শিক্ষা দেবো, যা তারা বেঁচে থাকলে আজীবন স্মরণ করবে।

ঃ কিন্তু মহারাজা! মানুষের সব তামান্নাই কি পূরণ হয়!

ঠিক তখন শোরগোল শোনা গেলো। রাজপুতরা চিৎকার করতে লাগলো। মহারাজা ও ধর্মপাল দেখলেন, দিগন্তের আবরণ ভেদ করে অশ্বারোহী মুজাহিদরা একের পর এক এগিয়ে আসছে। ধর্মপাল বললেন, এখন সুলতানের নেতৃত্বাধীন বাহিনী এগিয়ে আসছে।

মহারাজার কণ্ঠ চিরে অলক্ষে বেরিয়ে এলো– দেখলেন গুরুজী, সুলতানের বাহিনীর কী শানসওকাত, কী চমৎকার তাদের শৃঙ্খলা।

ধর্মপাল মৃদু হেসে বললেন, মহারাজা! মুজাহিদ বাহিনীর চেয়ে অধিক সুশৃঙ্খল বাহিনীর কথা আমার জানা নেই। দেখুন, একের পর এক কীভাবে বীরত্বের সাথে এগিয়ে আসছে।

ঃ হ্যাঁ, ধর্মপাল! তারা খুবই শৃঙ্খলিত বলে মনে হচ্ছে।

হারুন ও আলতুনতাশ-এর বাহিনীর সৈন্যরা মুসলমান বাহিনীকে অত্যন্ত আগ্রহ ও উচ্ছ্বাস ভরে স্বাগত জানাচ্ছে। সন্ধ্যা পর্যন্ত সুলতান-বাহিনী একের পর এক এগিয়ে আসতে থাকে। রাজপুতরা অনুমানই করতে পারলো না, আগত মুজাহিদদের সংখ্যা কতো হতে পারে। তৃতীয় দিনে আমীর আলী ও হাজের আলীর নেতৃত্বাধীন মুজাহিদরা আসলো। এভাবে তিন দিনে ক্রমাগত মুজাহিদ বাহিনী আসলো এবং সোমনাথের বিস্তৃত প্রান্তর জুড়ে অবস্থান নিলো।

যদিও সুলতানের বাহিনীতে সৈন্য ত্রিশ হাজার; কিন্তু উট-ঘোড়া ও যুদ্ধের অস্ত্র-শস্ত্র বহনকারী গাড়িতে সামনের বিশাল ময়দান ভরে গেলো। ফলে হিন্দুরা মুজাহিদদের সংখ্যা নির্ণয় করেত পারলো না।

হিন্দুদের সংখ্যাও কম নয়। তারা কেল্লার সকল মাঠ, সোমনাথ মন্দির ও অন্যান্য মন্দিরে অবস্থান নিয়েছে।

সুলতান মাহমুদ গজনবীর আক্রমণের পর সোমনাথের হিন্দুরা মুজাহিদ বাহিনীর তৎপরতার অপেক্ষা করছে। মুজাহিদ বাহিনীও কোনো তাড়াহুড়া করছে না। মনে হচ্ছে, যেনো তারা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পূর্ণ প্রস্তুতি নিচ্ছে।

বাইশ.

একদিন। হারুন ও বুরহান মুজাহিদদের ছাউনীর অদূরে নিরিবিলি স্থানে বসে কথা বলছে। বুরহান বললো, আমার মনে হয় চন্দ্রামুখীও অন্যান্যদের মতো আমাদের আগমন দেখেছে।

ঃ হতে পারে।

ঃ তবে তার অন্তরে যদি তোমার প্রতি...।

হারুন আর বলার অবকাশ না দিয়ে বললো, তাহলে নিশ্চয় সে আমার নিকট দৌড়ে চলে আসতো।

বুরহানের ওষ্ঠাধরে মুচকি হাসির ঝিলিক। বললো, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভালোবাসার টান তো এমনই হওয়া চাই।

হারুন আজব এক অভিনয় করে বললো, আরে তুমি সেদিনের কচি ছেলে। প্রেমের হাকীকত কী বুঝবে? ও নিয়ে তোমার মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই।

বুরহান অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে বললো, আর তুমি দেখছি নব্বই বৎসরের থুরথুরে বুড়ো। হাজার প্রেমের সফল নায়ক।

ঃ আরে জানো না, বুদ্ধির পরিপক্কতাই হলো বয়স ও জ্ঞানের আসল কথা।

ঃ তাহলে তো তা আমার ক্ষেত্রেই বেশি প্রযোজ্য– তোমার বেলায় নয়। কারণ, তুমি এক বিজাতীয় সুন্দরীর প্রেমে মজে জীবন পার করতে চলেছো। হারুন! যদি আল্লাহর অসীম অনুগ্রহে আমরা বিজয়ী হই, চন্দ্রামুখী বন্দি হয় আর মহামান্য সুলতান তাকে তোমার হাতে অর্পণ করেন, তাহলে কি তুমি তাকে শাদী করে নিবে না?

হারুনের কণ্ঠে দৃঢ়তা। বললো, না।

ঃ তাহলে কি তাকে দাসী বানিয়ে রাখবে?

ঃ তাতে তার ইজ্জতের হানি হবে।

ঃ তাহলে তুমি কী করবে?

ঃ তাকে মুক্ত করে দেবো।

ঃ তাহলে তোমার ভালোবাসা?

ঃ হ্যাঁ, তারপরও তা অটুট থাকবে।

ঃ মনে হচ্ছে, মুক্ত করে দেয়ার পর তুমি তাকে তোমার কাছেই রাখবে। তার জীবনও ধ্বংস করবে আর তোমার জীবনও ধ্বংস করবে।

ঃ না, আমি তাকে আমার সাথে থাকতে বাধ্য করবো না। তাকে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করবো। সে যেখানে ইচ্ছা চলে যেতে পারবে। যেখানে ইচ্ছা থাকতে পারবে।

ঃ তাহলে নিশ্চয় তুমি অন্য কোনো সুন্দরীকে বিয়ে করে নেবে।

ঃ কেয়ামত পর্যন্ত তা হবে না। বুরহান! তুমি জানো না, চন্দ্রামুখীর সাথে আমার কেমন ভালোবাসা হয়ে গেছে। শুধু এতোটুকু জেনে নাও। এরপর আর তোমার জানার কিছু নেই আর আমার বুঝানোরও কিছু নেই। তবে শুধু একটি কথাই তোমাকে বলবো, আমি আজীবন বিয়ে করবো না। চিরকুমার হয়ে থাকবো।

বুরহান একথা শুনে দারুণ বিস্মিত হলো। বললো, চিরকুমার থাকবে!

হারুন অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে শান্ত কণ্ঠে বললো, হ্যাঁ চিরকুমার হয়ে থাকবো। এটাই আমার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

বুরহানের কণ্ঠে তিরস্কারের তীব্র ঝাঁঝ। বললো, এই তো তোমার নির্বুদ্ধিতা ধরা পড়েছে। এবার বুঝে নাও কার কতো বয়স।

ঃ বন্ধু! তুমি যা-ই বলো হয়তো সবই ঠিক, তবে আমার প্রতিজ্ঞা বড় কঠিন।

ঃ কিন্তু তুমি এমন করতে চাচ্ছো কেনো?

ঃ বন্ধু! মানুষের জীবনে একবারই ভালোবাসা আসে। এক জীবনকে কেন্দ্র করে তা সুশোভিত ও পল্লবিত হয়। আমার দুর্ভাগ্য যে, রাজকুমারী চন্দ্রামুখীর সাথে আমার ভালোবাসা হয়ে গেছে। তাও আবার এমন পর্যায়ের, যা ব্যক্ত করা অসম্ভব। কিন্তু সে তো মূর্তিপূজারিনী, মুশরিক। আমি কিছুতেই তাকে বিয়ে করতে পারি না।

ঃ হ্যাঁ, যদি সেও তোমাকে হৃদয় দিয়ে ভালোবেসে থাকে, তাহলে?

ঃ তা অসম্ভব। মূর্তিপূজারিনী একজন মুসলমানকে বিয়ে করতে পারে না। যদি সম্ভব হয়েও থাকে, তবু তা হবার নয়।

ঃ যদি সে মুসলমান হয়ে যায়?

হারুনের কণ্ঠ এবার কেঁপে ওঠলো। বললো, এমন অবস্থা হলে ইসলামী বিধান মতে বিয়ে হতে পারে। তবে বুরহান! আমি আমার পবিত্র বংশের খুনকে ভিন্ন জাতির মাধ্যমে কলঙ্কিত করতে চাই না। এটা হবে আমার খান্দানের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা। এটা হবে আমার ঐতিহ্যের কপালে কালিমা লেপন। আমি কিছুতেই তা হতে দিতে পারি না।

বুরহানের কণ্ঠে রাজ্যের বিস্ময়। বললো, তুমি তো এক আজব মানুষ। বিস্ময়কর তোমার চিন্তাধারা।

হারুন তৃপ্তির সাথে বললো, বুরহান, আল্লাহর কাছে দু'আ করো, তিনি যেনো আমাকে আমার চিন্তা-চেতনায় অবিচল থাকার তাওফীক দান করেন।

ঠিক তখন এক শাহী অশ্বারোহী এক দ্রুতগামী অশ্ব ছুটিয়ে তাদের নিকট এসে দাঁড়ালো। অশ্ব থেকে নেমে বিনীত কণ্ঠে সালাম দিয়ে হারুনকে লক্ষ্য করে বললো, সুলতান আপনাকে এক্ষুনি যেতে বলেছেন।

ঃ আমাদের দু'জনকে?

ঃ না, শুধু আপনাকে।

ঃ বন্ধু! সুসংবাদ আছে মনে হচ্ছে। সুলতান দূত বানিয়ে তোমাকে সোমনাথের মহারাজার নিকট পাঠাবেন। তারপর হাসতে হাসতে বললো, যদি তাই হয় তাহলে অবশ্যই হৃদয়ের সেই... দেখা করে আসবে। বুঝলে?

হারুনের অধরে তৃপ্তির ঝলমলে হাসি বিকশিত হলো। সে সাথে সাথে উঠে দাঁড়ালো। অধিনায়কের পোশাক পরিধান করে রওনা হয়ে গেলো।

হারুনের মুজাহিদরা সমুদ্রের তীরে তাঁবু গেড়েছে। রাজপুতরা তাদের নৌকা

ও জলযানগুলোর নিরাপত্তার জন্য সমুদ্রের তীরে এক শক্তিশালী বাহিনী নিয়োজিত করে রেখেছিলো। তাই হারুনের অধীন মুজাহিদদের সদা সতর্ক অবস্থায় থাকতে হচ্ছে।

সুলতানের তাঁবু সমুদ্রের তীর থেকে কয়েক মাইল দূরে। হারুন দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে সুলতান-বাহিনীর নিকট গিয়ে পৌছলো। সুলতানের তাঁবুর অদূরে পৌছে সে ঘোড়া থেকে নেমে সুলতানের অনুমতি নিয়ে তাঁবুতে প্রবেশ করে।

হারুন তাঁবুতে প্রবেশ করলে সুলতান চোখ তুলে তাকান। সাথে সাথে হারুন অবনত শিরে সালাম জানায়। সুলতান সালামের উত্তর দিয়ে মুচকি হেসে বললেন, হারুন তুমি এসে গেছো? এসো আমার কাছে এসে বসো।

হারুন সুলতানের নিকটে গিয়ে বসলো। দেখলো, সুলতানের সামনে একখানা চিঠি। তবে কাগজের অবস্থা আর কালির অস্পষ্টতার কারণে বুঝা গেলো, চিঠিটি দীর্ঘদিন আগের লেখা।

হারুন মনোযোগের সাথে চিঠিটা দেখতে লাগলো। সুলতান বুঝতে পারলেন, হারুনের চোখ দু'টি চিঠিতে লেগে যাচ্ছে। সুলতান কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর বললেন, হারুন! যে চিঠিটি তুমি পড়ার জন্য চেষ্টা করছো, এ চিঠির সূত্রে আমি সোমনাথের এই রণক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হয়েছি।

হারুন তার ভুল বুঝতে পেরে কেঁপে ওঠলো। এটা তো ভারী অন্যায় হয়েছে। সুলতানের অনুমতি ছাড়া তাঁর সম্মুখের কোনো চিঠি পড়ার চেষ্টা করা ঠিক হয়নি। অনুতাপ বিজড়িত দৃষ্টি মেলে ক্ষণিকের তরে সুলতানকে দেখেই সে শির অবনত করে বিনম্র কণ্ঠে বললো, আলমপনা! আমি বড়ই অন্যায় করে ফেলেছি। আপনার অনুমতি ছাড়া গভীর দৃষ্টিতে চিঠিটি দেখেছি। তবে আমি তা পড়ার চেষ্টা করিনি।

সুলতান শান্ত কণ্ঠে বললেন, ভয় পেয়ো না হারুন। কথাটা আমি তোমাকে তিরস্কার করার জন্য বলিনি। আমিই তোমাকে পত্রটি দিতাম আর তুমি তা পাঠ করে তার মর্ম উদ্ধার করতে। কিন্তু তাতে একটি রহস্যের কথা বর্ণিত আছে, যা সময়ের আগে প্রকাশ করা সমীচীন মনে করছি না। সময় হলে আমি অবশ্যই তা প্রকাশ করবো।

হারুন বিনীত কণ্ঠে বললো, আলামপনার ইচ্ছাই যথার্থ।

ঃ তোমার কথা ঠিক। তবে আমি এমন কিছু বিষয় জানি, যা তুমি জানো না। ...যা হোক, বলছিলোম, এ চিঠিই আমাকে সুদূর সোমনাথে নিয়ে এসেছে।

ঃ হ্যাঁ আলমপানা! আপনি এ কথা বলেছিলেন।

ঃ আমি কেনো সোমনাথ আক্রমণ করতে এলাম সে কথা কেউ জানে না। তাই এ ব্যাপারে অনেকে অনেক মন্তব্য করে। ভবিষ্যতে ঐতিহাসিক হয়তো

বলবেন, আমি একজন অত্যন্ত লোভী যুদ্ধবাজ ছিলাম। সোমনাথ মন্দিরের সোনাদানার লোভই আমাকে সোমনাথ আক্রমণে উৎসাহিত করেছে। মোটকথা, প্রত্যেকে নিজ নিজ বুদ্ধি ও জ্ঞান অনুযায়ী বিভিন্ন মত পেশ করবে। কিন্তু... সুলতান একটি দীর্ঘশ্বাস নিয়ে বললেন, কিন্তু আমার আল্লাহ্ জানেন, আমি কেনো এতো দীর্ঘ বন্ধুর পথ অতিক্রম করে এখানে এলাম। কেনো আমি ভয়াবহ ও বিশাল মরুর বুক চিরে এখানে ছুটে এলাম। কেনো আমি হাজারো বিপদ পায়ে দলে এখানে এসে উপস্থিত হলাম।

হারুন বিনীত কণ্ঠে বললো, আল্লাহ্ যা চান, মানুষের জন্য তা-ই কল্যাণকর।

ঃ হ্যাঁ, সে-ই আসল কথা। আমি এ অভিযানে সাওয়াবের প্রত্যাশা রাখি। তিনিই উত্তম সাওয়াবদাতা। বলেই সুলতান কিসের চিন্তায় যেনো হারিয়ে গেলেন। তারপর আবার বলতে শুরু করলেন, হারুন! আমার যৌবন চলে গেছে। বার্ধক্য আমার সারা শরীর গ্রাস করে নিচ্ছে। আমি জীবনের শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছি। এখন খানকায় বসে আল্লাহর নিবিড় জিকির করার সময়। আখেরাতের সফরের পাথেয় সংগ্রহের সময়। কিন্তু... কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, যে কাজের জন্য আমি এখানে এসেছি, তাও ইবাদত। হারুন! তুমি কি আমার কথা শুনে বিস্মিত হচ্ছো?

ঃ আলমপানাহ! আপনি কেমন যেনো রহস্যময় কথা বলছেন।

ঃ হ্যাঁ, আমি এমন এক রহস্যময় কথা বলতে চাচ্ছি, যা ইতিপূর্বে কাউকে কখনো বলিনি।

ঃ আমার মতো তুচ্ছ গোলামের পক্ষে আপনার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা অসম্ভব।

সুলতান গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, হারুন! আমি তা বুঝি! আচ্ছা তোমার কি সোমনাথ দুর্গে প্রবেশ করার সাহস হয়?

ঃ সুলতানের নির্দেশ সর্বদা শিরোধার্য।

ঃ আমি তোমাকে দূত হিসেবে সোমনাথের মহারাজার নিকট পাঠাতে চাই।

শুনে হারুনের চেহারায় আনন্দের ঢেউ খেলতে লাগলো। চেহারাটা ঝলমল করে ওঠলো। তার চেহারা বললো, আমি প্রস্তুত।

সুলতান তার মসনদের নীচ থেকে একটি চিঠি বের করে হারুনের হাতে দিলেন। হারুন তা নিয়ে ভক্তিভরে চোখে-মুখে স্পর্শ করলো। সুলতান বললেন, এ চিঠি মহারাজাকে দেবে। যদি তিনি এ চিঠি সম্পর্কে কিছু জানতে চান, তাহলে বলবে, আমি এ ব্যাপারে কিছুই জানি না।

ঃ আলমপনার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালনের চেষ্টা করবো।

ঃ তোমাকে আরেকটি পত্র পৌঁছাতে হবে। তবে সেটি ধর্মপালের নিকট। তবে অত্যন্ত সর্তকতার সাথে পৌঁছাতে হবে, কেউ যেনো টের না পায়।

হারুন বিনীত কণ্ঠে বললো, জ্বি তা-ই হবে। সুলতান আবার তার মসনদের নীচ থেকে দ্বিতীয় চিঠিটি বের করে হারুনের হাতে দিলেন। হারুন সেটিও ভক্তিভরে গ্রহণ করলো।

সুলতান বললেন, এখনই রওনা হয়ে যাও। মহারাজার উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ শুরু করা যাবে না।

হারুন সালাম দিয়ে সুলতানের তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল। ঘোড়ায় চেপে নিজ তাঁবুতে ফিরে চললো। তাঁবুতে ফিরে এসেই দেখে বুরহান তার ফেরার অপেক্ষায় বসে আছে। হারুনকে দেখেই সে বলে ওঠলো, আমি যা বলেছিলাম, তাই বুঝি হচ্ছে? সুলতানের দূত হয়ে সোমনাথ যাচ্ছো!

হারুন বললো, তোমার ধারণাই ঠিক হয়েছে বুরহান! কিন্তু আমি কিছু বলার পূর্বে তুমি তা কীভাবে বুঝলে?

ঃ তোমার হাস্যোজ্জ্বল চেহারা দেখে। আচ্ছা কবে যাচ্ছো?

ঃ এখনই যাচ্ছি।

ঃ একাই যাচ্ছো বুঝি?

ঃ হ্যাঁ, একাই যাচ্ছি।

ঃ রাজপুতদের ব্যাপারে সতর্ক থাকবে। এরা বিবেকহীন ও নিচু স্বভাবের মানুষ।

ঃ আল্লাহই আমাকে হেফাজত করবেন।

হারুন দ্রুত অস্ত্র-সজ্জিত হয়ে বুরহানকে সালাম জানিয়ে সোমনাথের কেল্লার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলো।

তেইশ.

রাজপুতরা এখন সোমনাথ কেল্লার অতন্দ্রপ্রহরী। তারা দিন-রাত পালাক্রমে কেল্লার পাঁচিল প্রহরা দিচ্ছে। মুজাহিদ বাহিনীর প্রতি তাদের সদা-সতর্ক দৃষ্টি লেগে আছে। যেসব রাজা-মহারাজা সোমনাথ রক্ষার্থে এসেছেন, তারা বারংবার মহারাজার সাথে সাক্ষাৎ করছেন, শলাপরামর্শ করছেন, যুদ্ধ-কৌশল নিয়ে আলোচনা করছেন। আবার নিজ বাহিনীতে ফিরে যাচ্ছেন।

কেল্লায় অবস্থানরত সবাই জানে, সুলতান মাহমুদ গজনবী যুদ্ধ করার পূর্বে কোনো না কোনো পয়গাম অবশ্যই পাঠাবেন। এর পূর্বে তিনি যুদ্ধ করতে পারেন না। এটাই সুলতান মাহমুদ সম্পর্কে হিন্দুদের ধারণা ও বিশ্বাস। তাই সবাই সুলতানের দূতের অপেক্ষায় প্রহর গুণছে।

পাঁচিলের উপর থেকে রাজপুতরা যখন দেখলো, মুজাহিদ বাহিনীর দিক থেকে এক অশ্বারোহী অত্যন্ত ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে, সাথে সাথে তারা বিষয়টি সমরনায়কদের জানালো। সমর নায়করা এসে পাঁচিলের উপর থেকে অশ্বারোহীকে দেখতে লাগলো।

হারুন তার অশ্ব নিয়ে কেল্লার উত্তর দিককার ফটকের সামনে এসে দাঁড়ালো। তারপর উচ্চস্বরে বললো, আমি দূত। শাহী পয়গাম নিয়ে এসেছি। ফটক খুলে দাও।

সমবেত সমরনায়করা হারুনের কথা শুনে সাথে সাথে মহারাজাকে সংবাদ জানালো। ঘটনাক্রমে তখন সেখানে ধর্মপাল উপবিষ্ট ছিলেন। মহারাজা ধর্মপালকে বললেন, আপনি কি পাঁচিলের ফটকের নিকট গিয়ে দূতকে স্বাগত জানানোর কষ্টটুকু স্বীকার করবেন?

ঃ হ্যাঁ, আমি প্রস্তুত।

ঃ তাহলে যান। আমি আপনাকে এ কারণে পাঠাচ্ছি যে, আপনি ঐ ম্লেচ্ছ মুসলমানদের ভাষা বোঝেন আর মানুষের মনের গোপন কথা উদ্ধারেও আপনি পারদর্শী। আপনি দূত থেকে তথ্য উদ্ধার করতে চেষ্টা করবেন যে, মুসলমান যোদ্ধাদের সংখ্যা কতো।

ঃ মহারাজা, মুসলমানরা অত্যন্ত বিচক্ষণ, চৌকস ও দূরদর্শী। তাদের থেকে কোনো গোপন বিষয় উদ্ধার করা কঠিন। তারপরও আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করবো।

ঃ হ্যাঁ, চেষ্টা করবেন। আমার ধারণা, একমাত্র আপনিই তার থেকে কিছু জানতে পারবেন।

ধর্মপাল রাজপ্রাসাদ থেকে বেরিয়ে সোজা ফটকের দিকে রওনা হলেন। ফটকে পৌঁছে প্রহরীদের ফটকের ছোট দরজাটি খোলার নির্দেশ দিলেন। সাথে সাথে ফটক খোলা হলো। ধর্মপাল বাইরে বেরিয়ে গেলেন। হারুনকে দেখেই তার চেহারা উল্লাসে চক চক করে ওঠলো। খানিক অগ্রসর হয়ে বললেন, আহ্ হারুন তুমি এসেছো!

হারুন তাকে সালাম দিয়ে বিনীত কণ্ঠে বললো, হ্যাঁ, আমিই এসেছি।

হারুন ঘোড়া থেকে নেমে ধর্মপালের নিকট এগিয়ে আসলো। তারপর দ্রুত একটি চিঠি বের করে ধর্মপালকে দিয়ে বললো, সুলতান এ চিঠিটা আপনাকে দিতে বলেছেন।

ঃ আস্তে বলো।

ধর্মপাল চিঠিটা হাতে নিয়ে দ্রুত লুকিয়ে ফেললেন। তারপর বললেন, এর উত্তর কি দ্রুত দিতে হবে?

ঃ হ্যাঁ, যদি আপনার কোনো অসুবিধা না হয়।

ঃ তাহলে তো তোমাকে কিছু সময় অপেক্ষা করতে হবে।

ঃ আমি অপেক্ষা করবো।

ঃ কিন্তু সুলতান তোমাকে কেনো দূত বানিয়ে পাঠালেন?

ঃ এর কারণ তিনিই ভালো জানেন। হতে পারে, আমি সোমনাথবাসীর ভাষা বুঝি।

ঃ কিন্তু এখানে তো তোমার সমূহ বিপদের আশংকা রয়েছে।

ঃ আল্লাহ সাহায্য করবেন। আমি বিপদকে পরোয়া করি না।

ঃ শাবাশ, আল্লাহ তোমাকে হিম্মত দিন। শোনো, মহারাজা কিন্তু সুলতানের বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা জানতে প্রবল আগ্রহী।

ঃ আমি তা জানি না।

ঃ এই উত্তরই ভালো হবে।

হারুন ফটকে ঘোড়া বেঁধে ছোট দরজা দিয়ে কেল্লার ভেতর প্রবেশ করলো। দূত আসার সংবাদ বিদ্যুতের ন্যায় গোটা কেল্লায় ছড়িয়ে পড়লো। দূতকে দেখার জন্য প্রচুর মানুষ এসে সমবেত হয়েছে। তাদের ধারণা, হয়ত কোনো বিজ্ঞ বর্ষিয়ান ব্যক্তি এসেছেন, যিনি প্রজ্ঞার বলে যুদ্ধ ছাড়াই সমস্যার সমাধান করতে পারেন। কিন্তু হারুনকে দেখে সবাই বিস্মিত হলো। ভাবলো, এ তো পুঁচকে ছেলে। তার অভিজ্ঞতাই বা কী আছে। লোকটার এমন কী যোগ্যতা আছে যে, সুলতান তাকে দূত বানিয়ে পাঠালেন! কিছুই তো বুঝে আসছে না। কেউ কেউ মন্তব্য করলো, দেখবে সমস্যার কোনো সমাধান হবে না। পরিস্থিতি আরো জটিল আকার ধারণ করবে।

ধর্মপাল আর হারুন কথা বলতে বলতে শাহী প্রাসাদের পথ ধরে চলছেন। একটু যেতে না যেতেই কিছুটা শোরগোল শোনা গেলো। মনে হলো রাজকুমারী চন্দ্রামুখী মন্দির থেকে আসছে। হারুনের হৃদকম্প শুরু হয়ে যায়। উভয়ে রাস্তার পাশ দিয়ে হাঁটছেন।

অল্পক্ষণ পরই কয়েকজন অশ্বারোহী এলো এবং চলে গেলো। তারপই একটি রথ এলো। অত্যন্ত সুন্দর-সুসজ্জিত মনকাড়া রথ। কয়েকটি তাজী ঘোড়া রথটা টেনে নিয়ে আসছে। সূক্ষ্ম মিহি রেশমী পর্দায় রথের জানালাগুলো আবৃত। রথটি ধর্মপাল ও হারুনের একেবারে বরাবর এসেই দাঁড়িয়ে গেলো। রথ থেকে একটি মিষ্টি-মধুর সুরেলা কণ্ঠ ভেসে এলো, গুরুজী ধর্মপাল! আপনি এখানে?

ধর্মপাল আর হারুনের দৃষ্টি রথের উপর নিবদ্ধ হয়ে পড়লো। হারুন দেখলো, পূর্ণিমার সৌন্দর্য আর আলোকময়তা নিয়ে হাস্যোজ্জ্বল রাজকুমারী চন্দ্রামুখী তাকিয়ে আছে। হারুনের চেহারায়ও লালিমা ছড়িয়ে পড়লো। ধর্মপাল হারুনকে সাথে নিয়ে রথের নিকট এগিয়ে এসে বললো, শাহী দূত এসেছে, তাই ফটকে গিয়েছিলাম। তা তুমি কি মন্দির থেকে ফিরছো?

ঃ হ্যাঁ।

তার দৃষ্টি হারুনের ওপর পড়তেই তার চেহারার রং পাল্টে যায়। গোলাপী চেহারায় লালিমা ছড়িয়ে পড়ে। ডাগর চোখ দু'টি ক্ষণকালের জন্য নিষ্পলক হয়ে গেলো। চার চোখের মিলন ঘটলো। উভয়ে নিজ নিজ স্থানে স্থির হয়ে গেলো।

চন্দ্রামুখী আত্মসংবরণ করে উজ্জ্বল হাসির ঝিলিক ছড়িয়ে হারুনকে লক্ষ্য করে বললো, তাহলে আপনি এসেছেন... কিন্তু আফসোস, যুদ্ধ করার জন্য এসেছেন। হায়! যদি যুদ্ধের আগে আসতেন!

ঃ আমি সন্ধি ও শান্তির পয়গাম নিয়েই এসেছি।

ঃ তাহলে আপনার আগমন শুভ হোক।

ঃ আর এ কারণেও শুভ হোক যে, আশাতীতভাবে তোমার সাথে সাক্ষাৎ হয়ে গেলো।

চন্দ্রামুখী চেহারা ঝলমল করে ওঠলো। বললো, আমি আপনার অনুগ্রহের কথা কোনোদিন ভুলতে পারবো না।

ঃ আমার জীবনের এক কর্তব্য ও দায়িত্বকে এখনো তুমি ভুলোনি?

ঃ হায় যদি সন্ধি হতো!

ধর্মপাল বললেন, সে আশা করা যায় না।

চন্দ্রামুখী বললো, আমার বিশ্বাস, আপনি একটু চেষ্টা করলে এ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের দাবানল অল্পতেই নিভে যাবে।

ঃ সম্ভব নয়। যুদ্ধ-দেবতা নর বলি চান।

ঃ আপনি চেষ্টা তো করবেন।

ঃ চেষ্টা অবশ্যই করবো।

ঃ গুরুজ্বী, এবার যাবার অনুমতি দিন।

ঃ আচ্ছা যাও।

যাওয়ার প্রাক্কালে চন্দ্রামুখী কোমল আবেগময় দৃষ্টিতে হারুনের দিকে তাকায়। চোখের ভাষায় যেনো হারুনকে অনেক কিছু বলতে চায়। তারপর রথে উঠে বসে। রথ চলতে থাকে। হারুনের মনে হলো, যেনো হঠাৎ পূর্ণিমার চাঁদ মেঘে আচ্ছাদিত হয়ে গেছে আর গোটা কেল্লা অন্ধকারে ছেয়ে গেছে। চলন্ত রথের প্রতি হারুনের দৃষ্টি লেগে রইলো। ধর্মপালের সাথে সাথে সে মহারাজার সম্মুখে উপস্থিত হলো।

মহারাজা হারুনকে দেখে বিস্মিত হয়ে বললো, আরে, এ তো সেই তরুণ! আচ্ছা, তুমিই শেষে দূত হয়ে আসলে!

ধর্মপাল বললেন, হ্যাঁ, এ বয়সের যুবকরা চতুর, নির্ভীক ও দুঃসাহসী হয়ে থাকে।

মহারাজা বললেন, হ্যাঁ, এ কথা ঠিক।

হারুন একখানা পত্র বের করে মহারাজাকে দিলো। মহারাজা পত্রটি ধর্মপালকে দিয়ে বললেন, এর অনুবাদ করিয়ে আনুন। হারুন নীরবে বসে রইলো। অল্প কিছুক্ষণ পরই ধর্মপাল পত্রটির অনুবাদ করিয়ে এনে মহারাজার

হাতে দিলেন। মহারাজা পড়তে লাগলেন। যতোই সামনে অগ্রসর হচ্ছেন, ততোই তার চেহারা ক্রোধে লাল হয়ে যেতে লাগলো, চোখ দুটো জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো হয়ে গেলো।

পত্র পড়া শেষ হলে মহারাজা দাঁতে দাঁত পিষে বললেন, ম্লেচ্ছ সুলতান!... কিছুতেই এটা হতে পারে না।

ধর্মপাল বললেন, মহারাজ! সন্ধির শর্ত অত্যন্ত কঠিন। তবে রক্তপ্রবাহ বন্ধের একটিই উপায়।

মহারাজা ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন, রক্তের বন্যা বয়ে যাক তার কোনো তোয়াক্কা নেই। কিন্তু এ শর্ত কিছুতেই মেনে নেয়া যায় না। চন্দ্রামুখীকে কিছুতেই ঐ ম্লেচ্ছ সুলতানের হাতে তুলে দেয়া যায় না। একজন রাজপুত বেঁচে থাকতেও তা হতে পারে না। আপনি উত্তর লিখে দিন।

ধর্মপাল বললেন, মহরাজ! একটু... একটু ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করে দেখুন।

মহারাজা বললেন, আমি চিন্তা করেছি। প্রবঞ্চিত সুলতানকে দাঁতভাঙ্গা উত্তরই দিতে হবে।

ধর্মপাল উঠে চলে গেলেন এবং উত্তর লিখে নিয়ে মহারাজার সম্মুখে রাখলেন। মহরাজা পড়ে তাতে সীল-স্বাক্ষর করে বন্ধ করে তা হারুনকে দিয়ে দিলেন।

হারুন উঠে দাঁড়ায়। ধর্মপালও তার সাথে বের হয়ে যায়। উভয়ে কেল্লার বাইরে চলে আসে। ধর্মপাল দ্রুত একটি চিঠি বের করে হারুনের হাতে দিয়ে বললেন, এটা আমার পক্ষ থেকে সুলতানকে দেবে।

হারুন ধর্মপালকে সালাম জানালো। দুর্গের ফটক থেকে ঘোড়া খুলে নিয়ে তাতে সওয়ার হলো। তারপর উর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া হাঁকিয়ে চলে গেলো। ধর্মপালের দৃষ্টি হারুনের দিক থেকে ফিরে এলো না। দীর্ঘক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে রইলেন হারুন দৃষ্টির বাইরে চলে গেলে ধর্মপাল কেল্লায় ফিরে এলেন।

চব্বিশ

আসরের নামাযের পর হারুন সুলতানের তাঁবুতে প্রবেশ করলো। সালামের পর হারুন পত্র দু'টি সুলতানের সম্মুখে পেশ করলো। পত্র দু'টির ভাষা তুর্কী। তাই সুলতান নিজেই পড়তে শুরু করলেন। ধর্মপালের পত্র পড়ে সুলতান মিটি মিটি হাসলেন। তারপর মহারাজার পত্র পড়া শুরু করলেন। চিঠি পড়া শেষ হলে তার চেহারায় ক্রোধের সুস্পষ্ট ছাপ পরিলক্ষিত হলো। তিনি বলে ওঠলেন, কাফের, মূর্তিপূজক! সন্ধি চায় না, যুদ্ধ চায়! সৈন্য সংখ্যায় প্রবঞ্চিত, প্রতারিত! ঠিক আছে, তরবারীর জবাব তরবারী দিয়েই দেয়া হবে।

সুলতানকে ক্রোধান্বিত দেখে হারুন ভয় পেয়ে গেলো। সুলতান আওয়াজ দিতেই এক গোলাম ছুটে এলো। গোলাম সালাম দিয়ে একটু দূরে দাঁড়ালো। সুলতান বললেন, যাও এক্ষুনি আলতুনতাশ, আমীর আলী, হাজের আলী ও অন্যান্য সমরনায়কদের ডেকে আনো।

লোকটি মাথানত করে সালাম জানিয়ে চলে গেলো। সুলতান হারুনকে লক্ষ্য করে বললেন, হারুন! তুমি কি সোমনাথের বাহিনী দেখেছো? সংখ্যায় তারা কতো হতে পারে?

ঃ আলমপনা! আমি সঠিকভাবে তাদের সংখ্যা বলতে পারবো না। তবে আমি দেখেছি, কেল্লা, শহরের মধ্যবর্তী মাঠ ও মন্দিরগুলো সৈন্যে পরিপূর্ণ।

ঃ ধর্মপাল লিখেছে, রাজপুতদের সৈন্যসংখ্যা দেড় লাখের বেশি হয়ে গেছে। কেল্লা, শহর, মন্দির ও মাঠ পরিপূর্ণ হয়ে গেছে।

ঃ আসল কথা হলো, কাকের ন্যায় ভীতু একদল রাজপুত সমবেত হয়েছে।

ঃ সমবেত হতে দাও। আমরা সৈন্যসংখ্যার উপর নির্ভর করে আসিনি– আল্লাহর সাহায্যের ভরসা করে এসেছি। আল্লাহ অবশ্যই আমাদের সাহায্য করবেন।

ঃ আল্লাহর সাহায্য অন্যান্যবারের মতো এবারো আপনার সঙ্গী হবে। ইনশাআল্লাহ আমরা জয়ী হবে।

ঃ ইনশাআল্লাহ। মাগরিবের নামাযের সময় হয়ে গেছে। নামায পড়ে তুমি এখানে চলে আসবে।

হারুন তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেলো। সূর্য পশ্চিমাকাশে হাল্কা লালিমা বিতরণ করতে করতে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

এক বিরাট বিস্তৃত ময়দানে মুজাহিদরা একত্রিত হচ্ছে। নদীর তীরে এ ময়দানটি। সরীসৃপের মতো এঁকেবেঁকে নদীটি আরব সাগরে গিয়ে পতিত হয়েছে। মুজাহিদরা এ নদীর তীরে ভিড় করে অযু করছে। একজন অযু করছে, অন্যজন তার পেছনে দাঁড়িয়ে জামার হাতা গুটাচ্ছে। সবাই নীরবে অযু করছে। যার অযু শেষ হচ্ছে, সে বিস্তৃত ময়দানে গিয়ে সারিবদ্ধ হয়ে বসছে। হারুন অযু করে ময়দানের এক ঘাস-আচ্ছাদিত স্থানে বসে পড়লো। হাজার হাজার মুজাহিদ সারিবদ্ধ হয়ে বসে আছে।

সূর্য অস্তমিত হয়ে গেলো। পাঁচজন একসঙ্গে উচ্চকণ্ঠে আযান দেয়া শুরু করলো। 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার' রবে চারদিক গুঞ্জরিত-মুখরিত হয়ে ওঠলো। মুজাহিদরা নতশিরে আযানের ধ্বনি শুনতে ও তার উত্তর দিতে লাগলো।

আযান চলাকালে সুলতান তার তাঁবু থেকে বেরিয়ে বীরদর্পে এগিয়ে

এলেন। আযান শেষ হলে সবাই দু'আ পাঠ করে নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে গেলো। কাযী আসাকির ইমামের মুসল্লায় গিয়ে দাঁড়ালেন। মুজাহিদরা সারিবদ্ধ দাঁড়িয়ে গেলো।

নামায শুরু হয়ে গেলো। তাওহীদে বিশ্বাসী হাজার হাজার মুসলমান হাত বেঁধে সোজা হয়ে সেজদার স্থানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে। রুকুতে গেলে দাসত্বের এক চমৎকার দৃশ্য পরিলক্ষিত হলো। রুকু থেকে উঠে যখন সবাই সিজদায় গেলো, তখন আল্লাহর বড়ত্ব আর মানুষের তুচ্ছতা বিকশিত হলো। ফরয নামায শেষ হলে সবাই সুন্নত ও নফল নামায পড়তে শুরু করলো।

নামাযের পর সুলতান নিজ তাঁবুতে গিয়ে পৌছলেন। তাঁবু প্রদীপের আলোয় আলোকময়। তখন শীতের মৌসুম এসে গেছে। তাই সুলতান শীতের পোশাক পরে নিলেন। হারুন এসে একপাশে বসে পড়লো। অল্প কিছুক্ষণ পরই সকল সমরনায়কও এসে পৌছলো।

সুলতান বললেন, আমার জানবাজ বাহাদুর সালাররা! আমি সন্ধির চেষ্টা করেছি। কিন্তু অহংকারী মহারাজা তা প্রত্যাখ্যান করেছে। আমি চেয়েছিলাম যেনো রক্তক্ষয় না হয়। কিন্তু রাজপুতরা তাদের সৈন্যের আধিক্যে প্রবঞ্চিত। তারা ভুলে গেছে, আমি ইতিপূর্বে পনেরবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছি এবং তাদের চেয়েও ক্ষমতাদর্পী, অহংকারী ও শক্তিশালীদের পরাভূত করেছি। আমার মনে হচ্ছে, যুদ্ধের জন্য বেশিদিন অপেক্ষা করা ঠিক হবে না। আপনাদের মতামত বলুন।

আলতুনতাশ বললেন, আমি আমার অশ্বারোহী যোদ্ধাদের মতামত যাচাই করেছি। তারা সন্ধির কথা শুনে নিরাশ হয়ে পড়েছে। একজন যোদ্ধাও এমন পাওয়া যাবে না, যে যুদ্ধের আগ্রহ রাখে না।

আমীর আলী বললেন, আমার যোদ্ধাদেরও একই অবস্থা। তারা জিহাদ করতে অস্থির-বেচাইন। তারা শাহাদাতের লক্ষ্যেই সুদূর এই সোমনাথে এসেছে। তারা যুদ্ধ করতে উদগ্রীব।

সুলতান বললেন, কিন্তু আক্রমণের পদ্ধতি কেরূপ হবে?

আলতুনতাশ বললেন, আমাদের প্রথমে অগ্রসর হয়ে যুদ্ধ শুরু করতে হবে। রাজপুতদের সংখ্যা যদি তেমনই হয়, যেমন শোনা যাচ্ছে, তাহলে...

সুলতান আর সামনে অগ্রসর হতে না দিয়ে বললেন, রাজপুতদের সংখ্যা তো প্রায় দেড় লাখ।

আলতুনতাশ বললেন, তাদের সংখ্যাধিক্যে আমরা কোনো পরোয়া করি না। আমরা ভেড়ার ন্যায় তাদের তাড়িয়ে নিয়ে যাবো। ইনশাআল্লাহ আমাদের এক একজন যোদ্ধা দশ দশজন রাজপুতকে শায়েস্তা করার জন্য যথেষ্ট।

আমীর আলী বললেন, সৈন্য সংখ্যার এমন ব্যবধান সত্ত্বেও আমরা ইতিপূর্বে আরো বহুবার যুদ্ধ করে জয়ী হয়েছি।

আলতুনতাশ বললেন, আমি বলছিলাম, যেহেতু তাদের সংখ্যা দেড় লাখ, তাই হতে পারে তারা উত্তেজনায় উদ্বেলিত হয়ে সংখ্যাধিক্যের অহংকারে কেল্লার বাইরে চলে আসবে।

আমীর আলী বললেন, এ অসম্ভব মনে হয়। রাজপুতরা যতোই হম্বিতম্বি করুক না কেনো, বীরত্বের ময়দানে তারা ভেড়া। সুতরাং কেল্লার বাইরে তারা কিছুতেই আসবে না।

আলতুনতাশ বললেন, হয়তো এ কথা ঠিক। তবে আমি শুনেছি, কিছু কিছু রাজপুত গেরুয়া রঙের পোশাক পরে এসেছে। এরা নাকি জীবনের চেয়ে মরণকেই বেশি ভালোবাসে। যদি একথা সত্য হয়, তাহলে এই গেরুয়া রঙের পোশাক পরিহিত রাজপুতরাই কেল্লা থেকে বাইরে চলে আসবে।

সুলতান বললেন, হ্যাঁ, এটা হতে পারে। তবে ধরে নাও, তারা কেল্লার বাইরে আসলো না, তাহলে কী করতে হবে?

আলতুনতাশ বললেন, তাহলে আমাদের ঐ বাহিনীর উপর আক্রমণ করতে হবে, যারা কেল্লা ও শহরের মাঝে খোলা প্রান্তরে অবস্থান করছে।

হারুন বললো, আপনি মনে হয় ঐ সৈন্যদের কথা ভুলে গেছেন, যারা সমুদ্রের তীরে নৌ-যান প্রহরায় নিয়োজিত আছে।

আলতুনতাশ বললেন, আমার দৃষ্টিতে চারদিকেই রাজপুতরা ছড়িয়ে আছে। তাদের কাউকেই আমি বাদ দিতে পারছি না। যদি মহামান্য সুলতান পছন্দ করেন, তাহলে আমার পরামর্শ হলো, আমি ও ভাই আমীর আলী কেল্লা আক্রমণ করবো। সুলতান বাহিনী আমাদের পেছনে সশস্ত্র অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকবে। তারা প্রয়োজন ছাড়া যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে না। আর হাজের আলী তার অধীন মুজাহিদদের নিয়ে আম্রবেষ্টনীর পথে সশস্ত্র অবস্থায় প্রস্তুত হয়ে থাকবে, যেনো সেদিক থেকে হঠাৎ কোনো আক্রমণের মুখোমুখি হতে না হয়।

হাজের আলী বললেন, এদিক থেকে তো আক্রমণের কোনো সম্ভাবনা দেখছি না। তাহলে এদিকে থাকার কী ফায়দা থাকতে পারে?

আলতুনতাশ বললেন, হ্যাঁ এ সময় এদিকে কোনো দুশমন নেই। তবে রাজপুতদের আগমন এখনো শেষ হয়নি। তারা সাগরের তীরে তীরে এগিয়ে কেল্লা বা শহরে গিয়ে পৌঁছছে। জঙ্গলের কারণে আমরা তাদের দেখতে পাচ্ছি না। হতে পারে আমরা যখন যুদ্ধে লিপ্ত হবো, তখন তারা এদিক থেকে হঠাৎ আক্রমণ করে বসবে।

সুলতান বললেন, আমারো তা-ই মনে হচ্ছে। সকল পথেই প্রহরী নিযুক্ত করা

দরকার। তাহলে হাজের আলী এদিকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে প্রহরা দেবে। চেষ্টা করবে, যেনো এদিক দিয়ে কোনোমতে রাজপুতরা যাতায়াত করতে না পারে।

হাজের আলী বললেন, আমি তা জানতাম না, আমি এখনই তার ব্যবস্থা নেবো।

আলতুনতাশ বললেন, এখন সমুদ্রের দিকের সৈন্যদের বিষয়টি বাকি আছে। আমার মতে, হারুন ও বুরহান এদিক দিয়ে দুশমনদের অগ্রযাত্রা প্রতিহত করবে।

হারুন বললো, আমি এর সাথে আরেকটু যোগ করতে চাই। আমরা দুশমনদের অগ্রসর হয়ে আক্রমণের প্রত্যাশা করবো না, বরং আমরাই অগ্রসর হয়ে তাদের উপর আক্রমণ করবো।

আলতুনতাশ বললেন, আমি এটা ভালো মনে করি না।

সুলতান বললেন, কিন্তু আমার ধারণায় এটা ভালো। শুধু ভালোই নয়, এর অনেক প্রয়োজনও আছে। এর দ্বারা রাজপুতদের মাঝে আমাদের একটা প্রভাব পড়বে।

আলতুনতাশ বললেন, কিন্তু আমার ধারণা, যদি সেদিকে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়, তাহলে হারুনকে বিপদের মোকাবেলা করতে হবে।

হারুন বললো, আমার ধারণা, আমরা এভাবে আক্রমণ করলে রাজপুতদের মাঝে ভীতি ও আতংক ছড়িয়ে পড়বে।

সুলতান বললেন, আমারও তা-ই মনে হচ্ছে। যদি হারুন বন্দর দখল করে নেয়, তাহলে সমুদ্রের দিক থেকে আর আক্রমণের আশংকা থাকবে না।

হারুন বললো, ইনশাআল্লাহ। সুলতানের তামান্নাই পূরণ হবে।

সুলতান বললেন, ব্যস, আর কোনো কথা নেই। এবার আক্রমণ করতে হবে। ভয়াবহ আক্রমণ। অবিশ্বাস্য আক্রমণ।

আলতুনতাশ বললেন, এটাই সবার তামান্না। আমি এখনই শিবিরে শিবিরে ঘোষণা করে দিচ্ছি। মুজাহিদরা আক্রমণের কথা শুনে দারুণ আনন্দিত হবে।

সুলতান বললেন, ফজরের নামাযের পর সবাই অত্যন্ত বিনয়-নম্র হয়ে আল্লাহর নিকট বিজয় প্রার্থনা করবে। তারপরই আক্রমণ শুরু হবে।

আলতুনতাশ বললেন, সুলতানের হুকুম শিরোধার্য।

পরামর্শ সভা শেষ হয়ে গেলে সবাই নিজ নিজ আসন ত্যাগ করে চলে গেলো। সুলতান আবার অযু করে নামায পড়তে শুরু করলেন।

পঁচিশ

এশার নামাজের জন্য মুজাহিদরা বিশাল চত্বরে একত্রিত হলো। নামাজের পর কয়েকজন লোক এদিক-সেদিক দাঁড়িয়ে গেলো। উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত হলো, 'আগামীকাল আক্রমণ করা হবে। সবাইকে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে।' সাথে সাথে বিশাল চত্বর জুড়ে মৃদু গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ে। সবার চেহারা আনন্দে

চকচক করে ওঠে। ওষ্ঠকোণে নির্মল হৃদয়ের আকিঞ্চন ফুটে ওঠে।

তাঁবুতে ফিরে এসে সবাই জিহাদের প্রস্তুতিতে আত্মমগ্ন হয়ে গেলো। কেউ তরবারীতে ধার দিচ্ছে। কেউ তীর-ধনুক ঠিক করছে। কেউ বর্শার ফলাকে আরো শাণিত করছে। তারপরই শুরু হলো শুভেচ্ছা বিনিময়ের পালা। প্রিয়জন, পরিচিতজন, শুভাকাঙ্ক্ষী-শুভানুধ্যায়ীদের তাঁবুতে গিয়ে একে অপরকে শুভেচ্ছা ও মুবারকবাদ জানাতে লাগলো, যেনো মুজাহিদদের তাঁবুতে তাঁবুতে ঈদের দিনের প্রভাতে ঈদগাহে সমবেত হওয়ার প্রাক্কালে কিশোর-বালকদের আনন্দ-উল্লাস আর স্ফূর্তির প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠেছে।

পূর্ণিমার রাত। আকাশে চাঁদের নিটোল হাসি। রূপালী আলোর গুঁড়ো চুম্বকীয় আবেশে পৃথিবীর দিকে ছুটে আসছে। হাসছে গোটা দুনিয়া। জ্যোৎস্নার আলোকে সাদা-সফেদ পোশাকের মুজাহিদদের ফেরেশ্তার মতো মনে হচ্ছে। তারা এক তাঁবু থেকে আরেক তাঁবুতে যাতায়াত করছে। দেখা সাক্ষাৎ করছে। শুভেচ্ছা বিনিময় করছে। আল্লাহর রাহে জীবন উৎসর্গ করার প্রাক্কালে চির বিদায় নিচ্ছে।

নিঝুম রাতের স্তব্ধতা ভেঙে ফজরের আযানধ্বনি ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে তারা ঘুম থেকে লাফিয়ে ওঠলো। প্রাকৃতিক প্রয়োজন সেরে নামাযের জন্য বিশাল চত্বরে সমবেত হলো। চোখে-মুখে প্রফুল্লতা। আল্লাহর সাহায্যের প্রত্যাশায় হৃদয় প্রশান্ত, চিন্তামুক্ত। নামাজের পর সবাই অত্যন্ত খুশু-খুজু আর বিগলিত হৃদয়ে দু'হাত তুলে আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করলো। বিজয়ের প্রার্থনা করলো। তারপর দেরি না করে সবাই তাঁবুতে ফিরে গেলো। অস্ত্রসজ্জিত হয়ে রণক্ষেত্রে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেলো। প্রত্যেক মুজাহিদ নিজ নিজ সালারের অধীনে সারিবদ্ধ হয়ে জিহাদের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলো।

সালার হাজের আলী আমব্রেলীর সমস্ত পথ বন্ধ করে দিলেন। আলতুনতাশ ও আমীর আলী পাঁচ হাজার করে দশ হাজার মুজাহিদ নিয়ে সোমনাথ কেল্লার দিকে অগ্রসর হলেন। সুলতান তাঁর বাহিনী নিয়ে রণচত্বরের মাঝে স্থির দাঁড়িয়ে রইলেন। হারুন ও বুরহান তাদের অনুগত মুজাহিদদের নিয়ে সমুদ্র উপকূলে বন্দরের দিকে রওনা হলো। এভাবে মুজাহিদ বাহিনী রণাঙ্গনের চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। বিশাল চত্বর জুড়ে শুধু মুজাহিদ আর মুজাহিদ। অসংখ্য অগণিত মুজাহিদ।

কেল্লার পাঁচিলে যে রাজপুতরা দাঁড়িয়ে ছিলো, মুজাহিদ বাহিনীর রণপ্রস্তুতি দেখে তারা তারস্বরে চিৎকার শুরু করলো– 'মুসলমানরা আক্রমণ করতে আসছে, মুসলমানরা আক্রমণ করতে আসছে।' তাদের চিৎকার ও শোর-হাঙ্গামা শুনে অন্যান্য রাজপুতরা দৌড়ে কেল্লার পাঁচিলের নিকট এসে দাঁড়ালো। মহারাজাসহ অন্যান্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরাও বুরুজের উপর উঠে দাঁড়ালেন। দেখলেন, বাঁধভাঙা জোয়ারের ন্যায় মুজাহিদরা ধেয়ে আসছে।

মুজাহিদরা কেল্লার একেবারে নিকটে এসে পৌঁছলে রাজপুতরা চিৎকার করে বলতে লাগলো, হে ম্লেচ্ছ মুসলমানরা! তোমরা আমাদের পশমও ছিঁড়তে পারবে না। তোমাদের প্রবঞ্চিত সুলতান আমাদের কিছুই করতে পারবে না। সোমনাথ মহাপ্রতিমা আমাদের রক্ষার জন্য যথেষ্ট। কেল্লায় আক্রমণ করলেই সোমনাথ মহাপ্রতিমা তোমাদের জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ভষ্ম করে দেবেন। প্রাণের মায়া থাকলে ফিরে যাও।

মুজাহিদরা তাদের কথা বুঝলো না। তবে তাদের বর্ণনাভঙ্গী ও ইশারা-ইঙ্গিতে বুঝলো, তারা গালমন্দ করছে। অশ্লীল কথাবার্তা বলছে। তারা এসবের কোনো তোয়াক্কা না করে কেল্লার আরো নিকটে চলে এলো। তখন রাজপুতরা প্রস্তর নিক্ষেপ শুরু করলো। বৃষ্টির ন্যায় প্রস্তর এসে মুজাহিদদের উপর পড়তে লাগলো। মুজাহিদরা বড় বড় ঢাল তুলে ধরলো। প্রস্তরগুলো ঢালে আঘাত খেয়ে খেয়ে ছিটকে পড়তে লাগলো। ঢালের আড়ালে থাকায় ঘোড়াগুলো বেঁচে গেলো।

রাজপুতরা চিৎকার করে উল্লাস করতে করতে মুজাহিদদের উপর প্রবলবেগে প্রস্তর নিক্ষেপ করতে লাগলো। প্রবল প্রস্তর বর্ষণের কারণে কিছু কিছু পাথর এসে মুজাহিদদের শরীরে ও ঘোড়ার গায়ে আঘাত করতে লাগলো। জখমী হয়ে রক্ত প্রবাহিত হতে লাগলো। থেতলে গিয়ে দারুণ যন্ত্রণা দিতে লাগলো। কিন্তু তারপরও মুজাহিদ বাহিনী দাঁড়িয়ে রইলো না। পশ্চাৎগমনও করলো না। ক্রমেই তারা সম্মুখে অগ্রসর হতে লাগলো।

রাজপুতরা মুজাহিদদের দুঃসাহসিকতা ও বীরত্ব দেখে হতবাক্-হতবুদ্ধি হয়ে গেলো। তাদের বিশ্বাস ছিলো, প্রবল প্রস্তরবর্ষণের মুখে মুসলমানরা কিছুতেই দাঁড়াতে পারবে না। কিন্তু মুসলমানদের কিছুতেই দমন করতে পারছে না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের হতবুদ্ধিতা ভীতির আকার ধারণ করলো। তাদের মনের পর্দায় বারবার উঁকি দিতে লাগলো, তবে কি মুসলমানরা কোনো অদৃশ্য সৃষ্টি, নাকি জিন! মনে কিন্তু তাদের যে চিন্তাই আনাগোনা হোক, প্রস্তর নিক্ষেপে তারা কোনোই ত্রুটি করলো না। বরং উত্তরোত্তর তারা আরো ব্যাপক আকারে প্রস্তর নিক্ষেপ শুরু করলো।

মুজাহিদরাও দমবার পাত্র নয়। তারা ঘোড়া নিয়ে ক্রমেই সামনে অগ্রসর হতে লাগলো। তারা একেবারে কেল্লার পাঁচিলের নিকটে পৌঁছে গেলে পেছনের সারির কয়েকজন মুজাহিদ প্রথম সারিতে চলে এলো এবং ঘোড়ার পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সজোরে অব্যর্থ তীর নিক্ষেপ শুরু করলো। তীরের আঘাতে বেশকিছু প্রস্তর ছিটকে এদিক-সেদিক চলে গেলো। কিছু তীর প্রস্তরের ফাঁক দিয়ে সোজা পাঁচিলের উপর চলে এলো এবং যেসব রাজপুত ঝুঁকে প্রস্তর নিক্ষেপ করছিলো,

তাদের মাথায়-বুকে বিদ্ধ হলো। বেশকিছু রাজপুত আর্তচিৎকার করে পাঁচিলের ভেতর লুটিয়ে পড়লো এবং ডাঙ্গায় তোলা মাছের মতো ছটফট করতে লাগলো। বুঝে উঠার আগেই আবার অনেকগুলো তীর শাঁ শাঁ করে পাঁচিলের দিকে ছুটে এলো। আবারো বেশকিছু হিন্দু যোদ্ধা ও রাজপুত আহত হয়ে পাঁচিলের ভেতর লুটিয়ে পড়লো। এভাবে মুজাহিদদের তীর একের পর এক পাঁচিলের দিকে আসতে লাগলো এবং হিন্দুদের ক্ষতি সাধন করতে লাগলো। শত শত লোক আহত হলো। অনেকে ঘটনাস্থলেই ছটফট করতে করতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো।

এ অবস্থা দেখে রাজপুতদের গায়ে আগুন ধরে গেলো। ক্রোধে চোখ রক্তের গোলক হয়ে গেলো। আহত নাগিনীর মতো ফোঁস ফোঁস করতে করতে পাঁচিল থেকে নীচে নামতে লাগলো। অফিসাররা দেখে বিস্মিত হয়ে বললো, আরে! একি! তোমরা কোথায় যাচ্ছো?

উত্তেজিত হিন্দুরা বললো, আমরা ময়দানে যাচ্ছি। সেখানেই মুসলমানদের সাথে বুঝাপড়া করবো। অফিসাররা বললো, বিমুগ্ধ পতঙ্গের ন্যায় আগুনে ঝাঁপ দিও না। তোমরা মুসলমানদের চেনো না। দুর্গের মাঝেই থাকো। দেখো, ঘটনাপ্রবাহ কোথায় দাঁড়ায়। প্রয়োজনে আমরাই ময়দানে নেমে আক্রমণের নির্দেশ দেবো।

তারা আর সম্মুখে অগ্রসর হলো না। আবার পাঁচিলে ফিরে এলো ও পূর্ণ আগ্রহ-উদ্দীপনার সাথে প্রস্তরবর্ষণ শুরু করলো।

রাজপুতরা এবার মুজাহিদদের তীরকে দারুণ ভয় পেতে লাগলো। কারণ, যে-ই প্রস্তর নিক্ষেপের জন্য পাঁচিল থেকে উঁকি দিচ্ছে, মুহূর্তে তার দিকে ছুটে আসছে মুজাহিদদের তীর। অব্যর্থ তীর। কপালে বা মাথায় বিদ্ধ হচ্ছে আর লুটিয়ে পড়ছে পাঁচিলের মাঝে। আহতরা তারস্বরে আর্তচিৎকার করছে।

সামনের সারির যেসব মুজাহিদ আহত ও জখমী হয়েছিলো, তাদের পশ্চাতে পাঠিয়ে দেয়া হলো। এগিয়ে এলো নতুন মুজাহিদ। আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা হলো। মুজাহিদদের তীরের কারণে হিন্দুদের প্রস্তরবর্ষণের মাত্রা কমে এলো। মুজাহিদরা এবার অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পাঁচিলে তীর নিক্ষেপ করতে করতে সামনে এগিয়ে যেতে লাগলো।

পর্যায়ক্রমে মুসলমানদের অগ্রসরতা দেখে হিন্দুরা দারুণ ভয় পেয়ে গেলো। ভাবলো, যদি তারা পাঁচিলের গোড়ায় পৌছতে পারে, তাহলে আর তাদের রোধ করা যাবে না। তাই তারা প্রস্তর বর্ষণ ত্যাগ করে দোধারী খড়গ নিক্ষেপ শুরু করলো। হিন্দুদের চোরাগোপ্তা খগড় আক্রমণ অব্যর্থ হয়। খগড় যার উপর গিয়েই নিপতিত হলো, তাকে জখম করে ছাড়ে। আঘাতে শরীর কেটে রক্তের

ধারা শুরু হয়ে যায়। মানুষ ও ঘোড়ার যে অঙ্গেই আঘাত করে, তা কেটে যায়। ফলে বহু ঘোড়া ও অসংখ্য মুজাহিদ আক্রান্ত হয়ে পড়ে।

রাজপুতরা মুজাহিদদের এ অবস্থা দেখে আনন্দ-উল্লাসে ধ্বনি দিতে থাকে এবং অত্যন্ত ক্ষীপ্রতার সাথে খগড় নিক্ষেপ করতে থাকে। মুজাহিদরাও তীব্রভাবে তীর নিক্ষেপ শুরু করে। মুজাহিদদের তীরের ভয়ে তারা পাঁচিল থেকে মাথা তোলারও সাহস হারিয়ে ফেলে। তারা পাঁচিলের আড়ালেই লুকিয়ে রইলো।

এবার মুজাহিদরা দ্রুত ঘোড়া হাঁকিয়ে একেবারে পাঁচিলের নীচে চলে এলো। এ অবস্থা দেখে রাজপুতরা জোরেশোরে চিৎকার শুরু করলো। মুজাহিদরা মনে করলো, হয়তো হিন্দুদের সমর্থনে কোনো সৈন্য সাহায্য এসে গেছে, তাই তারা এদিক-সেদিক তাকাচ্ছে।

ছাব্বিশ.

আলতুনতাশ ও আমীর আলী যখন কেল্লায় আক্রমণের জন্য অগ্রসর হচ্ছিলো, ঠিক তখন হারুন ও বুরহান বন্দরে আক্রমণ করার জন্য অগ্রসর হচ্ছিলো। তাদের সাথে মাত্র পাঁচ হাজার জানবাজ মুজাহিদ। এদিকে বন্দর ও তার জাহাজগুলোর হেফাজতের জন্য বিশ হাজার হিন্দুযোদ্ধা সেখানে মোতায়েন ছিলো।

হিন্দু যোদ্ধারা মুজাহিদ বাহিনীকে অগ্রসর হতে দেখে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে যায়। হিন্দুরা দশটি সারিতে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়। প্রত্যেক সারিতে দু'হাজার করে যোদ্ধা। হারুন তার অধীন মুজাহিদদেরকে পাঁচটি সারিতে দাঁড় করালো। প্রত্যেক সারিতে এক হাজার করে মুজাহিদ। কিন্তু সে তার বাহিনীকে এমনভাবে সাজালো যে, হিন্দুরা এক হাজার সারির মুজাহিদদের দ্বিগুণ মনে করতে লাগলো।

রাজপুতরা তাদের যোদ্ধাদের সংখ্যা দেখে বিমুগ্ধ হলো। তাদের সাহস তুঙ্গে উঠে গেলো। তারা নির্ভয়ে বীর বিক্রমে হারুনের দিকে অগ্রসর হতে লাগলো।

হারুন তার ঘোড়া নিয়ে অধীন সকল মুজাহিদদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে ছুটে এলো। দেখলো, প্রত্যেক মুজাহিদ যেনো ক্ষুধার্ত শার্দূল। সম্পূর্ণ প্রস্তুত। সালারের নির্দেশের অপেক্ষায় অধীর। হারুন ঘোড়া নিয়ে এসে একেবারে সারির মাঝে দাঁড়ালো। তার কণ্ঠ এবার দরাজ, বজ্রনির্ঘোষ। বললো– 'ইসলামের সিংহ পুরুষরা! দুশমন তোমাদের সংখ্যায় অল্প দেখে বিমুগ্ধ ও আনন্দিত। তারা দৃঢ় পদবিক্ষেপে এগিয়ে আসছে। সত্যই তোমরা তাদের তুলনায় সংখ্যায় একেবারেই নগণ্য। কিন্তু তোমরা আল্লাহর রাহের সৈনিক। জিহাদের স্পৃহা, মৃত্যুর আকিঞ্চন তোমাদের ঘর থেকে বের করে নিয়ে এসেছে।

আল্লাহ শহীদের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেন ও জান্নাতের সকল দরজা তার জন্য খুলে যায়। জান্নাতের হুররা তাকে স্বাগত জানাতে এগিয়ে আসে। সুতরাং ভাগ্যবান ব্যক্তিদের নসীবেই শাহাদাত লেখা হয়। আর যারা বিজয়ী হয় তাদের গাজী বলা হয়। তারাও জান্নাতের হকদার। সারকথা, জিহাদে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তির জন্য জান্নাত নিশ্চিত। আর মুসলমানরা বিশ্বাস করে, মৃত্যুর সময় ও স্থান অবধারিত। সে স্থান আর সে সময় না এলে কেউ মৃত্যুবরণ করবে না। তাই মুসলমান মৃত্যুকে ভয় করে না। ইহজীবনের অবসানের জন্য মৃত্যু অনিবার্য। তাই তাতে ভয়ের কিছুই নেই। নির্ভয়ে-নির্দ্বিধায় জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়াই মুসলমানদের বৈশিষ্ট্য।

ঐ দেখো, আল্লাহর দুশমন মুশরিকরা এগিয়ে আসছে। শাহাদাতের তামান্নায় তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ো। তাদের প্রথম সারির যোদ্ধাদের দ্বিতীয় সারির উপর নিক্ষেপ করো। তোমাদের তরবারীর ঐ শক্তি দেখাও, যা হিন্দুদের মাঝে জনশ্রুতি হয়ে আছে। চরম ধৈর্য ও পর্বতসম দৃঢ়তার সাথে এগিয়ে যাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।'

হারুন বক্তব্য শেষ করে 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি দিলো। সাথে সাথে সারিবদ্ধ মুজাহিদরা বজ্রকণ্ঠে আল্লাহু আকবার বলে ধ্বনি তুললো। আকাশ-বাতাস-প্রান্তর প্রকম্পিত হয়ে ওঠলো। কেঁপে ওঠলো অগ্রসরমান হিন্দু যোদ্ধাদের অন্তরাত্মা। তারপর মুজাহিদরা কোষমুক্ত তরবারী হাতে উঁচিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হতে লাগলো। সবার আগে হারুন অগ্রসর হচ্ছে। তার হাতে পত্ পত্ করে উড়ছে ইসলামী পতাকা।

মুজাহিদদের হাতে কোষমুক্ত তরবারী দেখে রাজপুতরাও তাদের তরবারী কোষমুক্ত করে অগ্রসর হতে লাগলো। সূর্যের আলোতে ঝলমল করছে তলোয়ার। এগিয়ে আসছে উভয় বাহিনী। মধ্যবর্তী ব্যবধান ক্রমেই সংকীর্ণ হয়ে আসছে। সে এক শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি।

উভয় বাহিনী একত্রিত হতেই তরবারীর আঘাতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের পর অগ্নিস্ফূলিঙ্গ দেখা গেলো। ঢালের মাধ্যমে একে অপরের আঘাত প্রতিহত করতে লাগলো।

রাজপুতরা আজ রক্তপিপাসু। অত্যন্ত হিংস্র ও আগ্রাসী। তারা প্রচণ্ড আক্রমণ করলো। মুজাহিদরা অত্যন্ত দৃঢ়তা ও সাহসিকতার সাথে ঢাল দ্বারা তাদের আঘাত প্রতিহত করলো। পরপরই পাল্টা আক্রমণ করলো।

রাজপুতরা সে আঘাত প্রতিহত করে আবার প্রাণপণে আঘাত করলো। রাজপুতরা মুজাহিদদের ব্যূহ ছিন্ন করতে চেষ্টা করলো। মুজাহিদরা তা বুঝতে পেরে সাথে সাথে সচকিত হয়ে ওঠলো এবং রাজপুতদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে

দিলো। রাজপুতরা মুজাহিদদের উপর আর মুজাহিদরা রাজপুতদের উপর ক্ষুধার্ত শার্দূলের ন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়লো। তলোয়ারে তলোয়ারে, বর্শায় বর্শায় যুদ্ধ শুরু হলো। রক্ত-রক্ত খেলায়, প্রাণ দেয়া-নেয়ার খেলায় মেতে ওঠলো উভয় বাহিনী।

মুজাহিদরা তাকবীর ধ্বনি দিয়ে প্রবলবেগে ঝাঁপিয়ে পড়লে রাজপুতরা তা প্রতিহত করে। আর রাজপুতরা প্রতিমার নাম নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লে মুজাহিদরা তা প্রবল শক্তিতে প্রতিহত করে। এদিকে-সেদিকে অনেকেই আহত হতে লাগলো। তরবারীর আঘাতে অনেকের হাত-পা বা অন্য অঙ্গ কেটে যাচ্ছে। আর্তচিৎকার করে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে লুটিয়ে পড়ছে। অনেকে তরবারীর অব্যর্থ আঘাতে ছিটকে পড়ছে ধূলির ধরায়। ছট ফট করতে করতে কয়েক মুহূর্তে প্রাণবায়ু ত্যাগ করে নিস্তেজ-চিরশান্ত হয়ে যাচ্ছে। ক্রমেই উত্তেজনা বাড়ছে। যুদ্ধের মাত্রা তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। উভয় বাহিনী একে অপরের ব্যূহ ভেদ করতে আপ্রাণ চেষ্টা করছে। কিন্তু কেউ পেরে ওঠছে না।

প্রথম সারির যোদ্ধারা আহত বা নিহত হলে দ্বিতীয় সারির যোদ্ধারা পূর্ণ উদ্যম নিয়ে এগিয়ে আসছে। আবার নতুনভাবে যুদ্ধ শুরু হচ্ছে। পশ্চাতের যোদ্ধারা বারবার ধ্বনি দিচ্ছে আর সম্মুখবর্তীদের উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করছে। বারবার রণাঙ্গন ধ্বনি-প্রতিধ্বনিতে প্রকম্পিত হয়ে ওঠতে লাগলো।

হারুন আজ নির্ভীক, দুর্বার, দুর্দমনীয়। যেনো মূর্তিমান ক্ষুধার্ত শার্দূল। তার তরবারী আজ রক্তপিপাসু হয়ে ওঠেছে। রাজপুতদের সংহারে বেপরোয়া হয়ে ওঠেছে। বাম হাতে ইসলামী পতাকা আর ডান হাতে তরবারী। একের পর এক রাজপুত্তের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে আর নিমিষে তাকে খতম করে আরেকজনের দিকে ছুটে যাচ্ছে। যাদের উপরই ঝাঁপিয়ে পড়ছে, তাদের দু'চারজনকে হত্যা করে অন্যদের ছত্রভঙ্গ করে তাড়িয়ে দিচ্ছে।

প্রথম সারির রাজপুতদের হত্যা করে দ্বিতীয় সারির এক রাজপুত অফিসারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাকে ধরাশায়ী করে তৃতীয় সারির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। একের পর এক রাজপতুকে হত্যা করে রক্তের নেশায় যেনো কেবল সামনের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে।

বুরহান দূর থেকে লক্ষ্য করলো। তার মনে একটি অশুভ-আশংকার মেঘ উঁকি মারে। ভাবলো, আরে! আর একটু সামনে অগ্রসর হলেই তো রাজপুতরা তাকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলবে! তখন তো...। সে আর দেরি করলো না। সাথে সাথে হারুনের দিকে ধাবিত হলো। কিন্তু রাজপুতরা তাকে বাধা দিলো। বুরহান প্রচণ্ড আক্রমণ করে রাজপুতদের হত্যা করতে করতে হারুনের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো। বুরহান বাহিনীর আগমনে সবাই তাকবীর ধ্বনি দিয়ে ওঠলো। সাথে সাথে তারা একযোগে বীর বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়লো রাজপুতদের

উপর। সে এক অভাবনীয় আক্রমণ। অসম অভিযান। মুজাহিদদের সম্মিলিত আক্রমণে সাথে সাথে বেশকিছু রাজপুত রক্তাক্ত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। তাদের আর্তচিৎকারে চারদিকে ত্রাস ছড়িয়ে পড়লো। রাজপুতরা প্রাণপণে মুজাহিদদের প্রতিহত করতে চাইলো। কিন্তু না! রাজপুতরা তাদের অগ্রযাত্রা প্রতিহত করতে পারলো না। মুজাহিদরা ভেঙে দিলো তাদের ব্যূহ। ছড়িয়ে দিলো বিশৃঙ্খলা। আর্তচিৎকার আর আহাজারিতে কেঁপে ওঠলো রাজপুতদের হৃদয়। লাশের পর লাশ ফেলে রাজপুতরা পালাতে লাগলো। মুজাহিদরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে ভেড়ার ন্যায় হত্যা করতে লাগলো। অনেক রাজপুত আত্মরক্ষার জন্য নৌকায় চড়তে গিয়ে পানিতে নিমজ্জিত হয়ে প্রাণ হারালো।

ঠিক তখন আরেকটি রব ওঠলো। মুজাহিদরা দৃষ্টি তুলে দেখলো, আমব্রেলীর দিক থেকে রাজপুতদের অপর এক বিশাল বাহিনী বীরদর্পে এগিয়ে আসছে।

সাতাশ.

আমব্রেলীর পথের সার্বিক প্রহরার দায়িত্ব ছিলো সালার হাজের আলীর উপর। তিনি দূর থেকেই লক্ষ্য করলেন, রাজপুতদের এক বিশাল বাহিনী আমব্রেলীর দিক থেকে এগিয়ে আসছে। সাথে সাথে তিনি এ সংবাদ সুলতানের নিকট পৌছান।

সুলতান তার বাহিনীর দু'হাজার দুর্ধর্ষ মুজাহিদকে তার সাহায্যে পাঠিয়ে দিলেন এবং সাত হাজার দুর্ধর্ষ দুর্বার মুজাহিদকে প্রস্তুত রেখে নিজে মাঝে অবস্থান করে যুদ্ধের সার্বিক অবস্থার প্রতি কড়া দৃষ্টি রাখতে শুরু করেন।

মুজাহিদরা তখন তিনদিকে যুদ্ধ করছে। একদল মুজাহিদ পূর্বদিকে কেল্লার উপর আক্রমণ করছে। আরেকদল দক্ষিণ দিকে সমুদ্র উপকূলে যুদ্ধ করছে আর উত্তরদিকে আমব্রেলীর পথে রয়েছে আরেক দল মুজাহিদ। পশ্চিমদিকে দিগন্ত বিস্তৃত সমুদ্র। তাই সেদিকে মুজাহিদ মোতায়েনের কোনো প্রয়োজন নেই।

অল্প কিছু জানবাজ মুজাহিদ প্রাণপণে তিনদিকে যুদ্ধ করে যাচ্ছে। আর সুলতান মাহমুদ গজনবী মধ্যে দাঁড়িয়ে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছেন। কোনো প্রকার সাহায্যের প্রয়োজন হলে সাথে সাথে তা পূরণ করছেন।

আলতুনতাশ তার বাহিনী নিয়ে একেবারে কেল্লার নিকটে পৌছে গেছেন। এখন তারা পাঁচিলে আরোহণের প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছে। হারুন আর বুরহান বলয়ে দাঁড়িয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় কখনো পলায়নপর যোদ্ধাদের দেখছে আবার কখনো আমব্রেলী থেকে অগ্রসরমান রাজপুতদের দেখছে।

দূরদর্শী সুলতান মাহমুদ গজনবী বুঝতে পেরেছিলেন, এ দু'দিকে অতিরিক্ত মুজাহিদ প্রেরণের প্রয়োজন দেখা যাচ্ছে না। তবে আমব্রেলীর দিক থেকে

রাজপুতদের বিশাল বাহিনী ধেয়ে আসছে। তাদের প্রতিহত করার জন্য সেদিকে অতিরিক্ত কিছু মুজাহিদ প্রেরণ করা দরকার। তাই কালবিলম্ব না করে সেদিকে দু'হাজার দুর্ধর্ষ মুজাহিদ পাঠিয়ে দিলেন।

আমব্রেলীর দিক থেকে শিকদেব এক বিশাল বাহিনী নিয়ে আসছে। তার পিতা পরমদেব সোমনাথ মহারাজাকে সাহায্য করার জন্য শিকদেব-এর নেতৃত্বে এ বাহিনী পাঠিয়েছে। এ বিশ হাজার যোদ্ধার দশ হাজার পরমদেব-এর প্রেরিত সৈন্য আর বাকি দশ হাজার ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত রাজপুত।

শিকদেও অত্যন্ত ভীতু ও ভীরু। যুদ্ধের নামে তার হৃদপিণ্ডে হাতুড়ি পেটা শুরু হয়ে যায়। কিন্তু সোমনাথের প্রেক্ষাপট ভিন্ন। এ যুদ্ধে রাজকুমারী চন্দ্রামুখীকে নিয়েই তার সকল চিন্তা। তার মাথায় সর্বক্ষণ এ চিন্তাই ঘুরপাক খাচ্ছে, হয়তো হারুন রাজকুমারী চন্দ্রামুখীকে তুলে নিয়ে যাবে। তার জীবন পাতা থেকে রাজকুমারীর সোনালী স্মৃতি চিরতরে হারিয়ে যাবে। এ ধরনের হাজারো দুশ্চিন্তা তাকে সোমনাথ যুদ্ধে অংশগ্রহণে বাধ্য করেছে। এই যুদ্ধে অংশগ্রহণে সোমনাথ প্রতিমা বা সোমনাথের মহারাজার রাজত্ব রক্ষার সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। রাজকুমারী চন্দ্রামুখীকে হেফাজত করার জন্যই সে এ যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য এগিয়ে এসেছে।

কিন্তু যখন সে তার অনুগত বাহিনী নিয়ে সালার হাজের আলীর বাহিনীর মুখোমুখি হলো, তখন তার দারুণ আক্ষেপ হতে লাগলো। হায়! কেনো এ পথে এলাম! ধারণা ছিলো, এ পথে কোনো মুজাহিদ বাহিনী থাকবে না। নির্বিবাদে আমি সোমনাথে পৌঁছতে পারবো। হায় যদি জানতাম, এদিকেও মুজাহিদ বাহিনী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে, তাহলে এদিক দিয়ে না এসে বনের ভেতর দিয়ে গমন করে সোজা সোমনাথ শহরে প্রবেশ করতাম।

কিন্তু এখন পড়েছি গ্যাড়াকলে। না সামনে অগ্রসর হতে পারছি, না পেছনে ফিরে যেতে পারছি। তাই শিকদেব বাধ্য হয়ে রাজপুতদের আক্রমণের জন্য উৎসাহিত করলো। মুসলমানদের উপর প্রাণপণে ঝাঁপিয়ে পড়তে অনুপ্রাণিত করলো।

মুজাহিদ বাহিনী সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ালো। তারা সশস্ত্র। একেবারে প্রস্তুত। ঠিক তখন অনুপ্রাণিত রাজপুতরা এসে আক্রমণ শুরু করলো। মুজাহিদ বাহিনী এতোক্ষণ সালারের হুকুমের অপেক্ষায় ছিলো। নির্দেশ পাওয়ামাত্র তারা ব্যাঘ্রের ন্যায় হুংকার দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো। শুরু হলো তলোয়ারে তলোয়ারে যুদ্ধ, বর্শায় বর্শায় যুদ্ধ। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। রাজপুতরাও দক্ষ যোদ্ধা। তারাও বীরবিক্রমে আক্রমণ করলো। উভয় পক্ষের অনেকেই আক্রান্ত হলো। অনেকেই নিহত হলো।

মুজাহিদরা তাদের কয়েকজন সঙ্গীর শাহাদাতবরণের করুণ দৃশ্য দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে তাকবীর ধ্বনি দিয়ে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে বীরবিক্রমে রাজপুতদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। তারা এককেজন যেনো একেকটি ক্ষুধার্ত শার্দূল। তরবারীর আঘাতে আঘাতে কচুকাটা করতে করতে সম্মুখে অগ্রসর হতে লাগলো। রক্তে রক্তে ভেসে গেলো সারা প্রান্তর। হাজার হাজার লাশ পড়ে রইলো রণাঙ্গন জুড়ে। আহতদের গোঙানি আর আর্তচিৎকারে ভারি হয়ে ওঠলো আকাশ-বাতাস। লড়াইরত রাজপুত আর মুজাহিদদের শরীর রক্তে রক্তে লাল হয়ে ওঠে।

রাজপুতরা প্রথমে মুজাহিদদের সংখ্যা একেবারে কম দেখে বীরবিক্রমে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো। তাদের ধারণা ছিলো, চোখের পলকে তারা এ মুষ্টিমেয় মুসলমানকে ধূলিকণায় সাথে মিশিয়ে দিয়ে সামনে অগ্রসর হবে। কিন্তু তাদের সে ধারণা অল্প সময় পরে পাল্টে যায়। হাড়ে হাড়ে টের পায় কাদের বিরুদ্ধে তারা অস্ত্র ধরেছে। প্রাণ নিয়ে বাঁচতে পারাই এখন ভাগ্যের ব্যাপার।

মুজাহিদরা রাজপুতদের ব্যূহ ভেদ করে তাদের মাঝে ঢুকে পড়লো এবং নির্মমভাবে একের পর এক হত্যা করতে লাগলো। রাজপুতদের কয়েকজন বীর যোদ্ধাও মুজাহিদদের ব্যূহ ভেদ করে মুজাহিদদের মাঝে ঢুকে পড়লো। পরক্ষণেই বীর মুজাহিদরা তাদের চতুর্দিক থেকে ঘিরে নিঃশেষ করে ফেললো। কেউ প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে পারলো না।

কিছুক্ষণ যুদ্ধ চলার পর মুজাহিদরা অনুভব করতে পারলো, যেসব বীর রাজপুত প্রথম মুজাহিদ বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণপণ লড়ছিলো, তারা সবাই নিহত হয়ে গেছে। তখন তাদের যুদ্ধের স্পৃহা বহুগুণে বেড়ে যায়। নাঙ্গা তরবারী নিয়ে তারা এবার নতুন উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়ে। অবশিষ্ট রাজপুত ও যোদ্ধারা মুজাহিদদের মরণপণ আক্রমণ প্রতিহত করতে চেষ্টা করে। কিন্তু পারলো না। প্রবল ঝড়-ঝঞ্ঝার ন্যায় মুজাহিদরা হিন্দু যোদ্ধাদের তাড়িয়ে নিয়ে চললো। একের পর এক লাশ ফেলে হিন্দু যোদ্ধারা পিছু হটতে লাগলো। চারদিকে রক্ত আর রক্ত। চাপ চাপ রক্ত। ক্ষতবিক্ষত লাশ আর লাশ।

শিকদেব দূরে এক উঁচু টিলার উপর কয়েকজন বিশ্বস্ত সঙ্গী নিয়ে এ ভয়াবহ যুদ্ধ দেখছিলো। যুদ্ধের অনুপ্রেরণা ও জযবা তার অন্তর ছুঁয়ে গেলেও পরক্ষণেই ভয়ভীতি তাকে গ্রাস করে নিয়েছে।

শিকদেব দূর থেকে সালার হাজের আলীর বীরত্ব ও দুঃসাহসিক আক্রমণ লক্ষ্য করছিলো। দেখছে, সে এক অসম শক্তি, বীরত্ব ও দুঃসাহসিকতা নিয়ে যুদ্ধ করছে। কেউ তার সামনে এসে মুহূর্তকাল দাঁড়াতে পারছে না। যে-ই তার

সামনে পড়ছে, অবলীলায় তাকে ধরাশায়ী করে আরেকজনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। সংঘবদ্ধ একেকটি দলের উপর ক্ষুধার্ত শার্দূলের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ছে আর নিমিষে কয়েকজনকে হত্যা করে অন্যদের তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ভয়ে কোনো রাজপুতই তার দিকে অগ্রসর হচ্ছে না। তাকে দেখেই তারা ছুটে পালাতে চাচ্ছে।

শিকদেব চিন্তা করলো, যদি এভাবে যুদ্ধ চলতে থাকে, তাহলে কয়েক ঘন্টার মধ্যেই রাজপুত ও অন্যান্য যোদ্ধারা নিঃশেষ হয়ে যাবে। তাই সে তার বাহিনীকে রণাঙ্গন ত্যাগ করে চলে আসার নির্দেশ দেয়। রাজপুতরা এমন একটি ইঙ্গিতের প্রত্যাশায় অপেক্ষমান ছিলো। ইঙ্গিত পাওয়ামাত্র তারা দ্রুত পশ্চাতে ফিরে আসতে লাগলো। মুজাহিদরা এবার তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে হত্যা করতে লাগলো। সালার হাজেব আলী অত্যন্ত দূরদর্শী, বিজ্ঞ যোদ্ধা।

তিনি মুজাহিদদের পশ্চাদ্ধাবন করতে নিষেধ করে দিলেন। অমনি মুজাহিদরা অশ্বের বাগ টেনে ধরলো। এ সুযোগে হিন্দু যোদ্ধারা বনের অভ্যন্তরে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

সূর্য উঠার পর থেকে যুদ্ধ শুরু হয়েছিলো। এখনো ভয়াবহ যুদ্ধ চলছে। ইতিমধ্যে সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়েছে। আসরের সময় হয়ে গেছে অনেক আগে। মুজাহিদরা আজ তিনদিকে যুদ্ধ করেছে। প্রত্যেক দিকেই তারা বীরবিক্রমে যুদ্ধ করে হিন্দুদের অন্তরে ত্রাস সৃষ্টি করতে সক্ষম করছে।

দিবসের আর অল্পক্ষণ বাকি আছে। এ সময়ে দুর্গের পাঁচিলে আরোহণ করা সম্ভব নয়। পুরোপুরিভাবে বন্দরেরও পতন সম্ভব নয়। তাই সবদিক ভেবেচিন্তে সুলতান মাহমুদ গজনবী আজকের মতো যুদ্ধ স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি তিনদিকে সংবাদ পাঠিয়ে দিলেন। সংবাদ পেয়ে মুজাহিদ বাহিনী তাকবীর ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে রণাঙ্গন থেকে ফিরে এলো।

আটাশ.

সোমনাথের মহারাজ রাজপ্রাসাদের অদূরে অবস্থিত এক উঁচু বুরুজে সারাদিন কাটিয়ে দিলেন। অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে যুদ্ধের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করলেন। সারাদিন তার পাশে ছিলেন গুরুজী ধর্মপাল ও কিছু প্রতাপশালী রাজা। তারা সবাই বিস্মিত হয়ে মুজাহিদদের বীরত্ব, সাহসিকতা ও দুর্বার দুর্দম আক্রমণ প্রত্যক্ষ করলেন। একদিনের যুদ্ধেই তারা চিন্তায় পড়ে গেলেন। ভাবতে লাগলেন, যদি যুদ্ধের পরিস্থিতি এমনই হয়, তবে আশ্চর্যের কিছু নয় যে মুসলমানরাই জয়ী হবে।

এখনো মুসলমানদের চেয়ে ছয়গুণ বেশি রাজপুত ও হিন্দুযোদ্ধা শহর, কেল্লা,

মন্দির ও খোলা মাঠে অবস্থান করছে। কিন্তু তাদের সাহস নেই যে, তারা একযোগে মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর চারদিকে আবছা অন্ধকার ছড়িয়ে পড়েছে। শিকদেব তখন বনের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে কল্লায় প্রবেশ করলো। তার আগমনের সংবাদ পেয়ে মহারাজা কিছুটা আনন্দিত হলেন। কিন্তু এ ক্ষীণ আনন্দও হাওয়ায় মিশে গেলো যখন শুনতে পেলো, আজকে যুদ্ধে প্রায় দশ হাজার রাজপুত নিহত হয়েছে।

এ সংবাদ শুনে মহারাজা একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর নির্দেশ দিলেন, সাবধান! কিছুতেই এ সংবাদ প্রকাশ করা যাবে না। তাহলে যুদ্ধপ্রত্যাশী রাজপুতরা সাহস হারিয়ে ফেলবে, আর সাধারণ হিন্দুদের মাঝে ভয়-ভীতি ছড়িয়ে পড়বে। উপরন্তু গোটা সোমনাথে ভীষণ বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে।

বিছানায় ছটফট করতে করতেই সারারাত শেষ হয়ে গেলো। দুধসাদা ধবধবে নরম বিছানার পরশেও মহারাজার চোখে ঘুম এলো না। অস্থিরতা-দুশ্চিন্তা তাকে অনুক্ষণ তাড়া করে ফিরছে।

পরদিন চারদিকে সূর্যের বিমল আলো ছড়িয়ে পড়তেই মহারাজা বুরুজে গিয়ে বসলেন। মহারাজা ও অন্যান্য রাজাদের ধারণা ছিলো, আজো মুসলমানরা আক্রমণ করবে। কিন্তু মুসলমানরা আজ আক্রমণ করলো না।

বন্দরে তখনো ছোট-বড় অনেক নৌযান নোঙর করে রাখা ছিলো। তার নিরাপত্তায় মহারাজা রাতেই দশ হাজার রাজপুতকে সেখানে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। শাহী প্রাসাদ থেকে সমুদ্রে যাওয়ার জন্য এক গুপ্ত দরজা ছিলো। শাহী প্রাসাদের লোকেরা ছাড়া আর কেউ তা জানতো না। সে গুপ্ত দরজা দিয়ে এ দশ হাজার রাজপুতকে বন্দরে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। আসলে সমুদ্রের দিকটিতে সৈন্য প্রেরণের আরেকটি কারণ হলো, এদিককার পাঁচিলগুলো তেমন মজবুত ও দুর্ভেদ্য নয়। তাই মুসলমানরা এদিকে পৌঁছতে পারলে সহজেই কেল্লার পাঁচিল ভেঙে ফেলতে পারবে। তাই মহারাজা এ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

আজ কেল্লার পাঁচিলের উপর প্রচুর প্রস্তরখণ্ড জমা করা হয়েছে। পাঁচিলের এখানে-সেখানে স্তূপ করা হয়েছে লৌহখণ্ড। কিন্তু আজ আর মুজাহিদ বাহিনী আক্রমণ করতে এগিয়ে আসেনি। রাজপুতদের মাঝে খবর ছড়িয়ে পড়েছে, আজ আর যুদ্ধ হবে না।

সকালেই চন্দ্রামুখী স্নান সেরে ঝলমলে শুভ্র পোশাকে সুসজ্জিত হয়েছে। দাসীরা তাকে অপরূপ সাজে সজ্জিত করেছে। সে এক সাক্ষাৎ অপ্সরীর রূপ ধারণ করে ফুল বাগানে নেমে এলো। প্রভাতের মৃদুমন্দ বায়ুতে ফুটন্ত ফুলসহ ফুলগাছগুলো দুলছে। চারদিক সৌরভে মোহিত। মাঝে মাঝে দূর থেকে পাখির সুমধুর কণ্ঠ ভেসে আসছে। এই যাদুময় পরিবেশে রাজকুমারী

চন্দ্রামুখীকে পরীর মতো মনে হচ্ছে। আশপাশে রয়েছে তার কয়েকজন রূপসী সখী ও দাসী। তারাও অপরূপ সাজে সজ্জিত।

রাজকুমারী চন্দ্রামুখী যখন সখী ও দাসীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে বাগানময় পায়চারি করছে আর মাঝে মাঝে খিলখিল করে ভুবন ভুলানো হাসিতে সবাইকে মাতিয়ে তুলছে, ঠিক তখন হঠাৎ গুরুজী ধর্মপাল পরিদৃশ্য হলেন। রাজকুমারী গুরুজী ধর্মপালকে দেখেই বিস্মিত হলো। তারপর সবাইকে পশ্চাতে রেখে গুরুজীর নিকট ছুটে এলো এবং তার পা ছুঁয়ে আশীর্বাদ প্রার্থনা করলো। গুরুজী বললেন, বেটী! ঈশ্বরের প্রণাম যে, তুমি এখনো আনন্দিত-বিমুগ্ধ। অথচ এখন সোমনাথের প্রতিটি মানুষ চিন্তিত-বিষণ্ন।

ঃ চিন্তিত হয়ে লাভ কি গুরুজী!

ঃ হ্যাঁ, তোমার কথাই ঠিক। তাতে বিন্দুমাত্র লাভ নেই। বরং তাতে পেরেশানী আরো বেড়ে যায়। শান্তি অন্তর্হিত হয়। তাই প্রত্যেক মানুষকেই আনন্দিত ও প্রফুল্ল থাকা উচিত। দুশ্চিন্তা, বিষণ্নতা মানুষকে মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছিয়ে দেয় আর আনন্দ-উল্লাস মানুষকে মৃত্যুর যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেয়।

ঃ মনে হয় আজ মুসলমানরা আর হামলা করবে না।

ঃ হ্যাঁ, আজ তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়নি। তবে তাদের হামলা না করাই চিন্তার বিষয়। ঈশ্বর জানেন তারা এখন কী চিন্তা করছে, কী তাদের মতলব!

ঃ গুরুজী! আপনি এতো ভাবছেন কেনো? তারা যে চিন্তাই করুক, যে কৌশলই অবলম্বন করুক, তারা আমাদের সাথে যুদ্ধে পারবে না। দেখুন না আমাদের সৈন্যসংখ্যা কতো অধিক?

ঃ চন্দ্রামুখী! সৈন্যের প্রাচুর্যই বিজয়ের একমাত্র চাবিকাঠি নয়। যুদ্ধে চাই বীরত্ব, সাহসিকতা, হিম্মত ও পাহাড়সম দৃঢ়তা। দুর্ভাগ্য, আমাদের যোদ্ধাদের মাঝে এসব গুণের দারুণ অভাব। এরপরই ধর্মপালের কণ্ঠ আবেগবিজড়িত হয়ে এলো। বললেন, প্রিয় রাজকুমারী! তুমি কি বলতে পারো, কেনো এ যুদ্ধ হচ্ছে?

ঃ আমি তো একথা শুনে আসছি যে, সুলতান মাহমুদ গজনবী সোমনাথের ধনদৌলত আর হিরা-জহরতের কথা শুনে লোভ সামলাতে পারেননি। তাই যুদ্ধ করে সে সম্পদ লুট করতে এসেছেন।

ঃ না, এ কথা সত্য নয়। এ যুদ্ধ তোমাকে কেন্দ্র করে হচ্ছে। সুলতান মাহমুদ তোমাকে উদ্ধার করতে এসেছেন।

চন্দ্রামুখীর চেহারায় বিষণ্নতা ছড়িয়ে পড়লো। কেমন যেনো অপ্রস্তুত হয়ে গেলো। ইতিপূর্বে সে শোবাদেবীর নিকটও এই একই কথা শুনেছে। আজ আবার তা গুরুজী ধর্মপালের মুখে শুনছে। সে দারুণ বিস্মিত, অত্যন্ত বিষণ্ন হয়ে পড়লো। বিস্ময়ভরা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, আমাকে নিয়ে যুদ্ধ হচ্ছে মানে?

ধর্মপাল অত্যন্ত গম্ভীর স্বরে বললেন, হ্যাঁ, তোমাকে নিয়েই এ যুদ্ধ হচ্ছে– ইতিপূর্বে তিনি একটি পত্রে পরিষ্কারভাবে এ কথা বলে দিয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, চন্দ্রামুখীকে সমর্পণ করে না দেয়া পর্যন্ত এ যুদ্ধ চলতে থাকবে। যদি চন্দ্রামুখীকে সমর্পণ করে দেয়া হয়, তাহলে তিনি চলে যাবেন।

চন্দ্রামুখী লজ্জায় মাথা নীচু করে ফেললো। তারপর বললো, গুরুজী! দেখুন তো, মুসলমান বাদশাহরা কতো লম্পট আর চরিত্রহীন হয়!

ধর্মপালের কণ্ঠস্বর আরো গম্ভীর হয়ে গেলো। বললেন, চন্দ্রামুখী! তোমাকে নিয়ে সুলতানের কোনো কুমতলব নেই। তুমি হয়তো জানো না, তোমাকে নিয়ে এক গভীর রহস্য ঘুরপাক খাচ্ছে। সে রহস্যই সুলতানকে এ পর্যন্ত টেনে এনেছে। আমি তখন মহরাজাকে পরামর্শ দিয়েছিলাম, আপনি চন্দ্রামুখীকে গজনবীর হাতে সমর্পণ করে দিন। কিন্তু তিনি আমার কথা শুনলেন না।

বিস্ময়ভরা চন্দ্রামুখীর চোখ। সে নিষ্পলক নেত্রে ধর্মপালের দিকে কেবল চেয়ে রইলো। তারপর বললো, আপনি... আপনি আমার গুরুজ্বী হয়ে কি চান যে, আমি তার হেরেমে নিক্ষিপ্ত হয়ে পঁচে-গলে শেষ হয়ে যাই!

ধর্মপালের কণ্ঠ আরো গম্ভীর হয়ে ওঠলো। বললেন, সুলতান বুড়ো মানুষ। তার বয়স এখন সাতান্ন- আটান্ন বছর। তিনি তোমাকে তার হেরেমে রাখবেন না। তবে তিনি... উহু আমি তো কথার তালে তালে তোমাকে সেই রহস্যের কথা বলে দিচ্ছি, মহারাজার নির্দেশ ও ইশারা ছাড়া আমি যা বলতে পারি না। দেখো দেখো চন্দ্রামুখী, ঐতো শিকদেব ও কামিনী আসছে। তারা উভয়েই তোমার প্রতি রুষ্ঠ। তারা তোমার ক্ষতির চিন্তায় আছে। তাদের ব্যাপারে সতর্ক থেকো।

ঃ আচ্ছা গুরুজ্বী! তবে কি একথা সত্য নয় যে, কামিনী শুধু আমার সন্তুষ্টির জন্যই হারুনকে মুক্ত করে দিয়েছিলো?

ধর্মপাল মৃদু হেসে বললেন, আসলে ব্যাপার এমন নয়। সে নিজেই হারুনের প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে গেছে। সে এবার তার ভাইকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে। সে ফন্দি এঁটেছে, তোমাকে জঙ্গলে নিয়ে তার ভাইয়ের হাতে তুলে দেবে আর সে নিজে হারুনের নিকট চলে যাবে। শোনো, তার ব্যাপারে সদাসতর্ক থাকবে। সে ভয়ানক ফন্দিবাজ ও কুটিল নারী। আমি এখন যাচ্ছি।

ধর্মপাল বাগানের গাছের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। অমনি হাজারো চিন্তা চন্দ্রামুখীর মাথায় চেপে বসলো। সুলতান কেনো তাকে চান? যদি তাকে তার হেরেমেই রাখতে না চান, তবে কেনো এতো বিশাল মরুভূমি আর বিপদসংকুল বন্ধুর পথ অতিক্রম করে এসেছেন! কী এর রহস্য! তাকে কেন্দ্র করে এমন কী হচ্ছে! আর মহারাজাই বা কেনো সে রহস্য উন্মোচিত করছেন না। কামিনী...

সত্যই কি কামিনী হারুনের প্রেমে পড়ে গেছে? আবারো কি সে আমাকে ধোঁকা দেয়ার জন্য রাজপ্রাসাদে এসেছে?

রাজকুমারী যখন উদাস হয়ে এসব চিন্তায় বিভোর, তখন কারো আগমনের আওয়াজে সচকিত হয়েই দেখে, কামিনী এগিয়ে আসছে। কামিনী দারুণ সুন্দরী। অপরূপা। তার চেহারায় সর্বদা এক নিষ্পাপ নিষ্পাপ ভাব বিরাজ করলেও সে দারুণ চালাক ও দুষ্ট।

কামিনী এগিয়ে এসে অত্যন্ত আদবের সাথে চন্দ্রামুখীকে প্রণাম করলো। চন্দ্রামুখী তার দিকে তাকিয়েই প্রভাবিত হয়ে গেলো। ভাবলো, এমন নিষ্পাপ নির্দোষ চেহারার কামিনী কখনো আমাকে ধোঁকা দিতে পারে না। তার সলাজ দৃষ্টি আর নির্মল চেহারা বলছে, সে এখন আর আমাকে ধোঁকা দেবে না। আমিইবা তার ধোঁকায় পড়তে যাবো কেনো?

কামিনী অত্যন্ত নরম ও কোমল কণ্ঠে বললো, রাজকুমারী! তুমি এখনো আমার ব্যাপারে অসন্তুষ্ট হয়ে আছো?

কামিনীর কথায় চন্দ্রামুখীর ভাব-তন্ময়তা কেটে গেলো। বললো, না কামিনী! আমি তোমার ব্যাপারে অসন্তুষ্ট নই।

বিমুগ্ধ কণ্ঠে কামিনী বললো, ঈশ্বরের করুণা রাজকুমারী! আমি দারুণ লজ্জিত যে আমার দ্বারা হঠাৎ একটি ভুল হয়ে গিয়েছিলো। ইতিমধ্যে আমি তার বিনিময়ও দিয়ে দিয়েছি। ভাইজান হারুনকে গ্রেফতার করেছিলো। আমি তাকে গোপনে মুক্ত করে দিয়েছি। মাতাজ্বী শোবাদেবী নিশ্চয় তা তোমার নিকট বলেছেন।

ঃ হ্যাঁ, মাতাজ্বী আমাকে সে কথা বলেছেন। আমি তোমার কৃতজ্ঞতা আদায় করছি।

ঃ আমি তোমার বিশ্বস্ততার প্রমাণ দিয়েছি রাজকুমারী। ভাই শিকদেব তোমার অনীহার কারণে দারুণ বিষণ্নতা ও দুশ্চিন্তায় নিমজ্জিত হয়ে আছে। সে শুধু তোমার সন্তুষ্টির জন্য মহারাজার সাহায্যে বিশাল বাহিনী নিয়ে এসেছে।

ঃ তাহলে তো সে বড়ই ভুল করেছে। তার তো একনিষ্ঠচিত্তে সোমনাথ দেবতার সাহায্যের জন্য আসা দরকার ছিলো।

ঃ সোমনাথ দেবতাই তো তাকে স্বপ্নে এখানে আসার নির্দেশ দিয়েছেন।

ঃ তাহলে সে ভালোই করেছে।

ইতিমধ্যে সূর্যের উত্তাপ ছড়িয়ে পড়েছে। চন্দ্রামুখী বললো, চলো কামিনী! আমরা কক্ষে চলে যাই।

রাজকুমারী চন্দ্রামুখী যখন গুরুজ্বী ধর্মপালের সাথে কথা বলছিলো, তখন তার সখী ও দাসীরা দূরে সরে গিয়েছিলো। এখন যখন রাজকুমারী কামরায় ফিরে যাওয়ার জন্য পা বাড়ালো, তখন সবাই এসে রাজকুমারীর সাথে রাজপ্রাসাদের দিকে রওনা হলো।

উনত্রিশ.

সোমনাথ কেল্লার সামনে বিশাল চত্বর। প্রায় আট মাইল প্রস্থ ও দশ মাইল দৈর্ঘ্য। খালি চোখে মনে হয় তা দিগন্তের সাথে গিয়ে মিশেছে। এ চত্বর জুড়ে অবস্থান করছে ইসলামী বাহিনী। চত্বর জুড়ে তাঁবু আর তাঁবু। মাঝে মাঝে ফাঁকা।

এ চত্বরে পশ্চিম দিকে এক বিশাল নদী। উত্তর দিক থেকে প্রবাহিত হয়ে এসে দক্ষিণ দিকে মোড় নিয়ে সাগরে মিলেছে। এ নদীর তীরে এক নিরাপদ স্থানে মহিলাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মহিলাদের হেফাজতে নিয়োজিত পাঁচশ' সৈন্যের থাকার জন্য পর্দাবৃত স্থানে অদূরেই ব্যবস্থা করা হয়েছে। যথাসম্ভব চেষ্টা করা হয়েছে, যেনো মহিলারা ও ছোট ছেলে-মেয়েরা নিশ্চিন্তে ঘোরাফেরা করতে পারে। আনন্দ আর স্ফূর্তিতে সময় কাটাতে পারে।

নদীটি বিরাট ও বিস্তৃত। তাই এদিক থেকে শত্রু সৈন্যের আক্রমণের কোনো সম্ভবনা ছিলো না। এ স্থানের কয়েক মাইল দূরেই হাজের আলী আবম্রেলীর সকল পথ বন্ধ করে দুর্ভেদ্য প্রাচীর গড়ে তুলেছেন। পূর্ব দিকে স্বয়ং সুলতান মাহমুদ গজনবী, আলতুনতাশ আর আমীর আলী উপস্থিত।

মুসলিম বাহিনীর মহিলাদের থাকার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ নিরাপদ ও দুর্ভেদ্য। তাই তা নিয়ে কারো কোনো প্রকার দুশ্চিন্তা নেই। মহিলাদের তাঁবুগুলো নদীর একেবারে তীরে সবুজ-শ্যামল এক নিম্নভূমিতে স্থাপিত। ভারী চমৎকার সেই স্থানটি। ঘাসে ঘাসে ছাওয়া সমতল পরিচ্ছন্ন স্থানটি মহিলাদের নিকট তাঁবুর ফরাশের চেয়ে বেশি পছন্দনীয়। তাই তারা, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আর যুবতীরা তাঁবু ছেড়ে এসে ঘাসের উপরে বসে গল্প করছে।

যেদিন মুসলিম বাহিনী শত্রু সৈন্যদের পশ্চাদ্ধাবন করেছিলো, তার আগের দিন মাগরিবের নামায পড়ে আনীসা কয়েকটি মেয়ের সাথে নদীর তীরে এলো। ছল ছল ছলাৎ রব তুলে নদীর পানি তীরে আছড়ে পড়ছে। শাঁ শাঁ করে শীতল বায়ু উড়ে আসছে।

আকাশের কোণ জুড়ে পূর্ণিমার চাঁদ। আকাশ থেকে যেনো গলে গলে নির্মল আলোর ধারা পড়ছে। জ্যোৎস্নার পরশে নদীর পানি ঝিলমিল করছে। বালুকারাশি চিকমিক করছে। সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। সে এক বিস্ময়কর প্রাকৃতিক সাজসজ্জা।

আনীসা বললো, দেখো সখীরা! কেমন চিত্তহারী দৃশ্য।

একজন বললো, মনে হচ্ছে, স্থানটি যেনো জান্নাতের টুকরা।

আরেকজন বললো, পূর্ণিমার জ্যোতিতে আজ সারা দুনিয়া যেনো মিটি মিটি হাসছে। দেখো, গাছপালা, তরুলতা, নদীর বুকের উর্মীমালা সবই যেনো এক জীয়নকাঠির ছোঁয়ায় জীবন্ত হয়ে ওঠেছে।

আরেকজন মিটি মিটি দুষ্টুমির হাসি হেসে বললো, আরে তুমি কেবল আকাশের চাঁদই দেখলে? পৃথিবীর চাঁদ বুঝি তোমার নজরে পড়লো না?

এবার সবাই সমস্বরে বললো, আচ্ছা, তাহলে পৃথিবীর চাঁদ কোথায় তোমাকে বলতে হবে।

মেয়েটি মিষ্টি-মধুর হেসে তর্জনী বাঁকিয়ে আনীসার দিকে ইঙ্গিত করে বললো, এই তো পৃথিবীর চাঁদ। দেখো, দেখো তার নির্মল জ্যোতির্ময় চেহারা থেকে কীভাবে জ্যোতির ধারা ঠিক্‌রে বেরুচ্ছে আর পূর্ণিমার রৌশনীকে পরাজিত করার চেষ্টা করছে!

সত্যই সে সময় আনীসার চেহারা ভারী চমৎকার দেখা যাচ্ছিলো। মনে হচ্ছিলো, যেনো তা আলোর ফোয়ারার মতো চারদিকের অন্ধকার দূর করে স্বমহিমায় ঝলমল করছে।

মেয়েটির কথা বলার ভঙ্গিমায় সবাই হেসে ওঠলো। আনীসা বললো, তোমরা আবার আমাকে নিয়ে দুষ্টুমি শুরু করলে। বলেই সে সবার দিকে তেড়ে এলো। আর অমনি সবাই দে ছুট। দৌড়ে সবাই দূরে চলে গেলো। এতো দূরে চলে গেলো যে, তাদের কথা এখন আর শোনা যায় না। আনীসা একাকি দাঁড়িয়ে রইলো। উদাস তার দৃষ্টি। এদিক-সেদিক পিট পিট করে তাকাচ্ছে।

হঠাৎ তার দৃষ্টি পড়ে এক সাদা পোশাকের অশ্বারোহীর উপর। দূর থেকে খুট খুট শব্দ তুলে এগিয়ে আসছে। ধক্ করে ওঠলো তার হৃদপিন্ড। তা হলে কি বুরহান আসছে! মন তো বলে সে-ই আসছে। কিন্তু... কিন্তু এ সময়ে সে একা আসবে কেনো? সে তো সমুদ্রের দক্ষিণ দিকের রাস্তায় শত্রুদের প্রতিহত করতে মহাব্যস্ত।

অশ্বারোহী ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। আরো কিছুদূর এগিয়ে এলে আনীসা তাকে চিনে ফেললো। তার জ্যোতির্ময় গণ্ডদেশে গাঢ় গোলাপী রং ছড়িয়ে পড়লো। চোখ থেকে যাদুময় অপূর্ব এক জ্যোতি ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। কিন্তু সাথে সাথে সে না চেনার ভান করে সরে দাঁড়ালো। নদীর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। যেনো সে বুরহানকে দেখেনি। বুরহান এগিয়ে এসে দেখলো, আনীসা আত্মহারা হয়ে নদীর দিকে তাকিয়ে আছে। একেবারেই আত্মভোলা সে। নীরবে ঘোড়া থেকে নেমে নিঃশব্দে আনীসার দিকে এগিয়ে গেলো। একেবারে কানের কাছে মুখ নিয়ে বললো, আনীসা!

আনীসা থতমত খেয়ে শিহরিত হয়ে ওঠলো, যেনো সে খুব ভয় পেয়েছে। ভয়ার্ত ক্ষীণ একটা চীৎকার ধ্বনিও তার কণ্ঠ চিরে বেরিয়ে এলো। তারপর এমনি ভাবে পেছনে ফিরে তাকালো, যেন সে পড়ে যাচ্ছে। বুরহান সাথে সাথে তাকে ধরে ফেলে বললো, আনীসা... আনীসা! আমি বুরহান। তুমি এতো ভয় পাচ্ছো

কেনো? আনীসা ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালো এবং দ্রুত তার থেকে একটু দূরে সরে দাঁড়িয়ে দীর্ঘশ্বাস নিতে লাগলো। তারপর বললো, উহ্ আপনি তো আমাকে একেবারে ভয় পাইয়ে দিলেন!

বেচারা বুরহান একেবারে লাচার। ভয়ে অনুশোচনায় এতোটুকুন হয়ে কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বললো, মাফ করে দাও আনীসা! দারুণ বোকামী করে ফেলেছি।

বুরহানের বিনয় দেখে আনীসার মুখে হাসি উপচে পড়তে চাইলেও সে তা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে চেপে রাখলো। বললো, আপনার এই আচরণের কারণে এখনো আমার হৃদপিন্ড ধড়ফড় করছে। আচ্ছা, বলুন তো এমনটি কেনো করলেন?

অপরাধীর ন্যায় বুরহান আনীসার সামনে মাথানত করে দাঁড়িয়ে থেকে বললো, আমি বুঝতে পারিনি, আমার এই অস্ফুট ডাকের কারণে তুমি এতো ভয় পেয়ে যাবে।

আনীসা বললো, আপনি তো বীর যোদ্ধা। আপনার বীরত্বে আপনি অহঙ্কারী হয়ে ওঠেছেন!

বুরহান কোমল কণ্ঠে বললো, আমি তো এখনো কারো সামনে আমার বীরত্ব নিয়ে অহঙ্কার করিনি!

ঃ এ সময় আপনি কোথা থেকে এলেন?

বুরহানের কণ্ঠে সাধুতার বিকাশ। বললো, সেনা ছাউনী থেকে।

ঃ কেনো এলেন?

ঃ কী আর বলবো। মাগরিবের পরে মনটা কেমন যেনো অস্থির লাগছিলো। একটা দুশ্চিন্তা ও বিষন্নভাব ক্রমেই যেনো ফেনিয়ে ওঠছিলো। আমার মনে হতে লাগলো, হয়তো আনীসা...। কিন্তু আমার কথায় বিশ্বাস করবে না।

ঃ আচ্ছা, করবো, বলুন।

ঃ তাহলে শোনো, আমার অন্তর যেনো বারবার আমাকে ডেকে বলছে, তুমি কোনো বিপদে পড়েছো।

আনীসার মুখে মৃদু তিরস্কার ধ্বনি আর ওষ্ঠপ্রান্তে হাসির ঝিলিক। বললো, ভারী চমৎকার আপনার অন্তর।

বুরহান অপ্রস্তুত হয়ে গেলো। বললো, আমিও ভালো না। আমার মনও ভালো না। অন্তরে যে দুশ্চিন্তা উঁকি দিয়েছিলো, তাও মিথ্যা প্রমাণিত হলো। বরঞ্চ আমি এসে তোমাকে ভয় পাইয়ে দিলাম।

ঃ আপনি কীভাবে জানলেন, আমি এই দিকে আছি?

ঃ এটাও অন্তরের ক্যারিশমা। অন্তরই আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এলো।

আনীসার কণ্ঠ এবার তিরস্কারে ভরা। বললো, আহা রে! কী বুযুর্গ! আমার অন্তরে এ বিশ্বাস পয়দা করার জন্যই বুঝি আপনার আগমন।

ঃ অসম্ভব, এটা একেবারোই অসম্ভব। কোনো সুন্দরী যাদুকরকে কী কোনো বুযুর্গ কখনো প্রভাবিত করতে পেরেছে?

ঃ হ্যাঁ, যদি যাদুকর হয়, তবে অবশ্যই পারে।

ঃ তাহলে তুমি যাদুকর। আমাকে কিছু যাদু শিখিয়ে দাও।

ঃ যাদুর তত্ত্ব কী, তা কি আপনি জানেন?

ঃ হ্যাঁ, জানি। সৌন্দর্য আর রূপের চেয়ে শক্তিশালী কোনো যাদু হয় না।

আনীসা তীক্ষ্ম দৃষ্টি ফেলে সলাজ কণ্ঠে বললো, সৌন্দর্য কী যাদু হয়?

ঃ হ্যাঁ, হয়। দেখো তোমার তীক্ষ্ম দৃষ্টি থেকে এখন কীভাবে যাদুর ঝলক ঠিক্‌রে বেরুচ্ছে।

ঃ আপনি কথার কারিগর। বানিয়ে বানিয়ে সুন্দর করে কথা বলতে পারেন।

ঃ আর তুমি কথার পরশে মানুষকে অভিভূত করতে খুব পারদর্শী।

ঃ যদি এ সময় কেউ এখানে আপনাকে দেখে ফেলে?

ঃ তাহলে মনে করবে তুমি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছো।

ঃ আচ্ছা, মেহেরবানী করে...।

ঃ আমি চলে যাবো।

ঃ এমনিভাবে এ সময়ে কেউ দেখলে বদনামের ভয় আছে।

বুরহানের কণ্ঠে আবেগের উচ্ছ্বাস। বললো, তুমি এমন করে কথা বলছো কেনো আনীসা!

আনীসা হঠাৎ চমকে ওঠলো। বললো, দেখুন ঐতো নদীতে কিসের যেনো ঝুপঝাপ আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

ঠিক তখন বৈঠা ফেলার আওয়াজ শোনা গেলো। বুরহানও সে আওয়াজ শুনলো। বললো, মনে হচ্ছে নদীপথে কোনো নৌকা আসছে। কিন্তু কাদের নৌকা? আমাদের তো কোনো নৌকা নেই। বিস্ময়াবিভূত নেত্রে তারা নদীর দিকে তাকালো। হ্যাঁ, নদীর পানি চিড়ে নৌকাই ভেসে আসছে। তবে একটি নয় কয়েকটি নৌকা।

ঃ রাজপুতরা মহিলাদের তাঁবুতে আক্রমণ করতে আসছে! আনীসা, তুমি দৌড়ে চলে যাও। একেবারে মহিলাদের তাঁবুতে চলে যাও। যাও এক্ষুনি যাও। ঐ দেখো, নৌকাগুলো তীরে এসে ভিড়ছে।

আনীসার চোখে ভয়। বুরহানের দিকে তাকিয়ে বললো, আর আপনি?

ঃ আমি তাদের বাধা দেবো। প্রতিহত করবো।

আনীসার কণ্ঠে এক আকাশ বিস্ময়! বললো, আপনি একা?

ঃ হ্যাঁ, একাই। কিন্তু তুমি আমাকে নিয়ে এতো শংকিত হয়ে পড়েছো কেনো আনীসা! তাড়াতাড়ি দৌড়ে যাও। আহা, আর দেরি করো না। ঐ তো রাজপুতরা

তীরে নেমে এসেছে। এখন আর সময় নষ্ট করা যাবে না। তুমি থাকলে আমি কিছুই করতে পারবো না।

মুহূর্তকাল আনীসা কী যেনো ভাবলো, তারপর বললো, আচ্ছা, আমি এখনই দৌড়ে চলে যাবো; কিন্তু তার আগে আমাকে একটি প্রতিশ্রুতি দিতে হবে।

ঃ দ্রুত বলো, কী প্রতিশ্রুতি?

ঃ রাজপুতরা মহিলাদের তাঁবুর নিকটে পৌছা পর্যন্ত আপনি তাদের সামনে যাবেন না। তাদের আক্রমণ করবেন না।

ঃ আমি অঙ্গীকার করলাম তুমি যাও।

আনীসা আর দেরি করলো না, দৌড়ে চলে গেলো। আর বুরহান ঘোড়া ছুটিয়ে এক টিলার পশ্চাতে গিয়ে দাঁড়ালো এবং রাজপুতদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে লাগলো।

ত্রিশ.

রাজপুতরা দশ-বারোটি নৌকায় চেপে এসেছে। তারা যেদিকে নৌকা ভিড়িয়েছে, সে দিকটি উঁচু উঁচু টিলায় ভরা। মহিলাদের তাঁবুগুলো সেখান থেকে বেশ কিছুটা দূরে। সাধারণত এদিকে কোনো মুসলমান নারী-পুরুষ আসে না।

রাজপুতরা ক্ষীপ্রগতিতে নৌকা থেকে নেমে টিলার আড়ালে আশ্রয় নিতে লাগলো। বুরহান দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের পর্যবেক্ষণ করলো। তারা আড়াইশ'র মতো যোদ্ধা। মনে হচ্ছে, তারা রাতের আঁধারে আক্রমণ করবে না। রাতটা লুকিয়ে থেকে পরে আক্রমণ করবে।

তারপরও বুরহান বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো। তার ঘোড়া নীচু জমীনে দাঁড়িয়ে থাকার কারণে তাকে দেখা যাচ্ছিলো না। বুরহান এবার নিশ্চিত হয়ে গেলো যে, রাজপুতরা এখন আক্রমণ করবে না। তাই দাঁড়িয়ে না থেকে ধীরে ধীরে চলে আসতে লাগলো।

ফেরার পথে সে সতর্কতা অবলম্বন করে এসেছে, যেনো কেউ তার উপস্থিতির কথা জানতে না পারে। বুরহান মহিলাদের তাঁবুগুলোর নিকট পৌঁছে দেখলো, আনীসা সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। বললো, আনীসা! তুমি এখনো এখানে দাঁড়িয়ে?

আনীসা বললো, আমি আপনাকে দেখছিলাম। আমি আশঙ্কা করছিলাম, হয়তো আপনি একাই রাজপুতদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বেন।

বুরহান কৃতজ্ঞতাভরা দৃষ্টিতে আনীসার প্রতি তাকালো। তারপর বললো, তুমি যে আমার কথা স্মরণে রেখেছো এটাই আমার সান্ত্বনার জন্য যথেষ্ট।

লজ্জায় আনীসার চেহারা গোলাপী রং ধারণ করলো। চাঁদের উজ্জ্বল রোশনীতে তাকে ভারি চমৎকার দেখাচ্ছিলো।

বুরহান বললো, যদি তারা দশ-বিশজন হতো, তবে অবশ্যই আমি একাই তাদের মজা দেখাতাম। আর যদি তারা হামলা করতে এগিয়ে আসতো, তাহলেও আমি তাদের খেলা দেখাতাম।

ঃ তারা কতোজন হবে?

ঃ আড়াইশ'র মতো।

ঃ হয়তো তারা রাতের অন্ধকারে অতর্কিতে আক্রমণ চালাবে।

ঃ এখন তারা টিলার পশ্চাতে লুকিয়ে আছে। আরে, ঐতো ঈশার আযান হচ্ছে। তুমি তাঁবুতে চলে যাও। আমিও চলে যাচ্ছি।

ঃ কোথায় যাবেন?

ঃ নারীদের প্রহরী বাহিনীর নিকট যাচ্ছি। সেখানে নামায পড়বো। সেখান থেকে দেড়শ মুজাহিদ নিয়ে মহিলাদের তাঁবুর অদূরে টিলার পশ্চাতে লুকিয়ে থাকবো। রাতের অন্ধকারে রাজপুতরা অতর্কিত হামলা করতে এলে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বো।

আনীসার কণ্ঠে আনন্দ। বললো, আপনি চমৎকার চিন্তা করেছেন।

আনীসা বিদায় নিয়ে তাঁবুর দিকে চলে গেলো। বুরহানের ঘোড়াও চলতে লাগলো। পাহারারত বাহিনীর তাঁবুতে গিয়ে দেখে তারা নামায পড়ছে।

বুরহান এক তাঁবুর খুটির সাথে তার ঘোড়া বেঁধে অযু করে জামাতে শরীক হয়ে গেলো।

নামাযের পর প্রহরী বাহিনী প্রধানের সাথে কানে কানে বললো, রাজপুতরা নারীদের তাঁবুতে আক্রমণ করতে চাচ্ছে। প্রহরী বাহিনীর প্রধানের নাম খামারতাশ। এ সংবাদ শুনে সে চমকে ওঠলো। জিজ্ঞেস করলো, আপনি কীভাবে জানলেন?

বুরহান নৌকায় করে রাজপুতদের আসা এবং টিলার পেছনে লুকিয়ে থাকার ঘটনা শোনালো।

খামারতাশ বললো, আচ্ছা, তাহলে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, ইনশাআল্লাহ আমরা তাদের চরম শিক্ষা দিয়ে ছাড়বো।

দু'জন বসে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করলো। আক্রমণের পদ্ধতি-উপায় নিয়ে আলোচনা করলো এবং আড়াইশ সিপাই নিয়ে রওনা হয়ে গেলো।

রাজপুতরা নৌকা থেকে নেমে টিলার পশ্চাতে সবুজ-শ্যামল ঘাসের উপর নিশ্চিন্তে বসে আছে। নৌকার মাঝি-মাল্লারাও যোদ্ধা। তাই তারাও টিলার পশ্চাতে চলে এসেছে।

সবাই নীরব-নির্বাক। কারো মুখে কোনো কথা নেই। সময় আপন গতিতে তর তর করে বয়ে চলেছে। আকাশের পূর্ণ চাঁদ তার কক্ষ পথে এগিয়ে চলেছে।

রাত বাড়ার সাথে সাথে চারদিকে নীরবতাও বেড়ে গেলো। নারীদের তাঁবুর দিক থেকে মাঝে মাঝে যে শব্দ ভেসে আসছিলো, তাও বন্ধ হয়ে গেলো।

নিঝুম রাত। চারদিকে পিনপতন নীরবতা বিরাজ করছে। শুধু মাঝে-মাঝে রাতজাগা পাখির পাখা ঝাপটানি শুনা যাচ্ছে আবার পরক্ষণেই আবার নীরবতা ছেয়ে যাচ্ছে। ঠিক তখন এক রাজপুতের কথা শুনা গেলো, এখন আমাদের প্রস্তুতি নেয়া উচিত।

অপরজন বললো, হ্যাঁ, সময় তো হয়ে গেছে। এখনই প্রস্তুত হতে হবে।

তৃতীয়জন বললো, যদি আমরা এ অতর্কিত হামলায় সফল হতে পারি এবং ম্লেচ্ছদের নারী-শিশুগুলোকে গ্রেফতার করে নিয়ে যেতে পারি, তাহলে মহারাজা যে প্রস্তাবই দেবেন সুলতান মাহমুদ তা মানতে বাধ্য হবেন।

প্রথমজন বললো, এজন্যই তো আমাদের এই ভয়াবহ অভিযান।

দ্বিতীয়জন বললো, সোমনাথজ্বীর কৃপায় আমরা নিরাপদে এ পর্যন্ত এসে পৌঁছেছি। এখন সফলতার সাথে আক্রমণ করে ফিরে যেতে পারলেই কামিয়াব।

তৃতীয়জন বললো, সোমনাথজ্বীর ইচ্ছে, আমরা কামিয়াব হই। তাই তো মুসলমানরা এদিকের ব্যাপারে একেবারে গাফেল। সকালে তারা যখন জানতে পারবে, তাদের নারী ও শিশুদের গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তখন তাদের হুঁশ হবে।

চতুর্থজন বললো, কোতা সিং অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে গতকাল এসে সবকিছু দেখে গেছে।

পঞ্চমজন বললো, সে তো তার কাজ করে গেছে। এবার আমাদেরকে আমাদের কাজ করতে হবে।

ষষ্ঠজন বললো, আমাদের চেষ্টা করতে হবে, যেনো কারো আওয়াজ শোনা না যায়। প্রহরী বাহিনী অদূরেই অবস্থান করছে। তাদের কেউ বিন্দুমাত্র সন্দেহ করতে পারলেই মহাবিপদ। তাহলে প্রথমে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করতে হবে, তারপর মহিলাদের গ্রেফতার করতে হবে।

রাজপুতদের অফিসার বললো, কোনো মহিলা বা শিশুকে গ্রেফতার করার পর পরই তার মুখ বেঁধে ফেলবে। যদি কেউ চীৎকার করার চেষ্টা করে, তাহলে মুখ থেকে আওয়াজ বের হওয়ার পূর্বেই খঞ্জর মেরে একেবারে ঠাণ্ডা করে দেবে। সবাই অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ক্ষীপ্রগতিতে কাজ সমাধা করবে।

তারা অত্যন্ত সন্তর্পণে অগ্রসর হতে শুরু করলো।

মুজাহিদরা যে টিলার পশ্চাতে লুকিয়ে আছে, রাজপুতরা সে টিলার উপর উঠতে লাগলো। অনেক উঁচু টিলা। তারা দেখলো, সামনের প্রান্তর একেবারে শূন্য। কোনো মুসলমান দেখা যাচ্ছে না। অফিসার বললো, সোমনাথজ্বীর

কৃপায় সব ঠিক আছে। আমাদের এ অভিযান অবশ্যই সফল। দ্রুত চলো, দ্রুত। তবে সাবধানে।

তারা দ্রুত চলতে চলতে টিলার অপরদিকে নেমে পড়লো। নিঃশব্দে ক্ষীপ্রগতিতে চলতে লাগলো। পথ অমসৃণ, এবড়ো-থেবড়ো। কোথাও উঁচু আবার কোথাও নীচু। সকল বাধা অতিক্রম করে তারা চলতে লাগলো।

রাজপুতরা অর্ধেক পথ অত্যন্ত ক্ষীপ্রতার সাথে অতিক্রম করলো। তারপর এক লম্বা টিলার পার্শ্ব দিয়ে যেতে শুরু করলো। আসলে তা একটি মরা খাল। দু'পাশ উঁচু হওয়ার কারণে টিলা মনে হচ্ছে।

মরা খালটি কোথাও একেবারে স্বচ্ছ, আবার কোথাও গাছ-গাছালি আর কাটাগুল্মে ভরা। রাজপুতরা সতর্কতা অবলম্বনের জন্য এ পথ ধরে সামনে এগিয়ে চললো। হঠাৎ কয়েকজন রাজপুতের দৃষ্টি উপরের দিকে পড়তেই তারা কয়েকজন মুসলমানকে দেখতে পেলো। তারা উঁকি মেরে তাদের দেখছে।

তারা সাথে সাথে অন্যদের ইঙ্গিত করতেই অন্যরাও উপরের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলো, কয়েকজন মুসলমান সৈন্য তাদের পর্যবেক্ষণ করছে। সবার মাঝে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। সবাই উপরের দিকে তাকায়।

প্রথমে মাত্র কয়েকজনকে দেখা গিয়েছিলো। কিন্তু এখন অনেক মুজাহিদকে দেখা যাচ্ছে। এ দৃশ্য রাজপুতদের পিলে চমকে দিলো। তারা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো। এক অফিসার বললো, মনে হচ্ছে, মুজাহিদরা তোমাদের দেখে ফেলেছে। আক্রমণ করতে তোমাদের উপরে এসে দাঁড়িয়েছে। সাহসিকতার সাথে অগ্রসর হও। নির্বিচারে হত্যা করো। অফিসারের কথা শেষ হতে না হতেই তীরবর্ষণ শুরু হয়ে গেলো। বিশজন রাজপুত চীৎকার দিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। তারপর আরো অনেকে চীৎকার শুরু করলো।

এ অবস্থা দেখে অফিসার তাদের ধমকে ওঠলো। বললো, চুপ থাকো, হট্টগোল করো না। মনে হচ্ছে, তারা সংখ্যায় কম। তা না হলে তারা সামনে এগিয়ে আসতো। তোমরা চীৎকার করলে তাদের সাহায্য করার জন্য আরো মুজাহিদ এসে পড়বে। দ্রুত অগ্রসর হয়ে এ ফাঁদ থেকে বের হয়ে যাও। তারপর মুসলমানদের উপর হামলা করো।

আহত রাজপুতদের সেখানে ফেলে অন্যরা দ্রুত সামনে ছুটে গেলো। কিন্তু কয়েক কদম যেতে না যেতেই আরেক দফা তীর বর্ষিত হলো এবং বেশ কয়েকজন রাজপুত আহত হয়ে চীৎকার শুরু করলো। তারা লুটিয়ে পড়লো। অন্যান্য রাজপুতরা তাদের পদদলিত করেই উদভ্রান্তের মতো সামনের দিকে ছুটতে লাগলো। সামনে একটি পথ দিয়ে তারা যে-ই বেরুতে যাবে, অমনি দেখতে পেলো, তরবারী উঁচিয়ে যমদূতের মতো মুজাহিদরা দাঁড়িয়ে আছে।

আতঙ্কে ভ্যবাচ্যাকা খেয়ে স্থির হওয়ার আগেই মুজাহিদ বাহিনী আক্রমণ শুরু করলো। উপর থেকে তাদের উপর প্রবল বেগে তীর বর্ষিত হতে লাগলো। অনেকেই আক্রান্ত হয়ে লুটিয়ে পড়ে চীৎকার করছে। তলোয়ার আর তীরের আক্রমণের সামনে দাঁড়াতে না পেরে পেছন দিকে ছুটতে লাগলো। মুজাহিদরা তাদের পেছনে পেছনে নাঙ্গা তরবারী হাতে ছুটতে আর হত্যা করতে লাগলো।

লাশের পর লাশ ফেলে মুজাহিদরা রাজপুতদের ছাগপালের মতো তাড়িয়ে নিতে লাগলো। রাজপুতরা হতবুদ্ধি, হতবিহ্বল, কিংকর্তব্যকিমূঢ়। দৌড়ে শুধুই পালানোর চেষ্টা করছে।

তারা যখন প্রবেশপথ দিয়ে বের হতে শুরু করলো, ঠিক তখন দেখলো, সেখানেও একদল মুজাহিদ নাঙ্গা তরবারী হাতে দাঁড়িয়ে আছে। চাঁদের রোশনীতে তরবারীগুলো ঝলমল করছে। এ অবস্থা দেখে তারা একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলো। মুহূর্তকাল চিন্তা করার অবকাশ না দিয়েই মুজাহিদরা তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। নিমিষে প্রায় একশ রাজপুতকে ধরাশায়ী করে ফেললো।

যে মুজাহিদরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করছিলো, তারাও পশ্চাদ্দিক থেকে এসে উপস্থিত হলো। উভয় দিকের আক্রমণে তাদের অধিকাংশ সৈন্য ভূতলে লুটিয়ে পড়লো। যারা বীরত্বের সাথে লড়তে এগিয়ে এলো, তাদের সংখ্যা একেবারে নগন্য। তাই তারা আর বেশিক্ষণ টিকতে পারলো না। একে একে তারাও লুটিয়ে পড়লো। রাজপুতদের যুদ্ধের খাহেশ শেষ হয়ে গেলো। মুসলিম নারীদের আক্রমণ করতে এসে এভাবেই তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো। কেউ রক্ষা পেলো না। মুজাহিদরা নদীর তীরে গিয়ে তাদের নৌকাগুলো দখল করে নিলো। বুরহানের দূরদর্শিতা, নেতৃত্ব আর রণকৌশলে নীরবেই মুজাহিদরা মহাসঙ্কট ও বিপদ থেকে রক্ষা পেলো।

একত্রিশ.

ধর্মপাল পূর্বেই রাজকুমারী চন্দ্রামুখীকে বারবার সতর্ক করে দিয়েছেন, সে যেনো কামিনী ও শিকদেব-এর ব্যাপারে হুঁশিয়ার থাকে। এজন্য চন্দ্রামুখী সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, সে আর শিকদেব-এর সাথে দেখা দেবে না এবং কামিনীর সাথে কোথাও যাবে না।

কিন্তু একটি চিন্তা ইতিমধ্যে রাজকুমারী চন্দ্রামুখীকে পেয়ে বসেছে। রাজকুমারী জানে, কামিনীও সুন্দরী মেয়ে। তার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। তাছাড়া সে অত্যন্ত কূটকৌশলী। বুদ্ধি, মেধা, চতুরতা আর দুরন্তপনায় সে অনেক অগ্রসর। যদি সে হারুনকে প্রেমের জালে জড়িয়ে ফেলতে চায়, তাহলে কি হারুন তাকে ভুলে যাবে? এ চিন্তা এখন তাকে দিবানিশি জ্বালা দিতে লাগলো।

কিন্তু পরক্ষণেই ভাবলো, হারুন মুসলমান। অখ্যাত এক ম্লেচ্ছ। এক সাধারণ সৈনিক। আর সে রাজকুমারী, সোমনাথের মহারাজার মেয়ে। তাছাড়া রূপে-গুণে-সৌন্দর্যে সে অতুলনীয়। তাই তার জন্য শোভনীয় নয়, সে হারুনের ভালোবাসাকে অন্তরে ঠাঁই দেবে। তাছাড়া সে এমন এক সুলতানের সঙ্গে এসেছে, যিনি তাকে পেতে চান। তার জাতির সাথে তিনি যুদ্ধ করছেন।

এ চিন্তার পরপরই তাকে আরেকটি চিন্তা দারুণ পেরেশান করে তুললো। আসলে তো সে রাজকুমারী নয়। তাকে নিয়ে এক রহস্য আছে। নিশ্চয় সুলতান সে রহস্য অবগত হয়েছেন। তাই তিনি তাকে উদ্ধার করতে চাচ্ছেন। কিন্তু সে রহস্যটা কী? মহারাজা কেনো তা প্রকাশ করছেন না! এতে কী কল্যাণ আছে! রাজকুমারী দীর্ঘক্ষণ এ চিন্তায় আত্মমগ্ন হয়ে রইলো। চিন্তার কোনো শেষ নেই। কোনো অন্ত নেই। কোনো সমাধান নেই। চিন্তার রেশ ধরে ঘুরতে ঘুরতে আবার সে তার প্রথম চিন্তায় চলে এলো। কামিনী আর হারুনের চিন্তা-ই তাকে বেশি ভাবিয়ে তুললো।

বেশ কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর চন্দ্রামুখী ক্লান্ত হয়ে পড়লো। তারপর বিতৃষ্ণ হয়ে ভাবতে লাগলো, কামিনী যদি হারুনকে ভালোবাসে, তাহলে এতো পেরেশানির কী আছে? হারুনের সাথে আমার কী সম্পর্ক! তার চিন্তা আমার জন্য শোভনীয় নয়। সে আমার জাতির দুশমন। আমার দেবতার দুশমন। আর সবচে' বড় কথা হলো, সে একজন গোড়া মুসলমান। মুসলমানরা অমুসলমান নারীদের অত্যন্ত তুচ্ছতার সাথে দেখে। সে তো আমাকেও অপদস্ত করবে। তাহলে আমি কেনো তাকে নিয়ে এতো চিন্তা করবো।

এতোটুকু চিন্তা করার পর সে থামলো। ভেবে দেখলো, সে তার হৃদয়ের সাথে প্রতারণা করতে পারে না। তার অন্তরে হারুনের যে ছবি অঙ্কিত হয়ে আছে, তা সে মুছে ফেলতে পারবে না। চেষ্টা করেও তা মুছে ফেলা অসম্ভব। চন্দ্রামুখী বিচলিত হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। ভাবলো, আজ এখনো পর্যন্ত মাতা-পিতার সাথে সাক্ষাৎ হয়নি। চন্দ্রামুখী মহারাজা ও রাণীর কক্ষের দিকে পা পাড়ায়।

চন্দ্রামুখীর কক্ষটি প্রাসাদের এক প্রান্তে অত্যন্ত মনোরম ও সুরক্ষিত স্থানে অবস্থিত। সে তার কামরা থেকে বেরিয়ে গেলো। বেশ কিছু কামরা অতিক্রম করে একটি বিরাট কক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হলো। এটা মহারাণীর কামরা। সকাল বেলা মহারাণী এ কক্ষটিতে বসেন, এখানে বিশ্রাম নেন। সামনে এগিয়ে চন্দ্রামুখী রাজা ও রাণীর কথার শব্দ শুনলো। তাদের আওয়াজ শুনেই চন্দ্রামুখী দাঁড়িয়ে গেলো। ফিরে যাওয়ার চিন্তা করতেই হঠাৎ শুনতে পেলো, রাজা-রাণী তাকে নিয়েই আলোচনা করছেন। চন্দ্রামুখীর পা আর চললো না। সে পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে গেলো।

মহারাজা বলছেন, চন্দ্রামুখীর রহস্য মাত্র কয়েকজন ছাড়া আর কেউ জানে না। কিন্তু সুলতান গজনবী বিষয়টা জানলেন কীভাবে?

ঃ আমি তো দারুণ বিস্মিত।

ঃ আমার মনে হয়, সোমনাথে এমন কেউ আছে, যে সুলতানের নিকট গোপন খবরাখবর পৌঁছায়।

ঃ এটা নিশ্চিত। কিন্তু এখন খুঁজে বের করতে হবে কে সে গুপ্তচর।

ঃ এমনো হতে পারে, সে সুলতান থেকে কোনো প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছে।

ঃ হ্যাঁ, তাও হতে পারে। আমি অনেক রাত এ চিন্তায় কাটিয়ে দিয়েছি। কিন্তু তার কোনো সমাধান পাইনি। চন্দ্রামুখীর এ রহস্য তো তুমি, আমি, ধর্মপাল আর শোবাদেবী ছাড়া অন্য কেউ জানে না। আমরা চারজনই তা জানি। আমাদের কেউ তা প্রকাশ করে দিবে তা তো ভাবতেই পারি না। তাও আবার বারো-তেরো বছর পর।

ঃ চুপ করুন, কে যেনো আসছে। অসতর্কতার কারণে চন্দ্রামুখীর হাত দরজায় পড়লো। তাতে ক্ষীণ আওয়াজ হলো। মহারাজা ও মহারাণী নীরব হয়ে দরজার দিকে ফিরে তাকালেন।

চন্দ্রামুখী অনুশোচনাভরা অন্তর নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। মহারাণী উচ্চস্বরে বললেন, কে? এবার আর চন্দ্রামুখী নীরব দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না। সে কক্ষে প্রবেশ করলো। তারা চন্দ্রামুখীকে দেখে আনন্দিত হলেন। মহারাণী বললেন, এসো মা। রাজকুমারী চন্দ্রামুখী সম্মুখে অগ্রসর হয়ে তাদের পা ছুঁয়ে প্রণাম করলো। তারপর তাদের সম্মুখে অবস্থিত একটি আসনে বসে পড়লো। পরে বললো, আমার কী কথা নিয়ে আপনারা আলোচনা করছিলেন?

মহারাণী অর্থপূর্ণ দৃষ্টি মেলে মহারাজার দিকে তাকালেন আর মহারাজাও মহারাণীর দিকে তাকালেন। মহারাজা বললেন, আমরা বলছিলাম, আজ এখনো তুমি আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করোনি। চন্দ্রামুখী সোহাগী মেয়ের মতো মহারাজার দিকে তাকিয়ে বললো, আব্বাজান! আরো কী আলোচনা করছিলেন?

ঃ হ্যাঁ, আলোচনা করছিলাম, সুলতান গজনবী তোমাকে পেতে চান। এ জন্যই তিনি সোমনাথে এসেছেন।

মহারাণী চাপা ক্ষোভের স্বরে বললেন, আপনি এ কী বলতে শুরু করেছেন?

মহারাজা তার ভুল বুঝতে পেরে বললেন, যে কথা আমি বলতে চাচ্ছিলাম না, তা আজ অসতর্কতার সাথে বলে ফেললাম। আমার মন বলছে, তাকে এ কথাটি বলেই দেই। কিন্তু বলি বলি করে আজো বলা হয়নি। আর আজ বলেই ফেললাম।

চন্দ্রামুখী কপট বিস্ময়তার সাথে বললো, আমাকে পাওয়ার জন্যই কি সুলতান এখানে এসেছেন?

ঃ হ্যাঁ, তার একটি চিঠিও আমার নিকট পৌঁছেছে। স্পষ্টভাবে লিখে জানিয়েছেন, যদি রাজকুমারী চন্দ্রামুখীকে তার হাতে তুলে দেয়া হয়, তাহলে তিনি ফিরে যাবেন।

চন্দ্রামুখীর চোখে নিষ্পাপ নির্মল দৃষ্টি। বললো, কিন্তু পিতাজ্বী...!

মহারাজা পিতার স্নেহ-মমতায় ভরা কণ্ঠে বললেন, শোন চন্দ্রামুখী! কোন চিন্তা করবে না। আমি আমার জীবন থাকতে তোমাকে তার হাতে সমর্পণ করব না।

চন্দ্রামুখী নড়ে-চড়ে সোজা হয়ে বসে বললো, কিন্তু যদি পিতাজ্বী! শুধুমাত্র আমাকে বিসর্জন দেয়ার কারণে এ দেশ ও জাতির উপর যে মহাবিপদ এসেছে, তা দূর হয়ে যায়, তাহলে খারাপ কী?

মহারাজা ও মহারাণী চন্দ্রামুখীর এ আত্মত্যাগের মনোভাব দেখে খুব মুগ্ধ হলেন। মহারাণী তার উজ্জ্বল ললাটে চুমু খেলেন। তারপর বললেন, আমি আমার মেয়েকে কখনো বলি দিতে পারি না।

ঃ কিন্তু ভেবে দেখা দরকার। রাজ্য ধ্বংসের তীরে দাঁড়িয়ে আছে। মুসলমান ম্লেচ্ছ বাদশাহ তার একগুয়েমীতে অটল। একদিনের যুদ্ধে শত শত নারী বিধবা হয়েছে। হাজার হাজার সন্তান পিতৃহারা হয়েছে। আগামী কাল কী হবে, তা ঈশ্বরই ভালো জানেন।

মহারাজা বললেন, মেয়ে আমার! কোনো চিন্তা করো না। হাজার নয়, প্রয়োজনে লাখো রাজপুতের বিনিময়ে হলেও আমি কিছুতেই তোমাকে সেই ম্লেচ্ছ সুলতানের হাতে তুলে দিতে পারি না, পারবো না।

চন্দ্রামুখী বললো, ঈশ্বর না করুন যদি আমাদের বাহিনী পরাজয় বরণ করে, তাহলে...?

ঃ তাহলে আমরা তা-ই করবো, যা আমার পূর্বপুরুষরা করেছেন। আমরা আমাদের স্ত্রী-সন্তানদের অগ্নিকুণ্ডে বিসর্জন দিয়ে নিজেরা যুদ্ধ করতে করতে নিঃশেষ হয়ে যাবো।

ঃ পিতাজ্বী! একটু চিন্তা করে দেখুন, সে পরিণতি কতো কঠিন।

ঃ বীর-বাহাদুরদের ইতিহাস-ঐতিহ্য এমনই হয়ে থাকে। তারা আত্মবিসর্জন দিতে প্রস্তুত থাকে; কিন্তু নিজেদের ইজ্জত-আবরুতে বিন্দুমাত্র আচড় লাগতে দেয় না।

ঃ এটা এক রহস্যময় ব্যাপার।

মহারাণী দ্রুত সমাধান করতে গিয়ে বললেন, কিসের আবার রহস্য?

মহারাজা তার ভুল বুঝতে পারলেন। তিনি সতর্ক হয়ে বললেন, মুসলমানরা চিন্তা-চেতনায় ভালো হয় না। মেয়ে আমার! তুমি এসব কিছু একেবারেই জানো না।

চন্দ্রামুখী বুঝে ফেললো, মহারাজা তার নিকট সেই রহস্যের বিষয়টি বলতে চান। কিন্তু মহারাণীর কারণে বলতে পারছেন না। মহারাণী বলতে দিচ্ছেন না। এ রহস্যের বিষয়টি জানতে পারলেই চন্দ্রামুখী বুঝতে পারতো, কে সে? কী তার আসল পরিচয়? কেনোই বা সুলতান গজনবী তাকে পেতে চান?

তার দুঃচিন্তা হ্রাস পেলো না। বরং আরো কয়েকগুণ বেড়ে গেলো। কারণ এর আগেও দু'বার সে শুনেছে, সুলতান গজনবী তাকে পেতে চান। আজ স্বয়ং মহারাজার মুখে তা শুনতে পেলো।

মহারাণী বললেন, যাও, এখন তুমি যাও।

চন্দ্রামুখী বুঝে ফেললো, এখন আর অতিরিক্ত কিছু শোনা যাবে না। তাই ওঠে মহারাজা ও মহারাণীকে প্রণাম করে চলে গেলো।

বত্রিশ.

সকালে সুলতান শুনতে পেলেন রাতে বুরহানের বুদ্ধিমত্তা ও সতর্কতার কারণে শুধু যে আড়াইশ রাজপুত নিহত হয়েছে তা-ই নয়, বরং বেশকিছু নৌকাও মুজাহিদরা দখল করে নিয়েছে। সুলতান এ সংবাদ পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। সাথে সাথে বিজলীর মতো এক নতুন চিন্তাও তার ভাবনা জগতে চমকে ওঠলো। তিনি ভাবলেন, এ নৌকাগুলোর সাহায্যে সমুদ্রের তীরে আক্রমণ করে সর্বপ্রথম সোমনাথের বন্দর দখল করে নেয়া যায়।

তাই সুলতান সকাল সকাল আলতুনতাশ, আমীর আলী, আরো কয়েকজনকে নিয়ে পরামর্শ করলেন। কিন্তু তারা এ মুহূর্তে বন্দর আক্রমণে মত দিলেন না। বরং আরো শক্তি নিয়ে প্রচণ্ডভাবে কেল্লা আক্রমণেই তাদের অভিমত।

সুলতান তাদের মতামত মেনে নিলেন এবং আজ আবার পূর্ণ শক্তিতে কেল্লা আক্রমণের নির্দেশ দিলে। আলতুনতাশ ও আমীর আলী তাদের নেতৃত্বাধীন বাহিনী নিয়ে ধীরে ধীরে কেল্লার দিকে অগ্রসর হতে লাগলো। মুজাহিদ বাহিনী ফজরের নামাযের জন্য জাগ্রত হয়েছে। সেই কাকডাকা ভোর থেকেই রাজপুতরা কেল্লার পাঁচিলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুজাহিদ বহিনীর অবস্থা, চলাফেরা পর্যবেক্ষণ করছিলো। ইতিমধ্যে সোমনাথ বাহিনীর বড় বড় অফিসাররা বুরুজে এসে পৌছেছে। বুরুজগুলো পাঁচিলের মাঝে মাঝে তৈরি করা হয়েছে। এ বুরুজগুলোতে বসেই যুদ্ধের সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা হয়। সোমনাথের মহারাজাও তার নির্ধারিত বুরুজে এসে বসেছেন। ধর্মপাল, শিকদেবসহ আরো কয়েকজন রাজা-মহারাজা সেই বুরুজে এসে বসলেন।

ধর্মপাল বললেন, আমার মনে হচ্ছে, গতকাল সারা দিন মুসলমানরা যুদ্ধের জন্য তৈরি হয়েছে। আজ তারা অভিনব পদ্ধতিতে কেল্লা আক্রমণ করবে।

মহারাজা বললেন, আমারও এমনই মনে হয়। তবে একথা ভেবে আমার খুব আফসোস হয় যে, আমাদের সৈন্য ও অফিসাররা মুসলমানদের মতো বীর, কষ্ট সহিষ্ণু, নির্ভীক ও সাহসী নয়। কতো আফসোসের কথা, রাজপুতদের সংখ্যা মুসলমানদের তুলনায় কতো বেশি। তারপরও আমরা কেল্লায় আবদ্ধ হয়ে আছি। কেল্লা থেকে বেরিয়ে উন্মুক্ত প্রান্তরে যুদ্ধ করতে পারছি না।

ঃ মুসলমান জাতির সাথে যুদ্ধে পেরে ওঠা কঠিন। এ জাতি যুদ্ধ করাকেও পুণ্যের কাজ মনে করে। শুনেছি, নামায কখনো মুসলমানদের জন্য রহিত হয় না। কিন্তু যুদ্ধের ময়দানে তা রহিত হয়ে যায়। তাছাড়া মুসলমানরা বিশ্বাস করে, মৃত্যুর সময় ও স্থান ঈশ্বর নির্ধারিত করে রেখেছেন। সুতরাং মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে সে অবশ্যই নির্ধারিত সময়ে নির্ধারিত স্থানে এসে পৌঁছবেই। কোনো শক্তি তাকে আটকে রাখতে পারবে না। আর যার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসেনি, কেউ তাকে মারতে পারবে না। এ কারণে মুসলমানরা অত্যন্ত বীরত্বের সাথে লড়াই করে। তারা বিশ্বাস করে, যদি মৃত্যুর সময় এসে যায়, তাহলে কেউ তাকে বাঁচাতে পারবে না। আর যদি মৃত্যুর সময় না এসে থাকে, তাহলে সে মরবে না। বরং অন্যদের মারবে। তারা আরো বিশ্বাস করে, তারা যদি এসব ধর্মযুদ্ধে শহীদ হয়, তাহলে তাদের জীবনের সকল গুনাহ্ মাফ হয়ে যায়। আর যদি বেঁচে থাকে, তাহলে তারা অনেক পুণ্যের অধিকারী হয় আর তাদের গাজী বলা হয়। অথচ আমাদের হিন্দু ধর্মের বিশ্বাস হলো, মানুষ যা-ই করবে, অবশ্যই তার শাস্তি তাকে ভোগ করতে হবে। ঈশ্বর কিছুতেই তাকে ক্ষমা করবেন না। আর এ শাস্তির পদ্ধতি হলো, বিভিন্ন প্রকার প্রাণীর দেহে প্রবেশ করে বার বার তার জন্ম ও মৃত্যু হবে। তাছাড়া আরেকটি পার্থক্য হলো, আমাদের এ যুদ্ধ ধর্মযুদ্ধ নয়। তাই যুদ্ধ করে মরলেও আমাদের পাপের বোঝা হ্রাস পাবে না। এজন্যই আমাদের সৈন্যরা প্রাণ বাঁচিয়ে যুদ্ধ করে আর মুসলমানরা প্রাণ উৎসর্গ করতে পাগলপারা হয়ে যুদ্ধ করে।

ঃ আপনি ঠিক বলেছেন। তাহলে কি আমাদের ধর্মে কোনো ত্রুটি রয়েছে?

ঃ বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা চিন্তা-গবেষণা করলে হয়তো কিছু ত্রুটি চিহ্নিত করা যেতে পারে। কিন্তু এখন সে সব আলোচনা রাখুন। দেখুন ঐতো মুসলমানরা আক্রমণ শুরু করে দিয়েছে।

এবার সবার দৃষ্টি রণক্ষেত্রের দিকে লুটিয়ে পড়লো। মুসলমানরা অত্যন্ত দৃঢ় পদবিক্ষেপে অপূর্ব শৃঙ্খলার সাথে কেল্লার দিকে এগিয়ে আসছে। রাজপুতরা পাঁচিলের উপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তা বিস্ফারিত নয়নে দেখছে। মুসলমানরা একেবারে নিকটে চলে এলে হঠাৎ রাজপুতরা সমস্বরে চীৎকার শুরু করে দিলো। তাদের চীৎকারে সোমনাথ মন্দির ও শহরের সাধারণ লোকেরা আতঙ্কে থর থর

করে কাঁপতে শুরু করে। কারণ, তারা রাজপুতদের সাহসিকতা ও বীরত্বের প্রতি একটুও আস্থা রাখতে পারছে না। তারা দেখছে, মুসলমানদের থেকে রাজপুতদের সংখ্যা ছয়গুণ বেশি। অর্থাৎ একজন মুসলমানের মোকাবেলায় ছয়জন রাজপুত রয়েছে। তা সত্ত্বেও রাজপুতরা উন্মুক্ত প্রান্তরে গিয়ে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করতে পারছে না। তাদের নিশ্চিত বিশ্বাস, যদি কোনোভাবে মুসলমানরা কেল্লার ভেতরে প্রবেশ করতে পারে, তাহলে রাজপুতদের কচুকাটা করে শেষ করবে। আর কেল্লা পদানত করতে পারলে মন্দির আর শহর তো এমনিতেই পদানত হয়ে যাবে।

রাজপুতরা শোরগোল আর চীৎকার করছে আর মুসলমান মুজাহিদরা ধীরে ধীরে সামনে অগ্রসর হচ্ছে। যখন তারা এতো নিকটে পৌঁছে গেলো যে, তীর পাঁচিলের উপর দাঁড়িয়ে থাকা রাজপুতদের বিদ্ধ করতে সক্ষম, ঠিক তখনই হঠাৎ সবাই একযোগে ধনুক হাতে তুলে নিয়ে তূনীরে তীর সংযোজন করেই ছুঁড়ে মারলো। রাজপুতরা পাঁচিলে দাঁড়িয়ে চীৎকার করছিলো।

যারা তীর উড়ে আসতে দেখলো, তারা দেয়ালের আড়ালে বসে পড়লো। তারা বেঁচে গেলো। আর যারা দাঁড়িয়ে রইলো, তারাই তীরবিদ্ধ হয়ে চীৎকার করে লুটিয়ে পড়লো। এ কাণ্ড দেখে সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেলো। আহতদের সরিয়ে নিয়ে রাজপুতরা পাঁচিলের উপর থেকে প্রস্তর নিক্ষেপ শুরু করলো।

আজ মুসলমান মুজাহিদরা কেনো জানি অগ্রসর হচ্ছে না। একই স্থানে দাঁড়িয়ে থেকে নিক্ষিপ্ত পাথর প্রতিহত করছে আর তীর নিক্ষেপ করছে।

দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত এমনিভাবে চললো। পাথরের আঘাতে মুসলমানরা আর তীর বিদ্ধ হয়ে রাজপুতরা একে একে আহত হতে লাগলো। তবে মুসলমানদের চেয়ে রাজপুতদের ক্ষতি অনেক বেশি হচ্ছে।

যুদ্ধের শুরুতে প্রথম সারির মুজাহিদরাই তীর নিক্ষেপ করে। কিন্তু ধীরে ধীরে অন্যান্য সারি থেকেও মুজাহিদরা তীর নিক্ষেপ করতে শুরু করে। মুজাহিদরা মুষল ধারায় বৃষ্টির ন্যায় তীর বর্ষণ করতে লাগলো। ফলে রাজপুতদের জন্য পাঁচিলে দাঁড়িয়ে থাকা বা উঁকি দিয়ে দেখা একেবারে অসম্ভব হয়ে গেলো। কেউ একটু উঁকি দেয়ার চেষ্টা করলেই শাঁ করে তীর এসে তার কপালে বিদ্ধ হয়। এমন ভয়াবহ পরিস্থিতিতে রাজপুতরা পাঁচিলের আড়ালে বসে পড়লো। মুজাহিদরা এবার এক চমৎকার সুযোগ পেয়ে গেলো। তারা দ্রুত ঘোড়া হাঁকিয়ে পাঁচিলের নিকট গিয়ে পৌঁছলো। তবে বেশ কিছু মুজাহিদ স্ব স্ব স্থানে দাঁড়িয়ে থেকে মুষলধারায় তীরবর্ষণ করতে থাকলো। ফলে রাজপুতরা উঁকি দিয়ে মুজাহিদদের অবস্থা ও অবস্থান দেখার সুযোগ পেলো না। আজ মুজাহিদরা সাথে করে রেশমি সুতার মজবুত দড়ি ও সিঁড়ি নিয়ে এসেছে। তারা পাঁচিলের নীচে

পৌঁছেই চার দিকে ছড়িয়ে পড়ে। কিছু মুজাহিদ ঘোড়ার পিঠে দাঁড়িয়ে সিঁড়ি ও দড়ি পাঁচিলের উপর ছুড়ে মারে। পাঁচিলের দেয়ালে স্থানে স্থানে চূড়া তৈরি করা ছিলো। তাই কিছু দড়ি ও সিঁড়ি তাতে আটকে গেলো। আর সাথে সাথে জানবাজ মুজাহিদরা মাথায় ঢাল নিয়ে দাঁতে তলোয়ার কামড়ে ধরে দড়ি আর সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত উপরে উঠতে শুরু করলো।

রাজপুতরা এখন পাঁচিলের আড়ালে বসে আছে।

মুজাহিদদের অবস্থা তারা কিছুই জানে না। তাদের ধারণা, মুজাহিদরা পাঁচিলের অদূরে দাঁড়িয়ে শুধুই তীর নিক্ষেপ করছে।

কিন্তু তারা হঠাৎ দেখতে পেলো, মাথায় কালো ঢাল নিয়ে কে যেনো পাঁচিল টপকে ধপাস করে কেল্লার মাঝে এসে পড়লো। দেখে তারা একেবারে হতবাক্, কিংকর্তব্যবিমূঢ়। তারা ভয়ে চমকে ওঠলো। তারা কিছুই বুঝতে পারলো না। তারপর উন্মুক্ত তারবারী হাতে কয়েকজন মুজাহিদকে ধাবমান অসস্থায় দেখেই চীৎকার জুড়ে দিলো।

মুজাহিদরা বিদ্যুদ্বেগে ছুটে এসে আক্রমণ করে বসলো। কয়েকজন মুজাহিদের এ দুঃসাহস দেখে রাজপুতরা ক্ষীপ্ত হয়ে ওঠলো। তারাও চারদিক থেকে ছুটে এলো। শুরু হলো যুদ্ধ। প্রাণপণ যুদ্ধ করে চললো মুজাহিদ ও রাজপুতরা। তলোয়ারের আঘাতে আর শোরগোল ও চীৎকারের আওয়াজে এক ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি হলো। জনা-পঞ্চাশেক মুজাহিদ পাঁচিলের উপর এসে পৌঁছেছে। রাজপুতরা এদের হত্যা করে পাঁচিলে আরোহনের গর্ব চিরতরে মিটিয়ে দিতে এবং অন্যান্যদের আগমনেরও পথ রুদ্ধ করে দিতে চেষ্টা করলো।

কিন্তু হাজার হাজার রাজপুতের মোকাবেলায় হাতেগনা কয়েকজন জানবাজ মুজাহিদ এমন শৌর্য-বীর্যের সাথে যুদ্ধ করলো যে, রাজপুতরা সামনে দাঁড়াতেই পারলো না। এককেজন মুজাহিদ ক্ষুধার্ত শার্দূলের ন্যায় হুংকার দিয়ে সমবেত রাজপুতদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে নিমেষে তাদের ধরাশায়ী করে অন্যদের উপর হামলা করলো।

মুজাহিদের আক্রমণের মুখে রাজপুতরা দিশেহারা হয়ে গেলো। সিঁড়ি বা দড়ি খুলে দেয়া তো দূরের কথা, নিজেদের জান বাঁচানোই তাদের জন্য মুশকিল হয়ে পড়লো।

এভাবে কিছুক্ষণ যুদ্ধ চলার পর চারদিক থেকে ছুটে দলে দলে রাজপুত এলো। তারা এবার পুরোদমে ঝাঁপিয়ে পড়লো। যুদ্ধ করতে করতে মুজাহিদরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তাদের হাত যেনো আর শক্তি পায় না, পা যেনো ভেঙে পড়তে চায়। তাই তারা ধীরে ধীরে পিছু হটতে লাগলো।

কিন্তু পেছনে যাওয়াও সম্ভব নয়। তাই আরও বীরবিক্রমে ক্ষুধার্ত শার্দূলের

ন্যায় আল্লাহু আকবার ধ্বনি তুলে ঝাঁপিয়ে পড়লো। তাছাড়া সিঁড়ি ও দড়ির সাহায্যে নতুন নতুন মুজাহিদরা একে একে পাঁচিলের উপর উঠে আসছে। সব মিলিয়ে পাঁচিলের উপর একশ বা দেড়শ মুজাহিদ গিয়ে পৌঁছেছে। এ অল্প কয়েকজন মুজাহিদ হাজার হাজার রাজপুতের বিরুদ্ধে কতোক্ষণ টিকে থাকতে পারে! তবুও তারা কম করেনি, পাঁচশ'র মতো রাজপুতকে হত্যা করতে সক্ষম হয়। আহত হয় আটশ'রও বেশি।

মুজাহিদরা একে একে অনেকেই আক্রান্ত হতে লাগলো। অনেকে যুদ্ধ করতেও অক্ষম হয়ে পড়ে। তাদের কেউ কেউ শহীদ হয়ে গেছে। কেউ মাটিতে পড়ে কাতরাচ্ছে। এ সময় যদি অধিক সংখ্যক মুজাহিদ পাঁচিলের উপর উঠতে পারতো, তাহলে এবারের আক্রমণেই কেল্লা পদানত হয়ে যেতো। কিন্তু পাঁচিলের উপর উঠাই বড় সমস্যা। তাই যারা পৌঁছেছিলো, তারা আক্রান্ত হয়ে পড়ছিলো। আর দু'চারজন যারা দড়ি কিংবা সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছিলো, তারাও সংখ্যায় অল্প হওয়ার কারণে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। মুজাহিদদের এ করুণ দশা দেখে রাজপুতরা হই হই চীৎকার করে চার দিক থেকে নব উদ্দমে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং যে কয়জন তখনো যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলো, তাদের উপর সাঁড়াশি আক্রমণ চালিয়ে তাদের শহীদ করতে থাকে।

মুজাহিদরা তাদের প্রতিহত করতে করতে পিছু হটতে লাগলো। তারা একেবারে পাঁচিলের নিকট গিয়ে পৌঁছলো। মুজাহিদরা এবার শেষবারের মতো আবার আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিয়ে রাজপুতদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং অনেককে ধরাশায়ী করতে করতে সামনের দিকে এগিয়ে যায়।

রাজপুতরাও আবার পাল্টা আক্রমণ করে ক্লান্ত মুজাহিদদেরকে শহীদ করতে লাগলো। কিছু কিছু মুজাহিদ ইতিমধ্যে দড়ি ও সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এলো। এ যুদ্ধে দেড়শ মুজাহিদ শাহাদাতবরণ করে। প্রায় দু হাজার সাতশ' রাজপুত নিহত হয়। আহত হয় প্রায় দেড় হাজার। ইতিমধ্যে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। পশ্চিমাকাশে সূর্য মলিন হয়ে এলো। সেদিনের মতো যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে মুজাহিদ বাহিনী তাঁবুতে ফিরে এলো।

তেত্রিশ.

রাজকুমারী চন্দ্রামুখী এক দু'টি নয়– বেশ কয়েকটি সূত্রে শুনতে পেয়েছে, তার সাথে এক রহস্য জড়িয়ে আছে। কিন্তু কেউ তাকে সে রহস্য খুলে বলেনি। যদিও শোবাদেবী একবার বলতে চেয়েছিলেন; কিন্তু পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছিলো যে, তিনি আর বলতে পারেননি। এ চিন্তা রাজকুমারী চন্দ্রামুখীকে অস্থির ও বেচাইন করে তোলে। কিন্তু যখন শুনলো, সুলতান শুধু তার জন্যই

সুদীর্ঘ দুর্গম পথ অতিক্রম করে সোমনাথ আক্রমণ করতে এসেছেন, তখন তার সেই অস্থিরতা আরো বেড়ে যায়। এখন আবার কয়েক দিন যাবৎ কামিনী বার বার আসছে। মনে হচ্ছে, সে তার পূর্বের ভুলসমূহ পরিমার্জনের জন্যই আনাগোনা করছে। কিন্তু চন্দ্রামুখী তার ব্যাপারে স্বচ্ছ হতে পারছে না। কারণ, ধর্মপাল তাকে বার বার কামিনী ও শিকদেব-এর ব্যাপারে সতর্ক থাকতে বলেছেন। তাই চন্দ্রামুখী তাদের ব্যাপারে সদাসতর্ক থাকে। যদিও কামিনী এমন কিছু করছে না, যার কারণে কোনো প্রকার সন্দেহ জাগতে পারে, তবুও চন্দ্রামুখী তাদের ব্যাপারে সতর্ক।

এক বিকালের কথা। সূর্য তখন পশ্চিমাকাশে হেলে পড়েছে। চারদিকে রোদের সোনালী আভার ছড়াছড়ি। চন্দ্রামুখী ও কামিনী বসে কথা বলছে।

কামিনী বললো, রাজকুমারী! তুমি কী নতুন কোনো কথা শুনেছো?

ঃ এই মুসলমানরা সোমনাথ আক্রমণ করার পর থেকে অনেক উড়ো কথাই শুনছি। এগুলো আমার বিশ্বাস হয় না।

ঃ আমিও ঐসব উড়ো কথায় বিশ্বাস করি না। কিন্তু আমি যা শুনেছিলাম, রাতে তা সত্যই বাস্তবে দেখতে পেলাম।

ঃ তাহলে কি কোনো নতুন কথা প্রচার হয়েছে?

ঃ মুসলমানরা যখন পাঁচিলে উঠে পড়েছিলো, তখন নাকি কিছু মুসলমান কেল্লায় থেকে গিয়েছিলো।

রাজকুমারীর দু'চোখ বিস্ময়ে ভরে ওঠলো। বললো, এটা কি সম্ভব?

ঃ আমি শুনে প্রথমে বিশ্বাস করিনি। কিন্তু...।

ঃ কিন্তু কী?

ঃ নিজ চোখে দেখার পরও অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে।

ঃ আচ্ছা, তুমি কী দেখেছো?

ঃ গত রাতে আমি তোমার নিকট এসেছিলাম। জ্যোৎস্নার আলোতে চারদিক তখন উদ্ভাসিত। সে আলোতে কালো পোশাকে আবৃত এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম।

রাজকুমারী বিস্ময় প্রকাশ করে বললো, কালো পোশাকে আবৃত?

ঃ হ্যাঁ, মাথা থেকে পা পর্যন্ত সর্বাঙ্গ কালো পোশাকে আবৃত। আমি শুনেছি, মুসলমানরা আত্মগোপন করে আছে। তারা কালো পোশাকে আবৃত হয়ে রাতে বেরোয় আর অন্ধকার রাত্রে কিসের সন্ধানে যেনো ঘুরে বেড়ায়।

ঃ আমি কথাটা এই মাত্র তোমার মুখে শুনতে পেলাম।

ঃ আমি তো ধারণা করেছিলাম, আমি ও অন্যরা যখন শুনেছি, তুমিও বুঝি শুনে ফেলেছো।

ঃ আমাকে আজো কেউ বলেনি।

ঃ হয়তো মহারাজা তাদের নিষেধ করে দিয়েছেন। তাই তারা বলেনি।

ঃ না, মহারাজা নিষেধ করবেন কেনো?

ঃ তুমি ভয় পাবে বলে।

ঃ এ কালো পোশাকের মানুষগুলোর সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী?

ঃ আছে। শুনেছি তারা রাতের অন্ধকারে তোমাকে তুলে নিয়ে যেতে চায়।

রাজকুমারীর চেহারায় দুশ্চিন্তার এক কালো রেখা ফুটে ওঠলো। কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললো, কিন্তু মুসলমানরা কি এতো সাহস করতে পারে?

ঃ এটা তো কোনো আশ্চর্যের বিষয় নয়। মুসলমানরা সব কিছুই করতে পারে।

ঃ আচ্ছা, তুমি যখন কালো পোশাকে আবৃত ব্যক্তিকে দেখলে, তখন...।

ঃ ভয়ে আমার গলা শুকিয়ে গেলো। কণ্ঠ শব্দ হারিয়ে ফেললো। শরীর থর থর করে কাঁপতে লাগলো।

ইতিমধ্যে রাজকুমারীর আরো দু'জন সখী এসে উপস্থিত হলো। তাদের একজন বললো, তোমরা কি তাহলে কালো পোশাকে আবৃত মুসলমানদের কথা আলোচনা করছিলে?

কামিনী বললো, হ্যাঁ, তাহলে তোমরাও কি তাদের কথা শুনেছো?

ঃ হ্যাঁ, শুনেছি, কয়েকজন দাসী নাকি তাদেরকে দেখেছে।

ঃ কখন দেখেছে?

ঃ মধ্য রাতে। বেশ উঁচা-লম্বা মানুষ।

ঃ ঠিক। আমি তো দেখে প্রথমে ভূত মনে করেছিলাম।

ঃ সবাই তাকে ভূত মনে করেছে। দিনে এ কথা শুনেও ভয়ে আমার শরীর কাঁপতে লাগলো। আর তুমি বুঝি রাতে তাকে দেখে এখনো বেঁচে আছো।

ঃ আর তখন আমি একা ছিলাম।

রাজকুমারী বললো, তুমি তাকে কোন্ দিকে যেতে দেখেছিলে?

ঃ সে হয়তো আমার পদধ্বনি শুনতে পেয়েছিলো। আমার দিকে ফিরে তাকিয়েছিলো। মুখে একটা কালো মুখোশ। আমি তাকে দেখেই ভয়ে কাঁপতে লাগলাম। আমার মনে হচ্ছিলো, এই বুঝি সে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। আমার চোখ বন্ধ হয়ে গেলো। কিছুক্ষণ পর ভয়ে ভয়ে যখন চোখ মেলে তাকালাম, তখন দেখি সে আর নেই, যেনো বাতাসে মিশে গেছে।

ঃ আহা! তুমি যদি চীৎকার শুরু করে দিতে।

ঃ আমার শরীরে তো তখন এতোটুকু শক্তি-সাহস ছিলো না।

মেয়েটি বললো, কিন্তু এ মুসলমানদের সাহসিকতার কথা কি একটু ভেবে দেখেছো! তারা কোন্ সাহসে কেল্লার ভেতর লুকিয়ে আছে! ঈশ্বর জানেন, দিনের বেলা তারা কোথায় থাকে আর কোথায় খাওয়া-দাওয়া করে।

কামিনী বললো, প্রথমে শুনে আমার বিশ্বাস হয়নি। কিন্তু রাতে যখন স্বচক্ষে দেখলাম, তখন থেকে আমার আর ভয়ের অন্ত নেই। ঈশ্বর জানেন, মহারাজা আর মহারাণী এর কি বিহিত করেছেন।

আরেক মেয়ে বললো, শুনেছি, গোপনে সব ব্যবস্থা করা হচ্ছে। রাজকুমারী যেনো ভয় না পায়, তাই তারা সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। সবাইকে বলে দিয়েছেন, কেউ যেনো রাজকুমারীকে না বলে।

কামিনী বললো, রাজকুমারী যেনো সতর্ক থাকে, এ লক্ষ্যেই আমি বলে দিয়েছি। কারণ, সেই রহস্যময় লোকগুলো সর্বদা তাকে চোখে চোখে রাখছে।

সূর্য তখন অস্তমিত হয়ে গেছে। দাসীরা কামরায় কামরায় ও রাজপ্রাসাদের উঠানে প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়েছে। রাজকুমারী চন্দ্রামুখী নিজ কামরায় বসে আছে। কালো পোশাকাবৃত সেই অজ্ঞাত লোকটির ভয় তার হৃদয়ে বসে গেছে। ভয়ার্ত কণ্ঠে বললো, কিন্তু লোকটি আমাকে কেল্লার বাইরে নিতে পারবে না।

কামিনী বললো, এ ভরসায় নিশ্চিন্ত থাকা যায় না। তুমি কি শোনোনি, তারা কী দুঃসাহসিকতার সাথে দড়ি বেয়ে কেল্লার পাঁচিলের উপরে উঠে এসে যুদ্ধ করেছে? উপর থেকে নীচে নেমে যাওয়া তো আরো সহজ।

অন্য এক মেয়ে বললো, মুসলমানরা অত্যন্ত দুরন্ত। তাদের সবকিছুই বিস্ময়কর। আর এ বিষয়টিও কি আশ্চর্যের নয় যে, তাদের কয়েকজন এখনো কেল্লায় লুকিয়ে আছে? অথচ কেউ তাদের ধরতে পারছে না।

এক পরিচারিকা এসে বললো, রাজকুমারীজ্বী! মহারাণী আপনাকে ডাকছেন।

রাজকুমারী চন্দ্রামুখী বললো, হ্যাঁ, আমি নিজেই তাঁর কাছে যাবো যাবো করছি। চলো যাই।

চন্দ্রামুখী উঠে দাঁড়ালো। কামিনী ভয় বিজড়িত দৃষ্টিতে অনুকম্পা প্রার্থীনীর মতো তাকিয়ে বললো, মনে থাকে যেনো সেই কালো পোশাকাবৃত ব্যক্তির কথা। তবে মহারাণীকে কিছু বলো না।

চন্দ্রামুখী বললো, বলবো। তবে তোমাদের কারো নাম বলবো না।

কামিনী বললো, হ্যাঁ, তাই করো...। তবে না বললেই ভালো হতো। আর করবেই যখন, তখন কিন্তু আমাদের নাম বলবে না। অন্যথায় মহারাণী আমাদের ব্যাপারে খারাপ ধারণা করবেন।

ঃ তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। আমি কারো নাম বলবো না।

দাসীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে চন্দ্রামুখী মহারাণীর নিকট গিয়ে পৌঁছলো। প্রথানুযায়ী দু'হাতে মহারাণীর পদধূলি নিলো। মহারাণী তাকে আশির্বাদ দিয়ে পাশে বসালেন। বললেন, আজ কেনো জানি আমার মনটা খুবই অস্থির লাগছে। মন চাচ্ছে, আজ তোমাকে মন ভরে পেয়ার করি, আদর করি। বলেই

মহারাণী রাজকুমারীকে কোলে টেনে নিয়ে তার কপালে চুমু খেতে লাগলেন।

চন্দ্রামুখী বললো, আম্মাজান! আপনি কি সেই কালো পোশাকাবৃত মুসলমানদের কথা শুনেছেন?

মহারাণীর চেহারায় উদ্বেগের রেখা ফুটে ওঠলো। জিজ্ঞাসা করলেন, তাহলে তুমি শুনে ফেলেছো?

ঃ হ্যাঁ, শুনেছি। তবে আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।

ঃ এ ধরনের উদ্ভট কথা বিশ্বাস না করাই উচিত। কিন্তু তা তোমাকে কে বললো?

ঃ আমার তো মনে হয় সব দাসীই এই খবর জানে।

ঃ মেয়েদের নাড়ীতে কথা কমই হজম হয়। কোনো কথা শুনলে তারা তা না বলে থাকতে পারে না। বেটী! আমিও শুনেছি; কিন্তু দেখিনি। তাই আমি এ ধরনের উদ্ভট কথা বিশ্বাস করি না। তুমিও বিশ্বাস করো না।

রাজকুমারী চন্দ্রামুখী বুঝে ফেললো, নিশ্চয়ই এ কথার কোনো ভিত্তি আছে। তাই বললো, আম্মাজান! আপনি দাসীদের বলে দিন, তারা যেনো রাতে হুঁশিয়ার থাকে।

ঃ আমি আগেই তাদের দিক-নির্দেশনা দিয়েছি, সারারাত যেনো প্রহরা থাকে। দশ-পনেরজনের গ্রুপ করে দেওয়া হয়েছে। তারা প্রত্যেক কামরা, উঠান ইত্যাদি স্থানগুলোতে সারা রাত প্রহরা দিয়ে থাকে।

ঃ তাহলে কোনো ভয়ের কারণ নেই।

আরো কিছু বিষয় আলোচনার পর চন্দ্রামুখী তার কামরায় ফিরে এলো। খাওয়া-দাওয়ার পর সে পায়চারি করতে বাগানে গেলো। জ্যোৎস্না রাতের পৃথিবী দারুণ চমৎকার। আকাশ থেকে গলে গলে যেনো রূপা পড়ছে। স্নিগ্ধ আলোয় উদ্ভাসিত গোটা দুনিয়া। দশ-পনেরজন দাসী ও সখীদের দ্বারা পরিবেষ্টিতা হয়ে চন্দ্রামুখী বাগানে পায়চারি করতে লাগলো।

কিছুক্ষণ পায়চারির করার পর চন্দ্রামুখী শয়নকক্ষে ফিরে এলো এবং রাতের পোশাক পরে কোমল বিছানায় গা এলিয়ে দিলো।

চন্দ্রামুখী সাধারণত শোয়ার পরই ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু আজ সে যা কিছু শুনেছে, তার জন্য নানা দুশ্চিন্তা তাকে এমনই অস্থির করে তুললো যে, নিদ্রা যেনো কোথায় পালিয়ে গেছে। রাজকুমারী বিছানায় একা একা ছটফট করছে। বার বার এপাশ ওপাশ করছে।

তার মনে একই দুশ্চিন্তা বার বার উদয় হচ্ছে, এই বুঝি কালো পোশাকাবৃত কেউ এসে তাকে তুলে নিয়ে গেলো। এই বুঝি তার অস্পষ্ট ধ্বনি শুনা যাচ্ছে। এ ধরনের চিন্তা তার ঘুম তাড়িয়ে নিয়ে গেলো।

অর্ধরাত অতিবাহিত হওয়ার পর ধীরে ধীরে তার চোখে ঘুম নেমে এলো।

বেশ কিছুক্ষণ ঘুমানোর পর হঠাৎ তার চোখ খুলে গেলো। দেখলো, এক কালো পোশাকাবৃত সুঠাম শক্তিশালী ব্যক্তি তার উপর ঝুকে আছে। ভয় আর আতঙ্কে তার শরীর কাঁপছে। তার উন্মিলিত চক্ষু খুলে গেলো। তারপর অনুভব করলো, সেই কালো পোশাকাবৃত ব্যক্তিটি তাকে মজবুত হাতে কোলে তুলে নিলো। অস্পষ্ট একটু আর্তচীৎকারের পরই সে অচেতন হয়ে গেলো।

চৌত্রিশ.

প্রভাতের নির্মল আভা ছড়িয়ে পড়ার পর রাজকুমারী চন্দ্রামুখীর পরিচারিকা ও সেবিকারা এসে তার শয়নকক্ষের বাইরে দাঁড়িয়ে রইলো। তারা অপেক্ষা করছে, কখন রাজকুমারীর নিদ্রাভঙ্গ হবে আর কখন তাদের ভেতরে প্রবেশের জন্য ডাকবে। তারা নীরবে দাঁড়িয়ে আছে।

সাধারণত সূর্য উদয় হওয়ার পূর্বে রাজকুমারী তাদের ডাক দেয়। তার প্রতিদিনের অভ্যাস, ঘুম ভাঙার পর শয়নের পোশাক খুলে প্রয়োজনাদি সমাধা করে স্নান সেরে নেয়। কিন্তু আজ কী হলো! সূর্য উদিত হয়ে গেছে, তবুও রাজকুমারীর ঘুম ভাঙছে না; কাউকে ডাকছেও না। ইতিপূর্বে এমন ঘটনা কখনো ঘটেনি। তাই পরিচারিকা-সেবিকারা অস্থির ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে একে অপরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো। কিন্তু কারো মুখে কোনো কথা নেই, পাছে তাদের কথা শুনে রাজকুমারীর ঘুম ভেঙে যায়। তাহলে তারা রাজকুমারীর রোষানলে নিপতিত হবে।

এ অবস্থায় কয়েক ঘন্টা চলে গেছে। এবার পরিচারিকা-সেবিকাদের মাঝে চরম চাঞ্চল্য দেখা দিলো। তাদের একজন বললো, হায় দুর্ভাগ্য, রাজকুমারীর শরীর তো খারাপ হয়ে যায়নি!

আরেকজন বললো, নিশ্চয়ই কিছু একটা হয়েছে। তা না হলে তিনি সেই কখন ঘুম থেকে জাগ্রত হতেন!

তৃতীয়জন বললো, দরজায় আওয়াজ দেয়া দরকার।

চতুর্থজন বললো, না। হতে পারে রাতে ঠিকমত ঘুম হয়নি। তাই এখন ঘুমাচ্ছে।

পঞ্চমজন বললো, কিন্তু এখন তো মহারাণীর সাথে সাক্ষাতের সময় হয়েছে। যদি রাজকুমারী মহারাণীর নিকট না যায়, তাহলে তো মহাবিপদ।

ষষ্ঠজন বললো, কিন্তু তাই বলে তো আমরা জাগাবার দুঃসাহস করতে পারি না।

এধরনের আলোচনায় কিছু সময় অতিবাহিত হয়ে গেলো। তখনো রাজকুমারী তাদের কাউকে ডাকলো না। দেখতে না দেখতে রাজকুমারীর কয়েকজন বান্ধবীও এসে হাজির হলো। তাদের মধ্যে কামিনীও আছে। কামিনী জিজ্ঞেস করলো, রাজকুমারী কোথায়?

এক দাসী ওষ্ঠাধারে অঙুলি স্থাপন করে কণ্ঠস্বর একেবারে ক্ষীণ করে বললো, রাজকুমারীজ্বী এখনো ঘুমিয়ে আছেন।

কামিনী বললো, এখনো ঘুমিয়ে আছে? আশ্চর্য, তোমাদের কেউ গিয়ে কেনো জাগাওনি?

একজন বললো, রাজকুমারী রাগ করতে পারেন। তাই আমরা জাগাইনি।

কামিনী বললো, দাঁড়াও। আমি ভেতরে গিয়ে দেখি, এখনো শুয়ে আছে কারণটা কী?

কামিনী ভেতরে প্রবেশের জন্য পা বাড়াতে না বাড়াতে রব ওঠলো, মহারাণী আসছেন! সবাই যার যার স্থানে দাঁড়িয়ে মাথা অবনত করে দাঁড়িয়ে রইলো। মহারাণী জিজ্ঞাস করলেন, চন্দ্রামুখী কোথায়?

কামিনী বললো, এসে শুনতে পেলাম এখনো ঘুমিয়ে আছে।

মহারাণীর কণ্ঠে এক আকাশ বিস্ময়। বললেন, এখনো ঘুমিয়ে আছে! কেনো? শরীর খারাপ হয়নি তো!

কামিনী বললো, ঈশ্বরই জানেন?

মহারাণী বললেন, তোমরা তো সব গাঁধা। বলেই মহারাণী রাজকুমারীর শয়নকক্ষে প্রবেশ করলেন। সবার আগে তার দৃষ্টি রাজকুমারীর বিছানার উপর গিয়ে পড়লো। বিছানা শূন্য। খা খা করছে। এ দৃশ্য দেখে মহারাণীর চেহারা রক্তশূন্য হয়ে গেলো। সখীদের প্রতি ফিরে কম্পমান কণ্ঠে বললেন, চন্দ্রামুখী কোথায়?

সবাই দেখলো, রাজকুমারীর বিছনা খালি। কামরায় কেউ নেই। তারা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলো। স্থানুর মত স্থির হয়ে গেলো তাদের চিন্তা।

মহারাণী পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কী জানো না চন্দ্রামুখী কোথায়? কেউ জানে না রাজকুমারী চন্দ্রামুখী কোথায়। তাই তারা উত্তরে কী বলবে তা বুঝে উঠতে পারছে না। ভয়ে তাদের জিহ্বা যেনো কাঠ হয়ে গেছে।

সাহস করে এক পরিচারিকা বললো, মহারাণীজ্বী! আমরা কেউ কিছুই বলতে পারি না। আমরা কিছুই জানি না।

মহারাণী বললেন, তোমরা কখন থেকে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছো?

এক পরিচারিকা বললো, সূর্যোদয়ের আগ থেকে।

মহারাণী বললেন, কিন্তু সে যদি জাগ্রত হতো তাহলে...। ঠিক তখন মহারাণীর দৃষ্টি কক্ষে বিছানো ফরাশের এক পায়ের দাগের উপর পড়লো। তিনি অগ্রসর হয়ে সে দাগের উপর ঝুঁকে দেখলেন। অজ্ঞাত এক আতঙ্ক তার সারা দেহে ছড়িয়ে পড়লো। আতঙ্কভরা দৃষ্টিতে বললেন, দেখোতো পায়ের দাগটি কেমন?

পরিচারিকা আর সখীরা এসে দাগটি দেখতে লাগলো। স্পষ্ট পায়ের দাগ। বেশ বড়। এটা কিছুতেই চন্দ্রামুখীর পায়ের দাগ নয়।

কামিনী বললো, মনে হচ্ছে, এটা কোনো পুরুষের পায়ের দাগ। কালো পোশাকাবৃত মুসলমানরা তাদের মনোবাঞ্ছা পুরণ করে ফেলেছে।

মহারাণীর চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। তার দু'চোখে আতঙ্ক ফুটে ওঠলো। শরীল থর থরে কাঁপতে লাগলো। অস্ফুট কণ্ঠে বললেন, আহ! হয়তো ম্লেচ্ছ মুসলমানরা আমাদের চন্দ্রামুখীকে নিয়ে গেছে। পরম দেবতা... হে পরম দেবতা! আমাকে সাহায্য করো। আমাকে বাঁচাও...। মহারাণী সংজ্ঞা হারিয়ে পড়ে গেলেন। চন্দ্রামুখীর সখীরা তাকে তুলে নিয়ে চন্দ্রামুখীর বিছানায় শুইয়ে দিলো। তার চেতনা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে লাগলো। ঠিক তখন মহারাজা ও শিকদেব সেখানে এসে উপস্থিত হন। মহারাজা কক্ষের দরজায় দাঁড়িয়েই জিজ্ঞেস করলেন, চন্দ্রামুখী কোথায়?

মহারাজার কণ্ঠস্বর শুনে সবাই দরজার দিকে ছুটে এলো। একজন বললো, মহারাজা! রাজকুমারী কোথায় তা আমরা কেউ জানি না।

শুনে মহারাজা বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললেন, কখন থেকে তাকে পাওয়া যাচ্ছে না?

এক দাসী বললো, অন্নদাতা! আমরা তা বলতে পারছি না।

রাজকুমারীর এক সখী ইতিমধ্যে কী ঘটেছে তা বর্ণনা করলো এবং মহারাণী যে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে আছেন তাও জানালো। মহারাজা দ্রুত মহারাণীর শিয়রে গিয়ে দাঁড়ালেন। মহারাণী অবিন্যস্ত চুলে, বিবর্ণ চেহারায় বিছানায় শুয়ে আছেন। মহারাজার মাথায় তখন ঝিম ধরলো। হতাশা তাকে দিশেহারা করে তুললো। কিন্তু মহারাজা এতো সহজে হেরে যাওয়ার পাত্র নন। নিয়তির সাথে বুঝাপড়া করে সফলতার বিজয়মাল্য ছিনিয়ে আনাই তার সংকল্প। তিনি বললেন, যাও, জলদি যাও। রাজ চিকিৎসককে ডেকে আনো। সাথে সাথে কয়েকজন পরিচারিকা রাজ চিকিৎসকের সন্ধানে ছুটলো।

শিকদেব বললো, মহারাজা! আমি সাবধান করে দিয়েছিলাম। এ-ই আমার আশঙ্কা ছিলো। দেখুন এখন তা-ই ঘটলো।

মহারাজা বললেন, কিন্তু তুমি সেই কালো পোশাকাবৃত লোকটিকে কখন দেখেছিলে?

ঃ বোধ হয় রাতের এক তৃতীয়াংশের পর।

ঃ হায়! যদি তুমি তাকে ধাওয়া করে গ্রেফতার করতে!

ঃ মহারাজা! আমি তো বলেছিলাম আমার মনে হয়েছিলো আমি মানুষের ছায়ার মতো কী যেনো দেখলাম। তারপর মুহূর্তেই তা কোথায় যে অদৃশ্য হয়ে গেলো আমি বুঝতেই পারলাম না।

ঃ তারপর চিন্তা করা দরকার ছিলো, ছায়াটা কার হতে পারে।

ঃ পরে কক্ষে গিয়ে পৌঁছুলে আমার সে কথা স্মরণ হলো। আমি তৎক্ষণাৎ ফিরে এলাম। আমি রাজপ্রাসাদের প্রতিটি স্থান তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম; কিন্তু কাউকে পেলাম না। তখন আমার নিশ্চিত বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিলো, আমি বোধ হয় ভুল কিছু দেখেছিলাম।

ইতিমধ্যে রাজ চিকিৎসক এসে গেলো। দেখতে পন্ডিতের ন্যায় চেহারা। দাড়ি শিখদের মতো লম্বা। দাড়ি ও মাথার চুল সাদা। ভ্রূ কালো। এসেই মহারাজাকে নমস্কার করলো।

মহারাজা বললেন, আপনি এসে গেছেন। ঐ দেখুন রাণী অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন।

রাজ চিকিৎসক গিয়ে মহারাণীর শিয়রে বসলো। হাত ধরে নাড়ি পরীক্ষ করলো। তারপর কিছুক্ষণ মহারাণীর দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। পরে বললো, মনে হচ্ছে, মহারাণী কোনো প্রচণ্ড মানসিক আঘাত পেয়েছেন।

ঃ হ্যাঁ, আপনি সত্য বলেছেন। রাজকুমারীকে ম্লেচ্ছ মুসলমানদের কালো পোশাকাবৃত লোকেরা তুলে নিয়ে গেছে। এ আঘাত মহারাণী সহ্য করতে না পেরে চেতনা হারিয়ে ফেলেছে।

ঃ দ্রুত ঔষধ দিতে হবে। তা না হলে হৃদস্পন্দন থেমে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

মহারাজা, শিকদেব, দাসী ও রাজকুমারীর সঙ্গীরা চিকিৎসকের কথা শুনে বিচলিত হয়ে ওঠলো।

কয়েক মুহূর্তের জন্য সবার অন্তর থেকে রাজকুমারী চন্দ্রামুখীর কথা যেনো উধাও হয়ে গেলো। সবাই মহারাণীর চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়লো।

ডাক্তার একটি বাক্স থেকে একের পর এক অনেকগুলো বোতল বের করলেন। তারপর তার মধ্য থেকে একটি ছোট বোতলের ছিপি খুলে কয়েক ফোটা ঔষধ মহারাণীর মুখে ঢেলে দিলেন। তারপর বোতল বন্ধ করে মহারাণীর চেহারার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

মহারাজা কখনো মহারাণীর দিকে, কখনো চিকিৎসকের চেহারার দিকে তাকাতে লাগলেন। তিনি চিকিৎসককে জিজ্ঞেস করলেন, মহারাণীর অবস্থা কেমন মনে হচ্ছে? ঔষধ কী কাজ শুরু করেছে?

ডাক্তার বললেন, চিন্তার কোনো কারণ নেই। ঔষধের ক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই জ্ঞান ফিরে আসবে।

মহারাজার অন্তরের অস্থিরতা কিছুটা শান্ত হলো। তিনি নিষ্পলক চোখে মহারাণীর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

পঁয়ত্রিশ.

কিছুক্ষণ পরই মহারাণীর চেতনা ফিরে এলো। তিনি চোখ মেলে পিট পিট করে তাকালেন। মনে হলো, তিনি কিছু খুঁজছেন। মহারাজা, শিকদেব, রাজ-চিকিৎসক ও সমবেত দাসী ও অন্যান্যরা মহারাণীর সংজ্ঞা ফিরে আসতে দেখে আনন্দিত হলো।

মহারাজা মহারাণীকে কিছু বলতে উদ্যত হতেই রাজ-চিকিৎসক সাথে সাথে ইঙ্গিতে নিষেধ করলো। বললো, অন্নদাতা! এখনো মহারাণীর মস্তিষ্কে ভাববার শক্তি ফিরে আসেনি। তাই এভাবেই পিট পিট করে তাকাচ্ছে। আর একটু অপেক্ষা করুন।

মহারাজা নীরব হয়ে রইলেন। মহারাণীর চেহারা রক্তহীন, ফ্যাকাশে মনে হচ্ছে। দুশ্চিন্তা তার শরীরের রক্ত চুষে নিয়েছে। ইতিমধ্যে চোখের নীচে কালি পড়ে গেছে। কিছুক্ষণ অবুঝ শিশুর মতো অবাক্ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। ধীরে ধীরে তার দৃষ্টি অর্থবহ হতে লাগলো। তার স্মৃতিশক্তি ও চিন্তাশক্তি ক্রমশ ফিরে আসতে লাগলো।

বেশ কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর মহারাণী অস্ফুট কণ্ঠে কাঁদতে লাগলেন। মহারাজা অস্থির, চঞ্চল হয়ে ওঠলেন। এদিকে রাজ-চিকিৎসক নির্বিকার। মহারাণীর চেহারায় নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে তার হৃদয়ের অবস্থা জানার চেষ্টা করছে। ক্ষণকাল পর বললো, অন্নদাতা! কোনো চিন্তা করবেন না। মহারাণী সুস্থ হয়ে ওঠছেন। শীঘ্রই তিনি কথা বলবেন। তবে তার বিশ্রামের খুব প্রয়োজন।

ঠিক তখন মহারাণীর ওষ্ঠাধর তির তির করে কেঁপে ওঠলো। অস্ফুট কণ্ঠে বললেন, আমি এখন কোথায়?

মহারাজা বললেন, অস্থির হয়ো না, তুমি চন্দ্রামুখীর শয্যায় শুয়ে আছো।

সহসা মহারাণীর চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। বললেন, হায়! আমার চন্দ্রামুখী কোথায়!

মহারাজা বললেন, সে ভালো আছে, তার জন্য চিন্তা করো না।

মহারাণী কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে বললেন, ভালো আছে... কিন্তু কোথায়! তাকে তো দেখছি না।

ঃ এই তো আমাদের এই রাজপ্রাসাদেই আছে।

মহারাণী ওঠে বসার চেষ্টা করতে করতে বললেন, ডেকে আনো... ডেকে আনো আমার চন্দ্রামুখীকে। আমাকে কেনো তোমরা তুলে বসাচ্ছো না!

ঃ প্রিয়তমা! এখন ওঠার চেষ্টা করো না, তোমার স্বাস্থ্য ঠিক হলে তখন...।

হঠাৎ মহারাণীর সবকিছু স্মরণ হয়ে গেলো। তিনি এক দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে

বললেন, না... না... সে রাজপ্রাসাদে নেই। তাকে কালো পোশাকাবৃত ম্লেচ্ছরা নিয়ে গেছে। বলো... বলো... আমি কি আর আমার চন্দ্রামুখীর মুখ দেখতে পাবো না? বলো... বলো... চুপ হয়ে আছো কেনো?

মহারাজা কিংকর্তব্যবিমূঢ়। কী উত্তর দেবেন, কী বলবেন খুঁজে পাচ্ছেন না। মহারাণীর অস্থিরতায় ধৈর্যহারা হয়ে বললেন, হ্যাঁ, নিঃসন্দেহে তার সাথে তুমি সাক্ষাৎ করবে। ম্লেচ্ছরা কিছুতেই তাকে নিয়ে পালিয়ে যেতে পারবে না। আমার জীবদ্দশায় কিছুতেই আমি তা হতে দেবো না।

ঃ কিন্তু কার এমন দুঃসাহস আছে যে, আমার চন্দ্রামুখীকে ঐ ম্লেচ্ছদের হাত থেকে ছিনিয়ে আনবে?

মহারাজা শিকদেব-এর দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন। যেনো তিনি মহারাণীর প্রশ্নের উত্তর তার থেকে শুনতে চাচ্ছেন।

শিকদেব বললো, এই তো আমি আপনার দাসানুদাস উপস্থিত। আমাকে যা বলবেন, আমি তাই পালন করবো।

মহারাণীর দৃষ্টি এবার শিকদেব-এর দিকে ফিরে গেলো। আবেগে ভরা তার কণ্ঠ। বললেন, তুমি... শিকদেব। হ্যাঁ, তুমি পারো আমার চন্দ্রামুখীকে ফিরিয়ে আনতে। তুমি দুঃসাহসী, তুমি নির্ভীক। তুমি বীর। শিকদেব... শিকদেব তুমি আমাকে প্রতিশ্রুতি দাও, তুমি আমার চন্দ্রামুখীকে ফিরিয়ে আনবে।

শিকদেও বললো, মহারাণী! আপনি কোনো চিন্তা করবেন না, প্রয়োজনে আমি আমার জীবন বিসর্জন দিয়ে হলেও ঐ ম্লেচ্ছ পাপিষ্ঠ সুলতানের হাত থেকে রাজকুমারী চন্দ্রামুখীকে ছিনিয়ে আনবো।

শিকদেব! সে তোমার বাগদত্তা। তুমি যদি তাকে ফিরিয়ে আনতে না পারো, তাহলে সোমনাথের মহারাজার ইজ্জত ভূলুণ্ঠিত হবে। আমব্রেলী মহারাজার ইজ্জতও বাকি থাকবে না।

ঃ হ্যাঁ মহারাণী! আমি এ বিষয়ে খুব চিন্তা করেছি। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, কিছুতেই সোমনাথ রাজবংশ ও আমব্রেলীর রাজবংশের মর্যাদা ধূলি-লুণ্ঠিত হতে দেবো না।

ঠিক তখন রাজ চিকিৎসক এগিয়ে এলো। মহারাণীকে একটি ওষুধ সেবন করালো। ওষুধ সেবনের পর মহারাণীর গায়ে শক্তি সঞ্চারিত হলো। তিনি এবার উঠে বিছানায় বসলেন। মহারাণী কী যেনো বলতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু বলার আগেই ধর্মপাল এসে উপস্থিত হলেন। মহারাণী ধর্মপালকে দেখেই তাকে সম্বোধন করে ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললেন, মহাগুরুজী! আপনার চন্দ্রামুখীকে ম্লেচ্ছ জালিম বাদশাহ নিয়ে গেছে।

ধর্মপাল শয্যার পাশে বসতে বসতে বললেন, আমি এইমাত্র শুনলাম। কিন্তু

আমার বিষয়টি বুঝে আসছে না। কীভাবে সম্ভব যে মুসলমানরা রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করে রাজকুমারী চন্দ্রামুখীকে নিয়ে যাবে! অথচ কেউ তা...।

মহারাণী জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ধর্মপালের দিকে তাকালেন। বললেন, তাহলে আপনি কি শুনেননি, কিছু কালো পোশাকাবৃত মুসলমান কেল্লায় ঢুকে পড়েছিলো?

ঃ শুনেছি। আর আমি এখনো এ বিষয়টির স্বরূপ খুঁজে ফিরছি।

মহারাজা আর মহারাণী এবার আগ্রহভরা দৃষ্টিতে ধর্মপালের দিকে তাকালেন। মহারাজা বললেন, আচ্ছা, আপনি কি তার কোনো তত্ত্ব পেয়েছেন?

ঃ এখনো কোনো সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারিনি। তবে এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত যে, মুসলমানরা কেল্লার কোথাও আত্মগোপন করে থাকেনি। আর তারা রাজপ্রাসাদেও ঢুকতে পারেনি।

মহারাজা বললেন, তাহলে এই কালো পোশাকাবৃত লোকগুলো কারা, যাদেরকে রাজপ্রাসাদের অনেক লোক দেখেছে?

ঃ আমি সে কথাই বলতে চাচ্ছিলাম, কালো পোশাকাবৃত লোকেরা অন্য কেউ– মুসলমান নয়।

ঃ আপনি কীভাবে বুঝলেন?

ঃ মুসলমানরা কখনো কারো স্ত্রী বা মেয়েকে অপহরণ করে না। এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। তাই বলছি, এ অপকর্ম মুসলমানরা করেনি।

মহারাজার কণ্ঠে বিস্ময় ঝরে পড়লো। বললেন, আপনি কি জানেন না, সুলতান মাহমুদ গজনবী রাজকুমারী চন্দ্রামুখীকে নিয়ে যাওয়ার জন্যই সুদূর এই সোমনাথে এসে হাজির হয়েছেন?

ঃ হ্যাঁ, জানি। আর আমি ও আপনি তার কারণও জানি। চন্দ্রামুখীর জীবন যে রহস্যে ঘেরা তা-ও আমরা...।

মহারাজা কথার মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে বললেন, সে রহস্যের কথা এখন আর আলোচনার দরকার নেই। আমার তো বারবার এ কথাই মনে হচ্ছে, মাহমুদ গজনবী যখন চন্দ্রামুখীকে উদ্ধারের জন্য এতোদূর পথ পাড়ি দিয়ে এসেছে, তখন সে যে কোনো কৌশলে কর্মসিদ্ধির চেষ্টা করবে।

ঃ এর কারণ তারা এ কাজকে অত্যন্ত অন্যায় মনে করে। যদি এভাবে চুরি করে সুলতান চন্দ্রামুখীকে নিয়ে যেতে চাইতেন, তাহলে কয়েকজন গুপ্তচরকে পাঠালেই হতো। তারা এসে সবার অজ্ঞাতে চন্দ্রামুখীকে নিয়ে যেতো, কেউ তা জানতেও পারতো না।

ঃ এসব কিছুর পরও আপনার অভিমত কী?

ঃ আমার অভিমত হলো...।

কিন্তু না, যা বলবো তা বলার সময় এখনো আসেনি। আমার অনুসন্ধান প্রক্রিয়ার কিছু বিষয় এখনো অবশিষ্ট আছে। শেষ হলেই আমি তা মহারাজা ও মহারাণীর গোচরীভূত করবো।

শিকদেব বললো, কিন্তু মহাগুরুজী! আপনার সেই তথাকথিত অনুসন্ধান প্রক্রিয়া শেষ হতে হতে তো সুলতান গজনবী রাজকুমারীকে নিয়ে চলে যাবে।

ধর্মপাল বললেন, তাহলে তোমার অভিলাষ কী হে রাজকুমার?

ঃ আমি ক্ষণকাল পূর্বে মহারাণীর সাথে ওয়াদাবদ্ধ হয়েছি, জীবন দিয়ে হলেও আমি রাজকুমারীকে মহারাণীর নিকট ফিরিয়ে আনবো।

ঃ তুমি তোমার এ প্রতিশ্রুতি কীভাবে বাস্তবায়ন করতে চাচ্ছো?

ঃ আমার অভিমত হলো, আগামীকাল সকালে কেল্লা ও শহরের সকল দরজা খুলে দেয়া হবে এবং অকস্মাৎ মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

ঃ কিন্তু তুমি কি একবারও ভেবে দেখেছো, মুসলমানদের সহজে কাবু করা যায় না?

ঃ আমার বিশ্বাস, যদি আমাদের বাহিনী একসাথে আক্রমণ করে, তাহলে নিঃসন্দেহে মুসলমানরা পলায়ন ছাড়া আর কোনো পথ পাবে না।

মহারাজা বললেন, তোমার চিন্তাই আমার নিকট যথোপযুক্ত মনে হচ্ছে। আজই আমি সকল সেনাপতিকে ডেকে এ ব্যাপারে পরামর্শ করবো।

রাজ চিকিৎসক বললো, মহারাণীর এখন বিশ্রামের প্রয়োজন। এ আলোচনা এখন শেষ করুন।

মহারাজার কণ্ঠে সন্তুষ্টির রেশ ফুটে ওঠলো। বললেন, আপনি ঠিক বলেছেন। এই তো আমি কথা বন্ধ করে দিলাম।

মহারাণী বললেন, না না, এ বিষয়টির সমাধান এখনই করতে হবে। এখনই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আমি দেখতে চাই, তোমরা আমার চন্দ্রামুখীর জন্য কী করতে চাও।

মহারাজা বললেন, তুমি যা চাইবে, তা-ই করা হবে।

ঃ তাহলে কি আক্রমণ করা হবে?

মহারাজার কণ্ঠ দৃঢ় শোনালো। বললেন, হ্যাঁ, আক্রমণই করা হবে। এটা সোনাথের মহারাজার ইজ্জতের প্রশ্ন। এভাবে রাজকুমারীকে চুরি করে নিয়ে যাওয়া কোন হাস্য-রসিকতার বিষয় নয়। রাজপুতদের ছোট ছোট শিশুরা পর্যন্ত তাদের মহারাজার ইজ্জত রক্ষার্থে জীবন দিতে প্রস্তুত।

ধর্মপাল বললেন, কিন্তু আপনি যে আগ্রহ-উদ্দীপনা আর উত্তেজনা হিন্দু জাতির মাঝে সৃষ্টি করতে চাচ্ছেন, তা যেনো তাদের ধ্বংসের কারণ না হয়, এ দিকটাও চিন্তা করে দেখতে হবে।

ঃ না, কোনো পরোয়া নেই। আমার অন্তরে এখন প্রতিশোধের আগুন লেলিহান শিখার রূপ ধারণ করেছে। আমি নিজে এই আক্রমণে অংশগ্রহণ করবো। হয় চন্দ্রামুখীকে উদ্ধার করে আনবো, না হয় সেই ম্লেচ্ছ সুলতানের মুণ্ড নিয়ে আসবো।

ঃ কিন্তু মহারাজা! রাজকুমারী চন্দ্রামুখী তো সুলতানের সৈন্য শিবিরে নেই। অন্য কেউ হয়তো...।

মহারাজার কণ্ঠে রাজ্যের বিস্ময়। বললেন, অন্য কেউ চন্দ্রামুখীকে নিয়ে গেছে, আপনি তা-ই বলতে চাচ্ছেন? কার এতো দুঃসাহস যে, আমার রাজপ্রাসাদ থেকে চন্দ্রামুখীকে তুলে নিয়ে যাবে?

ঃ এ সম্ভব! সম্ভব!

ধর্মপালের কণ্ঠ বিনীত। বললেন, যে আশাহত হয়েছে, হয়তো সে-ই।

ঃ সে কে?

ঃ আপনি ভেবে দেখুন। নিজেই বুঝতে পারবেন।

মহারাজা বললেন, আমি অনেক চিন্তা করেছি। তারপর এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, চন্দ্রামুখীকে সুলতান নিয়ে গেছে। সে জিতে গেছে। তবে তাকে এর মাশুল দিতে হবে।

ঃ মহারাজা! একটু ভেবে দেখুন, আপনার জাতির কী পরিণতি হবে। যুদ্ধের আগুন ছড়িয়ে পড়তেই হাজার হাজার মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে। হাজার হাজার শিশু এতীম হয়ে যাবে। হাজার হাজার নারী বিধবা হয়ে যাবে। এ সব বিপর্যয়ের কথা কী ভেবে দেখেছেন?

ঃ আমি জানি, আপনি এই মতামতই দেবেন। কিন্তু সুলতান মাহমুদ যখন যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিয়ে সোমনাথের উপকণ্ঠে পৌছেছে, তখন আর যুদ্ধ না করে যাবে না। সুতরাং আজ না হোক কাল অবশ্যই তার সঙ্গে যুদ্ধ করতেই হবে। তাহলে আর দেরি করে লাভ কী? আমাগীকালই যুদ্ধটা হয়ে যাক। আর রাতেই বা কেনো হামলা করা হবে না। শিকদেব! এ ব্যাপারে তোমার মতামত কী?

ঃ অন্নদাতা! আপনার এ সিদ্ধান্ত অত্যন্ত সময়োপযোগি। যে মুসলমানরা রাজকুমারীকে তুলে নিয়ে গেছে, তারা যখন দিশেহারা হয়ে গাফলতের ঘুমে অচেতন হয়ে পড়বে, ঠিক তখন আচমকা তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। তারপর নিমিষে তাদের পিষে তাদের রক্তে সোমনাথের প্রান্তরকে লালে লাল করে ফেলতে হবে।

ঃ কিন্তু কথা হলো, মুসলমানরা সদা সতর্ক অবস্থায় থাকে। আচমকা তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের পর্যুদস্ত করা সম্ভব নয়। হতে পারে, তাতে ভাগ্য ডিগবাজি খাবে। পদানত করতে গিয়ে পদদলিত হতে হবে।

মহারাণী অস্ফুট কণ্ঠে বললেন, মহাগুরুজ্বী! এমন হবে না। রাতের অন্ধকারে আচমকা আক্রমণ করে রাজপুতরা ম্লেচ্ছদের চিরতরে স্তব্ধ করে দেবে।

ধর্মপাল বললেন, হতে পারে, তারাই রাজপুতদের স্তব্ধ করে দেবে।

মহারাজা বললেন, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। মুসলমানরা জানে, আমরা কেল্লায় অবরুদ্ধ হয়ে আছি। কখনো কেল্লা থেকে বের হই না। তাই আমরা মুসলমানদের প্রহরার তেমন পরোয়া করি না। এ কারণে তারা স্বাভাবিকভাবে গাফেল হয়ে থাকে। আমরা পূর্ণ শক্তি নিয়ে হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়বো। আপনি প্রভাতে শুনতে পাবেন, মুসলমানদের লাশে সোমনাথ প্রান্তর ভরে গেছে আর রাজকুমারী চন্দ্রামুখী রাজপ্রাসাদে ফিরে এসেছে।

ঃ ঈশ্বর যেনো এমনই করেন। তবে আমার মতামত না মানলে আপনি যা ভাবছেন, তা-ই করুন। কিন্তু সাবধানতার প্রয়োজন রয়েছে।

ঃ শিকদেব! অতর্কিত আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও।

শিকদেব-এর কণ্ঠে আনন্দের আভাষ। বললো, মহারাজা! আমি প্রস্তুত।

ইতিমধ্যে মহারাণী বেশ সুস্থ হয়ে ওঠেছেন। মহারাজা মহারাণীকে নিয়ে প্রস্থান করলেন।

ছত্রিশ.

পশ্চিমাকাশে সূর্য অস্তমিত হয়েছে বেশ কিছুক্ষণ আগে। এখন চারদিকে চাপ চাপ অন্ধকার। শেষ রাতে চাঁদ উঠবে। মুজাহিদ শিবির নীরবতায় সমাচ্ছন্ন। চারদিকে অন্ধকার ছেয়ে আছে।

রাতের সুনসান নীরবতায় নীরবে-নিশ্চিন্তে মুজাহিদরা তাদের শিবিরে ঘুমিয়ে আছে। মাঝে-মাঝে কারো নাক ডাকার মৃদু আওয়াজ উত্থিত হয়ে আবার নীরবতায় হারিয়ে যাচ্ছে।

মাঝে-মাঝে একদল প্রহরী মুজাহিদ বাহিনীর সদস্যদের ঘোড়ার হেষ্রারবও শোনা যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে, ঘোড়ার পদাঘাতের প্রতিধ্বনি। প্রহরী বাহিনী অত্যন্ত সতর্কতার সাথে শিবিরের চারপাশে প্রহরা দিচ্ছে। তারা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে প্রহরা দিচ্ছে।

প্রহরী বাহিনীর অফিসার আলতুনতাশ। আড়াই হাজার মুজাহিদ তার নেতৃত্বাধীন। কেল্লার দিক থেকেই আক্রমণের সন্দেহ বেশি। তাই তারা এ দিকে প্রহরা দিচ্ছে।

রাতের এক তৃতীয়াংশ বিগত হয়ে গেছে। এখন চারদিকে নিশ্চিদ্র অন্ধকার। মনে হচ্ছে, যেনো গাঢ় কৃষ্ণবর্ণের একখানা চাদর পৃথিবীর উপর ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। গাঢ় অন্ধকারে আকাশের তারকাগুলো পিট্ পিট্ করে আলো বিকিরণ করছে।

দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে মুজাহিদ শিবির। তাই আলতুনতাশ আড়াই হাজার মুজাহিদকে পাঁচ ভাগে ভাগ করে শিবিরের চারপাশে ছড়িয়ে দিয়েছেন। তারা সর্বদা শিবিরের চারপাশে নিশ্ছিদ্র প্রহরা দিচ্ছে।

আলতুনতাশ সদা সতর্ক। অত্যন্ত চৌকান্না। সে রাতে তিনি ভাবলেন, অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে কেল্লার একেবারে নিকটে গিয়ে পৌঁছবেন। চারদিক পর্যবেক্ষণ করবেন। সম্ভব হলে কেল্লার পাঁচিলে ওঠে যাবেন। তাই একশ' অশ্বারোহী মুজাহিদকে সাথে নিয়ে তিনি কেল্লার দিকে রওনা দিলেন। তারা নীরবে নিঃশব্দে অগ্রসর হচ্ছে। হঠাৎ অন্ধকার থেকে একটি আওয়াজ উত্থিত হলো– 'এ বাহিনীর অফিসার কে?'

আলতুনতাশ ঘোড়া সামনে নিয়ে এলেন। বললেন, আমি। আমার নাম আলতুনতাশ। উত্তর দিতে দিতে আলতুনতাশ সামনে অগ্রসর হতেই দেখতে পেলেন, তিনি এক সাধুর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। সাধুর কণ্ঠে তুর্কী ভাষা শুনে আলতুনতাশের বিস্ময় চরম আকার ধারণ করলো। বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে একেবারে নীরব হয়ে গেলেন। আবার সাধুর কণ্ঠ শোনা গেলো– 'খুব ভালো হয়েছে যে, আমি তোমার সাক্ষাৎ পেয়েছি। আমি একটি অত্যন্ত জরুরি কথা বলতে চাচ্ছি।'

আলতুনতাশ বললেন, আপনি ভারতবর্ষের হিন্দু ধর্মের সাধু হওয়া সত্ত্বেও কীভাবে অনর্গল তুর্কী ভাষায় কথা বলছেন?

সাধু বললেন, তুমি আমাকে চিনতে পারোনি।

আলতুনতাশ বললেন, আপনার নামটা জানতে পারি কি?

ঃ আমার নাম ধর্মপাল।

ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি বুঝে ফেলেছি। ক্ষমা করবেন, অন্ধকারে আপনাকে চিনতে পারিনি। বলেই এক লাফে ঘোড়া থেকে নেমে পড়েন এবং বিনীত কণ্ঠে বললেন, বলুন আপনার কী হুকুম।

ঃ আপনি সুলতানের পদস্থ অফিসার। আমার সাথে এমন আচরণ করবেন না। আমি এক দুনিয়াবিমুখ সাধু মাত্র।

ঃ তবে এমন সাধু, যার ইজ্জত ও সম্মান স্বয়ং সুলতানের হৃদয় দখল করে আছে।

ঃ এটা সুলতানের দয়া ও উদারতা।

ঃ প্রত্যেক মুসলমান আপনাকে শ্রদ্ধা করে, ভালোবাসে।

ঃ এটা মুসলমানদের মহান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

ঃ আপনি কি সুলতানের সাথে সাক্ষাৎ করতে চান?

ঃ তার আগে আমি কিছু কথা জিজ্ঞেস করতে চাই।

ঃ বলুন কী জিজ্ঞেস করবেন।

ঃ কিছু মুসলমান কী কেল্লায় রয়ে গেছে বা কাউকে কেল্লায় পাঠানো হয়েছে?

ঃ আমার জানামতে এমনটি হয়নি।

ঃ সুলতান কী আপনাকে সব বিষয় অবহিত করেন?

ঃ না, যে সব জানানো প্রয়োজন মনে করেন না, তা কাউকে জানান না।

ঃ তাহলে আমার মনে হয়, সুলতান এ বিষয়টি গোপন রেখেছেন।

ঃ বিষয়টি খুলে বলুন, আমি বুঝতে পারছি না।

ঃ কেল্লায় বিশেষ করে রাজপ্রাসাদে গুজব ছড়িয়ে পড়েছে, কিছু মুসলমান রাজপ্রাসাদে লুকিয়ে আছে। তারা কালো পোশাকে আবৃত হয়ে রাতে বের হয়।

ঃ মুসলমানরা তা করতে যাবে কেনো?

ঃ রাজপ্রাসাদের লোকদের ধারণা, রাজকুমারীকে গোপনে তুলে নিয়ে যাওয়ার জন্য তারা তা করছে।

ঃ এতো এক হাস্যকর ব্যাপার। মুসলমানরা রাজপ্রাসাদ বা কেল্লায় আত্মগোপন করার কোনো প্রশ্নই আসে না। তাছাড়া ভীরুর ন্যায় তারা রাজকুমারীকে তুলে আনতে যাবে কেনো? আমরা তো চন্দ্রামুখীকে লড়াই করে উদ্ধার করবো!

ঃ এও তো হতে পারে যে, সুলতান কেল্লা ও রাজপ্রাসাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্য কিছু জানবাজ মুজাহিদকে কেল্লায় বা রাজপ্রাসাদে ঢুকিয়ে দিয়েছেন?

ঃ হ্যাঁ, তা হতে পারে। তবে এটা কিছুতেই হতে পারে না যে, রাজকুমারীকে তুলে আনার জন্য তারা সেখানে যাবে।

ঃ যদি মুসলমানরা কেল্লায় গিয়ে থাকে, তাহলে অবশ্যই তারা রাজকুমারীকে তুলে নিয়ে এসেছে।

ঃ তার মানে কী রাজকুমারী চন্দ্রামুখী রাজপ্রাসাদে নেই?

ঃ তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

ঃ কবে থেকে?

ঃ গতরাতে আমি নিজে এ বিষয়টি অনুসন্ধান করে জেনেছি যে, কয়েকদিন যাবৎ এমন লোকদের চলাফেরা করতে দেখা গেছে। তাদের গ্রেফতার করার চেষ্টা করা হলে তারা বিস্ময়কর পন্থায় অদৃশ্য হয়ে গেছে, যা মুসলমান মুজাহিদদের পক্ষেই সম্ভব।

ঃ আপনি জানেন, মুসলমানরা যাদু জানে না। তারা এমন বিদ্যাও জানে না, যদ্বারা কায়া বদল করে ইঁদুর-বিড়াল বা অন্য কোনো প্রাণীর রূপ ধারণ করতে পারে। তাই কেল্লা ও রাজপ্রাসাদের অলিতে-গলিতে যখন রাজপুতরা নিচ্ছিদ্র প্রহরা দিচ্ছে, তখন মুসলমানরা কোথায় গিয়ে আত্মগোপন করে থাকবে? আমার মনে হচ্ছে, নিশ্চয় এতে গভীর কোনো ষড়যন্ত্র ও রহস্য আছে।

ঃ আমি ভাবনার খেই হারিয়ে ফেলেছি। কিছু বুঝতে পারছি না। যদি রাজকুমারী মুসলমানদের শিবিরে না থাকে, তাহলে কোথায় থাকতে পারে? কে তাকে এভাবে তুলে নেয়ার দুঃসাহস দেখাতে পারে?

ঃ হতে পারে এটা মহারাজারই কাণ্ড। তিনিই তার কিছু বিশ্বস্ত অনুচরের মাধ্যমে রাজকুমারীকে দৃশ্যপট থেকে সরিয়ে ফেলেছেন এবং প্রচার করেছেন, রাজকুমারী চন্দ্রামুখীকে মুসলমানরা তুলে নিয়ে গেছে। এ সংবাদ নিশ্চয় মুসলমানদের শিবিরে এসে পৌছবে। সুলতানও শুনবেন। আপনারা নিরাশ হয়ে ফিরে যাবেন।

ঃ আমার মনে হয়, ব্যাপারটি এমন নয়। রাজকুমারীর বিরহ শোকে তারা মর্মাহত। মহারাণী তো চেতনা হারিয়ে ফেলেছিলেন। তাই আমি এ ব্যাপারে প্রায় নিশ্চিত যে, রাজকুমারীর অবস্থা সম্পর্কে মহারাজা বা মহারাণী কিছুই জানেন না।

ঃ তাহলে নিশ্চয় রাজপ্রাসাদেই কেউ এক ষড়যন্ত্রের জাল বুনে চলেছে।

ঃ এটা হতে পারে। তবে আপনি সুলতানকে ব্যাপারটা জিজ্ঞেস করে নিশ্চিত হয়ে নেবেন।

ঃ নিশ্চয়ই আমি তা জেনে নেবো।

ঃ যদি রাজকুমারী চন্দ্রামুখী মুসলমানদের শিবিরে পৌছে থাকে, তবে তার হেফাজতের পূর্ণ ব্যবস্থা করবে।

ঃ হ্যাঁ, অবশ্যই তা করবো। তা আপনি কি এ জন্যই এসেছিলেন?

ঃ আমি আপনাকে আরো যে কথাটি বলার জন্য এসেছি, তাহলো আজ রাতের আঁধারে অতর্কিত আক্রমণ হবে। প্রস্তুত থাকবেন।

একটা আতঙ্কভাব আলতুনতাশের চেহারায় ফুটে উঠলেও রাতের অন্ধকারে তা বুঝা গেলো না। কিন্তু কণ্ঠস্বরে তা ফুটে ওঠলো। বললেন, কখন আক্রমণ হতে পারে!

ঃ হতে পারে, ইতিমধ্যে কেল্লার ফটক খুলে দেয়া হয়েছে। এখন পঙ্গপালের মতো রাজপুতরা তরবারী উঁচিয়ে ধেয়ে আসছে।

ঃ আপনাকে হাজারো শুকরিয়া। আমি এখনই ব্যবস্থা গ্রহণ করছি।

ঃ এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন, যেনো রাজপুতরা চিরতরে...।

ঃ আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। হাতে সময় একেবারে কম থাকলেও যা করা সম্ভব, আমি তাতে বিন্দুমাত্রও ত্রুটি করবো না।

ঃ আচ্ছা, আমি এখন যাচ্ছি।

ঃ আমি আরেকবার আপনাকে সকল মুসলমানের পক্ষ থেকে শুকরিয়া জানাচ্ছি।

ঃ আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি। এখন আসি।

ঃ ফী আমানিল্লাহ। তবে একটি কথা জানা দরকার।

ঃ বলুন কী কথা?

ঃ যদি কিছু মুসলমান সত্যই কেল্লায় বা রাজপ্রাসাদের ঢুকে থাকে, তাহলে তো তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা দরকার।

ঃ আমি তাদের সন্ধান করে ফিরছি। তাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব আমার। একথা বলে ধর্মপাল দ্রুত আঁধারের আচ্ছাদনে অদৃশ্য হয়ে গেলেন আর আলতুনতাশ ঘোড়ায় চেপে দ্রুত মুজাহিদ শিবিরের দিকে ছুটে চললেন।

সাঁইত্রিশ.

ধর্মপাল কেল্লার নিকটে পৌঁছেই ঘোড়ার পদধ্বনি শুনতে পেলেন। খুট্ খুট্ রব তুলে দলে দলে ঘোড়া কেল্লা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। তিনি ঢাল-তলোয়ারের মৃদু আওয়াজ শুনতে পেলেন। ধর্মপাল বুঝলেন, রাজপুতরা অতর্কিত আক্রমণ করতে বেরিয়ে যাচ্ছে। চারদিকে গাঢ় অন্ধকার। তাই অতি নিকটেরও কাউকে দেখা যাচ্ছে না। ধর্মপাল কাউকে দেখতে পেলেন না। তিনি চাইলেন না, কেউ তাকে দেখুক। তাই একটি ছোট টিলার পশ্চাতে গিয়ে আত্মগোপন করলেন। তিনি অত্যন্ত মনোযোগের সাথে সামনের খোলা প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

তিনি বিস্ফারিত নয়নে তাকালেন। কিন্তু কিছুই দেখতে পেলেন না। বিভিন্ন ধরনের আওয়াজ শুনতে পেলেও রাজপুতদের কোনো আওয়াজ শুনতে পেলেন না। তারা অত্যন্ত নীরবতার সাথে অগ্রসর হচ্ছে।

ধর্মপাল বেশ কিছু সময় নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে বিস্ফারিত নয়নে তাকিয়ে রইলেন। তিনি ভাবলেন, রাজপুতদের শেষ সৈন্যটি চলে গেলে তারপরই টিলার পশ্চাত থেকে বেরিয়ে যাবেন।

অবশেষে কেল্লার দিক থেকে আওয়াজ আসা বন্ধ হয়ে গেলো এবং ধীরে ধীরে তা মুজাহিদ শিবিরের দিকে চলে গেলো। কেল্লার দিক নীরবতায় আচ্ছন্ন হয়ে গেলো।

এবার ধর্মপাল টিলার পশ্চাত থেকে বেরিয়ে কেল্লার দিকে রওনা হলেন। কয়েক পা অগ্রসর হওয়ার পরই হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন এবং ক্ষণকাল পর মুজাহিদদের শিবিরের দিকে দ্রুত ছুটতে লাগলেন। এক অজানা অস্থিরতা ও চাঞ্চল্যভাব তার মাঝে দারুণ তোলপাড় সৃষ্টি করেছে। ছুটতে ছুটতে তিনি রাজপুতদের একেবারে নিকটে গিয়ে পৌঁছলেন। ঘোড়ার খুট্ খুট্ আওয়াজ শুনতে পেলেন। মাঝে মাঝে হেষ্রারবও শুনতে পেলেন।

এতো নিকটে পৌঁছার পরও নিকষ কালো অন্ধকারের কারণে ধর্মপাল রাজপুতদের কাউকে দেখতে পেলেন না। রাজপুতরাও তাকে দেখতে পেলো না। রাজপুতরা অত্যন্ত নিশ্চিন্তে মুজাহিদ শিবিরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তারা নির্বিঘ্নে মুজাহিদ শিবিরের একেবারে নিকটে গিয়ে পৌঁছলো।

যদিও ধর্মপাল বুঝতে পরেননি, তিনি মুজাহিদ শিবির থেকে কতোটুকু দূরে আছেন, তবু নিশ্চিত, তিনি মুজাহিদ শিবিরের দিকেই ছুটে যাচ্ছেন। একটি চিন্তাই তাকে অস্থির-বেচাইন করে তুলছে, কেনো এখনো মুজাহিদদের কোনো তৎপরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে না! তবে কি তারা এখনো বেঘোরে ঘুমাচ্ছে? এ বিশাল বাহিনী যদি অতর্কিত আক্রমণ করে বসে, তাহলে তারা কীভাবে প্রতিহত করবে? হায়! মুজাহিদদের পরিণতি কী হবে!

রাজপুতদের এই বিশাল বাহিনীকে পশ্চাতে ফেলে কি আমি তাদের আগে মুজাহিদদের শিবিরে পৌঁছতে পারবো? তাদের এই নিদ কি আমি এদের পৌঁছার আগে ভাঙাতে পারবো? আলতুনতাশ কী করলো! সে এখান কোথায়? এ ধরনের হাজারো চিন্তা এসে তার মস্তিষ্কে তোলপাড় সৃষ্টি করলো।

ধর্মপাল এ ধরনের চিন্তা করতে করতে দ্রুত ছুটে যাচ্ছেন। হঠাৎ শুনতে পেলেন, আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি উত্থিত হচ্ছে। এ ধ্বনি শুনতেই তার অস্থিরতা দূর হয়ে যায়। অধরের কোণে মৃদু হাসির রেখা ফুটে ওঠে। আবার কেল্লার দিকে ছুটে চলেন। কিছুদূর অগ্রসর হতেই দেখতে পেলেন, শিকদেব ঘোড়ার পিঠে চড়ে এগিয়ে আসছে। সে ধর্মপালকে দেখে ভক্তি গদগদ কণ্ঠে বললো, আপনি এখানে গুরুজ্বী মহাশয়!

ধর্মপাল বললেন, হ্যাঁ, দেখতে এলাম।

শিকদেও বললো, আমার বিশ্বাস ছিলো, আপনি দেখতে আসবেন। তারপর শিকদেব চলে গেলো। ধর্মপাল কেল্লার দিকে ফিরে এলেন।

রাজপুতরা মুজাহিদ শিবিরের একেবারে নিকেট পৌঁছে গিয়েছিলো। মুজাহিদ শিবির নীরবতায় আচ্ছন্ন থাকার কারণে রাজপুতরা ধারণা করেছিলো, মুজাহিদরা আয়েশী ঘুমে অচেতন। এ সময়ে নীরবে গিয়ে তাদের যুদ্ধের স্বাদ চিরতরে মিটিয়ে দিতে হবে।

কিন্তু তারা পেছন থেকে আকাশ কাঁপানো 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি শুনেই চমকে ওঠলো। ভয়ার্ত চোখে এদিক-সেদিক তাকাতে লাগলো।

আলতুনতাশ ধর্মপাল থেকে বিদায় নিয়েই তার অনুগত বাহিনীর নিকট ছুটে এসেছিলেন। তাদের জাগিয়ে তোলে আমীর আলীকেও সংবাদ জানালো। তারাও তৈরি হয়ে গেলো।

আমীর আলী দ্রুত এক অশ্বারোহীকে প্রেরণ করে সুলতানকে বিষয়টি অবহিত করলেন।

ইতিমধ্যে রাজপুতরা মুজাহিদ শিবিরের নিকটে এসে পৌছে। একদিক থেকে আলতুনতাশ ও অপর দিক থেকে আমীর আলী নিজ নিজ মুজাহিদদের নিয়ে হাজির হন। তারা অন্ধকারের সুযোগে একেবারে রাজপতুদের পেছন দিক দিয়ে এসে উপস্থিত হলেন।

রাজপতুরা পশ্চাতে মুজাহিদ বাহিনীকে দেখতে পেয়ে ঘুরে দাঁড়ালো। সম্মিলিত আল্লাহু আকবর ধ্বনিতে তাদের অন্তরাত্মা থর থর কাঁপতে লাগলো। মুজাহিদরা চোখের পলকে তাদের উপর আক্রমণ করে বসলো। রাজপুতরা ঢাল দ্বারা আক্রমণ প্রতিহত করতে চেষ্টা করলো। কিন্তু তাদের চেষ্টা ব্যর্থ হলো। মুজাহিদদের প্রচণ্ড আঘাতে তাদের ঢাল ছিটকে পড়ে যায়। তলোয়ার বিদ্ধ হলো কারো পিঠে, কারো ঘাড়ে, কারো মাথায়। তারা আর্তচীৎকার করে করে মাটিতে লুটিয়ে পড়তে শুরু করে।

রাজপুতরা এবার দুর্বার শক্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাদের তরবারীর আঘাতে মুজাহিদরাও আক্রান্ত হতে লাগলো। শুরু হলো প্রচণ্ড লড়াই। রক্তক্ষয়ী লড়াই। শির ধড় থেকে ছিটকে পড়তে লাগলো। হাত-পা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিটকে পড়তে লাগলো। চারদিক থেকে ভয়াল আর্তচীৎকার ভেসে আসতে লাগলো। আহতরা ঘোড়ার পদতলে পিষ্ট হয়ে মৃত্যুবরণ করতে লাগলো।

রক্তে রক্তে চারদিক পিচ্ছিল হয়ে গেলো।

যুদ্ধের প্রচণ্ডতায় সারিগুলো ভেঙে গেলো। মুজাহিদদের সারিতে রাজপুতরা আর রাজপুতদের সারিতে মুজাহিদরা ঢুকে পড়লো। উভয় দলই প্রাণপণ যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগলো।

অন্ধকারের নীরবতা ভেদ করে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত আহতদের আর্তচীৎকার আর ঢাল-তলোয়ারের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। আহত-উদ্ভ্রান্ত ঘোড়ার হেষ্রারব ভয়াল আকার ধারণ করেছে।

রাতের অন্ধকারের কারণে রাজপুতরা বুঝতে পারেনি, মুসলমানদের সংখ্যা কতো এবং কতোজন মুসলমান তাদের উপর আক্রমণ করেছে। আর মুজাহিদরাও বুঝতে পারেনি রাজপুত যোদ্ধারা ক'জন । কিন্তু উভয় দল মরণপণ যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে।

ভারতবর্ষে রাজপুতরা যোদ্ধা জাতি হিসেবে পরিচিত। তারা যখন রণাঙ্গনে নামে, তখন মৃত্যুর ভয়কে পায়ে দলে সামনে অগ্রসর হয়। মরণপণ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। তারা মুসলমানদের ব্যূহ ভেদ করে এগিয়ে যেতে চেষ্টা করছে। কিন্তু তারা মুসলমানদের সাথে পেরে ওঠছে না। ব্যূহ ভেদ করে একটুও সামনে এগুতে পারছে না।

ইতিমধ্যে পূর্বাকাশ আলোয় উদ্ভাসিত করে চাঁদ উদিত হলো। মুখে তার মিটি

মিটি হাসি। ধীরে ধীরে গাঢ় অন্ধকার বিদূরিত হয়ে যেতে লাগলো। চাঁদ যতোই উপরে ওঠছে, আলো ততোই ছড়িয়ে পড়ছে।

এখন রণক্ষেত্র অনেকটা আলোকময়।

মুজাহিদরা রাজপুতদের দেখতে পাচ্ছে। রাজপুতরা অল্পসংখ্যক মুজাহিদদের দেখে বিস্মিত হচ্ছে। সাথে সাথে তারা দুঃসাহসী হয়ে ওঠে। তারা নবউদ্যমে চারদিক থেকে মুজাহিদদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। রাজপুতদের প্রচণ্ড আক্রমণে মুজাহিদরা ঘাবড়ে যায়। আক্রমণের প্রচণ্ডতায় পিছু হটতে থাকে।

আলতুনতাশ দেখলেন, মুজাহিদরা ক্রমেই পিছু হটে যাচ্ছে। এ দৃশ্য তার দেহে আগুন ধরিয়ে দেয়। তিনি চীৎকার করে বললেন, মুজাহিদ ভাইয়েরা! এটা লজ্জার কথা। মুসলমান কখনো এমন হতে পারে না। শাহাদাতবরণ করা বা কাফেরদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করাই মুজাহিদদের কাজ।

তার বজ্রগম্ভীর কণ্ঠস্বরে সবাই চমকে ওঠলো। সবাই থমকে দাঁড়ালো। তারপর বীরবিক্রমে রাজপুতদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। আবার সংঘর্ষ শুরু হলো। প্রচণ্ড সংঘর্ষ। তরবারীর আঘাতে-প্রত্যাঘাতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ওঠতে লাগলো। রাজপুতরা একের পর এক ধরাশায়ী হতে লাগলো।

কিন্তু রাজপুতরাও পিছু হটছে না। ছুটে এসে আক্রমণ করছে। ঝাঁপিয়ে পড়ছে। আহত হচ্ছে, ভূতলে লুটিয়ে পড়ছে। মৃত্যুবরণ করছে। তারপর তাজাদম ঘোড়া নিয়ে আরেক দল ছুটে আসছে।

রাজপুতদের রক্তে যখন রণাঙ্গন লালে লাল হচ্ছে আর থেকে থেকে আল্লাহু আকবার ধ্বনি-প্রতিধ্বনিতে রণাঙ্গন থর থর করে কাঁপছে, ঠিক তখন আকাশের চাঁদ আরো আলোকময় হয়ে ওঠলো। জোছনার আলোকে রণাঙ্গন আলোকিত হয়ে গেলো। রাজপুতরা দেখলো, জোৎস্নার রূপালী আলো ভেদ করে মুজাহিদদের এক বিশাল বাহিনী ছুটে আসছে। অশ্বে উপবিষ্ট মুজাহিদদের নাঙ্গা তরবারীগুলো জোৎস্নালোকে ঝলমল করছে।

এ দৃশ্য দেখেই রাজপুতদের পিলে চমকে ওঠলো। সেই চমক কাটতে না কাটতেই মুজাহিদ বাহিনী এসে তাদের উপর ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়লো। রাজপুতরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলো।

এরা সেনাপতি আমীর আলীর বাহিনী। দুর্বার বেগে ছুটে এসে তারা সিংহের মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তাদের তরবারীর আঘাতে আঘাতে রাজপুতরা কচুকাটা হচ্ছে। একদিক থেকে আলতুনতাশের অন্যদিক থেকে আমীর আলীর অনুগত মুজাহিদরা রাজপুতদের সমান তালে নিঃশেষ করে চলছে। স্থানে স্থানে তাদের লাশের স্তূপ গড়ে ওঠে। রক্তে রক্তে চারদিক ভেসে যেতে থাকে। ফলে রাজপুতদের মনোবল ভেঙে পড়ে। তাদের প্রত্যয় জন্মে যায়, যদি তারা আর

কিছুক্ষণ রণাঙ্গনে থাকে, তাহলে তাদের একজনকেও জীবিত পাওয়া যাবে না। এরপরই তারা রণেভঙ্গ দিয়ে পালাতে লাগলো। দু'একজনকে পালাতে দেখে অন্যরাও তাদের পিছু নিলো। মাত্র কিছু সময়ের ব্যবধানে রণাঙ্গন ফাঁকা হয়ে গেলো। পলায়নপর রাজপুতদের পেছনে পেছনে তরবারী উঁচিয়ে ছুটলো মুজাহিদরা। অনেকেই আহত হয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হলো। কিছু রাজপুত ছুটে গিয়ে কেল্লায় আশ্রয় নিলো। অনেকে রাতের অন্ধকারে এদিক-সেদিক পালিয়ে গেলো।

যেসব মুজাহিদ পশ্চাদ্ধাবন করতে গিয়েছিলো, তারা বিজয়োল্লাসে তাকবীর ধ্বনি দিতে দিতে মুজাহিদ শিবিরে ফিরে এলো। এ হামলায় এগারো হাজার রাজপুত নিহত হলো। আর ছয়শ মুজাহিদ শাহাদাতবরণ করলো। এভাবেই এ অতর্কিত হামলা বুমেরাং হলো।

সুলতান মাহমুদ রাতের এই অতর্কিত আক্রমণ সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। সেনাপতি আলতুনতাশ বা আমীর আলী কেউ তাকে সংবাদ দেননি। বরং সুলতান বাহিনীর প্রহরী রাতে প্রহরা দানকালে শোরগোল শুনে দ্রুত বিষয়টি সুলতানকে অবহিত করেছে। সুলতানের নির্দেশ ছিলো, নতুন কিছু দেখলে বা শুনলেই যেনো তাকে তৎক্ষণাৎ অবহিত করা হয়।

সুলতান তখন শয্যায় বিশ্রাম করছিলেন। চোখে ছিলো হাল্কা ঘুমের আমেজ। কিন্তু হঠাৎ তার কানে হট্টগোলের আওয়াজ পৌঁছতেই তিনি লাফিয়ে ওঠলেন। গায়ের সাধারণ পোশাকেই বাইরে ছুটে এলেন। বাহিনীর অর্ধেককে দ্রুত প্রস্তুত হতে নির্দেশ দিয়ে সামরিক পোশাক পরিধান করতে আবার তাঁবুতে ফিরে এলেন।

তাঁবুর প্রহরীরা সাথে সাথে সামরিক অফিসারদের নিকট ছুটে গিয়ে সুলতানের নির্দেশ পৌঁছালো। অফিসারদের নির্দেশে ক্ষণিকের মধ্যেই মুজাহিদরা প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে এলো। সুলতান তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসে দেখেন, অর্ধেক বাহিনী তার নির্দেশের অপেক্ষায় প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চোখে তাদের শাহাদাতের তামান্না ঝলমল করছে। সুলতান তাদের দিকে এক পলক দৃষ্টি ফেলে ঘোড়ায় চেপে বসলেন। অফিসার ও রাজপ্রহরী বাহিনী এগিয়ে এসে তার পার্শ্বে দাঁড়ালো। তিনি ঘোড়া ছুটালেন। তাঁর পেছনে পেছনে ছুটে চললো বিশাল এক বাহিনী। রাতের নীরবতা ভেঙে ছুটে চললো সুলতানের বাহিনী। তারা কেল্লার দিকে যাচ্ছে।

তখন চারদিক জোৎস্নার আলোয় ফকফক করছে। পূর্ব আকাশ প্রভাতের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে গেছে। সূর্যের কিরণের হাল্কা আভা আকাশে ছড়িয়ে পড়েছে। সুলতান যখন সেনাপতি আলতুনতাশের মুজাহিদ শিবির অতিক্রম

করে গেলেন, দেখলেন, চারদিক লাশের পর লাশ ছড়িয়ে আছে। চাপ চাপ রক্ত চারদিকে ছড়ানো। আক্ষেপ আর অনুশোচনায় ভরা কণ্ঠে বললেন, হায় আফসোস! আমাদের পৌঁছুতে অনেক দেরি হয়ে গেছে। হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দিন। গাফলতির নিদে বিভোর থাকা তো তোমার প্রিয় বান্দাদের আলামত নয়। হে রহমান! আমার কারণে আজ অনেক মুজাহিদ শহীদ হয়ে হয়ে গেলো। হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করো।

ঠিক তখন আলতুনতাশ ও আমীর আলীর নেতৃত্বাধীন মুজাহিদরা বিজয় ধ্বনি দিতে দিতে ফিরে আসছিলো। তারা সুলতানের বাহিনীর নিকটে পৌঁছুলে সুলতানকে দেখে আনন্দে ফেটে পড়লো। চিৎকার করে ধ্বনি দিতে লাগলো, "গাজী সুলতান মাহমুদ জিন্দাবাদ, ইসলামের জয়যাত্রা চলছে, চলবে। মুজাহিদদের এ তাকবীর ধ্বনিতে রাতের নীরবতায় নিমজ্জিত রণপ্রান্তর প্রকম্পিত হয়ে ওঠলো। সেনাপতি আলতুনতাশ ও আমীর আলী সুলতানের সামনে এগিয়ে এলেন।

তারা দেখতে পেলেন, সুলতানের চোহারায় আক্ষেপের ছাপ পরিস্ফুট। তারা এগিয়ে এসে সুলতানকে মুবারকবাদ জানালেন। সুলতান বললেন, আমার বিশ্বস্ত বাহাদুর যোদ্ধারা! তোমরা বিজয়ী হয়েছো এ সংবাদে আমি মুগ্ধ হয়েছি। কিন্তু আমার হৃদয়কে আক্ষেপের কাঁটা রক্তাক্ত করছে যে, তোমরা রাতের এ অতর্কিত আক্রমণের সংবাদ আমাকে দাওনি!

আলতুনতাশ অবনত শিরে ক্ষণকাল নীরব থেকে বললেন, মহামান্য সুলতান! এ অপরাধ আমার। অকস্মাৎ শত্রুসৈন্য আক্রমণ করলে আমি দ্রুত শুধু ভাই আমীর আলীকেই সংবাদ দেয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম। আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

ঃ শোনো আলতুনতাশ! এ ঘটনায় শুধু যে তুমিই দোষি তা নয়। আমারও দোষ রয়েছে। আমিও অপরাধি। আমি অন্যমনস্ক ছিলাম। তাই আমার অজান্তে এ ঘটনা ঘটলো। আল্লাহ সবাইকে মাফ করে দিন। কিন্তু এ রাতের অন্ধকারে অতর্কিত আক্রমণের সংবাদ তোমরা কীভাবে পেলে?

ঃ ধর্মপাল এসে আমাকে বলে গেছেন।

তারপর আলতুনতাশ ধর্মপালের সাথে তার অকস্মাৎ সাক্ষাতের ঘটনার বিবরণ দেন।

ঃ আল্লাহ আমাদের রক্ষক। এটা আল্লাহর বিরাট নেয়ামত যে, দুশমনদের মাঝেই আমাদের বন্ধু রয়েছে। ...আচ্ছা, সকাল তো হয়ে এলো। এসো আমরা ফজরের নামায পড়ে নেই। বলেই সুলতান ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন। তারপর সবাই ঘোড়া থেকে নেমে পড়লো। অশ্বগুলো একদিকে ঘাস খেতে লাগলো। বিশ্রাম নিতে লাগলো।

মুজাহিদরা অজু করে নামাযের প্রস্তুতি নিচ্ছিলো। কয়েকজন মুজাহিদ সুললিত কণ্ঠে আযান দিলো। আযানের আওয়াজে আকাশ-বাতাস হিল্লোলিত হয়ে ওঠে। দূরে বন-বাদাড়ে কলতানে মূহ্যমান বিহঙ্গকূল আযানের সুমধুর আওয়াজে নীরব হয়ে যায়।

আযানের পর সবাই সুন্নত নামায আদায় করতে দাঁড়িয়ে গেলো। তারপর ফরজ আদায়ের জন্য সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ালো। সুলতান নামায পড়ালেন। নামাযের পর সুলতান শহীদদের এক স্থানে সমবেত করার নির্দেশ দিলেন আর রাজপুতদের অস্ত্রশস্ত্র একত্রিত করে তাদের লাশগুলো জঙ্গলে নিক্ষেপ করার আদেশ দিলেন।

সুলতানের নির্দেশ দ্রুত পালিত হলো। শহীদদের লাশগুলো একত্রিত করে জানাযা পড়ার আয়োজন করা হলো। জানাযার নামাযের পর তাদের দাফন করা হলো।

সুলতান তাঁবুতে ফিরে গেলেন। সেনাপতি আলতুনতাশ ও আমীর আলী তাদের শিবিরে ফিরে আসেন।

সূর্যটা এখন বেশ উপরে উঠে এসেছে। চারদিক সোনালী আভায় উদ্ভাসিত। রাতের এ রণক্ষেত্র থেকে নারী-শিবির অনেকটা দূরে। তারা এ যুদ্ধ সম্পর্কে কিছুই জানে না। প্রভাতের কুরআন তিলাওয়াত শেষে তাদের অনেকেই এদিক-সেদিক পায়চারি করছে।

কয়েকটি মেয়ে সকালের কাজ শেষ করে তাঁবু এলাকার বাইরে চলে আসে। তলোয়ার-তীর নিয়ে পাহাড়ের আড়ালে সাগর তীরে চলে যায়। তরবারী চালনা আর তীরন্দাজির প্রশিক্ষণ নেয়।

আজকের এই সোনাঝরা প্রভাতে তারা তরবারী আর তীর নিয়ে পাহাড়ের আড়ালে প্রশস্ত ময়দানে চলে এলো। প্রশিক্ষণ শেষে প্রায় সব নারী শিবিরে চলে গেছে। কিন্তু আনীসা তখনো ফিরে যায়নি। তলোয়ার হাতে সে যুদ্ধরত সৈনিকের মতো মহড়া দিচ্ছে।

প্রশিক্ষণের ক্লান্তি, তদুপরি সূর্যের তাপে তার মাথা থেকে ঘাম ঝরছে। তার গোলাপী গণ্ডদেশে যেনো ডালিমের লাল দানার রস ছিটিয়ে দেয়া হয়েছে। এখন সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উন্মুক্ত নির্মল বায়ু সেবন করছে।

তার দৃষ্টি সমুদ্রপৃষ্ঠে নিবদ্ধ। সূর্যের কিরণের ছোঁয়ায় সমুদ্রের বুকে যেনো আগুনের খেলা চলছে। ঝিলমিল করছে চারদিক। তাই সে বিমোহিত।

তার মাথার ওড়না পিঠের উপর পড়ে বাতাসের ঝাপটায় উড়ছে। বিলম্বিত কেশদামও বাতাসের ছোঁয়ায় নৃত্য দোলায় দুলছে। দীর্ঘ অনুশীলনীর ক্লান্তিতে সে দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছে।

হঠাৎ আনীসার কর্ণকুহরে এক মিষ্টিমধুর নারী কণ্ঠ ভেসে এলো– আপনি! একটু কথা শুনবেন?

বিস্মিত আনীসা দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখে এক সন্ন্যাসিনী তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তার গোটা অবয়ব জুড়ে ছড়িয়ে আছে মর্যাদা, সম্মান আর গাম্ভীর্য। ইনি শোবাদেবী। আনীসা ধীর পায়ে শোবাদেবীর দিকে এগিয়ে যায়। তারপর শান্ত অথচ বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলে, আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি হিন্দু-সন্ন্যাসিনী। কিন্তু আপনি তুর্কী ভাষায় কথা বলছেন। আপনি কি তুর্কী ভাষা জানেন?

ঃ বেটী! আমি তুর্কী ভাষা শিখেছি এতে আশ্চর্যের কী আছে?

ঃ তাহলে কি সোমনাথের নারীরা তুর্কী ভাষা জানে!

শেবাদেবী বললো, না।

ঃ তা আপনি কার থেকে তুর্কী ভাষা শিখেছেন?

ঃ বেটী! তোমাকে তো বেশ বুদ্ধিমতি মনে হচ্ছে। আমি যদি তোমাকে বলতে চাই, আমি কোথায় কীভাবে কার নিকট তুর্কী ভাষা শিখেছি, তাহলে তোমাকে এর রহস্য বলে দিতে হবে, যা এখনো বলার সময় আসেনি।

ঃ আমাকে বলতে পারেন। আমি কাউকে বলবো না।

ঃ না, না, আমি তা বলতে পারি না। সেটা আমার জীবন রহস্য। সময় এলে নিজেই বলবো।

ঃ সে সময় কখন আসবে?

ঃ সোমনাথ বিজয় হলেই সে সময় এসে যাবে।

ঃ আপনি কি বিশ্বাস করেন, সোমনাথ বিজয় হবে?

ঃ হ্যাঁ, আমার তা-ই বিশ্বাস। আজো এমন হয়নি যে, সুলতান মাহমুদ গজনবী কোনো দেশ, শহর বা কেল্লায় আক্রমণ করে জয়ী না হয়ে ফিরে এসেছেন।

ঃ আচ্ছা, রাজকুমারী চন্দ্রামুখীকে কি মুসলমানরা নিয়ে গেছে?

চন্দ্রামুখীর নাম মুসলিম নর-নারী সবাই এমনকি শিশুরাও জানে। তাই সে বললো, না, মুসলমানরা রাজকুমারী চন্দ্রামুখীকে আনেনি।

ঃ যদি মুসলমানরা নিয়ে আসতো, তাহলে অবশ্যই তাকে নারী-শিবিরে রাখার ব্যবস্থা করতো।

ঃ নিশ্চয়, নিশ্চয়। কিন্তু তাহলে কি চন্দ্রামুখী কেল্লা থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে?

ঃ হ্যাঁ, অত্যন্ত রহস্যজনকভাবে রাজকুমারী উধাও হয়ে গেছে। তাকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না।

ঃ আপনি কি তাকে তালাশ করে ফিরছেন?

ঃ আমি তাকে কেল্লায়, শহরে, মন্দিরে সর্বত্র তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি। কিন্তু কোথাও তার সন্ধান পাইনি। পরিশেষে আমি এখানে খুঁজতে এলাম। ভেবেছিলাম, হয়তো এখানে পাওয়া যাবে।

ঃ আপনি নিশ্চিত থাকুন, চন্দ্রামুখী মুসলমানদের শিবিরের কোথাও নেই। থাকলে আমি জানতাম।

ঃ আমি তোমার কথা বিশ্বাস করছি। আচ্ছা, হয়তো কখনো আবার তোমার সাথে দেখা হবে। এখন যাচ্ছি।

শেবাদেবী চলে গেলো। আনীসা বিস্ময়ে শোবাদেবীর দিকে তাকিয়ে রইলো।

আটত্রিশ.

আনীসা শোবাদেবীর গমন পথের দিকে বিস্ময় অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। টিলার পশ্চাতে হারিয়ে যাওয়ার পর মনে মনে বললো, এ সন্ন্যাসিনী কতো দুঃসাহসী, কতো নির্ভীক! নির্দ্বিধায় মুজাহিদদের এলাকায় চলে এসেছে! তার চেহারায় এক গাম্ভীর্যভাব সদা বিরাজমান। সবচে' বিস্ময়কর বিষয় হলো, অত্যন্ত স্পষ্ট তুর্কী ভাষায় তর তর করে কথা বললো। তাছাড়া তার উচ্চারণভঙ্গীও আকর্ষণীয়। একজন অমুসলিম নারীর জন্য যা ভাবাও অসম্ভব। চন্দ্রমুখীকে সে খুঁজে ফিরছে। মুসলমানদের সন্দেহ করছে। হ্যাঁ, শুনেছি অধিকাংশ হিন্দুই যাদুকর হয়ে থাকে। তাহলে... তাহলে কি এই সন্ন্যাসিনীও যাদুকর?

আনীসার হৃদয়ে ভয়ের পরশ লাগলো। ভয়ার্ত চোখে সে সন্ন্যাসিনীর প্রস্থান পথের দিকে তাকালো।

পরক্ষণেই মনে ভাবনা জাগে, আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া কিছুই তো হয় না। আর যাদুতে কিছু হলে কুরআনের আয়াত পড়লে তার ক্রিয়া দূর হয়ে যায়।

আনীসা যখন চিন্তার ভেলায় ভাসছিলো, ঠিক তখন একটি কণ্ঠ তাকে বিচলিত করে তুললো। বলছে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী ভাবছো আনীসা?

আনীসা চেয়ে দেখে বুরহান তার দিকে এগিয়ে আসছে। ঝলমলে তলোয়ারটা তখনো আনীসার হাতে।

বুরহান বললো, আচ্ছা, তরবারী চালনার প্রশিক্ষণ হচ্ছে বুঝি?

আনীসার অধরে মৃদু হাসির মিষ্টি রেখা ঝিলিক দিয়ে ওঠলো। বললো, জ্বি, মহোদয়! তা-ই হচ্ছে...। কিন্তু এ সময় এখানে যে!

ঃ এই তো হাঁটতে হাঁটতে এসে পড়লাম।

আনীসার অধরে আবার মিষ্টি হাসির রেখা ফুটে উঠলো। বললো, বারবার 'হঠাৎ করে' আর 'ঘটনাক্রমেই' বুঝি আসা হয়। ঐ দিনও বুঝি 'হঠাৎ করেই' এসেছিলে যে দিন...।

আনীসার চোখের তারায় দুষ্টুমি চিক চিক করে ওঠে। গোলাপ পাপড়ির মতো ওষ্ঠাধর দু'টি তির তির করে কাঁপছে।

বুরহানের মোহময় দৃষ্টি তখন আনীসার চেহারায় আটকে আছে। তার তৃষ্ণার্ত চোখ দু'টি ক্রমেই অস্থির-অধির হয়ে ওঠছে। বললো, হ্যাঁ, কোন্দিন আবার ঘটনাক্রমে এসেছিলাম!

ঃ যেদিন রাজপুত আর হিন্দু সৈন্যরা নৌকা নিয়ে নারী শিবিরে আক্রমণ করতে এসেছিলো, সেদিনও তো 'ঘটনাক্রমেই' এসেছিলে। যদি না আসতে, তাহলে...।

ঃ তাহলে ওরা তোমাকে ধরে নিয়ে যেতো।

ঃ শুধু আমাকে নয় সাহেব, সবাইকে নিয়ে যেতো। তাই সবাই আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ। প্রায়ই একথা আলোচনা হয়। আর তোমার বীরত্বের প্রশংসায় সবার মুখ পঞ্চমুখে পরিণত হয়।

ঃ কিন্তু তাতে আমার কী?

ঃ তাহলে... তাহলে আপনি কী চান?

ঃ আমি চাই পাষাণে গড়া হৃদয়ের সেই রূপসী আমার আলোচনা করুক, যে আমার স্বপ্নজগতের সিংহাসনে সমাসীন হয়ে আছে।

আনীসার অধরে দুষ্টুমির হাসি প্রকট হয়ে ওঠলো। বললো, শুনি সেই রূপসীটা কে?

বুরহান আবেগে অকপটে বললো, সে তুমি। আনীসা। জাগরণের সময়গুলোতে শুধু তোমার চিন্তায় বিভোর থাকি। আর নিদ্রায় হারিয়ে গেলে তুমি স্বপ্নের রাণী হয়ে ধরা দাও।

বুরহানের কথা শুনে আনীসা লজ্জায় এতোটুকুন হয়ে গেলো। তার উৎপলময় চোখ দু'টি আনত হয়ে স্থির হয়ে রইলো। গণ্ডদেশ দু'টিতে পড়ন্ত বিকেলের লালিমা ছড়িয়ে পড়লো।

বুরহান বললো, লজ্জা পেলে আনীসা? এতে লজ্জার কী আছে?

লজ্জায় টইটুম্বর আঁখি তুলে মিটিমিটি দৃষ্টি ছড়িয়ে আনীসা বললো, আপনি এ ধরনের কথা কেনো বলেন!

ঃ যেনো তুমি আমার মনের অবস্থা জানতে পারো।

ঃ দয়া করে এ ধরনের আলোচনা...

আনীসার কথার মাঝেই বুরহান বলে ওঠলো, আর কখনো বলবো না, এই তো? কিন্তু আমি অক্ষম, অপারগ। নিজেকে সংবরণ করতে বহু চেষ্টা করি। কিন্তু পারি না। ...তবে তুমি যদি পছন্দ না করো, তাহলে...।

ঃ আমার পছন্দ করা বা না করা বড় কথা নয়। বরং এতে প্রতি পদে পদে দুর্নামের ভয় রয়েছে।

ঃ দুর্নাম তো তখন হবে, যখন আমি অন্যদের নিকট তোমার আলোচনা করবো।

ঃ হয়তো ইচ্ছে করে আলোচনা করবেন না। অনিচ্ছায় তো আলোচনা এসে যেতে পারে।

ঃ তাহলে কি আমি হুঁশ জ্ঞান হারিয়ে...।

আনীসা কথার প্রবাহ পাল্টে দিতে বললো, আসল কথা হলো, সেদিন আপনি দারুণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছিলেন। নৌকায় যে রাজপুতরা এসেছিলো, তারা কিছুই বুঝতে পারেনি। আর আপনি তাদের নিঃশেষ করার সব আয়োজন করে ফেলেছিলেন। ফলে একজনও প্রাণে বেঁচে যেতে পারেনি।

ঃ তুমি আমার এই তুচ্ছ খেদমতের এতো প্রশংসা করো, তাহলে...।

আনীসা উল্লাসে গদগদ কণ্ঠে বললো, আমি আপনার কী প্রশংসা করবো। কোথায় আপনি আর কোথায়...। আনীসা মৃদু হাসির আভা ছড়িয়ে নীরব হয়ে গেলো।

বুরহানের কণ্ঠস্বর রহস্যময় হয়ে ওঠলো। বললো, আনীসা! বলতে পারো, তুমি কে?

ঃ আমি এক মুসলিম নারী।

ঃ না, না। বরং তুমি এক ছলনাময়ী অপরূপ সুন্দরী। তুমি পুষ্পকুঞ্জের শিশিরভেজা সুবাসিত নির্মল পুষ্পকলি।

ঃ হয়েছে হয়েছে, বেশ হয়েছে। কিন্তু আমি কেনো নীরবে এখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম আর কী দেখছিলাম, তা তো জিজ্ঞেস করেননি!

ঃ কিছুই দেখছিলে না। বরং চিন্তায় বিভোর হয়ে ছিলে?

ঃ হ্যাঁ, চিন্তা করছিলাম। কিন্তু কী চিন্তা?

ঃ চিন্তা করছিলে, বিয়ে হয়ে গেলে তোমার স্বাধীনতা শেষ হয়ে যাবে। যত্রতত্র ঘুরে বেড়াতে পারবে না।

আনীসা মুখটা পাংশুবর্ণ করে বললো, ছি, ছি, কতো নিচু চিন্তা-ভাবনা।

ঃ তাহলে কী চিন্তা করছিলে?

ঃ আপনি আসার কিছুক্ষণ আগে এক হিন্দু সন্ন্যাসিনী এখানে এসেছিলো।

বুরহান বিস্মিত হয়ে বললো, সন্ন্যাসিনী...। তাও আবার হিন্দু। রূপ-সৌন্দর্যের তুলনা করতে এসেছিলো?

ঃ না, না। সে চন্দ্রামুখীর খোঁজে এসেছিলো। চন্দ্রামুখীকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সন্ন্যাসিনীর ধারণা, তাকে মুসলমানরা তুলে নিয়ে এসেছে।

বুরহানের কণ্ঠে রাজ্যের বিস্ময়। বললো, চন্দ্রামুখীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না! সে কোথায় লুকিয়ে থাকবে? কে-ইবা তাকে তুলে নিয়ে যাবে?

বুরহান চিন্তার জগতে হারিয়ে যায়।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে বুরহান বলে ওঠলো, হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। এ ঘটনার

নেপথ্যে সোমনাথের মহারাজা ও তাঁর পরামর্শদাতাদের হাত রয়েছে। তারা এক কৌশল অবলম্বন করতে চাচ্ছে। রাজকুমারী চন্দ্রামুখী কোথাও যায়নি। রাজপ্রাসাদেই আছে। তাকে খুঁজে না পাওয়ার সংবাদ এ জন্য ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে, যেনো সুলতান মাহমুদ গজনবী যুদ্ধ না করে হতাশ হৃদয়ে ফিরে যান। কিন্তু এভাবে তো তারা মুসলমানদের ও সুলতান মাহমুদ গজনবীকে ধোঁকা দিতে পারবে না।

বুরহানের কথা শেষ হলে আনীসা বললো, আপনার ধারণাই সঠিক মনে হচ্ছে। নিশ্চয় মহারাজাই রাজকুমারী চন্দ্রামুখীকে কোথাও লুকিয়ে রেখে গুজব ছড়িয়ে দিয়েছে, তাকে পাওয়া যাচ্ছে না। কে যেনো তাকে নিয়ে গেছে। আমি যদি এ বিষয়টি তখন বুঝতে পারতাম, তাহলে সন্ন্যাসিনীকে বলে দিতাম।

ঃ এভাবে মহারাজা দু'টি স্বার্থ উদ্ধার করতে চান। এক. মুসলমানরা এ সংবাদ শুনে যুদ্ধ ছেড়ে নিরাশ হয়ে ফিরে যাবে। দুই. রাজপুতদের মাঝে এ কথা ছড়িয়ে দিয়ে তাদের মাঝে উত্তেজনা সৃষ্টি করতে সক্ষম হবেন। ফলে তারা উন্মাদের ন্যায় যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

ঃ আপনার চিন্তা সঠিক মনে হচ্ছে।

ঃ আমার ভয় হচ্ছে, কখন অকস্মাৎ রাজপুতরা মুজাহিদ বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

আনীসা রাতের আক্রমণের কথা শোনেনি। সে সমুদ্রের তীরে এতো দূরে অবস্থান করছিলো যে, রাতের যুদ্ধের শোরগোলও শুনতে পায়নি।

বুরহান বললো, চারদিকে খা খা করে রোদ ছড়িয়ে পড়েছে। তুমি শিবিরে ফিরে যাও। আমি বলেছিলাম, একাকি কোথাও বের হয়ো না। বলা যায় না, কোথায় কোন্ বিপদ লুকিয়ে আছে। তাই সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

ঃ এখন আমি বেশি দূরে যাই না। আগামীতে আরো সতর্কতা অবলম্বন করে চলবো।

আনীসা নারী শিবিরের দিকে চলে গেলো। বুরহান এক দৃষ্টিতে তার গমন পথের দিকে তাকিয়ে রইলো। আনীসা দৃষ্টির বাইরে চলে গেলে বুরহান সমুদ্রের তীরে নিজ বাহিনীর নিকট ফিরে গেলো।

উনচল্লিশ.

রাতের নিচ্ছিদ্র অন্ধকারে রাজপুতদের অতর্কিত আক্রমণ ব্যর্থ হয়ে গেছে। তাদের উপর মারাত্মক বিপর্যয় নেমে এসেছে। হাজার হাজার রাজপুত নিহত ও আহত হয়েছে। হাজার হাজার সৈন্য বন-জঙ্গলে পালিয়ে গেছে। হাতেগোনা অল্পসংখ্যক যোদ্ধা সুস্থ অবস্থায় ফিরে আসতে সক্ষম হয়েছে। তাদের একজন শিকদেব।

শিকদেব যুদ্ধে অংশগ্রহণই করেনি। সে ধর্মপালের সাথে কথা বলে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে দেখতে পায়, মুজাহিদ বাহিনী রাজপুতদের উপর মরণপণ আক্রমণ করছে। রাজপুতদের প্রায় দিশেহারা করে ফেলেছে। তাই সে আর সামনে অগ্রসর হয়নি। নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রণাঙ্গনের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে চেষ্টা করছে। মধ্য গগনে চাঁদ বিকশিত হলে চারদিকে চাঁদের স্নিগ্ধ আলো ছড়িয়ে পড়ে। সেই আলোতে শিকদেব সুস্পষ্টভাবে যুদ্ধের ভয়াবহতা দেখতে পায়। সময় পেরিয়ে কাকডাকা ভোরে যখন রাজপুতরা পরাজিত হয়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলো, চারদিকে লাশের পর লাশ ফেলে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পালাতে লাগলো, তখন সবার আগে পালিয়ে এলো শিকদেব। কেল্লায় ঢুকে সে-ই প্রথম কেল্লার জাগ্রত লোকদের পরাজয়ের সংবাদ দিলো। মুহূর্তে কেল্লার ভেতরে, শহরে ও মন্দিরে মন্দিরে এ ভয়াবহ পরাজয়ের সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো।

এ সংবাদ শুনে অবশিষ্ট রাজপুতদের মাঝে নৈরাশ্যের কালো ছায়া ছড়িয়ে পড়ে। মুজাহিদদের ভয় তাদের অন্তরে প্রোথিত হয়। তাদের নিশ্চিত বিশ্বাস হলো, এই যদি হয় যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি, তাহলে একদিন না একদিন মুসলমানদের হাতে সোমনাথের পতন ঘটবেই। মুসলমানরা শহর-বন্দর-কেল্লা আর মন্দির দখল করে নেবেই।

চাঁদ তার আলোকময় মূর্তি নিয়ে বেশ উপরে উঠে এলে মহারাজা রাজপ্রাসাদ ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। সোজা খাছ দরবারের কক্ষের দিকে গমন করলেন। তিনি এখনো রাজপুতদের পরাজয়ের সংবাদ শোনেননি।

তাই তাঁর পদবিক্ষেপ শান্ত-নিঃশঙ্ক। তিনি সিংহাসনে উপবেশন করতেই শিকদেব এসে দরবারে প্রবেশ করলো। অত্যন্ত আদবের সাথে কুর্নিশ জানিয়ে একটি আসনে উপবেশন করলো।

মহারাজার দৃষ্টি শিকদেব-এর মুখমণ্ডলের ওপর ঘুরছে। তার চেহারায় দুঃখ-বেদনা, ক্রোধ আর নৈরাশ্যের কালো ছাঁয়া পরিস্ফুটিত। মহারাজা আঁচ করলেন, বিধি-বিড়ম্বনার পালা বুঝি শুরু হয়ে গেছে। গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, রাতের আক্রমণের খবর কী শিকদেব?

ঃ মহারাজা! শুধু পরাজয়ই নয়– একবারে বুমেরাং হয়ে গেছে। হাজার হাজার রাজপুত নিহত ওআহত হয়েছে।

মহারাজার উজ্জ্বল চেহারায় যেনো অমাবশ্যার অন্ধকার নেমে এলো। বেশ কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে রইলেন। তারপর আক্ষেপভরা কণ্ঠে বললেন, হায় আফসোস! মহাদেব সোমনাথজ্বী দেখছেন, পাপিষ্ট ম্লেচ্ছরা তার পবিত্র স্থানকে অপবিত্র করছে। তার পূজারীদের নির্মমভাবে হত্যার পর হত্যা করে চলেছে। কিন্তু তিনি তাদের বিনাশ করছেন না। পূজারীদের রক্ষার কোনো আয়োজন

করছেন না। ...হায় সোমনাথজী! আমাদের রক্ষা করো...। আচ্ছা, শিকদেব! কী পরিমাণ যোদ্ধা নিহত হয়েছে?

ঃ বিশ হাজার রাজপুত আক্রমণে অংশগ্রহণ করেছিলো। আমার ধারণা ছিলো, আমাদের মরণপণ যোদ্ধারা মুসলমানদের পিষে মারবে। কিন্তু আফসোস! তারা প্রায় সবাই মৃত্যুবরণ করেছে।

মহারাজার কণ্ঠে অবিশ্বাসের সুর ফুটে উঠলো। বললো, বি-শ হাজার যোদ্ধা মৃত্যুবরণ করেছে! এতো সৈন্য কীভাবে নিহত হলো? আমার যে বিশ্বাস হচ্ছে না!

ঃ মহারাজা! আমি এখন এ পরাজয়ের মূল কারণ বর্ণনা করি, কেনো এ বিশাল বাহিনীর উপর পরাজয়ের ভয়াবহতা নেমে এলো, কী তার রহস্য। তবে তা আপনি বিশ্বাস করবেন না। মেনে নিতে চাইবেন না। শিকদেব-এর অন্তরে ধর্মপালের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে বিদ্বেষের আগুন জ্বলছিলো। এ আগুন ভয়াবহ আকার ধারণ করলো, যখন সে জানতে পারলো, চন্দ্রামুখীর সাথে তার বিয়ের ব্যাপারটি ধর্মপাল মেনে নেননি। চরম বিরোধিতা করে বিষয়টি বিলম্বিত করছেন। এতোদিন পর্যন্ত সে তার মনের ঝাল মিটানোর কোন সুযোগ পায়নি। আজ এ সুবর্ণ সুযোগ সে কিছুতেই হাতছাড়া করলো না।

ঃ কেনো বিশ্বাস করবো না। তবে কি আমি বিশ্বাস করি না যে, তুমি জাতি ও দেশের কল্যাণকামী ব্যক্তিত্ব? তুমি আমার ও আমার জাতির হিতাকাঙ্খী?

শিকদেব বললো, আপনি যা বলেছেন, তা সত্য। তবে আমি যার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত করবো, হয়তো আপনি তার বিরুদ্ধে আমার একটি কথাও শ্রবণ করা পছন্দ করবেন না। বিশ্বাস করবেন না।

মহারাজার হৃদয় ক্রোধান্বিত। তদুপরি আক্ষেপে জর্জরিত। তার কণ্ঠ এবার কঠিন শোনা গেলো। বললেন, শিকদেব! কোনো ভূমিকার প্রয়োজন নেই। তোমার মনের কথা আজ আমার কাছে নির্ভয়ে বলতে পারো। আমি আজ শুনতে চাই কে গাদ্দারী করলো, কে বিশ্বাসঘাতকতা করলো। কার কারণে আজ হিন্দুজাতির এ সর্বনাশ হলো।

এমন ব্যক্তি গাদ্দারী করেছে, বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, যার ব্যাপারে কখনো এমনটি ধারণা করা যায় না। যাকে সবাই দেশ ও জাতির কল্যাণকামী মনে করে। যাকে শুধু মহারাজাই নয়, বরং সোমনাথের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সবাই শ্রদ্ধা করে, সম্মান করে। মহারাজার কণ্ঠে অধৈর্যের সুর ফুটে ওঠলো। বললেন, তোমার ঐ পেঁচানো কথা রাখো। স্পষ্টভাবে বলো সেই নরাধম পাপিষ্ঠটা কে?

শিকদেব একটু থেমে বললো, তিনি হলেন, মহাগুরুজী ধর্মপাল।

বিস্ময়ের ঘোরে মহারাজার চোখ দু'টি বিস্ফারিত আর মুখখানা ব্যাদান হয়ে রইলো। কথা বলার শক্তিটুকুও যেনো তিনি হারিয়ে ফেললেন। কবরের নীরবতা

নেমে এলো দরবার কক্ষে। বেশ কিছুক্ষণ পর কম্পিত কণ্ঠে বললেন, তাহলে... তাহলে মহাগুরুজ্বী ধর্মপালই গাদ্দারী করলো?

ঃ আমি কখনো শোনা কথা বিশ্বাস করি না। আমি স্বচক্ষে তাকে মুজাহিদদের শিবির থেকে ফিরে আসতে দেখেছি...।

ঃ মুজাহিদদের শিবিরে গিয়েছিলো?

ঃ রাতের অতর্কিত আক্রমণের কথা মুসলমানদের জানিয়ে দিতে গিয়েছিলেন। এছাড়া তার আর কী কাজ থাকতে পারে। দেখুন মহারাজা! আপনার কিন্তু বিশ্বাস হচ্ছে না। আমি আগেই এ কথা বলেছিলাম।

ঃ এটা তো বিশ্বাসযোগ্য কথা নয়। শিকদেব! শুধু আমি কেনো সোমনাথের ছোট-বড় কেউ একথা বিশ্বাস করবে না। বলবে, এ অসম্ভব। গুরুজ্বী ধর্মপাল কিছুতেই এ কাজ করতে পারেন না।

শিকদেব-এর অধরে কুটিল হাসির আভা। বললো, কিন্তু এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, তিনিই এ ঘৃণ্য কাজটি করেছেন। আপনি তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করুন। তিনি সর্বদা সত্য কথা বলেন। হয়তো তিনি অকপটে স্বীকারও করবেন।

ঃ আচ্ছা, আমি তাকে এক্ষুনি ডাকছি।

মহারাজা হাত তালি দিলেন। এক সৈন্য এসে উপস্থিত হলো। পোশাক-পরিচ্ছদ আর আকৃতিতে ভয়ানক। মহারাজা বললেন, এক্ষুনি গুরুজ্বী ধর্মপালকে নিয়ে আসবে। সঙ্গে করে নিয়ে আসবে। যাবে আর আসবে।

সৈন্য চলে গেলো।

ঃ হয়তো মহারাজার স্মরণ আছে, রাতের অন্ধকারে যখন অতর্কিত আক্রমণ করার কথা হচ্ছিলো, তখন গুরুজ্বী তাতে ভিন্নমত পোষণ করেছিলেন। আর মহারাজা হয়তো একথাও শুনে থাকবেন, রাজকুমারী চন্দ্রামুখী মহাগুরুজ্বীর সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলো। তখন মহাগুরুজ্বীর নিকট দু'জন তুর্কী এসেছিলো।

ঃ হ্যাঁ, তা শুনেছিলাম।

ঃ শুধু কি তা-ই, গুরুজ্বী রাজকুমারীকে ম্লেচ্ছ বাদশাহ সুলতান মাহমুদের নিকট অর্পণ করে দেওয়ারও পরামর্শ দিয়েছিলেন।

ঃ হ্যাঁ, একথাও আমার বেশ মনে আছে।

ঃ এসব কিছু মিলিয়ে চিন্তা করলে কি এ ফল বের হয় না যে, গুরুজ্বী দুশমনদের সাথে মিলে দেশ ও জাতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছেন? বরং আমি একথাও বলবো, রাজকুমারী চন্দ্রামুখীকে তিনিই ষড়যন্ত্র করে কোথাও নিয়ে গেছেন।

ঃ তুমি সত্য বলেছো শিকদেব! তোমার কথায় আমার অন্তর ও চোখের পর্দা একে একে খুলে যাচ্ছে। আমি ঘোর বিভ্রান্তিতে সমাচ্ছন্ন ছিলাম।

ঠিক তখন সৈন্য এসে গুরুজ্বীর আগমনের সংবাদ জানালো। মহারাজা তাকে ভেতরে নিয়ে আসার অনুমতি প্রদান করলেন। ধর্মপাল এসে মহারাজাকে কুর্ণিশ করলেন। প্রথম দৃষ্টিতেই ধর্মপাল বুঝে ফেললেন, পরিস্থিতি খারাপ। তিনি এক পাশে এক আসনে বসে পড়েন।

শিকদেব গুরুজ্বী ধর্মপালকে উদ্দেশ করে বললো, আপনি সত্যবাদী মানুষ। আমার বিশ্বাস, আপনাকে যা জিজ্ঞেস করবো, তার সঠিক ও সত্য উত্তর প্রদান করবেন।

ঃ আমি মিথ্যা বলাকে ঘৃণা করি। সর্বদা সত্যই বলি, সত্যই বলবো।

ঃ আপনি কি গতরাতে মুসলমানদের শিবিরে গিয়েছিলেন?

ঃ হ্যাঁ, গিয়েছিলাম।

ধর্মপালের কথা শুনে মহারাজা সচকিত হয়ে ওঠলেন। বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে তিনি ধর্মপালের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কিন্তু ধর্মপালের সে দিকে কোনো খেয়াল নেই।

ঃ আপনি কি রাতের অতর্কিত আক্রমণের কথা মুসলমানদের জানিয়ে দিতে গিয়েছিলেন।

ধর্মপাল নির্ভীক কণ্ঠে বললেন, হ্যাঁ, আমি, আমিই তাদের তা জানিয়ে দিয়েছি।

ধর্মপালের কথা শুনে মহারাজা যেনো আকাশ থেকে পড়লেন। ক্রোধে কট মট করে ঝাঁঝালো স্বরে বললেন, আপনি... আপনি এ ঘৃণ্য কাজ করলেন! শেষে আপনিই গাদ্দারী করলেন!

ধর্মপালের কণ্ঠ শান্ত-সমাহিত। বললেন, নিঃসন্দেহে আমি করেছি। আমি রাতের অন্ধকারে চুপিচুপি চোরের মতো ঘুমন্ত মানুষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়াকে পছন্দ করি না। এটা কাপুরুষতা। এটা ভীতু চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ। বীর রাজপুতরা কখনো এ ধরনের নিচুতা পছন্দ করে না।

মহারাজা বললেন, কিন্তু ধর্মপাল। আপনার মনে রাখতে হবে, এটা ছেলে খেলা নয়। এটা যুদ্ধ। যুদ্ধের ময়দানে এ ধরনের ধোঁকা দেয়া সব ধর্মেই বৈধ।

ঃ কিন্তু বীর পুরুষ কখনো তা পছন্দ করে না।

মহারাজা ক্রোধে আগুন হয়ে বললেন, গুরুজ্বী! আপনি বিশ হাজার রাজপুতকে মৃত্যু গহ্বরে ঠেলে দিয়ে জাতির এমন ক্ষতি করলেন, যা পূরণ হবার নয়। তবে আমি এ অমার্জনীয় অপরাধকে এক শর্তে ক্ষমা করে দিতে পারি। তাহলো, আপনি রাজকুমারী চন্দ্রামুখীকে আমার নিকট ফিরিয়ে দেবেন।

মহারাজার কণ্ঠ অত্যন্ত তীক্ষ্ম। বললেন, আপনিই তাকে লুকিয়ে রেখেছেন। এটা আপনারই কাজ।

ঃ এটা একেবারে মিথ্যা কথা। আমি তাকে কোথাও লুকাইনি। মহরাজা! আপনি হয়তো জানেন না, আমি তাকে কতো স্নেহ করি, কতো মমতা করি। আমার ধারণা, তার রহস্য উন্মোচনের সময় ঘনিয়ে এসেছে...।

ঃ রহস্যের কথা তুলে আপনি আমাকে হুমকি দিতে চাচ্ছেন। আমার বাক্‌শক্তি রুদ্ধ করতে চাচ্ছেন? মনে রাখবেন, আমি এতে বিন্দুমাত্র ভীত নই। যদি প্রয়োজন পড়ে, তাহলে আমি নিজেই সকলকে ডেকে সে রহস্য ফাঁস করে দেবো।

ঃ কিন্তু আপনি যে রহস্যের কথা বুঝাতে চাচ্ছেন, আমি তা বলছি না। আমি আমার সম্পর্কে বলতে চাচ্ছি। আমিও এক রহস্যের আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছি।

ঃ আপনার রহস্য নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। আমি চন্দ্রামুখীকে চাই। শ্রীঘ্রই তাকে আমার নিকট ফিরিয়ে দিন।

ঃ আমি সত্য বলছি। চন্দ্রামুখী আমার নিকট নেই। বরং কে চন্দ্রামুখীকে লুকিয়ে রেখেছে, আমি তাকে খুঁজে ফিরছি।

ঃ তাহলে কি আপনি চান, আমি আপনার সাথে রূঢ় ব্যবহার করি।

ধর্মপালের কণ্ঠ গম্ভীর হয়ে ওঠলো। বললেন, আমার সাথে রূঢ় ব্যবহারের পরিণতিতে আপনার জাতি ও দেশ ধ্বংস হয়ে যাবে।

মহারাজা ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, কী, এতো বড় দুঃসাহস! আমার সামনে দাঁড়িয়ে আমাকে ধমক দিচ্ছেন! ...না আর ক্ষমা করা যায় না।

মহারাজা হাততালি দিলেন। জমকালো পোশাকে সজ্জিত এক সৈন্য এসে কুর্ণিশ করে দাঁড়ালো। মহারাজা বললেন, কয়েকজন সেনা ডেকে আনো।

সৈন্যটি চলে গেলো।

ধর্মপাল শান্ত কণ্ঠে বললেন, দেখুন মহারাজা! ক্রোধ খুব খারাপ। ক্রোধোন্মত্ত হয়ে এমন কাজ করবেন না, যার জন্য পরে আফসোস করতে হয়।

মহারাজার তীক্ষ্ম কণ্ঠ শোনা গেলো। বললেন, আর উপদেশ বাণী বিতরণ করো না। আমি যা করছি, খুব ভেবে চিন্তে করছি।

কয়েকজন সৈন্য এসে কুর্ণিশ করে দাঁড়ালো। মহারাজা নির্দেশ দিলেন, গুরুজী ধর্মপালকে বন্দি করে জিন্দানখানার অন্ধকার প্রকোষ্ঠে নিক্ষেপ করো।

সৈন্যরা ধর্মপালের দিকে অগ্রসর হলো। বিজয়-সুখে শিকদেব-এর চোখ দু'টি চক চক করে ওঠলো। ধর্মপালের শ্যেণ দৃষ্টিতে তা ধরা পড়ে। তিনি বললেন, শোনো শিকদেব! তুমি আজ যে ধ্বংসের বীজ বপন করলে, তা কিন্তু বিষাক্ত ফল ফলাবে। সোমনাথ ধ্বংস হয়ে যাবে। আমি ভাবছিলাম, হয়তো সন্ধির কোনো পথ বের করতে সক্ষম হবো। তাহলে শহরটি ধ্বংসের হাত থেকে বেঁচে যাবে। কিন্তু তা...।

মহারাজা এবার আরো ক্ষীপ্ত হয়ে বললেন, যা হওয়ার হবে। সে নিয়ে ভেবে লাভ নেই। তবে গাদ্দারকে অবশ্যই তার শাস্তি ভোগ করতে হবে।

ধর্মপাল অত্যন্ত প্রত্যয়ের সুরে বললেন, আমি আর একটি কথাও বলবো না। কিন্তু আমি যে নিরপরাধ তা অবশ্যই একদিন দিবালোকের ন্যায় ফুটে ওঠবে।

মহারাজা সৈন্যদের ইংগিত করলেন। তারা ধর্মপালকে বন্দি করে নিয়ে গেলো।

চল্লিশ.

আনীসা বুরহানের দৃষ্টির বাইরে চলে যায়। বুরহান আর দাঁড়িয়ে না থেকে বন্দরের দিকে পা বাড়ায়। সেখানেই তার অধীন মুজাহিদরা অবস্থান করছে। আনমনে চললেও চিন্তার ধোঁয়া কুন্ডলী পাকিয়ে তার মনের আকাশে উড়ছে। সে ভাবছে, তাহলে কি সত্যই রাজকুমারী চন্দ্রামুখীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। না-কি মহারাজা তাকে কোথাও লুকিয়ে রেখে গুজব ছড়িয়ে দিয়েছেন। যেনো সুলতান মাহমুদ গজনবী ধোঁকায় পড়ে ব্যর্থ মনে ফিরে যান। নানা ধরনের চিন্তার মাঝে তার মন সাক্ষ্য দিচ্ছে, রাজকুমারী নিখোঁজ হয়নি বরং নিখোঁজ হওয়ার সংবাদটি মিথ্যা। গভীর ষড়যন্ত্রের ফসল।

সমুদ্রের তীর ধরে হাঁটতে হাঁটতে বুরহান বেশ দূরে চলে এলো। চিন্তার কারণে সে কোথায় এসে পড়েছে, তার খেয়ালই রইলো না। হঠাৎ তার কানে পানি প্রবাহের শব্দ ভেসে এলো। মনে হচ্ছে, কেউ যেনো সাঁতার কাটছে। এ শব্দে তার চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে গেলো। চোখ মেলে এদিক-সেদিক তাকালো। সামনে সমুদ্র। দৃষ্টির সীমা ছাড়িয়ে নীল পানির তরঙ্গমালা নেচে বেড়াচ্ছে। সাথে সাথে তার মনে হলো, আরে আমি কোথায় চলে এলাম! একেবারে শত্রুদের কাছে চলে এসেছি! যদি তারা দেখে আক্রমণ করে বসে, তাহলে...। আক্রমণ করে করুক, জিহাদ করার জন্যই তো এসেছি। শাহাদাতই তো জীবনের লক্ষ্য। কিন্তু কার যেনো সাঁতারের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

বুরহান আবার এদিক-সেদিক সন্ধানী দৃষ্টি ফেললো। বাম দিকে শাহী প্রাসাদের দু'টি বুরুজ দেখা যাচ্ছে। বুরুজ দু'টি সমুদ্রের বুক চিড়ে দাঁড়িয়ে আছে। যেনো সমুদ্রের ডেউ এসে বুরুজগাত্রে চুমু খেয়ে ফিরে যাচ্ছে। বুরুজ দু'টির মাঝে প্রায় ষাট গজের মতো ব্যবধান। দুই বুরুজের মাঝে একটি চওড়া সিঁড়ি সমুদ্রের বুক থেকে রাজপ্রাসাদের দিকে উঠে গেছে।

বুরহান মনে মনে বললো, কেল্লা বা শাহী প্রাসাদ থেকে নিরাপদ সমুদ্রপথে যাওয়ার জন্যই এ বুরুজ দু'টি তৈরি করা হয়েছে।

উভয় বুরুজের নীচে সিঁড়ির শেষ ধাপের নিকটে নারকেল গাছের গুঁড়ির সাথে বেশ কিছু নৌকা ও জাহাজ বেঁধে রাখা হয়েছে। রাজপুতর সেগুলো প্রহরা দিচ্ছে। কিন্তু একি! ঐ তো, ঐ যে এক সন্ন্যাসী সমুদ্রে পড়ে গেছে। কূলে উঠতে চেষ্টা করছে; কিন্তু পারছে না। বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টি মেলে বুরহান সন্ন্যাসীর দিকে তাকিয়ে রইলো। দেখলো, সমুদ্রের এক বিরাট ঢেউ এসে সন্ন্যাসীকে ভাসিয়ে বেশ কিছুটা দূরে নিয়ে গেলো। বুরহানের দৃষ্টি সন্ন্যাসীর উপর আটকে আছে। সন্ন্যাসী সর্বশক্তি দিয়ে সাঁতরে সাঁতরে কূলে আসে। ঠিক তখন আরেকটি ঢেউ এসে তাকে ভাসিয়ে নিতে চাইলো। বুরহান বুঝে ফেললো, সন্ন্যাসীর শক্তি নিঃশেষ হয়ে

গেছে। যদি এবার ঢেউ তাকে মাঝে নিয়ে যায়, হয়তো আর ফিরে আসতে পারবে না। সলিল সমাধিই তার জীবনের ইতি টানবে।

বুরহান চোখের পলকে ছুটে গিয়ে সমুদ্রের কূলে দাঁড়ালো। তারপর মাথার পাগড়ি খুলে চীৎকার করে বললো, নিরাশ হয়ো না। এই নাও আমার পাগড়ি। মজবুত করে ধরো।

একথা বলেই বুরহান তার পাগড়ির একটা প্রান্ত সন্ন্যাসীর দিকে ছুঁড়ে মারলো। সন্ন্যাসীর ভাগ্য ভালো। সে সাথে সাথে তা ধরে ফেললো এবং তার সহায়তায় কূলে ওঠে এলো।

ক্লান্ত-শ্রান্ত সন্ন্যাসী। হাঁপাচ্ছে আর তার বুকটা উঠানামা করছে। কৃতজ্ঞতায় ভরা দৃষ্টি মেলে বুরহানের দিকে তাকাচ্ছে। তারপর অত্যন্ত সুস্পষ্ট পরিচ্ছন্ন তুর্কী ভাষায় বললো, আমি আপনার অশেষ কৃতজ্ঞতা আদায় করছি। আপনার অসিলায় আজ আমি নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেছি।

বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে বুরহান তার দিকে তাকিয়ে বললো, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কোনো প্রয়োজন নেই। বিপন্ন মানুষকে উদ্ধার করা মানুষের দায়িত্ব। আমি শুধু সে দায়িত্বটুকু পালন করেছি। কিন্তু আপনি তুর্কী ভাষা জানেন কীভাবে?

ঃ তার কারণ জিজ্ঞেস করো না। আমি সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীরা একাধিক ভাষা জানে। তোমার নাম কি হে যুবক?

ঃ বুরহান।

ঃ মনে হচ্ছে, তুমি সেনাপতি।

ঃ হ্যাঁ, একদল যোদ্ধা আমার অধীনে আছে।

ঃ আমি এমন একজন লোকেরই সন্ধান করে ফিরছি। শোনো, আমি সুলতানকে একটি সংবাদ দিতে চাই। তুমি প্রতিশ্রুতি দাও, আমি তোমাকে যা বলবো, তুমি তা সুলতানের নিকট দ্রুত পৌঁছিয়ে দেবে।

বুরহানের বিস্ময়ভাব ক্রমেই তীব্র আকার ধারণ করতে লাগলো। বললো, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনি যা বলবেন, আমি সুলতানের নিকট অবশ্যই পৌঁছিয়ে দেবো।

ঃ তুমি তাঁকে জানিয়ে দেবে, মহারাজা ধর্মপালকে গ্রেফতার করেছেন।

বুরহান এ কথা শুনে অত্যন্ত মর্মাহত হলো। বলে ওঠলো, মহারাজা ধর্মপালকে কেনো গ্রেফতার করেছেন?

ঃ তার বিরুদ্ধে মুসলমানদের হয়ে ষড়যন্ত্র করার অভিযোগ ওঠেছে। ধারণা করা হচ্ছে, হয়তো তাকে হত্যা করা হবে।

ঃ মনে হয় আপনি চাচ্ছেন, সুলতান যেনো দ্রুত আক্রমণ করেন।

ঃ হ্যাঁ, আমার সেটাই উদ্দেশ্য। সুলতান যদি প্রচণ্ড আক্রমণ করেন, তাহলে

মহারাজা ও রাজপুতরা যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি নিয়েই ব্যস্ত থাকবে। ধর্মপালকে নিয়ে চিন্তা করারই অবকাশ পাবে না।

ঃ আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। সুলতান এ সংবাদ পাওয়ার পরই প্রচণ্ড আক্রমণ করবেন।

ঃ এখন তুমি নাটকের মতো আমার উপর আক্রমণ করো, তাহলে যে রাজপুতরা আমাকে পর্যবেক্ষণ করছে ও আমাদের কথা বলা দেখছে. তারা আমাকে সন্দেহ বশত বন্দি করবে না।

ঃ কিন্তু আপনি এখন কেল্লায় ফিরে যাচ্ছেন কেনো?

ঃ আমাকে অবশ্যই ফিরে যেতে হবে। আমি ধর্মপালের মুক্তির চেষ্টা করছি।

ঃ আচ্ছা, তাহলে আপনাকে আরেকটি কথা বলতে হবে।

ঃ কী সে কথা?

ঃ রাজকুমারী চন্দ্রামুখীকে নাকি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

ঃ হ্যাঁ, এক গভীর রহস্যময় ব্যাপার। তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। রাজপুতদের ধারণা, মুসলমানরা তাকে তুলে নিয়ে গেছে।

ঃ কিন্তু সে তো মুসলমানদের শিবিরে নেই।

ঃ আমি ও ধর্মপাল পূর্ব থেকেই তা নিশ্চিত। আচ্ছা, এখন তুমি আমার উপর আক্রমণ করো।

বুরহান হুঙ্কার দিয়ে তরবারী উত্তোলন করলো। সন্ন্যাসী লাফ দিয়ে পশ্চাতে গিয়ে দাঁড়ালো। বুরহান সামনে অগ্রসর হয়ে আঘাত করলো। সন্ন্যাসী আরেক লাফে সমুদ্রের পানিতে ঝাপিয়ে পড়ে। বুরহান পানির দিকে অগ্রসর হতেই সন্ন্যাসী সাঁতার কেটে বেশ দূরে চলে যায়। বুরহান তীরে দাঁড়িয়ে কয়েকবার নিস্ফল হুঙ্কার দিয়ে ফিরে এলো।

ধর্মপালের বন্দি হওয়ার বিষয়টি বুরহানের মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। এ চিন্তা করতে করতেই সে তার অধীন বাহিনীর নিকট ফিরে আসছে। হঠাৎ কে যেনো ডেকে বললো, আরে এদিক দিয়ে আবার কোথা থেকে এলে?

বুরহান চমকে ওঠলো। চেয়ে দেখে, সামনে হারুন দাঁড়িয়ে আছে। ঠোঁট থেকে তার দুষ্টুমির মিটিমিটি হাসি উপচে পড়ছে।

ঃ বন্ধু! আজ আমি এক বিস্ময়কর সংবাদ পেয়েছি।

ঃ আরে রাখো তোমার বিস্ময়কর সংবাদ। আগে বলো, সকাল থেকে কোথায় ছিলে?

ঃ আমি একটু মহিলাদের তাঁবুর দিকে গিয়েছিলাম।

হারুন হেসে বললো, একেই তো বলে আকর্ষণ। একেবারে তীব্র আকর্ষণ। আল্লাহর কাছে দু'আ করি। আল্লাহ তোমাকে ধৈর্যধারণ করার তাওফীক দান করুন। আচ্ছা, শেষে দীদার-সাক্ষাৎ হয়েছে তো? নাকি যন্ত্রণা নিয়েই ফিরে এলে?

ঃ হয়েছে রে হয়েছে। তবে দোস্ত! তোমার জন্য আজ একটি নয়, দুই দু'টি সংবাদ নিয়ে এসেছি। প্রথম সংবাদ হলো, রাজকুমারী চন্দ্রামুখীকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

একথা শুনামাত্র হারুনের চেহারা মলিন হয়ে গেলো। বললো, কোথায় গেছে তা কি জানা গেছে?

বুরহান আনীসার সাথে সন্ন্যাসীনীর সাক্ষাতের কথা এবং সন্ন্যাসীনীর সমস্ত কথা হারুনের নিকট বর্ণনা করলো।

হারুন অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে তা শুনলো। তারপর বললো, আমি বুঝে ফেলেছি। রাজকুমারীকে শিকদেব লুকিয়ে রেখেছে।

বুরহান এতোক্ষণ চন্দ্রামুখীকে ঘিরে যে সব চিন্তা-ভাবনা করেছিলো, হারুনের এ কথাটি তার চিন্তায় ভিন্ন মাত্রা যোগ করলো। তাই জিজ্ঞেস করলো, তোমার এ ধারণা কেনো হলো?

ঃ হয়তো শিকদেব-এর প্রত্যয় জন্মেছে, তার সাথে আর চন্দ্রামুখীর বিয়ে হচ্ছে না। কারণ যাই হোক; বদমাশ যা করুক আমি তাকে দৃষ্টান্তমূলক শিক্ষা দিয়ে ছাড়বো। অবশ্যই তার চন্দ্রামুখীকে ফিরিয়ে দিতে হবে।

উত্তেজনায় হারুনের চেহারা লাল হয়ে ওঠে। ক্রোধোন্মত্ত চোখ থেকে যেনো আগুনের স্ফুলিঙ্গ বেরুতে থাকে।

ঃ নিজেকে শান্ত রাখতে চেষ্টা করো। আত্মসংবরণ একটি দুর্লভ গুণ।

ঃ চিন্তা করো না বুরহান! আমি নিজেকে সংবরণ করবো। আচ্ছা, দ্বিতীয় সংবাদটি কী?

ঃ মুসলমানদের সাথে ষড়যন্ত্র করার অভিযোগে মহারাজা ধর্মপালকে বন্দি করেছেন। তারপর বুরহান সন্ন্যাসীর সকল কথা হারুনকে শোনালো।

হারুন মহাচিন্তায় ঘুরপাক খেতে লাগলো। সে বললো, না, আর কালক্ষেপণ নয়। এখনই... এখনই সুলতানকে সংবাদটা দিতে হবে।

ঃ আমি এজন্যই তোমার নিকট এসেছি।

ঃ তাহলে আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না। চলো, তাড়াতাড়ি চলো।

হারুন ও বুরহান শাহী শিবিরের দিকে ঘোড়া হাঁকালো।

একচল্লিশ

হারুন ও বুরহান শাহী তাঁবুর সামনে এসে ঘোড়া থেকে নামে। তাঁদের দেখেই প্রহরী প্রধান এগিয়ে এসে সালাম করে। বললো, জাঁহাপনা আপনাদেরকে স্মরণ করছিলেন।

হারুন বললো, এইতো আমি উপস্থিত হয়েছি। সুলতানকে আমার আগমনের সংবাদ দাও।

দলের প্রহরী প্রধান শাহী তাঁবুর দিকে অগ্রসর হতেই বুরহান তাকে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, সুলতানের নিকট কি এখন কেউ আছে?

ঃ হ্যাঁ, আছেন। আলতুনতাশ ও আমীর আলী আছেন।

ঃ তারা কখন এসেছেন?

ঃ এই তো আপনারা আসার একটু আগেই এসেছেন।

ঃ আচ্ছা, তাঁকে আমাদের আগমনের সংবাদ দাও।

প্রহরী প্রধান শাহী তাঁবুতে অন্তর্ধান হয়ে গেলো। কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে এসে বললো, চলুন, সুলতান আপনাদের অপেক্ষা করছেন।

হারুন ও বুরহান শাহী তাঁবুতে প্রবেশ করলো। বিরাট তাঁবু। আলিশান তাঁবু। সুলতানের কক্ষের অদূরে পৌঁছতেই তাদের দৃষ্টি সুলতানের উপর নিপতিত হলো। তাঁর চেহারায় ঝড়ের পূর্বাভাস। থেকে থেকে যেনো ক্রোধের বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। একটা আবেগ আর উত্তেজনায় তিনি অধীর। তারা অগ্রসর হয়ে সুলতানকে সালাম দিয়ে এক পাশে বসে পড়ে।

কিছুটা অন্যমনস্কভাবেই সুলতান সালামের উত্তর দিলেন। হারুনের চোখে শ্যেণ দৃষ্টি। দেখলো, সুলতানের সামনে একটি পুরাতন চিঠি পড়ে আছে। এ চিঠিটি হারুন আরেকবার সুলতানের নিকট দেখেছে। সুলতান তখন বলেছিলেন, এ চিঠিকে ঘিরে একটি রহস্য আবর্তিত হচ্ছে।

হারুন আজ আবার সেই চিঠি দেখে দারুণ বিস্মিত হলো। তার মনে একটি চিন্তা বার বার দোল খেতে লাগলো। এ চিঠিটি কার? এ চিঠির সাথে সুলতানের কী সম্পর্ক? আর কেনোই বা সুলতান মাঝে-মধ্যে এটি তার সামনে মেলে ধরেন।

এ ধরনের চিন্তার একটা হালকা মেঘ তার হৃদয়াকাশে যখন ভেসে বেড়াচ্ছে, ঠিক তখন সুলতানের গম্ভীর কণ্ঠ ভেসে এলো। হারুন! তুমি কি শুনেছো, রাজকুমারী চন্দ্রামুখীকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না! কে বা কারা তাকে তুলে নিয়ে গেছে?

হারুনের শির অবনমিত। বললো, আলমপনা, আমি সংবাদটি কিছুক্ষণ আগেই শুনেছি এবং সুলতানকে তা অবহিত করার জন্যই এসেছি।

ঃ আচ্ছা, তুমিও জেনে ফেলেছো! কোথা থেকে জানলে?

ঃ বুরহান ভাই থেকে শুনেছি।

সুলতান বুরহানের দিকে তাকিয়ে বললেন, বুরহান! তুমি কোথা থেকে শুনেছো?

বুরহান কিংকর্তব্যবিমূঢ়। রাজকুমারী চন্দ্রামুখীর কথা সে আনীসা থেকে শুনেছিলো। কিন্তু সে আনীসার কথা বলতে চাচ্ছে না। তা ছাড়া মিথ্যাও বলা যাবে না। এখন কী করবে? একেবারে থতমত খেতে গেলো।

সুলতান তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। ক্ষণকাল অপেক্ষা করার পর বললেন, তুমি বোধ হয় যার থেকে শুনেছো, তার নাম বলতে চাচ্ছো না।

আলতুনতাশ সেখানে বসে আছেন। আনীসা তার অপার স্নেহসিক্ত কন্যা। হৃদয়ের টুকরা। সুতরাং কোন্ সাহসে, কীভাবে সে আলতুনতাশের কন্যার নাম উল্লেখ করবে। কিন্তু সুলতান জিজ্ঞেস করছেন। এমন অবস্থায় তো অবশ্যই নাম বলতে হবে।

তাই বললো, আলমপনা নাম বলতে কোনো সংকোচ বা দ্বিধা নেই। আপনি হয়তো শুনে থাকবেন, আমি একদিন রাতে নারীদের শিবিরের ঐ দিকে সমুদ্রের কূলে গিয়েছিলাম। সমুদ্রের বুক চিরে তখন কয়েকটি নৌকা এসেছিলো। আমি তাদের দেখেছিলাম।

ঃ হ্যাঁ, তোমার সে ঘটনা আমার বিস্তারিত জানা আছে। শুনেছিলাম, তখন একটি মেয়েও সমুদ্রের তীরে ছিলো।

ঃ জাহাপনা! আপনি ঠিকই শুনেছেন, সে ঘটনার পর থেকে আমি একটু অবসর পেলেই নারীদের ঐ দিকটায় একটু ঘুরে আসি। অবস্থা পর্যবেক্ষণ করি। ঘটনাক্রমে আজও আমি গিয়েছিলাম। দেখলাম, ঐ মেয়েটি আজো তীরে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে ভীত-উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছিলো। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমাকে এতে পেরেশান মনে হচ্ছে কেনো?

সে বললো, এই একটু আগে এখানে একজন সন্ন্যাসীনী এসেছিলো।

ঃ হিন্দু সন্ন্যাসীনী?

ঃ জ্বী হ্যাঁ, হিন্দু সন্ন্যাসীনী। আনীসা...।

বুরহানের কণ্ঠ থেকে হঠাৎ আনীসার নাম বেরিয়ে গেলো। আলতুনতাশ চমকে ওঠে বুরহানের দিকে তাকালেন।

সুলতান জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে সেই মেয়ের নাম আনীসা?

ঃ জ্বী হ্যাঁ, আমাকে সে এ নামই বলেছিলো।

ঃ তুমি হয়তো জানতে না আনীসা কার মেয়ে। এখন জেনে নাও, আনীসা সেনাপতি আলতুনতাশের মেয়ে।

বুরহান তা পূর্ব থেকেই জানে। সে বললো, হ্যাঁ, সন্ন্যাসীনী বলেছিলো, রাজকুমারী চন্দ্রামুখী কেল্লার ভেতরে রাজপ্রাসাদ থেকে বিস্ময়করভাবে নিখোঁজ হয়ে গেছে। সন্ন্যাসীনী তার অনুসন্ধানেই এসেছিলো।

সুলতান বললেন, মনে হচ্ছে, সে সন্ন্যাসীনী সেই মহিলাই হবে, সেই মহিলাই হবে। আমার অন্তর ঐ সাক্ষ্যই দিচ্ছে।

বুরহান এবং হারুন উভয়ে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে যায়। তারা একে অপরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। তারা বুঝে ফেলে, সুলতান কোন্ মুসলিম মহিলার কথা বলছেন। কিন্তু মুসলিম মহিলা আবার হিন্দু সন্ন্যাসীনী হয় কীভাবে? এটা কীভাবে সম্ভব!

তারা যখন এ চিন্তায় দোল খাচ্ছিলো, ঠিক তখন সুলতান উত্তেজনায় এসে বললেন, হায় যদি তাকে ধরে রাখা হতো। যদি তার আগমনের সংবাদ আমি পেতাম।

হারুনের কণ্ঠে উদ্বেগ। বললেন, আলমপনা! সে মুসলিম নারী?

এবার সুলতান সতর্ক হয়ে যান। বললেন, হারুন! তোমরা জানো না। সোমনাথ বিজয়ের পথ ধরে একটি অজ্ঞাত রহস্য জানা যাবে। যা বেশ কিছু মানুষকে ঘিরে ঘুরপাক খাচ্ছে। যে রহস্যের কথা শুনে শ্রোতা বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়বে। এই যে তোমরা এ চিঠিখানা দেখছো...।

সুলতান সেই পুরাতন বিবর্ণ কাগজটির দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, যা হারুন আরেকবার দেখেছিলো। হারুন বললো, হ্যাঁ, আলমপনা দেখেছি।

ঃ এ চিঠির মধ্যেই সমস্ত রহস্য লুকিয়ে আছে, যা আমাকে এই সুদূর ভারতবর্ষের এক প্রান্তে টেনে নিয়ে এসেছে। কিন্তু তা প্রকাশের সময় এখনো হয়নি। আচ্ছা, যে সন্ন্যাসীনী এসেছিলো, সে কি আবার সোমনাথের দিকে গেছে?

ঃ হ্যাঁ, সে ফিরে গেছে।

ঃ শোন, এ কিছুই নয়। এ হলো মহারাজার চালবাজি। সে আমাদের ধোঁকায় ফেলতে চায়।

ঃ কিন্তু আমার মনে হয় বিষয়টি এমন নয়।

ঃ তাহলে কী তোমার অন্য কোনো মত আছে?

ঃ কিন্তু আমি তো সে সময়ই সমুদ্রের তীরে এক সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম। সেও বলেছে, সত্যই রাজকুমারী চন্দ্রামুখী নিখোঁজ। তার কোনো সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না।

ঃ এ এক কৌশল। মিথ্যে কথা প্রচার করার কারণেই লোকেরা তা বিশ্বাস করেছে। আর তা আমাদের নিকট এসে পৌছেছে।

ঃ কিন্তু সে সন্ন্যাসী আমাকে আরেকটি সংবাদ দিয়েছে, যদ্বারা বুঝা যায়, রাজকুমারী নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারটি নিছক মিথ্যা প্রচারণা নয়। এর বাস্তবতাও আছে।

সুলতান বললেন, তা কী?

ঃ মহারাজা ধর্মপালকে গ্রেফতার করেছেন।

সুলতানের চেহারায় আবার দুশ্চিন্তার রেখা ফুটে ওঠলো। তিনি বললেন, এটা কবেকার ঘটনা?

ঃ আমি সন্ন্যাসীকে তা জিজ্ঞেস করিনি।

ঃ আমি সেই সন্ন্যাসীকেও চিনতে পেরেছি। কিন্তু তোমরা কেনো

তাকে ফিরে যেতে বারণ করলে না।

ঃ তিনি ধর্মপালের মুক্তির ব্যাপারে তদবীর করতে ফিরে গেছেন।

ঃ আফসোস, বড়ই ভুল হয়েছে। মনে হয় আমার সকল মেহনতই বৃথা যাবে। তারপর সুলতান আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, হে আল্লাহ! আমি কি বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যাবো! আপনার প্রিয় বান্দাদের উপর কি বিপদের পাহাড় নিপতিত হবে আর আমি শুধু দেখতে থাকবো! তাদের কোনো সহায়তা করতে পারবো না! হে আল্লাহ! আমাকে সাহায্য করুন। দীর্ঘদিন যাবৎ আপনার প্রিয় বান্দারা চেষ্টা করছে। তা সফলতার দোর গোড়ায় পৌছিয়ে দেয়ার তাওফীক দিন।

মজলিসে উপস্থিত সবাই বিস্ফারিত নেত্রে তার দিকে তাকিয়ে রইলো। সুলতান বললেন, সেই সন্ন্যাসী আরো কিছু বলেছে কি?

ঃ হ্যাঁ, বলেছে, আজই সুলতানকে এ সংবাদ জানিয়ে বলবেন যেনো সুলতান দ্রুত আক্রমণ করেন। এমন আক্রমণ করানো যে মহারাজার সমস্ত চিন্তা-ফিকির যুদ্ধের মাঝে ঘুরপাক খেতে থাকে। যেনো ধর্মপালের ব্যাপার নিয়ে কোনো চিন্তা করার সুযোগ না পান।

ঃ তাহলে তো মনে হয় মহারাজাকে একটা শিক্ষা দিতে হবে। আর যদি তা সত্যই হয়ে থাকে, তবে অবশ্যই সত্বর এমন প্রচণ্ড আক্রমণ করতে হবে, যা রাজপুতরা প্রতিহত করতে অক্ষম থাকবে। মহারাজা চিন্তার সাগরে হাবুডুবু খেতে থাকবে। আলতুনতাশ তুমি সব কথাই শুনলে। আগামীকাল সকালেই তুমি এমন প্রচণ্ড আক্রমণ করবে, যেনো দুশমন দিশেহারা হয়ে যায়।

আলতুনতাশের কণ্ঠে দৃঢ়তা ফুটে ওঠলো। বললেন, আলমপনা! আপনার নির্দেশ যথাযথভাবে পালিত হবে।

ঃ আর আমীর আলী! তুমি আলতুনতাশের সাথে থাকবে। আমি তোমাদের পশ্চাতে থাকবো। আর হারুন! তুমি ও বুরহান বন্দরে আক্রমণ করবে। এ সিদ্ধান্তে যেনো চুল পরিমাণ হেরফের না হয়। আমাদের অবশ্যই ধর্মপালকে রক্ষা করতে হবে।

হারুন বললো, আশা করি মহান সুলতান আগামীকাল আমাদের দুঃসাহসিক অভিযানের কথা শুনতে পাবেন।

সুলতান বললেন, যাও, এখনই গিয়ে তৈরি হতে থাকো। আল্লাহর নিকট বিজয় ও সাহায্যের জন্য দু'আ করো। আমিও আল্লাহর নিকট দু'আ করবো।

সবাই একে একে শাহী তাঁবু ত্যাগ করে নিজ নিজ বাহিনীর নিকট ফিরে যায়। সুলতান অযু করে নামাযে দাঁড়িয়ে যান। সেজদায় লুটিয়ে পড়ে আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করতে থাকেন।

বিয়াল্লিশ.

মুসলিম বাহিনীর শিবিরে শিবিরে সংবাদ ছড়িয়ে পড়েছে, আগামীকাল প্রচণ্ড আক্রমণ করা হবে। তাই মুজাহিদরা রাত থেকেই যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

সকালে ফজরের নামায আদায়ের পর সবাই অস্ত্রসজ্জিত হয়ে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে গেলো। রাজপুতরা কেল্লার প্রাচীর ও বুরুজ থেকে দেখতে পায়, মুসলমানরা সশস্ত্র অবস্থায় সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তারা বুঝে ফেললো, আজ প্রচণ্ড আক্রমণ হবে। তারা সাথে সাথে রণডংকা বাজাতে লাগলো। ভয়ংকর আওয়াজ উত্থিত হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়তেই সোমনাথের হিন্দুরা বুঝে ফেললো, আজ আবার মুসলমানরা কেল্লা আক্রমণ করবে।

সাথে সাথে রাজপুতদের কয়েকজন অফিসার কেল্লার প্রাচীরে এসে পৌঁছলো। গোটা কেল্লাজুড়ে সাজ সাজ রব পড়ে গেলো। সোমনাথ রক্ষা করার জন্য যে সব রাজা-মহারাজা এসেছিলেন, তারা বুরুজে এসে ওঠলেন। সোমনাথের মহারাজাও এসে তার শাহী বুরুজে আরোহণ করলেন।

সোমনাথ বাহিনীর অফিসাররা কেল্লার প্রাচীরে ঘুরে ঘুরে ইট-পাথর আর তীরের মজুদ পর্যবেক্ষণ করতে লাগলো। কোথাও অপর্যাপ্ত মনে হলেই তা পূরণ করার নির্দেশ দিতে লাগলো।

কেল্লার অধিবাসীরা দেয়ালের পেছন কিংবা কেল্লার প্রাচীর থেকে মুসলমানদের গতিবিধি লক্ষ্য করছিলো। সূর্য পূর্বাকাশে কিছুটা উপরে ওঠে এসে যখন সোমনাথে উজ্জ্বল আলো ছড়িয়ে দিলো, ঠিক তখন মুজাহিদরা 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি দিয়ে অগ্রসর হতে লাগলো। এ ধ্বনি এতো বিকট যে, এক মাইল দূরে থাকা সত্ত্বেও রাজপুতদের মনে হলো, মুসলমানরা বুঝি কেল্লার অতি নিকটে এসে পৌঁছেছে। মুজাহিদ বাহিনী ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে লাগলো। রাজপুতরা তাদের দেখেই চীৎকার শুরু করে দিলো। রাজপুতদের মন্দিরের পুরোহিতরা সিঙ্গা আর ঘন্টা বাজানো শুরু করলো।

রাজপুতরা ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে অগ্রসরমান মুজাহিদদের দিকে তাকিয়ে আছে। তাদের বিস্ফারিত চোখ থেকে যেনো অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ঠিক্‌রে বেরুচ্ছে। যদি তাদের সামর্থ থাকতো, তাহলে কেল্লার প্রাচীর থেকে লাফিয়ে নেমে তাদের পদভারে পিষ্ট করতো। কিন্তু তারা জানে, মুসলমানরা রণাঙ্গনে ক্ষুধার্ত শার্দুলের রূপ ধারণ করে। তাই তারা কেল্লার প্রাচীরে দাঁড়িয়েই তাদের ক্রোধ ও জিঘাংসার অগ্নিবর্ষণ করতে লাগলো।

মুজাহিদরা অত্যন্ত ধীরে ধীরে সামনে অগ্রসর হচ্ছে। দূর থেকে মনে হচ্ছে, যেনো সমবেত মানুষের এক উত্তাল তরঙ্গ ভয়াবহ আওয়াজ তুলে এগিয়ে আসছে। কেল্লার অদূরে পৌঁছে মুজাহিদরা দাঁড়িয়ে যায়। তূনীর থেকে তীর নিয়ে

ধনুকে সংযোজন করে বীরবেশে সেনাপতির নির্দেশের অপেক্ষা করতে থাকে।

সর্বাগ্রে সেনাপতি আলতুনতাশ-এর বাহিনী। আলতুনতাশ তার বাহিনীর মাঝে অবস্থান করছেন। তিনি উচ্চকণ্ঠে তীর নিক্ষেপের নির্দেশ দিলেন। সাথে সাথে ঝাঁকে ঝাঁকে তীর কেল্লার দিকে ছুটে গেলো। মনে হলো যেনো একটি তূনীর থেকেই তীরগুলো বেরিয়ে গেছে।

শাঁ শাঁ করে বায়ুতরঙ্গ ভেদ করে তীরগুলো কেল্লার প্রাচীরে গিয়ে আঘাত করলো। যে রাজপুতরা প্রাচীরের উপর থেকে দেখছিলো, তারা প্রাচীরের আড়ালে চলে গেলো।

রাজপুতরাও প্রাচীরের আড়াল থেকে তীর বর্ষণ করতে লাগল। কিন্তু তাদের তীর মুজাহিদদের নিকট গিয়ে পৌছলো না। মাঝপথেই তা মাটিতে পড়ে গেলো।

মুজাহিদরা এবার পায়ে পায়ে এগিয়ে আসতে এবং থেমে থেমে তীর নিক্ষেপ করতে লাগলো। তাদের তীরগুলো প্রাচীরে আঘাত করে নীচে পড়তে লাগলো। কিছু কিছু তীর প্রাচীরের শীর্ষপ্রান্ত স্পর্শ করে ভেতরে গিয়ে পড়তে লাগলো। মাঝে-মধ্যে হতভাগ্য রাজপুতদের শরীরে বিদ্ধ হয়ে তাদের জখম করতে লাগলো।

রণাঙ্গনের একদিক থেকে মুজাহিদরা তীর ছুঁড়ছে আর অন্যদিক থেকে রাজপুতরা কেল্লার প্রাচীরের আড়াল থেকে তীর ছুঁড়ে মারছে। এ তীর ছোঁড়াছুড়ি এতো অধিক পরিমাণে হচ্ছে, যেনো তীরের কারণে আকাশের সূর্য ঢেকে যাচ্ছে।

আজ রাজপুতরা প্রকাশ্যে কেল্লার প্রাচীরের নিকট আসতে সাহস করেনি। বরং প্রাচীরের ফাঁক দিয়ে তীর নিক্ষেপ করছে। তাই তাদের তীরে মুজাহিদদের তেমন ক্ষতি হচ্ছে না। আবার রাজপুতরাও আড়ালে থাকার কারণে তেমন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে না। কিন্তু মুসলমানরা সুযোগে সুযোগে সামনে অগ্রসর হচ্ছে।

সেনাপতি আলতুনতাশ আজ নতুন পদ্ধতিতে মুজাহিদদের সারিবদ্ধ করেছেন। প্রত্যেক সারির মাঝে বিশ গজ করে ব্যবধান। তাই সৈন্যের সংখ্যা দশগুণ বেশি মনে হচ্ছে।

আলতুনতাশের বাহিনীর পর সেনাপতি আমীর আলীর বাহিনী। এ বাহিনীও ক্রমেই সামনে এগিয়ে আসছে। আমীর আলীর বাহিনীর পর কিছুটা জায়গা ফাঁকা। তারপরই শাহী ফৌজ। দেখতে তাদের ভয়ঙ্কর শার্দূল মনে হয়।

অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, মুসলমানরা আজ প্রতিজ্ঞা করে এসেছে, তারা আজ হয়তো সোমনাথের পতন ঘটাবে, নয়তো এ পথে জীবন উৎসর্গ করবে।

মুজাহিদরা সুশৃংখলভাবে এগিয়ে আসছে। অত্যন্ত ধীর তাদের গতি। অত্যন্ত দৃঢ় তাদের পদবিক্ষেপ।

রাজপুতরা এবার প্রস্তর বর্ষণ শুরু করলো। ধারালো পাথর বৃষ্টির ন্যায় মুষলধারায় বর্ষিত হতে লাগলো। পাথরের আঘাতে মুজাহিদরা আক্রান্ত হতে লাগলো। অতিষ্ঠ হয়ে ঘোড়াগুলো উদ্ভ্রান্তের মতো ছুটাছুটি শুরু করে দিয়েছে।

মুজাহিদরা এবার দ্রুত তাদের বড় বড় হালকা ও মজবুত ঢালগুলো মাথার উপর তুলে নিলো। নিজেদের এবং ঘোড়াগুলোকে ঢালের আড়ালে নিয়ে নিলো। সাথে সাথে ঘোড়াগুলো আরোহীর অনুগত হয়ে সামনে অগ্রসর হতে লাগলো।

রাজপুতরা এ অবস্থা দেখে চিৎকার করে দ্বিগুণ উদ্যমের সাথে পাথর নিক্ষেপ করতে লাগলো। ইতিমধ্যে মুজাহিদদের পক্ষ থেকে তীর নিক্ষেপের মাত্রা কমে এসেছে। এই সুযোগে রাজপুতরা পাঁচিলের উপর থেকে উঁকি মেরে মেরে তীর নিক্ষেপ করতে লাগলো। রাজপুতদের এই পাথর ও তীর আলতুনতাশ-এর অনুগত বাহিনীর উপর পড়তে লাগলো। একের পর এক যখম হতে লাগলো। কিন্তু মুজাহিদদের অন্তরে আজ এমন এক উদ্দীপনা-আগ্রহ তরঙ্গায়িত হচ্ছে, যার কারণে তারা কোনো কিছুই পরোয়া করছে না। আমীর আলী এ অবস্থা দেখে তার অনুগত প্রথম দুই সারির মুজাহিদদের তীর নিক্ষেপের নির্দেশ দিলেন। হঠাৎ হাজার হাজার তীর লক্ষ্যপানে শাঁ শাঁ করে ছুটে গেলো। উপুড় হয়ে থাকা রাজপুতদের শরীরে বিদ্ধ হলো। সাথে সাথে চারদিক থেকে চিৎকার উত্থিত হলো। অনেকে কেল্লার উপর থেকে গড়িয়ে পড়লো। ষাট ফুট দেয়ালের উপর থেকে পড়ে তাদের হাড়-গোড় ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেলো।

এভাবে দু'-তিন দফা তীর নিক্ষেপ করতেই কেল্লার পাঁচিল থেকে রাজপুতরা উধাও হয়ে গেলো। এবার তীর আর প্রস্তর নিক্ষেপের তীব্রতা কমে এলো। এ সুযোগে মুসলমানরা দ্রুত পাঁচিলের নিকটে গিয়ে পৌছলো। আজ মুসলমানরা সাথে করে পাঁচিল ভাঙা এবং ছিদ্র করার যন্ত্রপাতি নিয়ে এসেছে। সাথে এনেছে রেশমি সুতার মজবুত দড়ি ও অন্যান্য সামগ্রী।

কেউ ঘোড়ার পিঠে দাঁড়িয়ে পাঁচিলের উপরে দড়ি ইত্যাদি আটকানোর চেষ্টায় রত। কেউ পাঁচিলের সাথে ঘোড়া দাঁড় করিয়ে পাঁচিল ভাঙতে ও ছিদ্র করতে আরম্ভ করলো।

রাজপুতরা কেল্লার ছিদ্র দিয়ে এ অবস্থা দেখে মুসলমানদের উপর প্রভাব সৃষ্টি করার লক্ষ্যে উচ্চস্বরে চিৎকার করতে লাগলো এবং পাঁচিলের উপর দাঁড়িয়ে অত্যন্ত সাহস ও দৃঢ়তার সাথে তীর ও ধারালো পাথর নিক্ষেপ করতে লাগলো।

মুজাহিদদের ছুঁড়ে মারা কিছু কিছু দড়ি কেল্লার সাথে আটকে যায়। মুজাহিদরা সে দড়িতে চড়ে উপরে উঠতে লাগলো। বেশ কিছু রাজপুত এ চিত্র দেখে ছুটে গিয়ে সিঁড়ির রশি কেটে দিলো। ফলে যে সব মুজাহিদ উপরে উঠছিলো, তারা নীচে পড়ে গেলো এবং হাড় ভেঙে চুরমার হয়ে গেলো। কিন্তু

যে রাজপুতরা মুজাহিদদের সিঁড়ির দড়ি কাটতে পাঁচিলের প্রান্তে এসেছিলো, নীচ থেকে মুজাহিদরা তীরের আঘাতে তাদেরও আহত করে পাঁচিল থেকে নীচে ফেলে দিতে সক্ষম হলো। পাঁচিল থেকে পড়ে তাদের হাড়ও ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেলো। অবশেষে কিছু দুরন্ত দুর্বার মুজাহিদ সব বাঁধা উপেক্ষা করে কেল্লার পাঁচিলের প্রায় উপরে উঠে যেতে সক্ষম হলো।

আমীর আলীর সৈন্যরা বিষয়টা লক্ষ করলো। তারা বুঝলো, এখন তীর নিক্ষেপ করলে মুসলমানদের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । তাই তারা তীরবর্ষণ বন্ধ করে দিলো।

মুজাহিদরা পাঁচিলের দেয়াল বেয়ে পাঁচিলের উপর লাফিয়ে ওঠলো। তারা নাঙ্গা তরবারী হাতে ক্ষুধার্ত শার্দুলের মতো রাজপুতদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। মুজাহিদদের শাণিত তরবারীর আঘাতে কচুকাটা হয়ে রাজপুতরা লুটিয়ে পড়তে লাগলো। কেল্লার পাঁচিলের উপর মরণপণ যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলো।

রাজপুতরাও পিছ-পা হওয়ার নয়। তারাও শাণিত তরবারী দিয়ে দুঃসাহসিকতার সাথে মুজাহিদদের সাথে যুদ্ধ করতে লাগলো। মাত্র কয়েকজন মুজাহিদই দড়ি বেঁয়ে পাঁচিলের উপর উঠে আসতে সক্ষম হয়েছিলো। আর হাতে গোনা কয়েকটি সিঁড়িই পাঁচিলে আটকে পড়লো। অন্যদিকে পাঁচিলের উপর রাজপুতরা ছিলো অসংখ্য। তাই যে মুজাহিদই পাঁচিলের উপর গিয়ে ওঠতো, সে-ই বীরবিক্রমে পাঁচ-সাতজন রাজপুতকে হত্যা করে শহীদ হয়ে যেতো।

তবুও মুজাহিদরা একের পর এক পাঁচিলের উপর চড়তে লাগলো আর রাজপুতদের হত্যা করতে করতে শহীদ হতে লাগলো।

রাজপুতরা মুজাহিদদের একের পর এক পাঁচিলেব উপর আসতে দেখছিলো এবং পাঁচিল ভাঙার শব্দ শুনছিলো। তারা মুজাহিদদের দুঃসাহসিকতা ও বীরত্বে বিস্মিত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লো।

সূর্য মাথার উপর থেকে হেলে পড়ে তৃতীয় প্রহরের সূচনা করেছে। তারপর আরো পশ্চিমে হেলে পড়লো। কিন্তু মুজাহিদরা আজ যোহরের নামায পড়ারও সুযোগ পায়নি। তারা আজ মরণখেলায় এতোই মেতে ওঠেছে যে, নামায পড়ার সময়ও পাচ্ছে না। তাদের একই লক্ষ্য, কেল্লা দখল করতেই হবে। এ লক্ষেই তারা প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছে।

সে যুগের মুজাহিদদের এই দুঃসাহস ও হিম্মত ছিলো যে, তারা সোমনাথের লৌহসম কঠিন কেল্লার প্রাচীর ভাঙার সাহস করেছিলো। আর তারা আকাশচুম্বি পাঁচিলে উঠে নির্ভয়ে রাজ সৈন্যদের ও রাজপুতদের হত্যা করে নিজেরা শাহাদাতের সুধা পান করে লুটিয়ে পড়ছিলো। মুজাহিদদের ক্রমাগত আক্রমণের ফলে পাঁচিলের উপর রাজপুতদের লাশের স্তূপ পড়ে গেলো। তারা সারির পর

সারি রাজপুতদের হত্যা করতে লাগলো। মুজাহিদেরও মৃত্যুর সংখ্যা কম ছিলো না। যে মুজাহিদই পাঁচিলের উপর ওঠে যেতো, সে-ই শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করে ধন্য হতো।

মুজাহিদদের লক্ষ্য মরা আর মারা। তাই নির্ভয়ে তারা দুশমনদের হত্যা করতে করতে সামনে এগিয়ে যেতো। তাদের হাতে যতোক্ষণ তরবারী আছে আর শরীরে শক্তি আছে, ততোক্ষণ যুদ্ধ চালিয়ে যেতো। যুদ্ধ করতে করতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে লুটিয়ে পড়তো। রাজপুতরা তাকে নির্মম আঘাতে শহীদ করে দিতো।

এভাবেই যুদ্ধ হচ্ছিলো। ধীরে ধীরে সূর্য আকাশের পশ্চিম প্রান্তে অগ্রসর হচ্ছিলো। এক সময় সূর্য অস্তমিত হয়ে গেলো। পূর্বদিক থেকে অন্ধকার ক্রমেই এগিয়ে আসতে লাগলো। সুলতান তখন মুসলমানদের ফিরে আসার ইঙ্গিত করেন।

আলতুনতাশ সাথে সাথে মুজাহিদদের ফিরে আসার নির্দেশ দিলেন। মুজাহিদরা নির্দেশ পেয়ে পাঁচিল থেকে নেমে এলো। তারপর ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে 'আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে ফিরে এলো। রাজপুতরা পুনরায় মুজাহিদদের উপর তীর ও পাথর নিক্ষেপ শুরু করলো। মুজাহিদরা তাদের আক্রমণ প্রতিহত করতে করতে তাঁবুতে ফিরে এলো।

এ দিনের যুদ্ধে মুসলমানরা বিশেষ কোনো বিজয় অর্জন করতে না পরলেও রাজপুতরা মুজাহিদদের দুঃসাহসিকতা ও নির্ভীকতা দেখে ভয় পেয়ে যায়। এ যুদ্ধে পাঁচ হাজার রাজপুত ও সাড়ে তিনশ মুজাহিদ নিহত হয়।

মহারাজা ও অন্যান্য রাজাদের সঙ্গে শিকদেব আজ একটি বুরুজে বসা ছিলো। তারা দিনভর যুদ্ধ পরিস্থিতি অবলোকন করেছে। সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর মুজাহিদরা যখন যুদ্ধ বন্ধ করে ফিরে যায়, তখন অন্যান্যদের সাথে সেও তার আসন ত্যাগ করে নিজ কক্ষের দিকে রওনা হয়।

তখন রাত হয়ে গেছে। চারদিকে অন্ধকার ছড়িয়ে পড়েছে। আনমনে হাঁটছিলো শিকদেব। হঠাৎ মনে হলো, তার পশ্চাতে কে যেনো পা টিপে টিপে এগিয়ে আসছে। সে পশ্চাতে ফিরে তাকালো। দেখলো, এক লোক অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পা ফেলে দ্রুততার সাথে তার দিকেই এগিয়ে আসছে। শিকদেব কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, কে? আগন্তুক কোনো উত্তর দিলো না। সে সতর্ক পদক্ষেপে দ্রুত এগিয়ে আসতে লাগলো।

শিকদেব ভাবলো, হয়তো কোনো পথিক বা রাজকর্মচারি হবে। রাজ প্রাসাদের দিকে যাচ্ছে। লোকটি রাস্তা থেকে সরে এমন এক স্থানে গিয়ে দাঁড়ালো, যে স্থানটি দূরের আলোয় উদ্ভাসিত না হলেও অন্ধকার নয়। সে

ভাবলো, আগন্তুক এগিয়ে সামনে গেলে সে ধীরে-সুস্থে যাবে। কিন্তু আগন্তুক তা করলো না। সোজা তার দিকেই এগিয়ে এলো এবং ঠিক তার সামনে এসে দাঁড়ালো। বললো, আপনি আমার থেকে বেঁচে যেতে চাচ্ছেন?

শিকদেব কণ্ঠ শুনেই চমকে ওঠলো। তার চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। হতবুদ্ধিতায় কাঁপতে কাঁপতে বললো, আরে... তুমি...!

আগন্তুকের কণ্ঠ গম্ভীর। বললো, হ্যাঁ, আপনি আমাকে এতো সহজে চিনে ফেললেন...।

শিকদেব বললো, আওয়াজেই বুঝতে পেরেছি।

শিকদেব-এর চেহারায় আলোর প্রতিবিম্ব। আর আগন্তুকের চেহারা অন্ধকারে আচ্ছন্ন । আগন্তুক বললো, এতেই আপনার চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে!

শিকদেব-এর মন ভয়ে কাঁপলেও মুখে জোর এনে বললো, আমার চেহারা তো ফ্যাকাশে হওয়ার কথা নয়।

ঃ তা-ই তো দেখছি। ভয় পাচ্ছেন কেনো? আমি ভূত-প্রেত নই। ফেরেশতাও নেই। আমি একজন মানুষ। ঐ মানুষ...।

ঃ সে কথা না বলাই ভালো।

ঃ হয়তো সে আলোচনায় আপনার হৃদয়ে কষ্টের ছোঁয়া লাগবে!

ঃ হ্যাঁ।

আগন্তুক ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললো, পাষাণ, দাগাবাজ...তোর অন্তর কষ্ট পায়... তোর অন্তর...।

শিকদেব বিনয়ভরা কণ্ঠে বললো, মোহন সিং! একটু ধৈর্য ধরো। একটু চিন্তা করো। এটা সাধারণ জনগণের চলার পথ। এমন স্থানে এ ধরনের কথা বলা ঠিক নয়।

আগন্তুকের কণ্ঠ আরো তীক্ষ্ণ। আরো দৃঢ়। বললো, এক নির্দয়, পাষাণ, জালেমের ইজ্জত! এদিকে তাকাও। আমার দিকে চেয়ে দেখো। এখন তোমাকে কে আমার হাত থেকে রক্ষা করবে?

শিকদেব হাতজোড় করে বললো, চিৎকার করো না। আমার একটি কথা ঠান্ডা মাথায় শোনো।

ঃ বলো।

ঃ এখানে নয়, আমার সঙ্গে চলো।

ঃ কোথায়? তোমার কক্ষে? তাহলে তুমি আমাকে সহজেই...।

ঃ না আমার কক্ষে না। আমি জানি এখন তুমি আমার কোনো কথা-ই বিশ্বাস করবে না।

মোহন সিং বললো, তাহলে কোথায়?

ঃ রাজ বাগিচায়।

ঃ তাহলে তুমি সহজেই আমাকে বন্দি করাতে পারবে এবং রাজ বাগিচায় প্রবেশের দায়ে আমাকে ফাঁসিতেও ঝুলাতে পারবে!

শিকদেও বললো, একটু চিন্তা করে দেখো, আমি কি এমন দুঃসাহসিকতা দেখাতে পারি? যদি তোমাকে বন্দি করি, তাহলে তোমার একটি শব্দই আমার ধ্বংসের জন্য যথেষ্ট। তোমাকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলানোর পূর্বে আমাকেই তো তলোয়ার দ্বারা দ্বি-খন্ডিত করা হবে।

ঃ আমি বুঝি।

ঃ তাহলে তুমি কেনো আমাকে বিশ্বাস করতে পারছো না।

ঃ ওখানে গেলে হয়তো তুমি নতুন ফন্দি আঁটার সুযোগ পাবে!

ঃ সেখানে আমি আর তুমি, আমরা দু'জন থাকবো। তৃতীয় কেউ থাকবে না। এ কারণেই আমি সে স্থান পছন্দ করেছি। বলো, যাবে?

ঃ কিন্তু তুমি আমাকে কী বলবে?

ঃ তোমার ভুল ধারণা দূর করতে চেষ্টা করবো।

মোহন সিং অধির হয়ে বললো, দাগাবাজ, শয়তান... আমাকে ধোঁকা দিয়ে ধ্বংস করতে চাচ্ছো!

শিকদেব বিনীত কণ্ঠে বললো, মোহন সিং! পরমাত্মার দোহাই দিয়ে বলছি, শোরগোল করো না। তোমার এই চিৎকার যদি বিপদ টেনে আনে, তাহলে তুমিও কিন্তু মুক্তি পাবে না। আমি বন্দি হলে তুমিও বন্দি হবে। আমার অপরাধে তুমিও অংশীদার! আমাকে যে শাস্তি দেয়া হবে, তোমাকে সে শাস্তিই দেয়া হবে। ঠান্ডা মস্তিষ্কে চিন্তা করো, আমি সত্য বলছি না মিথ্যা বলছি।

এবার মোহন সিং কিছুটা নরম হলো। বললো, না, না তুমি মিথ্যা বলছো না। সত্য বলছো। ...আচ্ছা চলো।

উভয়ে নীরবে চলছে। উভয়ই উভয়কে ভয় করছে। কেউ কাউকে পেছনে যেতে দিচ্ছে না। আবার কেউ কারো আগেও যাচ্ছে না। উভয়ে আড়চোখে একে অপরকে দেখছে আর এগিয়ে যাচ্ছে। উভয়ের হাত তলোয়ারের হাতলে। যেনো প্রয়োজনে তা ব্যবহার করতে মুহূর্তে কাল বিলম্ব না হয়।

এক গোপন দরজা দিয়ে উভয়ে রাজ প্রাসাদের বাগিচায় প্রবেশ করলো। শিকদেব বললো, এ স্থান নিরাপদ। এখানে আমরা খোলামনে কথা বলতে পারবো। নিশ্চিন্তে কথা বলতে পারবো।

মোহন সিং-এর কণ্ঠ আবারো তীক্ষ্ণ ও শাণিত হয়ে উঠলো। বললো, নিরাপদ আর নিশ্চিন্তের কোনো প্রয়োজন নেই। আমরা এখন উভয়ে একে অপরের শত্রু...।

শিকদেব ভনিতা করে অট্টহাসি দিলো। তার হাসিতে ভয়-ভীতির ভাব পরিস্ফুট হলো। বললো, শত্রু... আমরা শত্রু নই।

মোহন সিং বললো, এটা কি শত্রুতার আলামত নয় যে, আমরা একে অপরকে ভয় করছি এবং উভয়েই তলোয়ারের হাতল চেপে ধরে আছি।

শিকদেব তলোয়ারের হাতল থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে বললো, তুমি সত্য বলেছো। কিন্তু এখন আমরা বরং গোটা জাতি বহিঃশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছি। এখন নিজেদের শত্রুতার কথা ভুলে ঐ হানাদার শক্তির বিরুদ্ধেই আমাদের পূর্ণ শক্তি ব্যয় করা উচিত।

ঃ এখন আমার বেশি কথা বলার সময় নেই। তোমার যুক্তির কথা শোনার ধৈর্য আমার নেই। আমি জিজ্ঞেস করছি, আমি যখন তোমার নির্দেশ অনুযায়ী...।

শিকদেব দ্রুত তার মুখে হাতচাপা দিয়ে বললো, পরমাত্মার শপথ দিয়ে বলছি, চুপ করো! যে ঘটনা আজো এক রহস্য হয়ে আছে, তা মুখে উচ্চারণ করো না।

ঃ তাহলে বলো, কেনো তুমি আমাকে ধোঁকা দিয়েছিলে? কেনো আমাকে জল্লাদের হাতে সমর্পণ করেছিলে? কেনো আমাকে হত্যা করতে চেয়েছিলে?

ঃ তুমি জানো, আমার এক পরিচারকের নামও মোহন সিং।

ঃ হ্যাঁ, তা জানি।

কথা বলতে বলতে তারা সমুদ্রের দিকে এগুচ্ছে। এ বাগিচার এক প্রান্ত সমুদ্রের তীরে গিয়ে মিশেছে। কিন্তু তা সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে বিশ ফুট উঁচুতে।

ঃ তাহলে শোনো এবং বিশ্বাস করো, আমি আমার ঐ পরিচারককে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলাম। কিন্তু বজ্জাত নির্বোধরা তার পরিবর্তে তোমাকে পাকড়াও করেছে। আমি সত্য বলছি। আমি তোমাকে জীবিত দেখতে পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত।

মোহন সিং ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললো, আনন্দিত হয়েছিলে! হ্যাঁ, তুমি আনন্দিতই হয়েছিলে; তাইতো আমার কণ্ঠস্বর শুনেই তোমার চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিলো!

ঃ আমি তৎক্ষণাৎ অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলাম এবং ভয় পেয়েছিলাম। কারণ, তুমি নিশ্চয় আমার সম্পর্কে ভুল ধারণা রেখেছিলে এবং তখন যে কোনো দুর্ঘটনাই ঘটাতে পারতে। তবে আমার বিশ্বাস ছিলো, তোমার সাথে খোলামেলা কথা বলতে পারলে তুমি আমাকে বিশ্বাস করবে। একটু চিন্তা করে দেখো মোহন সিং! যদি আমি তোমাকে বিশ্বাস না করতাম, তাহলে তোমাকে এ গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব দিতাম না, যে কাজের সাথে আমার জীবন-মরণ

জড়িয়ে আছে। যে ভুল হয়েছে, তা আমার পরিচারকদের ভুল। আমি তাদের এর শাস্তি দেবো। অত্যন্ত কঠিন ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেবো।

কথা বলতে বলতে তারা বাগিচার লোহার ফটকের সামনে এসে উপস্থিত হলো। ফটকের উভয় পার্শ্বে লোহার মজবুত রেলিং। রাজবংশের লোকেরা এদিকে ঘুরতে আসে। তারা রেলিংয়ের পার্শ্বে দাঁড়ায়। ঝুঁকে সমুদ্রের নয়নাভিরাম দৃশ্য উপভোগ করে।

শিকদেব সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বললো, ইস্ কী অন্ধকার! মনে হচ্ছে সমুদ্রের বুক থেকে আকাশ পর্যন্ত কালো চাদর ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে। দেখেছো, রাতের এই বাতাস কতো নির্মল, আনন্দদায়ক। শীতল বাতাসের ছোঁয়ায় শরীর শান্ত হয়ে যায়। হৃদয় সজীব হয়ে ওঠে।

ঃ শিকদেব! তুমি যা কিছুই বলো আমার কিন্তু বিশ্বাস হচ্ছে না। আমার মনে হচ্ছে, তুমি আমাকে হত্যা করতে চেয়েছিলে। আর এ কারণে... আমি আজ তোমাকে কিছুতেই জীবিত ছাড়বো না।

ঃ তাহলে দুনিয়াতে কি তোমার এমন কেউ আছে, যার কথা তুমি বিশ্বাস করো? হ্যাঁ, হ্যাঁ মনে পড়ছে, তুমি কামিনীর কথা বিশ্বাস করো।

মোহন সিং শিকদেব-এর বোন কামিনীকে ভালবাসতো। সে বললো, নিঃসন্দেহে জগতে এক ব্যক্তিই আছে, আমি যার কথা বিশ্বাস করি।

ঃ ঠিক আছে।

ঃ দেখো মোহন সিং! কেমন ফুরফুরে শীতল বায়ু উড়ে উড়ে আসছে।

সে উঁকি দিয়ে সমুদ্রের দিকে তাকালো। হঠাৎ বলে উঠলো, উহুঁ ঐ দেখো...ঐ যে ছোট ছোট আলো দেখা যাচ্ছে। মুসলমানরা নৌকা নিয়ে এদিকে আসেনি তো!

মোহন সিং এবার রেলিং-এর উপর দিয়ে বুক পর্যন্ত ঝুঁকে নদীর আলোগুলো পরখ করছে।

আচমকা শিকদেব মোহন সিংকে তুলে ধরে সমুদ্রে ফেলে দিলো। মোহন সিং-এর এক ভয়ার্ত চিৎকারের আওয়াজ ভেসে এলো। তারপর ঝুপ করে পানিতে পড়ে পড়ে গেলো।

শিকদেব জয়ের আনন্দে অট্টহাসি দিয়ে বললো, কুত্তা, সে সময় মরলি না তো এখন মরন। বলেই শিকদেব সে স্থান থেকে চলে এলো। তার অন্তরে আনন্দের নহর বয়ে চলছে। সে বীর পদক্ষেপে চলে এলো।

শিকদেব আজ আনন্দে দিশেহারা। তাকে দেখলে মনে হয়, সে তার এক ঘোরতর দুশমনকে ভূপৃষ্ঠ থেকে সরিয়ে দিতে পেরেছে। শাহী বাগিচা থেকে বের হয়ে সে তার বাসায় গিয়ে পৌছলো। কয়েকটি কক্ষ অতিক্রম করে নিজের

বিশেষ কক্ষে পৌঁছুতেই তার দৃষ্টি কামিনীর উপর নিপতিত হলো। কামিনীও শিকদেব-এর চেহারায় সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকালো।

কক্ষটি তীব্র আলোতে আলোকিত। তাই একে অপরের চেহারায় সন্ধানী দৃষ্টি ফেলে মনের অবস্থা আঁচ করতে পারলো। আজ কামিনী মনভাঙা, বিষাদক্লিষ্ট। পক্ষান্তরে শিকদেব-এর মেজাজ ফুরফুরে ও আনন্দিত।

কামিনী বললো, ভাইয়া! এসে পড়েছো?

শিকদেব বসতে বসতে বললো, হ্যাঁ এসে পড়েছি।

ঃ আজ তোমাকে খুব উৎফুল্ল মনে হচ্ছে। কী খবর! নতুন কোনো সুসংবাদ আছে কি?

ঃ কামিনী! তোমার মতো বোনকে দেখে কি আমি আনন্দিত হবো না! কিন্তু তোমাকে যে বিষাদক্লিষ্ঠ মনে হচ্ছে। কারণ কী?

ঃ আমি...হ্যাঁ আমি আজ দারুণ বিষন্ন, চিন্তাক্লিষ্ঠ। হয়তো বিষন্নতাই আমার নসিব।

ঃ কিন্তু কেনো তা তো বললে না?

ঃ যখন থেকে তোমার সাথে ষড়যন্ত্রে শরিক হয়েছি...।

ঃ ষড়যন্ত্রের কথা বাদ দাও। তুমি কি জানো না, দেয়ালেরও কান আছে?

ঃ শুনেছি এবং জানিও। কিন্তু তোমাকে বুঝানোর জন্যই...।

ঃ ইঙ্গিতই যথেষ্ট। নতুন কিছু ঘটেছে কি?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ কী ঘটনা?

ঃ তুমি তো বলেছিলে ভাইয়া! মোহন সিংকে শেষ করে দেয়া হয়েছে।

ঃ আমি তো এমন সংবাদই পেয়েছিলাম।

ঃ কিন্তু সে এখনো জীবিত।

ঃ আমিও আজ এমনই সংবাদ পেয়েছি।

ঃ সে আজ আমাকে ধমকি দিয়েছে।

ঃ কী বললো?

ঃ হয় আমি তার কথা শুনবো, না হলে সে আমাকে ও তোমাকে গ্রেফতার করাবে।

শিকদেব ক্ষীপ্ত হয়ে বললো, নিমকহারাম, কুত্তার বাচ্চা!

ঃ কেনো তার উপর ভরসা করেছিলে?

ঃ কামিনী! তুমি বলেছো এবং আমিও জানতাম সে তোমাকে ভালোবাসে।

কামিনী লজ্জা পেলো। তার সরল চোখের তারায় লজ্জার আবরণ ছড়িয়ে পড়লো। প্রসঙ্গ পরিবর্তনের জন্য শিকদেব বললো, কিন্তু এখন আর কোনো অসুবিধা নেই।

কামিনী আগ্রহভরে চোখ উপরে তুললো এবং বললো, তাহলে কি সে সন্তুষ্ট হয়ে গেছে।

ঃ না, তার কণ্ঠ চিরতরে রুদ্ধ করে দেয়া হয়েছে।

ঃ মানে?

ঃ এখন সে কথা না বলাই ভালো। একদিন এমনিতেই জানতে পারবে।

কামিনী বললো, কিন্তু আমার দারুণ ভয় হচ্ছে ভাইয়া! তার সামনে পড়তেই আমি কাঁপতে শুরু করেছি।

ঃ নিশ্চিন্ত থাকো। কোনোদিন সে তোমার সামনে এসে দাঁড়াবে না।

ঃ ভাইয়া আজো তো মুসলমানরা প্রচণ্ড আক্রমণ করেছে!

শিকদেব বললো, নিঃসন্দেহে তারা জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করেছে। তারা তো কেল্লার উপর উঠে এসেছিলো। কিন্তু পাঁচিলের উপর আমাদের যোদ্ধার সংখ্যা বেশি থাকায় তারা তেমন কিছু করতে পারেনি।

ঃ না, মনে হয় ঘটনা তেমন নয়। বরং রাত হয়ে যাওয়ার কারণে তারা ফিরে গেছে।

ঃ হ্যাঁ, এমনো হতে পারে। তবে মুসলমানরা এক যোদ্ধা জাতি। তারা বীর যোদ্ধা। এই যোদ্ধারা এমন বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে যে, তাদের মোকাবেলা করাও কঠিন।

কামিনী বললো, এই হাঙ্গামায় তো হারুনকে দেখতে পাননি?

ঃ আমি চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছি। বিস্ফারিত নয়নে তাকিয়ে ছিলাম। কিন্তু তাকে দেখতে পাইনি। হয়তো সে সুলতানের সাথে আছে।

ঃ শুনেছি, সুলতান তাকে খুব স্নেহ করেন।

ঃ আমিও শুনেছি।

ঃ আসলে সে তার যোগ্য।

শিকদেব ক্রোধ আর বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে কামিনীর দিকে তাকালো।

কামিনী বুঝে ফেললো, তার মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে। একজন রাজপুতের সামনে একজন মুসলমানের প্রশংসা করা ঠিক নয়। তাই বললো, কিন্তু তার জীবিত থাকা খুবই ক্ষতিকর।

ঃ তা ঠিক। কিন্তু একথাও ভাবতে হবে, তার নিকট আমাদের পৌছা সম্ভব কিনা?

ঃ যদি যুদ্ধ না হতো, তাহলে তো তাকে হত্যা করা খুব একটা কঠিন বিষয় ছিলো না।

ঃ তা কীভাবে?

ঃ একজন সুন্দরীকে পাঠানো হতো। সে তাকে ধোঁকা দিয়ে টেনে টেনে নিয়ে আসতে পারতো।

শিকদেও বললো, আচ্ছা আমি চিন্তা করে দেখবো।

ঃ যদি তাকে তুমি নাগালে পাও, তাহলে কী করবে?

ঃ তৎক্ষণাৎ হত্যা করে ফেলবো।

কামিনীর অন্তরে দারুণ ব্যাথা লাগলো। তার চেহারা ফিকে হয়ে গেলো। কিন্তু মুখে বললো, এমনই তো হওয়া উচিত। তবে সুলতান যতোদিন ফিরে না যাবেন, ততোদিন তাকে হত্যা করা ঠিক হবে না।

ঃ কিন্তু কামিনী! তাকে আমি সহজে কীভাবে নাগালে পেতে পারি? সে তো যেন-তেন কেউ নয়। সুলতানের প্রিয়পাত্র। মুসলমান যোদ্ধাদের প্রিয়ভাজন!

ঃ আর কিছুদিন অপেক্ষা করো। একটা পথ অবশ্যই বের করবো।

ঃ যদি সুলতান গজনবী কোনো কারণে ফিরে যান বা পরাজিত হয়ে চলে যান, তাহলে সব কিছুই ঠিক হয়ে যাবে।

ঃ কিন্তু আমি শুনেছি, সুলতান যা ইচ্ছে করেন, তা বাস্তবায়িত করেই ক্ষান্ত হন। তিনি তো আর এমনি এমনি ফিরে যাবেন না। হ্যাঁ, যদি পরাজিত হয়েও ফিরে যান, তারপরও প্রতিশোধ নিতে আবার আসবেন।

ঃ তবে মনে রেখো, একবার যদি পরাজিত হয়ে পালাতে বাধ্য হন, তাহলে পুনরায় এদিকে আসার সাহস করবেন না। তুমি কি জানো না, পথ কতো দুর্গম। আমি তো বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাই। তিনি চার-পাঁচশ মাইলের রুক্ষ মরু প্রান্তর অতিক্রম করে কীভাবে এলেন! আচ্ছা, এখন তুমি চলে যাও!

কামিনী উঠতে উঠতে বললো, আমি কি তাহলে মোহন সিং-এর ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকতে পারি?

ঃ হ্যাঁ, নিশ্চিন্ত থাকো। এখন আর সে তোমার বা আমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

কামিনী চলে গেলো। শিকদেব মনে মনে বললো, আমি তো কামিনীকে খুবই সরল মেয়ে মনে করতাম। কিন্তু এখন দেখছি, সে অনেক চালাক হয়ে গেছে। ...হারুনকে বাঁচাতে চায়। ...হ্যাঁ, তার কারণও আমি জানি। যদি তাকে নাগালে পাই, তাহলে বুঝাবো।

তারপর দাঁতে দাঁত পিষে বললো, কালবিলম্ব না করে সাথে সাথে তাকে হত্যা করবো। টুকরা টুকরা করে ফেলবো। কিন্তু তার মাঝে এমন কি আকর্ষণ আছে, যে মেয়েই তাকে দেখে, সে-ই তার প্রেমে পড়ে যায়! রাজকুমারী চন্দ্রামুখী তাকে পেতে আগ্রহী ছিলো। কামিনীও তার প্রতি দুর্বল!

এক পরিচারকের কণ্ঠস্বরে শিকদেব-এর চিন্তার সূত্র ছিঁড়ে যায়। বললো, বলবীর চন্দর প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করছেন।

শিকদেব মাথা তুলে পরিচারকের দিকে তাকালো। বললো, আসতে বলো।

কিছুক্ষণ পর বিশাল দেহের অধিকারী এক যুবক এসে উপস্থিত হলো।

তারই নাম বলবীর চন্দর। সে এসে অত্যন্ত আদবের সাথে শিকদেবকে কুর্নিশ ও আশির্বাদ জানালো।

শিকদেব বললো, বসো, তোমার চেহারা থেকে ভীতির আভাস পাওয়া যাচ্ছে। হয়েছে কি?

বলবীর চন্দর ভয়ার্ত কণ্ঠে বললো, হুজুর! সে তো পালিয়ে গেছে!

ঃ কে, মোহন সিং?

ঃ জ্বী হুজুর।

ঃ তোমরা কি তাকে প্রহরা দাওনি?

ঃ হুজুর! আমরা তো কড়া প্রহরা দিয়েছি। কিন্তু...।

ঃ তাহলে কীভাবে পালালো?

ঃ পরমাত্মাই ভালো জানেন। আমি খুবই চিন্তিত।

ঃ চিন্তা করো না। সে আমার নিকট এসেছিলো।

ঃ কখন?

ঃ এই তো একটু পূর্বে।

ঃ হায় হায় এটা আবার কেমন হলো! তাহলে কি আপনি তাকে গ্রেফতার করেছেন?

ঃ না।

ঃ তাহলে সে কোথায় গেছে?

ঃ সেখানে গেছে, যেখানে তার যাওয়ার দরকার ছিলো।

বলবীর চন্দর বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে তাকিয়ে থেকে বললো, আচ্ছা, স্পষ্ট করে বলুন না সে কোথায় গেছে?

ঃ যমের পেটে।

ঃ কীভাবে?

শিকদেব ঘটনাটি আগাগোড়া শুনিয়ে দিলো। বলবীর চন্দরের ভয় দূর হয়ে গেলো। সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললো, আপনি ঠিক করেছেন। তা না হলে বলা-ই মুশকিল ছিলো, সে কার কার ক্ষতি আর কাকে কাকে গ্রেফতার করিয়ে হত্যা করাতো। এখন আরেক সমস্যা রয়ে গেছে।

ঃ কে?

ঃ ধর্মপাল।

ঃ কিন্তু সে তো গ্রেফতার হয়ে গেছে।

বলবীর চন্দর বললো, যে কারণে গ্রেফতার হয়েছে, আপনিও তা জানেন।

ঃ হ্যাঁ, জানি।

ঃ আর একথাও জানেন, সে একজন নামকরা জ্যোতিষী।

ঃ হ্যাঁ, জানি।

ঃ তাহলে হতে পারে সে তার বিদ্যাবলে কিছু জেনে মহারাজাকে বলে দেবে আর মহারাজা...।

শিকদেব-এর অন্তরে কম্পন সৃষ্টি হলো। বললো, আরে, আমি তো এ বিষয়টি চিন্তাই করিনি। তাহলে এখন কী করতে হবে। তাহলে কি রক্ষীদের মাধ্যমে হত্যার ব্যবস্থা করবো?

ঃ এটা সম্ভব নয়। কারণ, তার রক্ষীরা তাকে সীমাহীন শ্রদ্ধা করে। কোন টোপেই তাদের রাজি করানো যাবে না।

শিকদেব-এর চোখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি। বললো, তাহলে...।

ঃ একটি পন্থা এখন আমার ভালো মনে হচ্ছে?

ঃ সেটা কী?

ঃ মহারাজা তার প্রতি চরম অসন্তুষ্ট। তাই মহারাজাকে আরো ক্ষেপিয়ে তার নির্দেশেই তাকে হত্যার ব্যবস্থা করতে হবে।

ঃ এটা একটু কঠিন বিষয়।

ঃ একটু চেষ্টা করে তো দেখবে?

ঃ আমি এখনই মহারাজার নিকট যাচ্ছি।

ঃ তাহলে নিশ্চিন্ত থাকুন, এ কাঁটাও দূর হয়ে গেলো বলে।

বলবীর চন্দর চলে গেলো। শিকদেব মহারাজার নিকট যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলো।

তেতাল্লিশ.

সোমনাথের মহারাজা সারাটা দিন বুরুজে বসে বসে যুদ্ধের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেছেন। তিনি দেখেছেন, মুসলমানরা কতো দুঃসাহসিকতার সাথে নির্দ্বিধায় ও নির্ভয়ে আক্রমণ করে, কতো ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে তীর আর পাথরের বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে সামনে অগ্রসর হয় এবং পাঁচিলের নিকট পৌঁছে যায়। তারপর যন্ত্রপাতি দিয়ে কেল্লার দেয়াল ভাঙতে ও ছিদ্র করতে থাকে। আরেক দল তো আরো দুর্ধর্ষ। রেশমের দড়ি ছুঁড়ে মেরে কেল্লার পাঁচিলের উপর আটকিয়ে তর তর করে উপরে উঠে যায়। তারপর ক্ষুধার্ত শার্দুলের ন্যায় অসংখ্য রাজপুতের সাথে মরণখেলায় মেতে ওঠে। রক্তের বন্যা বইয়ে দিয়ে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে ক্লান্ত-অবসন্ন হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লে ভীরু কাপুরুষ রাজপুতরা গিয়ে বীরত্ব ফলায়।

গভীর দৃষ্টিতে মহারাজা এসব ঘটনা দেখছিলেন। যুদ্ধ শেষে মহারাজাকে সংবাদ দেয়া হলো, আজকের যুদ্ধে পাঁচ হাজার রাজপুত নিহত হয়েছে আর আড়াই হাজার আহত হয়েছে। মহারাজা এতে দারুণ মর্মাহত ও বিষন্ন হলেন।

সাথে সাথে এও শুনলেন যে, মুসলমানরা সর্বসাকুল্যে সাড়ে তিনশ' নিহত হয়েছে। এ সংবাদে মহারাজা আরো বেশি দুশ্চিন্তায় নিমজ্জিত হলেন যে, রাতের খাবারের কথাও ভুলে গেলেন।

রাতের কিছু অংশ কেটে যাওয়ার পর মহারাজা অন্যান্য সকল রাজা মহারাজাদের বিশেষ বৈঠক তলব করলেন। মহারাজার নিয়ম এমনই ছিলো। রাতে তখন বিশেষ দরবার ডাকতেন, যখন সোমনাথের পুরোহিতরা মন্দিরে সোমনাথ মূর্তির স্নান দানে লিপ্ত থাকতো।

বৈঠকে সকল রাজা-মহারাজারা এসে উপস্থিত হলে সোমনাথের মহারাজা এসে নিজ আসন গ্রহণ করলেন। তারপর বিজ্ঞের ন্যায় ধীরে ধীরে শান্তকণ্ঠে বলতে লাগলেন–

আজ আপনারা সবাই দেখেছেন, মুসলমানরা কী বীরত্ব, দুঃসাহসিকতা ও অকুতোভয় হয়ে যুদ্ধ করেছে। কতো দৃঢ়তা ও ধৈর্যের সাথে লড়াই করেছে। তীর ও প্রস্তরবর্ষণ উপেক্ষা করে পাঁচিলের নিকট পৌঁছেছে। কীভাবে তারা পাঁচিল ভাঙার চেষ্টা করেছে। যদি পাঁচিল মজবুত না হতো, তাহলে অবশ্যই আজ তারা এতোটুকু পরিমাণ ছিদ্র করে ফেলতো, যদ্বারা অন্তত একটি ঘোড়া অনায়াসে প্রবেশ করতে পারে। কিন্তু পাঁচিল মজবুত হওয়ার কারণে তা করতে পারেনি। আপনারা কি ঐ দুর্ধর্ষ যোদ্ধাদের দেখেছেন, যারা রেশমের দড়ি বেয়ে তর তর করে কেল্লার উপর উঠে এসেছে এবং যুদ্ধ করে অসংখ্য রাজপুতকে হত্যা করে নিজেরা নিহত হয়েছে?

সবচে' ভয়ের বিষয় হলো, আজ পাঁচ হাজার রাজপুত নিহত হয়েছে আর মুসলমানরা নিহত হয়েছে মাত্র সাড়ে তিনশ। যদি এভাবে যুদ্ধ চলতে থাকে আর এভাবে রাজপুরা নিহত হতে থাকে, তাহলে নিঃসন্দেহে দ্রুত রাজপুতদের মাঝে হতাশা সৃষ্টি হবে। শীঘ্রই তারা মনোবল হারিয়ে ফেলবে। মুসলমানরা এ পবিত্র ভূমিকে অপবিত্র করবে। আমাদের তীর্থস্থানকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করবে।

আপনারা অবশ্যই শুনেছেন, সুলতান মাহমুদ যে দেশই বিজয় করেছে, সেখানে নির্বিচারে লুণ্ঠন চালিয়েছে। আমরা পরাজিত হলে সে এ শহর, কেল্লা ও মন্দিরেও লুণ্ঠন চালাবে। হয়তো আমাদের দেবতাদেরকে ভেঙে টুকরো টুকরো করবে। ম্লেচ্ছরা কখনো মূর্তি-দেবতা সহ্য করে না।

একথা বলার পর মহারাজার কণ্ঠ ভারী হয়ে এলো। দুঃখ-বেদনা আর কান্নায় তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এলো। আর কিছু বলতে পারলেন না।

তখন এক মহারাজা দাঁড়িয়ে ক্ষীপ্ত কণ্ঠে বললেন, এটা কখনোই হতে পারে না। এই অত্যাচারি ম্লেচ্ছ সুলতান কেল্লা পদানত করে শহরে ধ্বংসলীলা চালাবে, মন্দিরে লুট-তরাজ করবে, আমাদের দেবতার গায়ে হাত তুলবে এটা হতে

পারেনা। মনে রাখবেন, যদি এই ম্লেচ্ছ এমন দুঃসাহস দেখাতে আসে, তাহলে সোমনাথ দেবতার অভিশাপে সে ভস্ম হয়ে যাবে।

মহারাজার কণ্ঠ নৈরাশ্যে ম্লান হয়ে পড়েছে। বললেন, আমিও তো এমনই মনে করতাম। কিন্তু নৈরাশ্য যেনো আমার দিকে বানের মতো ধেয়ে আসছে। হয় আমার বিশ্বাসে চির ধরেছে, অন্যথায় দেবতাদের ঐ মর্যাদা ও শক্তি-সামর্থ অবশিষ্ট নেই, যা আমরা প্রাচীন ধর্মগ্রন্থসমূহে পাঠ করে আসছি।

এক রাজা দাঁড়িয়ে গেলেন। তেজোদীপ্ত কণ্ঠে, বললেন, না, না, মহারাজা! বিষয়টি এমন নয়। আমরা আগে যা ছিলাম এখনো তা-ই আছি। আমাদের বিশ্বাসও তেমনি অটুট আছে। দেবতাদের সেই মর্যাদা ও শক্তি-সামর্থও তেমনি আছে। তবে এখনো সেই সময় আসেনি, যখন দেবতারা তাদের ভয়ঙ্কর শক্তি ও প্রতাপের বিকাশ ঘটাবেন।

মহারাজার কণ্ঠ এবার আরো জোরালো। বললেন, সে সময় কবে আসবে, কখন আসবে? মুসলমানরা কি আমাদের উপর আক্রমণ করছে না? দেবতা সোমনাথজ্বীর অনুসারীদের কি নির্মমভাবে হত্যা করা হচ্ছে না? নারীরা কি বিধবা হচ্ছে না? শিশুরা কি এতীম হচ্ছে না? তাহলে কেনো এখনো দেবতারা নীরবে বসে আছেন আর তাদের ভক্ত–অনুসারীদের মৃত্যুযন্ত্রণা উপভোগ করছেন! এখনো কেনো তারা তাদের শক্তির বিকাশ ঘটাচ্ছেন না?

আরেক রাজার কণ্ঠ শোনা গেলো। অত্যন্ত প্রশান্ত ও নির্ভরতায় ভরা সে কণ্ঠ। বললেন, নিশ্চয় সহায়তা আসবে। নিশ্চয় নিশ্চয় সাহায্য আসবে। কিন্তু এখন আমাদের পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে। আমাদের ধৈর্য-সহ্য, আমাদের দৃঢ়তা ও আত্মবিশ্বাসের পরীক্ষা চলছে। আমরা এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলেই দেবতারা আমাদের সহায়তার এগিয়ে আসবেন। তখন তারা আমাদের হয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করবেন।

মহারাজার কণ্ঠ ভেসে এলো। বললেন, আমিও এমনই ধারণা করতাম। একথাই বলতাম। তবে যে বিষয়টি আমাকে ভাবিয়ে তুলছে, তা হলো, আমরা সংখ্যায় মুসলমানদের চে' অনেক গুণে বেশি। কিন্তু সাহসিকতা, দৃঢ়তা ও রণক্ষেত্রে অবিচলতার ক্ষেত্রে আমরা ভীরুতার পরিচয় দিচ্ছি। আমাদের অবস্থা হলো, আমরা সংখ্যায় অধিক হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানদের ভয়ে অস্থির। কেল্লার ভেতরে নিরাপদ আশ্রয়ে থেকে বীরত্ব প্রদর্শন করছি। অথচ প্রয়োজন ছিলো, রণক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে বিজয়মাল্য ছিনিয়ে আনা বা যুদ্ধ করতে করতে বীর বেশে ইহলোক থেকে বিদায় নেয়া।

অনেক রাজা প্রায় অস্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। কম্পিত কণ্ঠে বললেন, মহারাজা! আপনি ঠিক বলেছেন। আর আমার ঐ ভাইও ঠিকই বলেছেন যে,

আমাদের পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে। আমার মনে হচ্ছে, আমরা পরীক্ষায় পরিপূর্ণভাবে উত্তীর্ণ হতে পারিনি। বরং আমরা কেল্লায় নিরাপদে থেকে আমাদের বীরত্বের সুখ্যাতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের উজ্জ্বল ধারায় কালিমা লেপন করছি। আমাদের করণীয় ছিলো, মুসলমানরা আসার সাথে সাথেই কেল্লা থেকে বেরিয়ে তাদের মুখোমুখি দাঁড়ানো এবং সম্মুখসমরে লিপ্ত হওয়া।

আরেক রাজা বললেন, সে সময় তো এখনো বাকি আছে। এখনো আমাদের নিকট প্রচুর যোদ্ধা রয়েছে। এখনো আমরা চাইলে রণাঙ্গনে নেমে যুদ্ধ করতে পারি।

মহারাজার কণ্ঠে হতাশার সুর। বললেন, এটা কিভাবে সম্ভব, যখন রাজকুমারী চন্দ্রামুখীকে মুসলমানরা গোপনে তুলে নিয়ে গেছে; অথচ রাজপুতদের রক্ত এখনো উষ্ণ হয়ে ওঠেনি। যদি তাদের মাঝে বিন্দুমাত্র মর্যাদাবোধ থাকতো, হিম্মৎ থাকতো, তাহলে আমি বাঁধা দিলেও তারা তা মানতো না। বীরবিক্রমে মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তো। তাদের হাড় ভেঙে চুরমার করে দিতো। এ পবিত্র ভূমিতে তাদের অস্তিত্ব নিঃশেষ করে দিতো কিংবা নিজেরা নিঃশেষ হয়ে যেতো।

এক রাজা বললেন, মহারাজা! আপনি সত্য বলেছেন। তবে আপনার হয়তো জানা নেই, রাজপুতরা কতো মর্মাহত, কতো ব্যথিত! তারা কতো আবেগে উদ্বেলিত তাও মনে হয় আপনি অনুধাবন করতে পারেননি। কিন্তু তারা অসহায়। তারা তাদের আবেগ-উচ্ছ্বাসকে দমন করে নিরাশায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে। কারণ, তাদের কেল্লা থেকে বের হওয়ার অনুমতি নেই।

মহারাজা বললেন, কিন্তু আমাকে তো কেউ একথা একবারও বলেনি। আমি তো এ ব্যাপারে কিছুই জানি না!

অন্য এক রাজা বললেন, আসলে আমরা সবাই আপনার দিকে তাকিয়ে ছিলাম। আমরা সবাই আপনার সাহায্যের জন্য এসেছি। আপনার নির্দেশ মান্য করা আমরা অবশ্য কর্তব্য মনে করি। আমরা নিজ ইচ্ছায় কিছু করতে চাই না। আপনি আমাদের নির্দেশ দিয়ে দেখুন, আমরা রণাঙ্গনে কী প্রলয় ঘটিয়ে ছাড়ি। কীভাবে মুসলমানদের রক্ত নিয়ে খেলা শুরু করি।

মহারাজার চোখ আনন্দে চক চক করে ওঠলো। আত্মতৃপ্তিতে মনটা শান্ত হয়ে এলো। তিনি নিকটে ও দূরে পর্যবেক্ষকের দৃষ্টি ফেললেন। যেনো তিনি রাজাদের মনের অবস্থা যাচাই করতে চেষ্টা করছেন। ক্ষণকাল নীরব থেকে বললেন, তাহলে... তাহলে কি আপনারা সবাই রণাঙ্গনে গিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত?

সকলের উচ্ছ্বসিত কণ্ঠ কল্লোলিত হয়ে ওঠলো। চিৎকার করে বললেন, হ্যাঁ, আমরা সবাই রাজি, আমরা সর্বাত্মকভাবে প্রস্তুত।

মহারাজা বললেন, আচ্ছা, এবার আপনারা ভেবে-চিন্তে বলুন, কেল্লার বাইরে গিয়ে আক্রমণ করা কি সমীচীন হবে?

এক রাজা বললেন, আমার মনে হয় তা সমীচীন হবে না, ভালো ফল বয়ে আনবে না।

আরেক রাজা বললেন, যদি গভীরভাবে খতিয়ে দেখা হয়, তাহলে প্রতীয়মান হবে যে, এ কারণেই মুসলমানদের সাহস উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। তারা দেখছে, আমরা তাদের দেখে ভয়ে ইঁদুরের মতো গর্তে লুকিয়ে আছি। যদি আমরা বীর বিক্রমে রণাঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়তাম, তাহলে তারা এতো সাহস পেতো না। বরং আমরা যে শর্তারোপ করতাম, তা-ই মেনে নিতে বাধ্য হতো। তারা অনেক আগেই রাতের অন্ধকারে সোমনাথ ছেড়ে পালাতো।

এক রাজা উত্তেজনায় অধীর হয়ে বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ আপনি আমার মনের কথাই বলেছেন ভাই। আমি একথাই বলতে চাচ্ছিলাম। আমাদের অবশ্যই কেল্লা থেকে বেরিয়ে যুদ্ধ করতে হবে। বীরবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

এবার সবাই সমস্বরে বলে ওঠল, আমাদেরও একই কথা। আমরা কেল্লার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করবো। বীরত্বের সাথে সোমনাথ দেবতার জন্য জীবন উৎসর্গ করবো।

মহারাজার কণ্ঠে আবেগের উচ্ছ্বাস। হৃদয়ে আনন্দের হিল্লোল। বললেন, আচ্ছা তাহলে আপনারা এখন বিদায় নিন। যোদ্ধাদের বলে দিন, তারা যেনো রণাঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আগামীকালের সূর্য হয়তো নিহত মুসলমানের উপর শেষ রশ্মিটি বিকিরণ করতে করতে অস্তমিত হবে অথবা চূড়ান্ত আঘাত হেনে আমরা বীর বিক্রমে নিঃশেষ হয়ে যাবো।

সকলে আসন ছেড়ে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললো, সোমনাথ দেবতাজীর ইচ্ছায় অবশ্যই আগামীকাল মুসলমানদের লাশের উপর সূর্য অস্তমিত হবে।

সকল রাজা উঠে চলে যাচ্ছেন। ঠিক তখন শিকদেব এসে উপস্থিত হলো। সে সকল রাজার সাথে সাক্ষাত করে সোমনাথের মহারাজার সম্মুখে এসে উপস্থিত হলো। অত্যন্ত বিনম্রকণ্ঠে তাকে নমস্কার জানিয়ে আসন গ্রহণ করলো।

মহারাজা বললেন, শিকদেব! তুমি বেশ উপযুক্ত সময়েই এসেছো। আজকে আমরা সবাই বসে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আগামীকাল সকালে কেল্লা থেকে বেরিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবো।

শিকদেব উল্লসিত হয়ে বললো, অত্যন্ত সময়োপযোগি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আমিও এ প্রস্তাব দেয়ার জন্যই উপস্থিত হয়েছিলাম।

মহারাজা বললেন, বেশ, তাহলে তুমিও তোমার অনুগত যোদ্ধাদের নিয়ে সকালে কেল্লার ফটকে উপস্থিত থেকো।

শিকদেব বললো, তা-ই হবে মহারাজা! রাজাজ্ঞা শিরোধার্য। তবে আমি আরেকটি কথা বলতে এসেছিলাম।

মহারাজা তার দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, বলো, কী বলতে এসেছো?

শিকদেব বললো, আমি এবং সকল রাজা ধর্মপালের উপর দারুণ ক্ষীপ্ত। সকলের মনের আবেদন ও দাবি, তাকে তার বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি আগামী কালই দেয়া হোক এবং আগামীকাল যুদ্ধে যাওয়ার আগেই তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হোক।

মহারাজার কণ্ঠে উদাসীনতার ছাপ। বললেন, এতো তাড়াহুড়া করা যাবে না। তাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হবে। নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার শেষ সুযোগ তাকে দেয়া উচিত। আর এটা যুদ্ধের চূড়ান্ত পরিণতির পর হবে।

মহারাজার কথার পর শিকদেব এর আর কিছু বলার সাহস রইলো না। মহারাজা ওঠে চলে গেলেন। শিকদেব ব্যর্থমনে ফিরে গেলো।

চুয়াল্লিশ.

ইসলামী পতাকা পত্ পত্ করে উড়ছে। তার নীচে দাঁড়িয়ে আছেন সুলতান মাহমুদ গজনবী। চোখে তাঁর প্রখর দৃষ্টি। দেখছেন, কীভাবে মুসলমান বীর যোদ্ধারা, কীভাবে মুজাহিদরা বীরবিক্রমে তীর আর প্রস্তর বর্ষণের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জীবন বাজি রেখে ক্রমেই সামনে অগ্রসর হচ্ছে। কীভাবে দড়ির সিঁড়ি বেয়ে তর তর করে কেল্লার পাঁচিলে উঠে যাচ্ছে আর ক্ষুধার্ত শার্দূলের ন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

মুজাহিদদের জিহাদের স্পৃহা আর শাহাদাদের তামান্না দেখে তাঁর শিরায় উষ্ণ রক্ত উছলে ওঠলো। তিনিও জীবন বাজি রেখে দাড়ির সিঁড়ি বেয়ে কেল্লার পাঁচিলে উঠতে ইচ্ছে করলেন। কিন্তু মুসলিম বাহিনীর সিংহহৃদয় অফিসাররা এসে বিনীত কণ্ঠে বললো, মহামান্য সুলতান! আমাদের শিরায় খুন থাকতে আপনি একাজে যাবেন, এটা হয় না। আপনি দেখুন আমরা কী করছি।

কিন্তু তারপরও তিনি একবার দেখলেন, কেল্লার পাঁচিলে যে সব মুজাহিদ উঠে যুদ্ধ করছিলো, তাদের উপর রাজপুতরা ভীষণভাবে আক্রমণ করেছে। এ দৃশ্য তাঁর শরীরে আগুন ধরিয়ে দিলো। তিনি আর নিজেকে সংবরণ করতে পারলেন না। সারির পর সারি ভেদ করে সম্মুখে অগ্রসর হতে লাগলেন। সুলতানের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তাকে বুঝিয়ে বললেন, মহামান্য সুলতান! আপনি শান্ত হোন। একটু দেখুন, জীবন উৎসর্গকারী মুজাহিদরা কী বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করছে। এ বিশাল মুজাহিদ বাহিনীর সদস্যদের শাহাদাতের সুযোগ দিন। এখনো আপনার ময়দানে অবতীর্ণ হওয়ার সময় হয়নি।

সুলতান বললেন, আমি স্বচক্ষে দেখছি, রাজপুতরা মুসলমানদের উপর বীরবিক্রমে আক্রমণ করছে। এ দৃশ্য দেখার পর আমার শিরায় উষ্ণ খুন উছলে ওঠেছে। আমি সহ্য করতে পারছিনা। মুসলমানরা একের পর এক শহীদ হবে আর আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবো, তা কিছুতেই হতে পারে না। আমি তা সহ্য করতে পারবো না!

সুলতানের এ অবস্থা দেখে তাঁর বিশেষ অনুগত বাহিনীর মাঝেও উত্তেজনার হিল্লোল বয়ে গেলো। তারাও উদ্বেলিত হয়ে সামনে অগ্রসর হতে লাগলো। কিন্তু সেনাপতিদের নির্দেশে তারাও শান্ত হলো। আবেগ-উত্তেজনা কিছুটা কমে এলো।

এ ব্যাপারে সেনাপতিদের পরিকল্পনা ছিলো, আলতুনতাশ ও আমীর আলীর নেতৃত্বাধীন বাহিনী সরাসরি যুদ্ধ করবে আর সুলতানের অধীন দূর্ধর্ষ বাহিনী অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবে। ফলে রাজপুতদের মাথায় এ চিন্তা আগুন ধরিয়ে দেবে যে, এতো অল্পসংখ্যক মুসলমান যুদ্ধে আমাদের দিশেহারা করে দিচ্ছে। যদি গোটা বাহিনী একযোগে আক্রমণ করে, তাহলে যে পরাজয় অনিবার্য, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

সেনাপতিদের এ দৃষ্টিভঙ্গী ফলদায়ক হয়েছে। পাঁচিলের উপরের রাজপুতরা বিস্ময়ভরা চোখে দেখছে, অল্প কিছু মুজাহিদ কী দুঃসাহসিকতা ও বীরত্বের সাথে কেল্লার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে! অথচ বিপুলসংখ্যক মুজাহিদ এখনো নির্দেশের অপেক্ষায় আছে। এ অল্পসংখ্যক মুসলমানের বীরত্ব ও সাহসিকতায় রাজপুতরা ভীতু হয়ে পড়লো। মুসলমানদের বীরত্বের আতঙ্ক তাদের হৃদয়ে স্থায়ীভাবে আসন গেড়ে বসলো। তারা পরস্পর বলাবলি করতে লাগলো, যদি মুসলিম বাহিনীর সবাই একসাথে আক্রমণ করে, তাহলে তাদের হাত থেকো রক্ষা পাওয়ার কোনোই সুযোগ থাকবেনা।

সন্ধ্যায় সেদিনের মতো যুদ্ধ বিরতি দিয়ে মুসলিম বাহিনী পশ্চাতে ফিরে এলো। সুলতান নির্দেশ দিলেন, আজ মাগরিবের নামায সবাই এক জায়গায় এক সাথে আদায় করবো।

ইতিপূর্বে পাঁচ স্থানে পৃথক পৃথকভাবে জামাত হতো। হাজের আলীর নেতৃত্বাধীন বাহিনীতে এক জামাত। হারুন ও বুরহানের নেতৃত্বাধীন বাহিনীতে এক জামাত। আমীর আলীর নেতৃত্বাধীন বাহিনীতে এক জামাত। আলতুনতাশ-এর নেতৃত্বাধীন বাহিনীতে এক জামাত ও সুলতানের নেতৃত্বাধীন বাহিনীতে এক জামাত। এভাবে পাঁচ জামাতে নামায আদায় করা হতো।

আজ আলতুনতাশ, আমীর আলী ও সুলতানের অধীন বাহিনী এক সাথে রণাঙ্গনে অবস্থান করছে। তাই সূর্য অস্তমিত হওয়ার পরপরই মুজাহিদরা ঘোড়া

থেকে নেমে ওযু করে নিলো। সুউচ্চ সুললিত কণ্ঠের কয়েকজন মুজাহিদ একত্রে সমকণ্ঠে আযান দিলো। তারপর জামাত শুরু হলো। সারির পর সারিতে দাঁড়িয়ে খোদায়ে বেনিয়াযের সামনে হাত বেঁধে উপস্থিত হয়ে গেলো। সুলতান মাহমুদ গজনবী নামাযের ইমামতি করলেন।

নামাযের পর মুজাহিদরা যার যার তাঁবুতে ফিরে গিয়ে খাবারের আয়োজন করতে লাগলো। কারণ, আজ সারা দিন তাদের অনেকে যুদ্ধরত ছিলো। অনেকে রণাঙ্গনে সিপাহসালারের নির্দেশের অপেক্ষায় প্রস্তুত ছিলো। তাই দুপুরে খাওয়া-দাওয়া হয়নি। সবাই ক্ষুধার্ত। সবাই চাচ্ছে যদি তৈরি খাবার পাওয়া যেতো! কিন্তু আজ তো সবাই রণাঙ্গনে ব্যস্ত ছিলো। কে তাদের জন্য খাবার তৈরি করবে। তাই নিজেরাই রান্না করে খাবার খেলো।

এশার নামাযের পর সুলতান সেনাপতিদের ডেকে পাঠালেন। বললেন, আজ মুজাহিদরা অত্যন্ত আন্তরিকতা, সাহসিকতা ও বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তারপরও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুজাহিদ কেল্লার পাঁচিলে উঠতে সক্ষম হয়নি। যদি এমনিভাবে যুদ্ধ চলতে থাকে, তাহলে অনেক দিন লাগবে। আর যুদ্ধ বেশিদিন গড়াতে দেয়া ঠিক হবে না। একে তো রসদপাতি অভাব পড়ে যাবে, দ্বিতীয়ত রাজধানী থেকে বেশিদিন দূরে থাকাও আমি পছন্দ করছি না। আমাদের সীমান্তে অবস্থিত কাফেররা সিংহাসন খালি দেখে রাজধানীতে আক্রমণ করে বসতে পারে। এদিকে যতোই দেরি হতে থাকবে, ততোই সোমনাথে অবরুদ্ধ মানুষের জন্য সাহায্য আসতে থাকবে। তাই আমার ইচ্ছা দ্রুত একটি পরিণতির দিকে যাওয়া উচিত।

আলতুনতাশের কণ্ঠে পরম ভক্তি ও শ্রদ্ধা। বললেন, আলমপনা! আপনি আজ যে অভিমত ব্যক্ত করলেন, আমরাও তা-ই চিন্তা করছিলাম এবং যথাসাধ্য চেষ্টাও করছিলাম। কিন্তু আজ আমাদের নিকট স্পষ্ট হয়ে গেছে, কেল্লা অত্যন্ত মজবুত। এ কেল্লা ভাঙাও কঠিন। প্রায় এক প্রহর বীর যোদ্ধারা জানপ্রাণ চেষ্টা করেও তাতে বিন্দুমাত্র ফাটল ধরাতে পারেনি বা এতটুকু ছিদ্রও করতে পারেনি, যা দিয়ে বিড়াল ঢুকতে পারে। আর দড়ি ও সিঁড়ি বেয়ে গোটা বাহিনীর কেল্লার পাঁচিলে উঠাও সম্ভব নয়। তাই যুদ্ধ পদ্ধতি নিয়ে নতুন করে ভাবা উচিত।

আমীর আলী বললেন, আমি নিকট থেকেই দেখেছি, মুজাহিদরা জানপ্রাণে কেল্লার পাঁচিলে উঠার চেষ্টা করছিলো। কিন্তু তারা তেমন সফল হতে পারছিলো না।

সুলতান মাহমুদ বললেন, হ্যাঁ, আমরাও তা অবলোকন করেছি। মুজাহিদদের সাহসিকতা ও হিম্মৎ দেখে আমিও অবাক্ হয়েছি। কিন্তু এখন আমাদের ভাবতে হবে, কীভাবে সহজে কেল্লা পদানত করা যায়।

আলতুনতাশ বললেন, অগ্নিতীর নিক্ষেপ করে কেল্লার ভেতরে আগুন লাগিয়ে দিলে কেমন হয়?

সুলতান বললেন, এটা আমার নিকট পছন্দনীয় নয়। এভাবে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত হওয়া মানবতা বিরোধী। তাছাড়া আমরা তো এখানে থাকার জন্য বা রাজত্ব কায়েম করার জন্য আসিনি। আমাদের লক্ষ্য রাজকুমারী চন্দ্রামুখীকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া। এর জন্য কেল্লা ও শহরকে ধ্বংস করা উচিত হবে না।

আমীর আলী বললেন, তাহলে আমরা আগামীকাল একযোগে পূর্ণ শক্তি নিয়ে আক্রমণ করি। কেল্লার তিন দিক থেকে দুর্বার আক্রমণ চালিয়ে যে কোনো এক দিক থেকে রাজপুতদের তাড়িয়ে দিয়ে দলে দলে কেল্লায় উঠে যেতে চেষ্টা করি।

আলতুনতাস বললেন, চমৎকার প্রস্তাব। আগামীকাল এভাবেই যুদ্ধ করতে হবে।

সুলতান বললেন, মুজাহিদেরকে এ বিষয়টি ভালোভাবে বুঝিয়ে দেবে। তাদের উৎসাহিত করবে, যে কোনোভাবেই হোক কেল্লার পাঁচিল দখল করে নিতে হবে। কেল্লার দেয়াল ভাঙার চেষ্টা করতে হবে।

আমীর আলী বললেন, তা-ই হবে।

সুলতান বললেন, তাহলে এখন বিশ্রাম নেয়া হোক।

সকলে উঠে চলে গেলো এবং প্রত্যেক সেনাপতি নিজ অধীন মুজাহিদদের সুলতানের নির্দেশ মোতাবেক প্রস্তুত হওয়ার হুকুম দিলেন।

রাতে মুজাহিদরা অত্যন্ত শান্তভাবে ঘুমালো। সকালে আযানের আওয়াজ শুনে ঘুম হতে ওঠে। জামাতের সাথে নামায আদায় করে।

দু'আর পর তারা রণাঙ্গনের দিকে ফিরে তাকাতেই দেখলো, রাজপুতরা পঙ্গপালের মতো দলে দলে চিৎকার করতে করতে ময়দানে ছুটে আসছে। হাতে তাদের শাণিত তরবারী, ঢাল, তীর, বল্লম।

সিপাহসালাররা সাথে সাথে মুজাহিদদের সশস্ত্র হওয়ার হুকুম দিলো।

মুজাহিদরা দৌড়ে তাঁবুতে ফিরে গেলো এবং দ্রুত যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে ফিরে এসে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ালো।

পঁয়তাল্লিশ

রাজপুত যোদ্ধারা পঙ্গপালের মত দলে দলে সোমনাথ কেল্লা থেকে বেরিয়ে আসছে, যেনো তাদের শেষ নেই। যেনো সোমনাথের সকল অধিবাসী আজ রণ-ময়দানে নেমে এসেছে। দিগন্ত-বিস্তৃত রণপ্রান্তর জুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে রাজপুত যোদ্ধারা।

মুসলিম মুজাহিদ বাহিনীতেও আজ উল্লাসের শেষ নেই। আনন্দের আতিশয্যে উদ্বেলিত হয়ে মুজাহিদরা রণক্ষেত্রে নেমে এসেছে। তারা সারির পর সারিবদ্ধ হয়ে সুশৃঙ্খলভাবে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। মুজাহিদ বাহিনীর অনতিদূরে এসে রাজপুত যোদ্ধারা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াতে লাগলো।

মুজাহিদ বাহিনীর বাম পার্শ্বের নেতৃত্বে রয়েছেন আলতুনতাশ। ডান পার্শ্বের নেতৃত্বে আমীর আলী আর মাঝে রয়েছেন সুলতান মাহমুদ স্বয়ং। প্রত্যেক পার্শ্বেই প্রধান অধিনায়কের অধীনে রয়েছে আরো বেশ কিছু সেনাপতি ও অফিসার।

রাজপুতরাও মুজাহিদ বাহিনীর মতো ডানে, বামে ও মাঝে তিনজন অধিনায়কের নেতৃত্বে সুশৃঙ্খল হয়ে রণাঙ্গনে দাঁড়িয়েছে। তাদের মাঝে অবস্থিত রাজা-মহারাজারাই নেতৃত্বে রয়েছেন। কেউ হয়েছেন ডান পার্শ্বের অধিনায়ক, কেউ বাম পার্শ্বের। তবে মধ্য বাহিনীর সর্বাধিনায়ক খোদ সোমনাথের মহারাজা। তার সাথে রয়েছে শিকদেব।

রাজপুত যোদ্ধাদের সংখ্যা আজ এতো বেশি পরিলক্ষিত হচ্ছে যে, মুজাহিদরা মনে করছে, চারদিক থেকে যেনো তারা পরিবেষ্টিত হয়ে যাচ্ছে। রণক্ষেত্রের চারদিকে যেনো রাজপুত আর রাজপুত।

সুলতান মাহমুদ গজনবী শির উঁচু করে চারদিকে দৃষ্টি বুলালেন। কপালের কুঞ্চন রেখায় চিন্তার ভাব ফুটে ওঠলো। তিনি তার একান্ত ঘনিষ্ঠ পরিচারককে ইঙ্গিতে কাছে ডাকলেন। কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিসিয়ে বললেন, যাও, শাইখ আবুল হাসান খিরকানীর জুব্বাটি নিয়ে এসো।

পরিচারক সাথে সাথে মুজাহিদদের সারি ভেদ করে অদৃশ্য হয়ে গেলো এবং কিছুক্ষণ পরে একটি জুব্বা নিয়ে ফিরে এলো। সুলতান মাহমুদ গজনবীর অন্তরে আল্লাহওয়ালা-বুযুর্গদের ইজ্জত ও মর্যাদা ছিলো অপরিসীম। তিনি অত্যন্ত আদবের সাথে জুব্বাটি পরিচারকের হাত থেকে তুলে নিলেন। তারপর ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন।

পরিচারক দ্রুত জায়নামায বিছিয়ে দিলো। সুলতান মাহমুদ দু'রাকাত নামায আদায় করে দু'আ শুরু করলেন–

'হে পাক পরওয়ারদেগারে আলম! হে আল্লাহ! হে রহমান, রাহীম! মুসলমানরা আপনার সাহায্যের আশায় স্বদেশ ছেড়ে দূর দেশে এসেছে। দুশমনদের দেশে এসে পৌঁছেছে। কাফেরদের সাথে জিহাদ করার জন্য এসেছে। তাদের সংখ্যাধিক্যে আজ রণক্ষেত্র জনসমুদ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। হে আমার মাওলা! মুসলমানদের সাহায্য করুন। আজ যদি আপনার ইবাদতকারী বান্দারা শেষ হয়ে যায়, তাহলে আমি পাপীর কারণে ইসলামের ভীষণ ক্ষতি

হবে। মুসলমানদের শক্তি ও প্রভাব বাকি থাকবে না। হে আল্লাহ! ইসলাম ও মুসলমানদের অপমান ও লাঞ্ছনার হাত থেকে রক্ষা করুন। আপনি প্রচন্ড প্রতাপ ও ক্ষমতার অধিকারী। হে আল্লাহ! আমার শাইখের জুব্বার মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখুন। আপনার গোনাহ্গার বান্দা মাহমুদের মর্যাদা সুউচ্চ করুন।'

সুলতান মাহমুদ যখন দু'আ করছিলেন, তখন তার দু'চোখ দিয়ে অশ্রুর বন্যা বয়ে যাচ্ছিলো। তার অশ্রুতে গন্ডদ্বয় সিক্ত হয়ে দাড়ি বেয়ে টপ্ টপ্ করে গড়িয়ে পড়তে লাগলো।

কিছুক্ষণ দু'আ করার পর তার হৃদয় এক অপার্থিব প্রশান্তির ছোঁয়ায় শান্ত হয়ে গেলো। দু'আ শেষে যখন দাঁড়ালেন, তখন তাঁর হৃদয়ে উচ্ছ্বাস ও আবেগের ঢেউ তরঙ্গায়িত হচ্ছে। সকল দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা দূর হয়ে গেছে। তিনি ঘোড়ায় চেপে সামনে অগ্রসর হলেন। মুজাহিদের সর্বপ্রথম সারির সামনে গিয়ে ডানে ও বামে ঘুরে-ফিরে দেখলেন। তারপর সবার মাঝে এসে দাঁড়ালেন। তারপরই তাঁর সুউচ্চ কণ্ঠ ছড়িয়ে পড়লো– 'আমার মুজাহিদ ভাইয়েরা! এ কারণে কোনো নৈরাশ্যের শিকার হয়ো না যে, আমরা সংখ্যায় নগন্য আর দুশমন অনেক বেশি। মুসলমান সর্বদা আল্লাহর উপর ভরসা রেখে যুদ্ধ করে। আর আল্লাহ সর্বদা মুসলমানদের সাহায্য করেন। ইনশাআল্লাহ, আজো আল্লাহ আমাদের সাহায্য করবেন। মুসলমানদের ঐতিহ্যই হলো, তাদের সংখ্যা একেবারে নগন্য হওয়া সত্ত্বেও বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে আল্লাহর উপর ভরসা রেখে যুদ্ধ করে এবং বিজয়মাল্য ছিনিয়ে আনে। তোমরা মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করো। আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদের জন্য জান্নাতের ওয়াদা করেছেন। আর জান্নাত তরবারীর ছায়াতলে। শাহাদাত জিহাদ করার মাধ্যমেই অর্জিত হয়। তাই আজ জিহাদ করো, লড়াই করো। মন দিয়ে হৃদয় দিয়ে যুদ্ধ করো। মনে রেখো, যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে মূর্তি, পাথর, গাছপালা, পশুপক্ষি, নদনদী ইত্যাদির পূজা করে, কুদরতিভাবেই তারা বীর বাহাদুর হয় না। নিশ্চয়! নিশ্চয়! নিশ্চয়! তোমাদের প্রাণপণ আক্রমণের তোড়ে তারা পশ্চাদ্ধাবন করে পালাবে।'

সুলতান মাহমুদ গজনবীর এ আবেগ-উদ্দীপ্ত বক্তৃতা মুজাহিদদের অন্তরে শাহাদাতের তামান্নার নহর বইয়ে দিলো। তারা জীবন উৎসর্গ করার জন্য সর্বাত্মকভাবে তৈরি হয়ে গেলো।

রাজপুতদের বাহিনী থেকে নাকাড়ার ধ্বনি-প্রতিধ্বনির গুরুগম্ভীর আওয়াজ ভেসে আসছে। তাদের প্রত্যেক দলের লোকেই নাকাড়ার ধ্বনি দিচ্ছিলো। তাই গোটা রণক্ষেত্র মুখরিত ও গুঞ্জরিত হয়ে ওঠলো।

মুজাহিদ বাহিনী ও হিন্দু রাজপুতদের মাঝে খুব বেশি দূরত্ব নেই। তীরের আওতায় এসে পড়েছে উভয় বাহিনী। উভয় বাহিনী মরণপণ রক্তাক্ত খেলায়

ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত হয়ে গেলো। পরক্ষণেই রাজপুতরা চিৎকার ধ্বনি দিতে দিতে মুসলমানদের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে লাগলো। তারা এভাবে অগ্রসর হচ্ছে, যেনো মুজাহিদদেরকে চার দিক থেকে ঘিরে ফেলবে এবং ঘোড়ার পদতলে পিষ্ঠ করে নিঃশেষ করে ফেলবে।

রাজপুতদের এ অবস্থা দেখে সুলতান মাহমুদ গজনবী হতবাক্ ও বিস্মিত হয়ে পড়লেন। তিনি হিন্দু রাজপুতদের বাহিনীর দিকে ও আকাশের দিকে তাকাচ্ছিলেন।

রাজপুতদের বিশাল বাহিনী সমুদ্রের তরঙ্গমালার ন্যায় তরঙ্গ তুলে তুলে এগিয়ে আসছে। হঠাৎ সুলতান মাহমুদ দৃঢ়পদে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। কণ্ঠ চিরে তার তাকবীর ধ্বনি বিঘোষিত হলো। সাথে সাথে মুজাহিদরা উচ্চকণ্ঠে তাকবীর ধ্বনি দিলো। রণাঙ্গন কেঁপে উঠলো। রাজপুতদের নাকাড়ার আওয়াজ থেমে গেলো।

এবার মুজাহিদ বাহিনী অগ্রসর হতে লাগলো। তাদের শানশওকত আর শক্তিমত্তার ভিন্ন রূপ। চোখে-মুখে শাহাদাদের নেশা। পদবিক্ষেপে পাহাড়সম দৃঢ়তা। সাদা ধবধবে পোশাক। শাণ দেয়া তরবারী রোদের আলোয় ঝলমল করছে।

রাজপুতরা তীর বর্ষণ শুরু করলো। সাথে সাথে মুজাহিদরা হাতে তূনীর তুলে নিলো এবং তীরবর্ষণ শুরু করলো। তীরে তীরে আকাশ ছেঁয়ে গেলো। শাঁ শাঁ রব তুলে আসছে আর যাচ্ছে।

তীরের আঘাতে অনেকেই আক্রান্ত হচ্ছে। আক্রান্ত হয়ে চিৎকার আর আর্তনাদ শুরু করছে। আক্রান্ত অশ্ব বেদনায় লাফিয়ে ওঠছে, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। আহত যোদ্ধা কখনো ঘোড়া থেকে পড়ে যাচ্ছে আর পদদলিত হয়েই নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে।

উভয় পক্ষই তীরবৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষার জন্য ঢাল তুলে নিলো এবং পায়ে পায়ে এগিয়ে চললো। ধীরে ধীরে উভয় বাহিনীর মাঝে ব্যবধান কমে আসতে লাগলো। এখনো উভয় বাহিনীর মাঝে বেশ ব্যবধান। বেশ কিছু তীর নিজ নিজ বাহিনীর মাঝে গিয়ে পড়তে লাগলো। এসব তীর রাজপুতদেরই বেশি। হয় তারা তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে পূর্ণ শক্তিতে নিক্ষেপ করেনি বা শারীরিক দুর্বলতার কারণেই দূরে নিক্ষেপ করতে পারছে না।

তাছাড়া রাজপুতদের তীর নিক্ষেপে কোনো শৃঙ্খলা ছিলো না। পশ্চাৎ ও সামনের সকল রাজপুতই সমান তালে লক্ষ্যহীনভাবে তীর ছুঁড়ছে। তাই মুজাহিদরা তা সহজেই ঢাল দ্বারা প্রতিহত করে সামনে এগিয়ে আসছে।

মুজাহিদ বাহিনীতে সবকিছুই যেনো পরিকল্পিত। দেহের পূর্ণ শক্তিতে এক একটি তীর ছুঁড়ছে। লক্ষ্য নির্ধারণ করে ছুঁড়ছে। তীরের আঘাতে বিকট চিৎকার করে লুটিয়ে পড়ছে এক একজন রাজপুত। আহত হচ্ছে ঘোড়া। হ্রেষারব তুলে চিৎকার করতে করতে চরম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে।

এ তীরযুদ্ধে মুজাহিদদের চে' রাজপুতরা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হলো। কারণ, মুজাহিদরা যেভাবে তীর নিক্ষেপ করছে, রাজপুতরা তা জানে না। তাছাড়া রাজপুতদের তীরের ফলা প্রশস্ত হওয়ার কারণে শরীরে বেশ জায়গা জুড়ে ক্ষতের সৃষ্টি করলেও শরীরের অভ্যন্তরে তা বেশি প্রবেশ করছে না। পক্ষান্তরে মুজাহিদদের তীরের ফলা তীক্ষ্ম ও অপ্রশস্ত। তাই শরীরের যেখানেই তা বিদ্ধ হচ্ছে গভীরে গিয়ে পৌঁছছে। কখনো হাড়ে গিয়েও আঘাত হানছে।

আজকের যুদ্ধে উভয় বাহিনীই মরণপণ প্রতিজ্ঞা নিয়ে এসেছে। হয় বিজয় নয় মৃত্যু, এর একটা আজ হতেই হবে। তাই শার্দূলের ক্রোধ আর গর্জন করতে করতে উভয় বাহিনী আরো এগিয়ে এলো।

ছেচল্লিশ.

মুজাহিদ বাহিনী আর রাজপুতরা মুখোমুখী হতে না হতেই তীর-তূনীর কাঁধে ঝুলিয়ে অস্ত্র হাতে তুলে নিলো। রাজপুতদের হাতে দোধারী উজ্জ্বল তরবারী আর মুজাহিদদের হাতে সমরকন্দের ঐতিহ্যবাহী ঝলমলে তরবারী। সূর্যের আলোতে তরবারীগুলো ঝকমক করতে লাগলো।

মুজাহিদদের ঢাল কালো রংয়ের আর রাজপুতদের ঢাল সাদা রংয়ের। সূর্যের আলোয় তা পূর্ণিমার চাঁদের মতো ঝলমল করছে।

উভয় দলই আজ মরণ পিয়াসায় উদ্বেলিত। রক্ত নেয়া-দেয়ার খেলায় উন্মত্ত। তাই মরণপাগল পতঙ্গের ন্যায় তরবারী হাতে একে অপরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। চারদিকে তরবারী আর তরবারীর আঘাতের ভয়ঙ্কর শব্দ ছড়িয়ে পড়ে। শুরু হয়ে যায় ঘোরতর যুদ্ধ। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ।

মৃত্যু-ফেরেশ্তা আজ সদলবলে যেন ডানা মেলে প্রদক্ষিণ করছে আর ছো মেরে মেরে জান কবজ করছে। তরবারীর আঘাতে কারো শির ছিটকে পড়ছে। কারো হাত দ্বিখন্ডিত হচ্ছে। কারো শরীরে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয়ে রক্তের ধারা ছুটে চলছে। চারদিকে যেনো রক্তের নহর বয়ে চলছে।

রাজপুতরা তাদের অভ্যাস অনুযায়ী ভীষণ জোরে জোরে চিৎকার করতে লাগলো। নাকাড়া বাজাতে লাগলো। জোরে জোরে সিঙ্গায় ফুঁৎকার দিতে লাগলো। সব কিছু মিলে এমন এক বিকট ভয়ঙ্কর আওয়াজ উত্থিত হলো, যা কয়েক মাইল দূর থেকেও শুনা যাচ্ছে।

ক্রোধে অধির কিছু রাজপুত শার্দূলের ন্যায় গর্জন করতে করতে মুজাহিদদের ব্যূহ ভেদ করে ভেতরে ঢুকে যায়। মুজাহিদরাও শাহাদাতের তামান্নায় অধীর হয়ে বীর-বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ে রাজপুতদের ব্যূহ ভেদ করে সামনে এগিয়ে গেলো। ভয়াবহ যুদ্ধ চলছে। চারদিকে অস্ত্রের ঝন্‌ঝনানি, চিৎকার আর

আর্তনাদে বাতাস ভারি হয়ে এলো। লাশে লাশে ভরে যাচ্ছে রণাঙ্গন। রক্তের স্রোত বয়ে চলছে চারদিকে। যুদ্ধের লোমশ থাবা ছিনিয়ে নিচ্ছে হাজারো রাজপুত আর মুজাহিদকে।

রাজপুতদের ধারণা, বিজয় অবশ্যই তাদের পদচুম্বন করবে। কারণ, সংখ্যায় তারা প্রচুর- অগণিত। তাই তারা দুঃসাহসিকতার সাথেই যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। একজন ধরাশায়ী হলেই আরেকজন ভীষণ গর্জন করতে করতে এগিয়ে আসছে।

মুজাহিদরা আজ সর্বাত্মক যুদ্ধে অবতীর্ণ। তাই তারা একে অন্যের খবর নিতে পারছে না। সবাই নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত। সবাই বীরত্ব ও দুঃসাহসিকতার চরমে পৌঁছে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে।

দেখতে দেখতে রণাঙ্গনের সর্বত্র যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়লো। রণাঙ্গন জুড়ে শুধু যুদ্ধ আর যুদ্ধ। সূর্য যতোই উর্ধ্বে উঠছে, যুদ্ধের ভয়াবহতা ততোই তীব্র হচ্ছে। বীর বিক্রমে একে অপরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। যুদ্ধ করতে করতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে।

এদিকে রাজা-মহারাজারা নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে যুদ্ধের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছেন। তাদের কেউ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করছেন না। প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দিচ্ছেন। মরণপণ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে উৎসাহ দিচ্ছে। বিজয় বার্তা শুনিয়ে রাজপুতদের উদ্বেলিত করছেন।

সোমনাথের মহারাজাও তাঁর বিশেষ বাহিনী কর্তৃক পরিবেষ্টিত হয়ে বিস্ফারিত নেত্রে যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করছেন। কেল্লার অদূরে এক বিশেষ ঘোড়ায় চেপে টিলার উপর দাঁড়িয়ে আছেন। ঘোড়াটি যেমন হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ, তেমনি তেজোদীপ্ত ও নির্ভীক। ঘোড়াটি রূপার মালায় সজ্জিত। মাঝে-মাঝে স্বর্ণ আর মূল্যবান পাথরের পুঁতিতে সুশোভিত। সূর্য্যের আলোয় তা ঝলমল করছে।

মহারাজাও মহামূল্যবান মাণিক্য আর অলঙ্কারে সজ্জিত হয়ে আছেন। তার মাথার মুকুটটি দারুণ চমৎকার সাজে সজ্জিত। হীরা, মুক্তা ও মূল্যবান পাথর ঝলমল করছে। স্বর্ণখচিত রেশমি কাপড়ে তাকে দারুণ চমৎকার দেখাচ্ছে।

তবে মহারাজার দৃষ্টি আটকে আছে রণাঙ্গনের পরিস্থিতির ওপর। ভয়াবহ যুদ্ধ চলছে। এখনো বুঝা যাচ্ছে না, কারা বিজয়ী হবে আর কারা পরাজিত হবে। তাই মহারাজার চেহারায় এক দুশ্চিন্তার ছাপ পরিস্ফুট।

মুজাহিদদের দেখলেই বুঝা যায়, তারা আজ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, হয় যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হবে, অন্যথায় বিজয়মাল্য ছিনিয়ে নেবে। তাই বীরবিক্রমে শার্দূল হুঙ্কার ছেড়ে একেকজন মুজাহিদ রাজপুতদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে আর একের পর একেকে কুপোকাত করে ধূলির ধরায় নিক্ষেপ করছে। সাধারণ মুজাহিদরা তাদের অফিসার বা নেতৃস্থানীয় কোনো মুজাহিদকে যখনই দেখছে, তাকে

রাজপুতরা ঘিরে ফেলেছে, মুহূর্তে তাকবীর ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে চার দিক থেকে সেদিকে ছুটে আসছে আর রাজপুতদের কচুকাটা করে ভূতলে নিক্ষেপ করছে।

আলতুনতাশ ও আমীর আলীকে আজ শাহাদাতের নেশা পাগল করে দিয়েছে। তাদের চকচকে তরবারী বিরামহীনভাবে রাজপুতদের দ্বিখণ্ডিত করে চলছে। রাজপুতরা ভয়ে তাদের সামনেই এগুতে চাচ্ছে না। কিন্তু তারা দাঁড়িয়ে নেই। সিংহের ন্যায় হুঙ্কার ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে আর নিঃশেষ করছে।

সুলতান মাহমুদ গজনবী এখনো যুদ্ধে অংশ নেননি। তীক্ষ্ম দৃষ্টি চারদিকে ফেলছেন আর সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছেন। মুজাহিদদের অনুপম দুঃসাহসিকতা ও দুর্দান্ত আক্রমণ দেখে বিস্মিত ও উল্লসিত হচ্ছেন।

সুলতানকে পরিবেষ্টিত করে তাঁর চারপাশে দাঁড়িয়ে আছে পাঁচ শত সশস্ত্র বীর যোদ্ধা। এরা সুলতানের হাতে গড়া বিশেষ বাহিনী। এরা দুর্দান্ত, দুর্বার। এরা দুর্ধর্ষ দুর্নিবার। এরা প্রশ্নাতীত নির্ভরশীল। সুলতান এদের নিয়ে আক্রমণ করার জন্য সুযোগের সন্ধানে আছেন।

হঠাৎ সুলতানের মনের আকাশে কিসের যেনো চিন্তার শুভ্র মেঘমালা ভেসে এলো। আর দেরি করলেন না। এক অশ্বারোহীকে ইশারায় কাছে ডাকলেন। বললেন, যাও, এক্ষুনি হাজের আলীকে গিয়ে বলো, সে যেনো তার বাহিনী নিয়ে চলে আসে।

দূত অশ্ব ছুটলো। অশ্বের পদাঘাতে ধূলি উড়াতে উড়াতে অদৃশ্য হয়ে গেলো। সুলতানের দৃষ্টি অশ্বারোহীর দিকেই লেগে আছে। তিনি আনমনে বললেন, অশ্বারোহী দারুণ ক্ষীপ্র তো। নিশ্চয় সত্বর ফিরে আসবে।

মুহূর্তকাল অতিবাহিত হতে না হতেই দেখা গেলো অশ্বারোহী ধূলি ঝড় উড়িয়ে ছুটে আসছে। দেখতে দেখতে অশ্বারোহী এসে সুলতানকে অভিবাদন জানিয়ে বললো, আলমপনা! সে দিক থেকে রাজপুতদের একটি বাহিনী এগিয়ে আসছে।

সুলতান বিস্মিত হলেন। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হলেন। শান্ত সমাহিত কণ্ঠে বললেন, কে আসছে?

ঃ মনে হচ্ছে, আমব্রেলীর রাজা।

ঃ তার সাথে আগত যোদ্ধার সংখ্যা কতো হতে পারে?

ঃ তার সঠিক ধারণা এখনো করা যাচ্ছে না।

ঃ আচ্ছা, তুমি এক কাজ করো। হারুনকে গিয়ে এ সংবাদ দাও। তাকে বলো, সে যেনো তার বাহিনী নিয়ে হাজের আলীর সাহায্যে ছুটে যায়। আর বুরহান বন্দর প্রহরায় নিয়োজিত থাকুক।

ঃ বেশ, আমি এক্ষুনি যাচ্ছি।

সাতচল্লিশ.

এদিকে যখন ভীষণ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলছে, ঠিক তখন আমব্রেলীর মহারাজা তার বিশাল বাহিনী নিয়ে এগিয়ে এলেন। সেনাপতি হাজের আলী দূর থেকে এ বাহিনীকে আসতে দেখে তাদের মোকাবেলা করতে সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।

আমব্রেলীর মহারাজার নেতৃত্বে দশ-বারো হাজার দুর্ধর্ষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যোদ্ধা এলো। অবশ্য মহারাজার পূর্বেই তার পুত্র শিকদেব সোমনাথের মহারাজার সাহায্যার্থে এসেছিলো। কিন্তু যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি জানতে না পেরে অবশেষে মহারাজা নিজেই যোদ্ধাদের নিয়ে সোমনাথের পথে রওনা হলেন।

মহারাজা দূর থেকে হাজের আলীর বাহিনীকে দেখতে পেলেন। তাদের সংখ্যা যে একেবারে নগণ্য তাও অনুধাবন করতে পারলেন। এ সুযোগকে সুবর্ণ মনে করে মহারাজা যোদ্ধাদের বললেন, পরমাত্মা এই অল্প সংখ্যক ম্লেচ্ছকে তোমাদের মোকাবেলার জন্য নিয়ে এসেছেন। এদের কচুকাটা করে সামনে অগ্রসর হও।

রাজপুতরা যোদ্ধা জাতি। যুদ্ধের নামে পাগল। তাই সাথে সাথে তৈরি হয়ে গেলো। অস্ত্রশস্ত্র পরখ করে নিলো। দূর থেকে আক্রমণের উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে চললো।

হাজের আলীও রাজপুতদের এ বাহিনীকে দেখে ফেলেছে। তিনি বুঝে ফেললেন, সমাগত বাহিনী সোমনাথে যাওয়ার চেষ্টা করবে। তাই সেও তার বাহিনীকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে নির্দেশ দিলেন।

ঠিক তখন সুলতানের দূত তার নিকট পৌঁছলেন। তিনি দূতকে বললেন, ঐ তো এ পথ দিয়ে আমব্রেলীর রাজা বিরাট বাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসছেন। সুতরাং এখন আমার পক্ষে এ স্থান ত্যাগ করা সম্ভব নয়। দূত ফিরে গেলো আর হাজের আলী শত্রুদের প্রতিহত ও পরাভূত করতে প্রস্তুত হতে লাগলেন।

আমব্রেলীর রাজা আরো এগিয়ে এলেন। একেবারে মুজাহিদ বাহিনীর নিকটে পৌঁছে গেলেন। নিজে বাহিনীর একেবারে মাঝে অবস্থান করে দুর্বার আক্রমণ করার নির্দেশ দিলেন।

সংখ্যাধিক্যে গর্বিত রাজপুত যোদ্ধারা। অহংকারে টইটম্বুর তাদের গর্বিত শির। বিজয় তাদের নিশ্চিত। তাই উৎসাহে উদ্বেলিত হয়ে বিজয় মাল্যকে দ্রুত ছিনিয়ে নিতে প্রচন্ড আক্রমণ করলো। তাদের ধারণা, এ আক্রমণের ধাক্কা সামাল দিতে দিতেই তাদের পরাভূত হতে হবে। সোমনাথের পাক জমিন তাদের নাপাক রক্তে সিক্ত হবে।

কিন্তু মুজাহিদদের দৃঢ়তা, অবিচলতা আর শৃঙ্খলার যে কোনোই তুলনা নেই! পর্বতপ্রমাণ দৃঢ়তা নিয়ে তারা রাজপুতদের আক্রমণকে প্রতিহত করে চললো।

রাজপুতরা এতে দারুণ বিস্মিত হলো। হতবাক্ হলো। তলোয়ার আর তলোয়ালের আঘাতে রণময়দানে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ধারা ছুটে চললো। তাকবীর ধ্বনি-প্রতিধ্বনিতে আকাশ-বাতাস কেঁপে ওঠতে লাগলো। মুজাহিদরা রাজপুতদের ব্যূহ ভেদ করতে তীরবেগে আক্রমণ করছে আর রাজপুতরা মুজাহিদদের ব্যূহ ভেদ করতে বীর বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

যুদ্ধের আগুন চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। ঝলমলে তলোয়ারগুলো রক্তে রঞ্জিত হয়ে রক্তিম বর্ণ ধারণ করলো। হাত-পা আর শরীরের বিভিন্ন কর্তিত অঙ্গ বিক্ষিপ্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। আহত ঘোড়াগুলোর আর্তচিৎকার আর হ্রেষারবে পরিবেশ ভারি হয়ে এলো। রক্তে রক্তে চারদিক লালা হয়ে গেলো।

জানবাজ মুজাহিদরা রক্তের দরিয়া পেরিয়ে ব্যূহ ভেদ করতে বার বার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। রাজপুতরাও বার বার ঝাঁপিয়ে পড়ছে। অবশেষে কেউ কারো ব্যূহ রক্ষা করতে পারলো না। মুজাহিদরা রাজপুতদের সারির মাঝে আর রাজপুতরা মুজাহিদদের সারির মাঝে ঢুকে পড়লো। শুরু হলো যুদ্ধের নতুন ধারা।

সকলেই দিশেহারা হয়ে গেছে। তলোয়ার দ্বারা আক্রমণ করছে আর ঢাল দ্বারা আক্রমণ প্রতিহত করছে।

আমব্রেলীর রাজা চিৎকার করে নিজ বাহিনীকে উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করছেন। মুজাহিদদের নির্বিচারে নির্মমভাবে হত্যা করতে অনুপ্রাণিত করছেন। রাজপুতরা তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে শার্দূলের ন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়ছেন।

মুজাহিদরা সংখ্যায় কম হলেও অত্যন্ত বীরত্ব ও সাহসিকতার সাথে রাজপুতদের আক্রমণ প্রতিহত করে একের পর এক রাজপুতকে ধরাশায়ী করছে। উভয় পক্ষের অনেকেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

সেনাপতি হাজের আলী আজ অত্যন্ত উল্লাসে তরবারী চালনা করছেন। ক্ষীপ্ত হাতের আঘাতে একের পর এক খতম করছেন আর অন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছেন। সেই সঙ্গে গোটা বাহিনী পরিচালনা করছে। কখনো যুদ্ধে নিমগ্ন হয়ে পড়ছেন। আবার যুদ্ধ ছেড়ে চারদিকে ঘোড়া ছুটিয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিচ্ছেন। যখনই দেখছেন, কোনো মুজাহিদকে রাজপুতরা চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে, অমনি ছুটে গিয়ে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছেন। নিমিষে তাদের ছত্রভঙ্গ করে ধরাশায়ী করছেন।

হাজের আলীর ঘোড়া আজ আঘাতে আঘাতে দুর্বল হয়ে পড়েছে। সে চলচ্ছক্তি হারিয়ে ফেলেছে। মৃত আর আহতদের রক্তে ময়দান লালে লাল হয়ে গেছে। হাজের আলীর মাংসপেশীও যেনো দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। ক্লান্তি আর অবসন্নতা সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ছে। পরিকল্পনা বাস্তবায়নে দেহ অপারগ হয়ে পড়ছে। এ অবস্থা শুধু হাজের আলীর নয়; রবং প্রত্যেক মুজাহিদদের এই একই অবস্থা।

কিন্তু তারপরও মুজাহিদরা জীবন বাজি রেখে লড়ে যাচ্ছে। অবাধ্য দেহের কোনোই পরোয়া করছে না। তবে রাজপুতরা মুজাহিদদের সার্বিক অবস্থা লক্ষ্য করে বুঝে নিলো, মুজাহিদদের শরীর আর সইতে পারছে না। তারা আরো প্রচন্ড শক্তিতে আক্রমণ চালালো। এবার আর মুজাহিদরা তা যথাযথভাবে প্রতিহত করতে পারলো না। তারা ধীরে ধীরে পিছু হটতে লাগলো।

মুজাহিদদের এ অবস্থা দেখে রাজপুতদের অন্তর আশার দোলায় দুলে ওঠলো। তারা এবার নব উদ্যমে আক্রমণ শুরু করলো।

মুজাহিদ বাহিনী তখন দিশেহারা। হৃদস্পন্দন তাদের বেড়ে চলেছে। নিরাশার অন্ধকার তাদের চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে। ঠিক তখন পশ্চাদ্দিক থেকে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে, বজ্র-নিনাদে ধ্বনিত হলো আল্লাহু আকবার তাকবীর ধ্বনি। রাজপুতরা ভয়াতুর দৃষ্টিতে আর মুজাহিদরা প্রত্যাশার চাহনীতে ফিরে তাকালো। দেখলো, ধূলিঝড় উড়িয়ে আসছে এক বিশাল বাহিনী। হাতে হাতে উন্মুক্ত ঝকমকে নাঙ্গা তলোয়ার। চোখে শাহাদাতের তামান্নার ঢেউ। মুখে তাকবীর ধ্বনি।

যুদ্ধরত মুজাহিদদের চুপসে যাওয়া হৃদয় বিজয়ের আশায় স্ফীত হয়ে ওঠলো। পেশীতে পেশীতে ফিরে পেলো অতিন্দ্রিয় শক্তি। পুনরায় দুর্দম গতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে রাজপুতদের উপর। আর আতঙ্কে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায় রাজপুতদের অন্তর। হঠাৎ যেনো তাদের পেশীর শক্তি কোথায় উধাও হয়ে গেলো। আর আমব্রেলীর রাজা পরমদেব-এর দেহে কম্পন শুরু হয়ে গেছে।

আগন্তুক এ বাহিনীর নেতৃত্বে রয়েছে হারুন। তারা অশ্বপৃষ্ঠে চড়ে উড়ে উড়ে এসে রাজপুতদের উপর তীর বেগে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং অনায়াসে তাদের হত্যা করে চলে। রাজপুতদের মাঝে চারদিকে চরম বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়লো। আহতদের আর্তনাদ আর গোঙ্গানীতে পরিবেশ আরো ভয়াবহ হয়ে ওঠলো।

ভীতু পরমদেব এ অবস্থা দেখে বুঝে ফেললেন, এখানে দাঁড়িয়ে থাকা মানে আত্মহত্যা করা। ম্লেচ্ছদের হাতে নিহত হওয়ার অপমান থেকে তাকে বাঁচতে হবে। এরপর আর কিছু ভাবতে পারলো না। রাজপুতদের রণে ভঙ্গ দেয়ার ইঙ্গিত দিয়েই অশ্ব নিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালালেন আমব্রেলীর দিকে।

মুহূর্তে চোখের পলকে রাজপুতরা আমব্রেলীর পথে ঘোড়া ছুটালো। শুরু হলো পালানোর প্রতিযোগিতা। মুজাহিদরাও তাদের পশ্চাতে ঘোড়া ছুটালো। তীর-তীব্র তাদের গতি। পশ্চাদ্ধাবন করে একের পর এককে হত্যা করতে লাগলো। এতে অনেকেই নিহত হলো।

দূর- বহুদূর পর্যন্ত মুজাহিদরা তাদের তাড়িয়ে নিয়ে গেলো আর পথে পথে হত্যা করলো। রাজপুতরা নাগালের বাইরে চলে গেলে তারা ফিরে এলো এবং পথে পথে নিহত রাজপুতদের অস্ত্রশস্ত্র ও পাথেয় সংগ্রহ করে নিয়ে এলো।

রণাঙ্গনে ফিরে এসে শহীদ মুজাহিদদের লাশগুলো একত্রিত করে সবাই তাদের জানাযার নামায আদায় করে পরিধানের পোশাকেই দাফনের ব্যবস্থা করলো। এ যুদ্ধে প্রায় পৌনে তিনশ মুজাহিদ শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করে আর তিন হাজার রাজপুত নিহত হয়।

হারুন তার অধীন মুজাহিদদের নিয়ে নিজ কর্তব্যস্থলে চলে গেলো।

আটচল্লিশ.

মুজাহিদ বাহিনী আর রাজপুতদের মাঝে ভীষণ যুদ্ধ চলছে। সুলতান মাহমুদ গজনবী যুদ্ধের পোশাকে সজ্জিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি চারদিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখছেন। যুদ্ধের গতি-প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করছেন। তাঁকে পরিবেষ্টিত করে দাঁড়িয়ে আছে তারই হাতে গড়া বিশেষ বাহিনী। দুরন্ত, দুর্বার, দুর্ধর্ষ সে বাহিনী।

হিন্দুরা আজ মরণপণ যুদ্ধে নেমেছে। জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করে যাচ্ছে। তাদের বিশ্বাস, আজ তারা বিজয়মাল্য ছিনিয়ে আনবেই। সোমনাথ দেবতার ইজ্জত রক্ষার্থে তারা একের পর এক জীবন দিয়ে যাচ্ছে। তারা আজ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, হয় মুসলমানদের পরাজিত করে সোমনাথ থেকে তাঁড়িয়ে দেবে, অন্যথায় নির্মমভাবে হত্যা করে তাদের রক্ত দিয়ে সোমনাথের মাটি বিধৌত করবে।

মুজাহিদরাও আজ প্রাণপণ যুদ্ধ করছে। ক্ষুধার্ত শার্দূলের ন্যায় উন্মুক্ত তরবারী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে আর একের পর এক হিন্দু যোদ্ধাদের খতম করে আরেকজনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। তারা আজ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, হয় শহীদ হয়ে রক্তপলাশের ন্যায় রণাঙ্গনে লুটিয়ে পড়বে, অন্যথায় রাজপুতদের হত্যা করে রক্তের দরিয়া অতিক্রম করে কেল্লায় বিজয় নিশান উড়াবে।

যুদ্ধ তীব্র থেকে তীব্র আকার ধারণ করলো। আজ কেউ মৃত্যুর হীমশীতল থাবার ভয়ে আতঙ্কিত নয়। সবাই দুর্বার, দুর্নিবার। প্রত্যেক যোদ্ধা যেনো ক্ষুধার্ত-পিপাসার্ত ভয়ঙ্কর এক শার্দূল। হুঙ্কার দিয়ে একে অন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। বিদ্যুদ্গতিতে তরবারী চালনা করছে। ঢালের সাহায্যে প্রতিপক্ষের আঘাত প্রতিহত করছে। আবার ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

শীলাখন্ডের ন্যায় ছিটকে ছিটকে পড়ছে মানুষের কর্তিত মস্তক। লাশে লাশে স্তূপ হয়ে আছে রণাঙ্গনের চারদিক। রক্তধারা বয়ে চলছে নিম্নভূমির দিকে। অশ্বের পদতলে পিষ্ট-নিষ্পিষ্ট হচ্ছে লাশ আর আহতদের দেহ। থেকে থেকে বাতাসের পরতে পরতে চারদিক থেকে ভেসে আসছে আহতদের আর্তচিৎকার আর মৃত্যু যাতনার করুণ গোঙ্গানী। আকাশ-বাতাস আর গোটা প্রকৃতি আজ ভারাক্রান্ত, বিষাদে মলিন।

চারদিকে যুদ্ধ চলছে। শুধুই তরবারীর ঝনঝন আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। বারবার বিকট হুঙ্কারের ধ্বনি উত্থিত হচ্ছে। মাঝে-মাঝে রণভেরী আর তাকবীর ধ্বনি যোদ্ধাদের শরীরে প্রতিশোধের আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে। ঝিমিয়েপড়া যুদ্ধ আবার লেলিহান রূপ ধারণ করে লোলুপ জিহ্বা প্রসারিত করে আদম সন্তানদের গ্রাস করতে ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

সুলতান মাহমুদ গজনবীর চোখে তীক্ষ্ম দৃষ্টি। বাজপাখির চাহনী। ঘুরে ঘুরে চারদিক দেখছেন আর প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিচ্ছেন। তাকে ঘিরে আছে দুর্ধর্ষ সিংহ-হৃদয় পাঁচ হাজার যোদ্ধা। তাদের চোখগুলো যেনো টকটকে অঙ্গার। ললাটের কুঞ্চনে ইস্পাতকঠিন প্রতিজ্ঞা। পেশীবহুল সুঠাম দেহে জীবন উৎসর্গের উন্মাদনা। তারা সুলতানের অঙ্গুলী সঞ্চালনের প্রতীক্ষায় বিস্ফারিত নয়নে তাঁকিয়ে আছে।

ঠিক তখন একটি চিন্তার তীক্ষ্ম সূঁচ তার হৃদয়কে বিদ্ধ করতে করতে অস্থির করে তুললো। রক্তাক্ত হৃদয়ে ভাবতে ভাবতে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগলেন, হায়! আমি কি এতোই পাষাণ! আমার চোখের সামনে একের পর এক মুজাহিদ জীবন দিচ্ছে আর আমি নিরাপদে অশ্বপিঠে বসে তা দেখছি! ...হায় যদি কেয়ামত দিবসে আল্লাহ আমাকে জিজ্ঞেস করেন, মাহমুদ! মৃত্যুর ভয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুসলমানদের মৃত্যুর করুণ দৃশ্য দেখেছিলে কেনো? ...তাহলে আমি কী উত্তর দেবো? আমার জীবন তো এ মুসলমানদের চেয়ে বেশি মূল্যবান নয়। কিছুতেই নয়। আমিও তো মুসলমান। আমিও তো মুজাহিদ। তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ দেখা কিছুতেই উচিত হচ্ছে না।

সুলতান মাহমুদ গজনবী আর ভাবতে পারলেন না। তার কণ্ঠ চিরে জলদ-গম্ভীর স্বরে বিঘোষিত হলো আল্লাহু আকবার। সাথে সাথে পাঁচ হাজার বীর যোদ্ধার বজ্রনির্ঘোষ কণ্ঠে উচ্চারিত হলো আল্লাহু আকবার। থর থর করে কেঁপে ওঠলো রণাঙ্গন। কেঁপে ওঠলো রাজপুত বীর যোদ্ধাদের অন্তরাত্মা। ধূলিঝড় তুলে চকচকে তরবারী উঁচিয়ে এগিয়ে আসছে সুলতানের বাহিনী। সবার আগে সুলতান। শিরে জমকালো শীরস্ত্রাণ। হাতে ঝলমলে তলোয়ার। তাজি ঘোড়াটি তাঁকে নিয়ে উড়ে উড়ে আসছে। বাতাসে উড়ছে তাঁর জুব্বার প্রান্তদেশ। এ দৃশ্য দেখেই চুপসে গেলো রাজপুতদের সকল আশা-আকাজ্ক্ষা। উবে গেলো হৃদয়ের সাহসিকতা।

সুলতান তাঁর বাহিনী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন রাজপুতদের উপর। কচুকাটা করে করে সামনে অগ্রসর হতে লাগলেন। বারবার আল্লাহু আকবার ধ্বনি-প্রতিধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন রাজপুতদের উপর। নিমিষে ধরাশায়ী করে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন আরেক দলের উপর। দেখতে দেখতে

ক্ষণিকের ব্যবধানে হাজার হাজার রাজপুত মৃত্যুর গহ্বরে নিপতিত হলো। অবশিষ্টরা ভয়াতুর চোখে ইতিউতি তাকিয়ে চারদিক অন্ধকার দেখলো। তারপর আর দেরি করলো না। ঘোড়ার মুখ পশ্চাতে ফিরিয়েই দে ছুট।

চারদিকে রব ওঠলো- পালাও, পালাও। উর্ধ্বশ্বাসে কেল্লার দিকে ছুটে চলছে রাজপুতরা। মুজাহিদরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে আঁড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে আর হত্যা করছে। চারদিকে মৃত্যুদৃশ্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। রণ ময়দান খালি করে রাজপুতরা ছুটে পালাচ্ছে। মুজাহিদরা তাদের আঘাত করে করে ধরাশায়ী করছে।

রাজপুতদের কিছু ঘোড়া নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ে যায়। সাথে সাথে রাজপুত যোদ্ধারাও সিটকে পড়ে হাড় ভেঙে চুরমার হয়ে নিস্তব্ধ হয়ে যায়। অনেক পদাতিক যোদ্ধা অশ্বারোহী যোদ্ধাদের অশ্বের পদতলে পিষ্ট হয়ে নিঃশ্বেষ হলো। লাশের পর লাশ ফেলে রাজপুত যোদ্ধারা প্রাণ বাঁচাতে ছুটে চললো।

সোমনাথের মহারাজা যখন দেখলেন, যুদ্ধের পরিস্থিতি পাল্টে গেছে, পরাজয় নিশ্চিত, ঠিক তখনই মহারাজা অশ্ব নিয়ে কেল্লার দিকে ছুটে পালান। মহারাজার পেছনে পেছনে অন্যান্য রাজা-মহারাজারাও পালিয়ে যান। তারা কেল্লায় প্রবেশ করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। তাদের পেছনে পেছনে পরাজিত রাজপুতরাও কেল্লায় প্রবেশ করতে শুরু করে।

সূর্য অস্তাচলে। আকাশের বুকে রক্তের আবীর ছড়িয়ে যুদ্ধের শেষ পরিণতি দেখার জন্য যেনো পর্দার অন্তরাল থেকে সূর্যটা তাঁকিয়ে আছে। আর অন্ধকার যেনো দূর-দূরান্তের ঝোপ-জঙ্গল, বন-বাদার পদানত করে ক্রমশ ছুটে আসছে।

সুলতান ভাবলেন, মুজাহিদরা সারাদিন যুদ্ধ করে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়েছে। তাদের মন যুদ্ধ করতে চাইলেও শরীর তা চাচ্ছে না। তাই তিনি তাদের ফিরে যাওয়ার হুকুম দিলেন। যারা সুলতানের এ নির্দেশ শুনতে পেলো, তারা ফিরে গেলো। আর যারা শুনতে পায়নি, তারা রাজপুতদের হত্যা করতে করতে কেল্লার ফটক পর্যন্ত পৌঁছলো। কেল্লার অভ্যন্তরে প্রবেশেরও চেষ্টা চালালো। তারা যখন পশ্চাতে ফিরে দেখলো, মুজাহিদের সংখ্যা একেবারে কম, তখন তারা মুজাহিদ আসার জন্য তাকবীর দিতে ও আহ্বান জানাতে লাগলো।

কেল্লার ভেতরের রাজপুতরা ভয় পেয়ে গেলো, এই বুঝি মুজাহিদরা কেল্লায় ঢুকে পড়ছে। তাই তারা তড়িঘড়ি করে বহু রাজপুত যোদ্ধাকে বাইরে রেখে ফটক বন্ধ করে দেয়। মুজাহিদরা ফটকের বাইরে অবস্থিত রাজপুত যোদ্ধাদের উপর আক্রমণ করে নিমিষে শেষ করে দেয়। সূর্যের অনুপস্থিতিতে আকাশের বুক গলে গলে চারদিকে অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ছে। ফলে মুজাহিদরা কেল্লার ফটক ছেড়ে মুজাহিদ শিবিরের দিকে ফিরে চললো।

রণাঙ্গন থেকে ফিরে এসে তারা মাগরিবের নামায আদায় করে। আল্লাহর দরবারে লুটিয়ে কৃতজ্ঞতা আদায় করে। নামায শেষে আহত মুজাহিদদের সেবা-শুশ্রূষায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সুলতানের নির্দেশে তারা বেশ কিছু দলে বিভক্ত হয়ে মশাল হাতে ছড়িয়ে পড়ে। আহত মুজাহিদদের তুলে এনে সেবা-শুশ্রূষার ব্যবস্থা করা হয়। আর শহীদ মুজাহিদদের দাফনের ব্যবস্থা করা হয়।

এ গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোর পর তারা রান্নার আয়োজন করে। সারা দিনের ক্লান্তিতে নেতিয়েপড়া মুজাহিদদের চেহারায় এখন এক পরম আনন্দ আর উল্লাসের আভা লেপ্টে আছে।

উনপঞ্চাশ.

সোমনাথের মহারাজা এ পরাজয়ের গ্লানিতে দারুণ বিষন্ন, অত্যন্ত চিন্তাক্লিষ্ঠ। বর্ষার আকাশের ন্যায় তার চেহারা কালো মলিন হয়ে আছে। সকালে যখন রাজপুতরা বীর বেশে দলে দলে রণাঙ্গনের দিকে ছুটছিলো, তখন তার ধারণা ছিলো, নিশ্চয় এ বিশাল বাহিনী মুসলমানদেরকে পদতলেই নিষ্পিষ্ট করে ছাড়বে। দুপুর পর্যন্ত যুদ্ধের গতি-প্রকৃতির ভাব ভালোই ছিলো। রাজপুতরা বেশ বীরত্বের সাথেই যুদ্ধ করে যাচ্ছিলো। এতে সোমনাথ মহারাজার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিলো, রাজপুতরাই বিজয় লাভ করবে এবং সন্ধ্যার আগেই মুসলমানদের গর্বিত শির চির পদানত হবে।

কিন্তু দুপুরের পর থেকে সময় যতোই গড়াচ্ছিলো, যুদ্ধের গতি যেনো ততোই পাল্টে যাচ্ছিলো। মুজাহিদরা এগিয়ে যেতে লাগলো। এতে মহারাজা দারুণ অস্থির ও উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়লেন। তারপরও রণাঙ্গনের কোনো দিকে যদি রাজপুতরা মুজাহিদদের ব্যূহ ভেদ করে সামনে এগিয়ে যেতো, তখন মহারাজার হৃদয় বিজয় আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে ওঠতো। পক্ষান্তরে মুজাহিদরা যদি রাজপুতদের ব্যূহ ভেদ করে সামনে অগ্রসর হতো, তখন মহারাজার চেহারায় হতাশার ছাপ পরিলক্ষিত হতো।

এমনি আশা-নিরাশায় দোল খেতে খেতে যখন দিবসের আর মাত্র এক চতুর্থাংশ বাকি রয়েছে, তখন মহারাজার নিরাশা তীব্র আকার ধারণ করে। একটা আতঙ্ক আর ভয় তার হৃদয়ে তোলপাড় শুরু করে। সূর্য অস্তমিত হওয়ার কিছু পূর্বেই মহারাজা বুঝে ফেললেন, বিজয় আর সম্ভব নয়। যে কোনো সময়ই পরাজয়ের অশুভ পদচারণা শুরু হয়ে যেতে পারে।

সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর তা-ই ঘটল।

বিষন্ন ভারাক্রান্ত মহারাজা সোজা রাজপ্রাসাদে গিয়ে তার নিজ কক্ষে প্রবেশ করলেন। অবসাদগ্রস্ত দেহটি দুগ্ধ ফেননিভ বিছানায় ফেলে নীরব নিঃসাড় হয়ে

পড়ে রইলেন। কক্ষের এক কোণে একটি প্রদীপ আলো বিকিরণ করছে। এমন সময় মহারাণী এসে হাজির হলেন। মহামূল্যবান রেশমি কাপড়ের লেহেঙ্গা পরিহিতা। কারুকার্য, মণি-মুক্তা ও স্বর্ণখচিত। ধীরে ধীরে মহারাজার শিয়রে গিয়ে উপস্থিত হলেন। মহারাণীর চেহারাও আজ বিষন্ন-মলিন। বললেন, নাথ! আপনি আজ কেনো এতো বিমর্ষ?

মহারাজা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, কারণ, ভাগ্যতারকার গ্রহণ লেগেছে। ভাগ্য বিধাতা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন।

ঃ অবশেষে হলো কী, তাতো আমাকে বলবেন!

ঃ তা-ই হয়েছে, যা বিশ্বাস করতাম না।

ঃ বলুন, আমি শুনতে চাই।

ঃ তুমি কি শোননি, আজকের যুদ্ধে রাজপুতরা পরাজিত হয়েছে?

ঃ হ্যাঁ, শুনেছি।

ঃ এটা কি লজ্জা ও বিষন্ন কারণ নয়?

ঃ নিশ্চয়, তবে যে শুনলাম, মুসলমানরা সংখ্যায় অনেক বেশি ছিলো।

ঃ তোমরা ভুল শুনেছো। আফ্‌সোস, মুসলমানরা রাজপুতদের তুলনায় এতো কম ছিলো যে, যদি তারা অস্ত্র ছাড়াই মুসলমানদের উপর একসাথে আপতিত হতো, তবুও তারা রাজপুতদের ভারে থেতলে যাওয়ার কথা ছিলো।

ঃ তাহলে কি রাজপুতরা বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেনি? ভীরুতা দেখিয়ে রণাঙ্গন থেকে পালিয়েছে?

ঃ এটাও বলা ঠিক হবে না। রাজপুতরা আজ অত্যন্ত বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছে।

ঃ তাহলে কি সত্যই মুসলমানরা দুঃসাহসী, বীরযোদ্ধা?

ঃ আমি তাদের বীরত্বের অনেক গল্প শুনেছি। কিন্তু বিশ্বাস করতাম না। আজ আমি তাদের যে অবিশ্বাস্য রণমূর্তি দেখলাম, তাতে বলতে হয় সত্যই তারা বীরের জাতি। তারা মরতে জানে।

ঃ এতো দারুণ শংকার কথা!

ঃ এর চেয়ে আরো বিস্ময়কর কথা হলো, তাদের ছোট ছোট তলোয়ারগুলো এভাবে আঘাত করতে থাকে যে, লোহা আর পাথরও রক্ষা পায় না। মানুষের কথা বলাই নিষ্প্রয়োজন।

মহারাণী বললেন, শুনেছি, এরা নাকি যাদুকর! আসলে কি তাই?

ঃ কী আর বলবো। হতে পারে তারা যাদুকরও। আজ যদি আমব্রেলীর রাজা তার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এসে আমাদের সাথে যুদ্ধ করতেন, তাহলে হয়তো আমাদের মর্যাদা রক্ষা পেতো।

ঃ কিন্তু তার তো আসার কথা ছিলো।

ঃ এটাই তো আমার বেদনার কারণ। এদেশের রাজা-মহারাজাদের মতো তিনিও মুসলমানদের ভয় পেতে শুরু করেছেন।

ঠিক তখন শিকদেব প্রবেশ করে বললো, অন্নদাতা! ক্ষমা চাচ্ছি। তিনি মুসলমানদের ভয় করেন না।

মহারাজা তার দিকে ফিরে তাঁকিয়ে বললেন, তাহলে কেনো তিনি যুদ্ধে এলেন না?

শিকদেব গালিচায় বসতে বসতে বললো, তিনি এসেছিলেন এবং যুদ্ধ করতেই এসেছিলেন। কিন্তু অপদার্থ মুসলমানরা তাকে আসতে পথ দেয়নি। তাই তিনি ফিরে গেছেন।

মহারাজার কণ্ঠ চিরে ভয় আর বিস্ময় ঝরে পড়ে। বললেন– তিনি ফিরে গেছেন? ...তাহলে কি তিনিও পরাজিত হয়েছেন?

ঃ হ্যাঁ, তিনিও পরাজিত হয়েছেন।

ঃ এতো আরো বিস্ময়কর কথা! হায়, আমি কী ধারণা করেছিলাম আর কী হয়ে গেলো! ... কিন্তু তুমি এটা জানলে কী করে?

শিকদেও বললো, এই তো একটু আগে জঙ্গলের পথে এক অশ্বারোহী যোদ্ধা এসে আমাকে এ সংবাদ দিলো।

মহারাজা বললেন, তাহলে...তাহলে তিনি কেনো জঙ্গলের পথ ধরে চলে এলেন না?

ঃ মুসলমানরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে অনেক দূর পর্যন্ত নিয়ে গেছে। তাই তারা জঙ্গলের পথ দিয়ে আসতে পারেনি।

ঃ তাহলে তো মুসলমানদের বীরত্বে কোনো সন্দেহ নেই। তারা একদিকে আমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে, অপরদিকে আমব্রেলীর মহারাজার সাথেও যুদ্ধ করেছে। এতো এক মহাবিস্ময়কর কথা!

ঃ শুনেছি, বন্দরের দিক থেকে যখন আমাদের যোদ্ধারা আক্রমণ করেছে, তখন সেদিক দিয়েও একদল মুসলমান তাদের প্রতিহত করেছে।

ঃ মনে হচ্ছে, ম্লেচ্ছদের ঐ সুলতান খুব দক্ষ যুদ্ধবাজ। সে বাইরের সকল সম্পর্ক থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। যদি এমনি অবস্থায় আর কয়েকদিন কাটে, তাহলে তো চরম খাদ্যসংকট দেখা দেবে। মানুষ অনাহারে মৃত্যুবরণ করবে!

ঃ এতে সন্দেহ নেই। বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য এতো বৃদ্ধি পেয়েছে যে, বিত্তহীন মানুষেরা চরম আতঙ্কিত অবস্থায় রয়েছে। আর এটাও বিস্ময়ের ব্যাপার নয় যে, তারাই বিশ্বাস ঘাতকতা করবে।

ঃ আর এ-ও তো অত্যন্ত চিন্তার বিষয় যে, কেনো এখনো মহাদেবতা সোমনাথজী আমাদের প্রতি রুষ্ট হয়ে আছেন! কেনো তিনি এখনো এই ম্লেচ্ছদের নিঃশেষ করছেন না!

ঃ এ কারণে যে, সাচ্চা অন্তর নিয়ে তার পূজা করা হচ্ছে না।

এদিকে বাইরে থেকে আওয়াজ ভেসে এলো। মহারাজা, মহারাণী ও শিকদেব দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখেন, সোমনাথ মন্দিরের মহাপূজারী ধীর পদবিক্ষেপে এগিয়ে আসছে। এসে তিনি এক পাশে বসে পড়েন। মহারাজা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, এ সব কিছুই আমার কর্মের ফল।

মহাপূজারী বললেন, আমি বেশ কয়েক বৎসর যাবৎ চিৎকার করে আসছি, লোকদের পূজার দিকে আহ্বান করা দরকার। কিন্তু আমার কথা কেউ কানে তোলেনি। সবাই রং-তামাশা, আর আনন্দ-ফুর্তিতে নিমজ্জিত।

মহারাজা বললেন, আর এজন্যই তো আজ হিন্দু জাতির উপর এ আযাব নেমে এসেছে। আচ্ছা, আমি এখনই ঘোষণা করে দিচ্ছি, কাল সকালে যেনো সোমনাথের সকল অধিবাসী ও বাহিনীর সকল যোদ্ধা মন্দিরে উপস্থিতি হয়ে সোমনাথজীর পূজা-প্রার্থনা করে। তাকে সন্তুষ্ট করে। বিজয়ের জন্য নিবেদন করে। আর আমিও সে পূজানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবো।

ঃ মহারাজা! আমি এ উদ্দেশ্যেই আপনার নিকট এসেছি।

ঃ শিকদেব! যাও মহামন্ত্রীকে আমার এ নির্দেশ পৌঁছিয়ে দাও।

শিকদেব উঠতে উঠতে বললো, ঠিক আছে। আমি এখনই যাচ্ছি।

শিকদেব অদৃশ্য হয়ে গেলো। কিছুক্ষণ পর মহাপূজারী অনুমতি নিয়ে ভেতরে ঢুকলো।

এবার মহারাণী মহারাজাকে একান্তে পেয়ে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলেন। তারপর হতাশা ভরা কণ্ঠে বললেন, আমার হৃদয়ের টুকরার কি কোনো সংবাদ পেলে?

ঃ পেতাম যদি এই ম্লেচ্ছদের পরাজিত করে হটিয়ে দিয়ে তাদের মহিলা আর শিশু গ্রেফতার করে আনতে পারতাম।

ঃ কিন্তু আমি আজ এক অত্যন্ত বিস্ময়কর সংবাদ শুনতে পেলাম।

ঃ কী সংবাদ?

ঃ চন্দ্রামুখী মুসলমানদের মাঝে নেই।

ঃ তাহলে কোথায় আছে?

ঃ এই কেল্লাতেই আছে।

বিস্ময়ের প্রবল ঝাকুনিতে মহারাজা বিছানায় উঠে বসলেন। চোখ তার বিস্ফারিত। মুখটা ব্যাদান। তিনি যেনো তার কানকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। তাই আবার জিজ্ঞেস করলেন, এই কেল্লাতেই আছে?

মহারাণীর কণ্ঠে আস্থার জোর। বললেন, হ্যাঁ, এই কেল্লাতেই আছে।

ঃ আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।

ঃ আমারও বিশ্বাস হচ্ছিলো না। কিন্তু দ্রুতই বিশ্বাস হয়েছে।

ঃ কীভাবে?

ঃ একটি শর্ত আছে।

মহারাজার কণ্ঠে বিস্ময়ের সুর। বললেন, অবশেষে তুমিও আমার থেকে প্রতিশ্রুতি নিতে চাচ্ছো!

বিনয় বিগলিত মহারাণীর কণ্ঠ। বললেন, আমি আপনার দাসী। জন্মজন্মান্তরের দাসী। তাই কীভাবে আপনার থেকে প্রতিশ্রুতি নেয়ার কথা ভাবতে পারি। এর কোনো অধিকার আমার নেই। তবে হে আমার স্বামী! আমার হৃদয়ের অধিশ্বর! দেশ ও জাতির কল্যাণের জন্যই আমি একটিমাত্র প্রতিশ্রুতি নিতে চাই।

মহারাজার কণ্ঠ শান্ত হয়ে এলো। বললেন, আচ্ছা বলো, কী প্রতিশ্রুতি নিতে চাও।

ঃ যতোক্ষণ পর্যন্ত এ ম্লেচ্ছরা এদেশ ছেড়ে চলে না যাবে বা তাদের হত্যা করা না হবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত আপনি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কিছুই বলবেন না। এমনকি তাকে বুঝতেই দেবেন না, আপনি বিষয়টি জানেন।

মহারাজার কণ্ঠে আশার সুর নেচে ওঠলো। বললেন, তাহলে কি আমার চন্দ্রামুখী ফিরে আসবে?

মহারাজার কণ্ঠে বিস্ময় ঝরে পড়ে। বললেন, আর তুমি এটা নীরবে সহ্য করতে পারবে!

মহারাণীর কণ্ঠ সিক্ত। বেদনায় যেনো মূক হয়ে গেছেন। ভাঙ্গা কণ্ঠে বললেন, কী করবো। তাছাড়া যে আজ কোনো উপায়ও নেই। এদিকে কন্যার হৃদয় নিংড়ানো মমতা, ভালোবাসা। অন্যদিকে দেশ ও জাতির প্রেম আর ধর্মের ইজ্জতের চিন্তা। দুটোই তো এক সাথে রক্ষা করতে হচ্ছে। ...স্বামী ...আমার হৃদয়ের অধিশ্বর ...আমি ধৈর্য ধরবো। আমি আত্মনিয়ন্ত্রণ করবো।

মহারাজা জিজ্ঞেস করলেন, কিন্তু ...কিন্তু সে কোন্ হতভাগ্য চন্ডাল?

ঃ সব কিছুই বলবো। তবে আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে।

মহারাজা বললেন, আচ্ছা, আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আমি সেই নরাধমকে যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কিছুই বলবো না। এখন বিস্তারিত শোনাও।

ঃ সেই পাপিষ্ঠটা হলো শিকদেব।

আকাশের বিদ্যুতের মতো হঠাৎ মহারাজার হৃদয়টা ঝিলিক মেরে ওঠলো। বললেন, শিকদেব... যাকে আমরা সন্তানতুল্য মনে করে আসছিলাম? সে-ই আজ কালসাপ হয়ে দংশন শুরু করেছে!

মহারাণীর কণ্ঠে দৃঢ়তা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠলো। বললেন, হ্যাঁ, সে-ই, সে-ই আপনার আর আমার হৃদয়কে আঘাতে আঘাতে রক্তাক্ত করেছে। মৃত্যুযন্ত্রণায় আমাদের ধুঁকে ধুঁকে মারছে। সে-ই রাজকুমারী চন্দ্রামুখীকে তার শয়নকক্ষ থেকে জোর করে তুলে নিয়ে গেছে।

রাগে-ক্ষোভে মহারাজার মুখখানা গনগনে আঁচের মত লাল হয়ে ওঠলো। ছোখ দু'টিও অঙ্গারের মত টকটকে লাল। অধীর, অস্থির মহারাজা হয়তো এখনই শিকদেবকে গ্রেফতার করে এনে শিরোচ্ছেদের নির্দেশ দেবেন। উত্তেজনায় তার বুকটা টিপটিপ করতে করতে কিছুটা শান্ত হয়ে এলো। ধীরে ধীরে মনের উত্তেজনা-চাঞ্চল্য কিছুটা থিতিয়ে এলো। তারপর বললেন, কিন্তু এ রহস্যের জট খুললো কীভাবে?

ঃ আজ আমার নিকট চম্পা এসেছিলো। চম্পা মোহন সিং-এর বোন। আর মোহন সিং শিকদেব-এর আজ্ঞাবহ। চম্পাই আমাকে সমস্ত ঘটনা বলে দিয়েছে। সেও হয়তো একটি শব্দও বলতো না। কারণ, মোহন সিংও এ অপরাধের সাথে জড়িত। কিন্তু শিকদেব এ গোপন বিষয়টি অজ্ঞাত রাখার জন্য মোহন সিং-কে হত্যা করেছে অথবা ভূগর্ভের কোনো কক্ষে বন্দি করে রেখেছে। কিন্তু চম্পার যখন নিশ্চিত বিশ্বাস হলো যে, তার ভাইকে হত্যা করা হয়েছে, তাই সে প্রতিশোধস্পৃহায় অধীর হয়ে আমার নিকট ছুটে এসে সবকিছু বলে দিয়েছে। সে একথাও বলেছে যে, শিকদেব -এর সন্দেহ হয়েছে, চন্দ্রামুখী তার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে রাজি হবে না। কারণ, এক ম্লেচ্ছ মুসলমানকে নাকি সে ভালবাসে...।

মহারাজার কণ্ঠে আনন্দের ঢেউ খেলে গেলো। বললেন, এটা মিথ্যা কথা। একেবারে মিথ্যা কথা।

ঃ আমিও এ কথা বিশ্বাস করতাম না। কিন্তু শিকদেব-এর মনে কোনোভাবে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছিলো। তাই সে মোহন সিংকে উৎসাহিত করে তার মাধ্যমে চন্দ্রামুখীকে তুলে নিয়ে গেছে। এখন সে চিন্তায় আছে, সুযোগ পেলেই চন্দ্রামুখীকে আমব্রেলীতে নিয়ে যাবে।

মহারাণীর কথার মাঝেই মহারাজা চিন্তার জগতে হারিয়ে গেলেন। ভাবতে লাগলেন, শিকদেব কীভাবে এসে সহমর্মিতা প্রকাশ করেছিলো আর বলেছিলো, মুসলমানরাই চন্দ্রামুখীকে তুলে নিয়ে গেছে এবং কীভাবে রাতের অন্ধকারে আক্রমণ করতে উৎসাহিত করেছিলো। ভাবনার গলি- ঘুপচিতে কয়েকটি চক্কর দিতেই বিষয়টা তার নিকট স্পষ্ট হয়ে যায়। বললেন, নিশ্চয় এটা শিকদেব-এরই কাজ। তারপর দাঁতে দাঁত পিষে বললেন, যুদ্ধের পরিসমাপ্তির পরই আমি তাকে আর তার পিতাকে এমন শিক্ষা দেবো, যা ভারতবর্ষের মানুষ যুগ যুগ ধরে স্মরণ করে শিউরে ওঠবে।

ঃ আপনি ঠিকই বলছেন। তা-ই করা উচিৎ।

ঃ যাক, এ ব্যাপারে তো নিশ্চিন্ত হলাম যে, চন্দ্রামুখী মুসলমানদের নিকট নেই। দুর্গেই আছে।

ঃ সতর্ক থাকতে হবে, যেনো শিকদেব ঘুণাক্ষরেও বুঝতে না পারে, আমরা বিষয়টি জানি।

ঃ নিশ্চিন্ত থাকো প্রেয়সী!

ঃ রাখো ওসব। এবার চারটে খেয়ে নাও।

ঃ কী আর খাবো। দুঃখ-বেদনা আর দুশ্চিন্তা আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছে।

ঃ না খেলে তো আরো ভেঙে পড়বে।

ঃ আজ রাজপুতরা যে ভীরুতা দেখিয়েছে, তাতে আমি দারুণ বিষন্ন হয়ে পড়েছি।

ঃ না, না, রাজপুতরা তো আজ বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছে। কিন্তু মুসলমানরা মানুষ নয়। ওরা দৈত্য।

ঃ তাহলে এ যুদ্ধের ফলাফল কী হবে?

ঃ আশা করি, মহাদেবতা সোমনাথজী আমাদের রক্ষা করবেন। তারই সন্তুষ্টি অর্জন করা দরকার।

ঃ হ্যাঁ, আমি নির্দেশ দিয়েছি, যেনো আগামীকাল সকালে সোমনাথের সকল অধিবাসী মহাদেবতার পূজায় অংশগ্রহণ করে।

ঃ আপনি বেশ ভালো করেছেন। আচ্ছা, আমি খাবারের ব্যবস্থা করছি।

উত্তরের অপেক্ষা না করেই মহারাণী ওঠে গেলেন এবং অল্প কিছুক্ষণ পরেই খাঞ্চায় করে খাবার নিয়ে এলেন। খাবারের ঘ্রাণে চারদিক মৌ মৌ করতে লাগলো। তারা খেতে শুরু করলো।

পঞ্চাশ.

নয়নাভিরাম এক কক্ষ। কক্ষের এক কোণে একটি চমৎকার সুসজ্জিত কুরসীতে উপবিষ্ট কামিনী। গোলাপী রংয়ের ব্লাউজ আর নারেঙ্গী রংয়ের শাড়িতে তাকে বেশ মানিয়েছে। শাড়ির প্রান্তদেশে ঝুলছে স্বর্ণখচিত প্রশস্ত ঝালর। ঝালরের মাঝে মাঝে খচিত মুক্তাগুলো ঝলমল করছে। প্রস্ফুঠিত কুসুমের সুরভিত সুষমায় তার তনুমন আজ গৌরবান্বিত। সত্যই আজ সে মোহময়, নীলচঞ্চল।

আলীশান কুরসীতে বসে গভীর চিন্তায় হারিয়ে যায় কামিনী। চারদিক নীরব নিঝুম। কিছুক্ষণ পর তার পুষ্পপেলব ওষ্ঠাধর কেঁপে ওঠে। মৃদু সুরেলা কণ্ঠে স্বগতোক্তি করে– চন্দ্রামুখীকে আমার ভাইয়ের অবশ্যই বিয়ে করতে হবে। এখন তো সে ভাইয়ার হাতের মুঠোয়। বিয়েতে অমত প্রকাশ করেও লাভ হবে না। ভাইয়াও তার প্রেমে একেবারে মজে আছে। আমিও তো ভাইয়ার সাথে এ ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়েছি, যেনো...। নাহ... সে কথা বলা ঠিক হবে না ...হায় হারুন ...আমি জানি তুমি একজন ম্লেচ্ছ। তুমি

আমার ধর্ম, জাতি ও আমার দেশের দুশমন। কিন্তু ...আমি তোমার প্রেমে পাগল। তোমাকে আমার পেতেই হবে। দুনিয়ার মানুষের দেবতা-মহাদেবতা সোমনাথজ্বী। কিন্তু আমার ...আমার দেবতা তুমি। হায়! কীভাবে তোমাকে আমার হৃদয় চিরে দেখাবো। তুমি তো আমার মনমন্দিরের মূর্তি। আমি তোমারই পূজা করি। কিন্তু যখন আমি ভাবি, তুমি চন্দ্রামুখীর মনের মানুষ, তখন আমি তা সহ্য করতে পারি না। তখন আমার অঙ্গ-প্রতঙ্গে আগুন ধরে যায়। ...আমি তোমার নিকট যাবো ...আমার প্রাণের কথা তোমার প্রাণের নিকট সমর্পণ করবো...।

তোমার কারো নিকট যেতে হবে না। আমি নিজেই এসে পড়েছি।

গুরুগম্ভীর এক আওয়াজ উত্থিত হয়ে কামিনীর কক্ষে প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করে। কামিনীর চিন্তার তার ছিন্ন হয়ে যায়। সে তার মায়াময় নয়ন দু'টির আলো সামনে ফেলতেই হকচকিয়ে ওঠলো। দেখে, সামনে মোহন সিং দাঁড়িয়ে আছে। মোহন সিং-কে দেখেই তার উজ্জ্বল চেহারা পাণ্ডুর আকৃতি ধারণ করে। ক্ষীণ একটি চিৎকারের আওয়াজ তার কণ্ঠ চিরে বেরিয়ে আসে।

মোহন সিং ধীর পদবিক্ষেপে কামিনীর একেবারে নিকটে এগিয়ে আসে। ভয়ে কামিনীর দেহ বেত পাতার মতো থর থর করে কাঁপতে থাকে।

মোহন সিং-এর কণ্ঠে প্রেমের মধু। বললো, কামিনী আমার! তুমি আমাকে দেখে ভয় পেয়ো না। আমি তোমাকে ভালোবাসি। তুমি শুধু আমার হৃদয় মন্দিরেই নও– আমার শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে সদা বিরাজমান। দুনিয়ার মানুষ যাকেই পূজা করুক; কিন্তু আমি- আমি শুধু তোমাকেই পূজা করি।

মোহন সিং নীরব হয়ে যায়। কামিনীর কণ্ঠ যেনো শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। বচনশক্তি যেনো নিঃশেষ হয়ে গেছে। চিৎকার দিয়ে কাউকে ডাকতে মন চাচ্ছে। কিন্তু আওয়াজই তো বের হচ্ছে না।

এসব কিছুর পরও সে শক্তি সঞ্চয় করে বলার জন্য চেষ্টা করে। তাঁর ফ্যাকাশে ওষ্ঠাধর কেঁপে ওঠে। শুধু এতোটুকুই বলতে পারলো, তুমি...।

মোহন সিং বললো, হ্যাঁ, আমি। তোমার কি বিশ্বাস হচ্ছে না কামিনী! তুমি যদি বলো, তাহলে আমি আমার শির কেঁটে তোমাকে উপহার দিতে পারি।

কামিনী বললো, কিন্তু ভাইয়া ...।

ঃ তোমার ভাইয়াকে আমি পরোয়া করি না। সে গাদ্দার, দাগাবাজ। দু'-দু'বার সে আমাকে হত্যা করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু ইশ্বর আমাকে রক্ষা করেছেন। এবার আমার প্রতিশোধ নেয়ার পালা। আমি যখন এখনো বেঁচে আছি, তখন তার বেঁচে থাকা অনুচিত।

এতোক্ষণে কামিনী কিছুটা আত্মস্থ হয়ে ওঠেছে। সে বললো, ভাইয়া এখনই এখানে আসবে ...।

মোহন সিং বললো, আমি জানি। আর এ জন্যই আমি চলে যাচ্ছি। পাপিষ্ঠ নরাধমকে বলে দেবে, সে যেনো প্রস্তুত থাকে। কিন্তু তুমি ...তুমি আমাকে ভয় করো না কামিনী! আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমি তোমার পূজারী। তুমি আমার দেবী।

এরই মধ্যে কারো অস্পষ্ট পদধ্বনি শুনে মোহন সিং শংকিত হয়ে ওঠলো। বললো, মনে হচ্ছে কেউ আসছে। আমি গেলাম। আবার দেখা হবে।

একথা বলেই মোহন সিং উধাও হয়ে যায়। কামিনীর ভয় বিদূরিত হয়ে যায়। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললো, উফ্ পরামাত্মা! লোকটা আবার কোথা থেকে এলো! আমি যতোই তার থেকে বাঁচতে চাই, সে ততোই আমার সামনে এসে উপস্থিত হয়। আমি তাকে দেখলে দারুণ ভয় পাই।

শিকদেব এসে কামরায় প্রবেশ করলো। সাধারণ পোশাক পরিহিত। এসেই বললো, কার কথা বলছিলে? কাকে ভয় পাও?

শিকদেবকে দেখেই কামিনীর চেহারা আলোকিত হয়ে ওঠলো। বললো, ভাইয়া! বেশ ভালো সময়েই এসেছো।

শিকদেব কামিনীর পাশে গিয়ে বসলো। বললো, হ্যাঁ, এখনই সময় পেলাম। যুদ্ধের পোশাক খুলেই তোমার নিকট ছুটে এলাম।

ঃ আহ! যদি একটু আগে আসতে!

ঃ তাহলে কী হতো?

ঃ তুমি তার সাক্ষাৎ পেতে, আমি যাকে ভয় করি।

ঃ কে?

ঃ মোহন সিং।

মোহন সিং-এর নাম শুনেই শিকদেব চমকে ওঠলো। বললো, মোহন সিংকে কি তুমি স্বচক্ষে দেখেছো?

ঃ হ্যাঁ।

ঃ কখন?

ঃ এই তো কিছুক্ষণ পূর্বে।

ঃ না তা হতে পারে না। তার লাশ তো মাছ আর ঘরিয়ালরা খেয়ে ফেলেছে।

ঃ কিন্তু সে জীবিত।

ঃ তাহলে তার প্রেতাত্মা হবে।

ঃ প্রেতাত্মা ...।

ঃ হ্যাঁ, ভূত। আমি সে দিন তোমাকে এজন্য বলিনি যে, তুমি ভয় পাবে। এখন শোনো, আমি তাকে বাগানে নিয়ে সমুদ্রে ফেলে দিয়েছিলাম। সে তখন ভয়ঙ্কর আর্তচিৎকার দিয়েছিলো। আমি পানিতে তার পতন ধ্বনি শুনেছিলাম।

ঃ কিন্তু ভাইয়া, সে তো এসেছিলো।

ঃ আমি নিশ্চিত, সে জীবিত নয়।

ঃ এখন আমি তোমাকে কীভাবে নিশ্চিত করবো, আমি তাকে স্বচক্ষে দেখেছি?

ঃ এ জন্যই তো বলি, তুমি হয়তো তার প্রেতাত্মাকে দেখেছো।

ঃ ভাইয়া! প্রেতাত্মারা কি কথা বলতে পারে?

ঃ না।

ঃ তাহলে শোনো, সে আমার সাথে রীতিমত কথা বলেছে।

শিকদেব দারুণ বিস্মিত হলো। বললো, সে কথা বলেছে?

ঃ হ্যাঁ, কথা বলেছে।

ঃ কী বলেছে?

লজ্জায় কামিনী শির নত করে ফেললো। বললো, তা-ই বলেছে, যা সে বলে থাকে।

শিকদেব দাঁতে দাঁত পিষে বললো, নিমকহারাম, কুত্তা... তাহলে কি কোনোভাবে বেঁচে গেলো!

ঃ নিশ্চয় সে বেঁচে এসেছে। তুমি যদি আমব্রেলীতে চলে যাও, তাহলে অনেক ভালো হবে। অন্যথায় সে তোমার থেকে প্রতিশোধ নেবে।

শিকদেব যেনো চিন্তার বাগানে কিছুক্ষণ বিচরণ করে এলো। বললো, আমব্রেলীতে চলে যাবো...।

ঃ হ্যাঁ, আর চন্দ্রামুখীকেও নিয়ে যেতে হবে।

শিকদেব সচকিত হয়ে বললো, আমি তোমাকে কতোবার বলেছি, এভাবে খোলামেলা আলোচনা করবে না। কেউ শুনে ফেললে পরিণতি কী হবে, তা কি ভেবেছো? কিন্তু তুমি আমার কথা শুনছো না।

তুষারশুভ্র ঝলমলে দন্তরাজি দিয়ে অধর কেটে কামিনী তার ভুলের কথা স্বীকার করে বললো, ভাইয়া! ভারি ভুল হয়ে যায়। এবার থেকে সতর্ক থাকবো।

ঃ আসল ব্যাপার হলো, নারীদের কোনো রহস্যময় বিষয়ের সাথে সংযুক্ত করতে নেই। কারণ, বিজ্ঞজনরা বলেছেন, নারীর পেটে কথা হজম হয় না।

ঃ আচ্ছা আমার যে দোষই থাকুক, আমি সে সম্পর্কে কিছুই বলবো না। কিন্তু তুমি এখন তাকে নিয়ে চলে যাও।

ঃ কীভাবে নিয়ে যাবো।

ঃ যেভাবে পারো।

ঃ নরাধম ম্লেচ্ছ-মুসলমানরা তো সবগুলো পথ বন্ধ করে দিয়েছে!

ঃ যদি বাহিনী নিয়ে যাও, তাহলে মুসলমানরা নিশ্চয় দেখে ফেলবে। তাই দু'চারজনকে সাথে নিয়ে যাও।

ঃ কিন্তু... তাকে কেল্লা বের করবো কীভাবে?

ঃ চিন্তা করো। নিশ্চয় কোনো পথ বেরিয়ে আসবে।

ঃ হ্যাঁ, চিন্তা করবো। তুমিও কি চলে যাবে?

ঃ না, এখন আমার যাওয়া সমীচীন হবে না। তুমি তাকে নিয়ে যাও।

ঃ দু'-চার দিনের মধ্যেই এর ব্যবস্থা করছি।

ঃ দু'-চার দিন পর নয়, আজই ব্যবস্থা করো।

ঃ এটা কীভাবে সম্ভব? ...আর এতো তাড়াহুড়া কি ভালো হবে?

ঃ সে হুমকি দিয়ে গেছে। বলেছে, তোমার ভাই আমাকে হত্যার জন্য দু'বার চেষ্টা করেছে। এবার আমার প্রতিশোধ নেবার পালা। আমি তাকে জীবিত রাখবো না।

শিকদেব ভয় পেয়ে গেলো। বললো, তাহলে তো মনে হচ্ছে, সে নিশ্চয় বেঁচে আছে। কিন্তু সে কোথায় থাকে?

ইতিমধ্যে কার যেনো কলহাস্যের কণ্ঠ ভেসে এলো। কামিনী ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেলো। শিকদেব ভয় পেলো। কামিনী বললো, এটা তারই কলহাস্যের আওয়াজ।

শিকদেব দ্রুত উঠে দাঁড়ায়। লাফ দিয়ে অন্য কামরায় যায়। সে কামরাটি আলোয় উজ্জ্বল। শিকদেব বিস্ফারিত নয়নে চারদিক পর্যবেক্ষণ করে। না, কোথাও কেউ নেই।

এরপর আরেকটি কামরায় যায়। তারপর বাইরে এসে দাঁড়ায়। চারদিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে দেখে। চারদিক সুনসান নীরব। কেউ নেই। তারপর ফিরে এসে বলে, সে হয়তো কোথাও লুকিয়ে আছে। তাকে লুকিয়ে থাকতে দাও। আমার থাবা থেকে সে কিছুতেই বাঁচতে পারবে না।

কামিনী তখনো কাঁপছিলো। সে শিকদেবকে ঝাপটে ধরে বললো, ভাইয়া! এখানে আমার দারুণ ভয় লাগছে।

শিকদেব সান্ত্বনা দিয়ে বললো, আরে কিসের ভয়। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। আমি এখনই তোমার নিকট চার-পাঁচজন দাসী পাঠিয়ে দিচ্ছি। রাতে তোমার কামরায় তাদের নিয়ে থাকবে।

শিকদেব চলে গেলো। কিছুক্ষণ পরই কয়েকজন দাসী এসে উপস্থিত হয়। তাদের পেয়ে কামিনীর হৃদয় প্রশান্ত হলো। তাদের নিয়ে সে কথাবার্তায় মগ্ন হলো।

একান্ন.

মোহন সিং-এর বোন চম্পা মহারাণীকে সঠিক সংবাদই দিয়েছে। শিকদেব রাজকুমারী চন্দ্রামুখীর বিভিন্ন আচরণে-উচ্চারণে একেবারে নিরাশ হয়ে পড়েছে। তার মনে প্রত্যয় জন্মেছে, রাজকুমারী চন্দ্রামুখী তাকে স্বামী হিসেবে বরণ করে

নেবে না। সেই সঙ্গে একটা ভয়, একটা আশংকা সর্বদা তাকে কুরে কুরে খাচ্ছে, যদি মহারাজা রাজকুমারীর মনের দিকে চেয়ে নিজের মত ঘুরিয়ে ফেলেন! যদি রাজকুমারীকে তার সাথে বিয়ে দিতে সম্মত না হন!

দুর্ভাবনার ঘূর্ণিপাকে ঘুরপাক খেতে খেতে হঠাৎ তার মনের কুৎসিত সাপটি ফণা তুলে ঘুরে দাঁড়ায়। না... চন্দ্রামুখীকে আমার পেতেই হবে। তাকে ছাড়া আমার এ জীবন বৃথা। এ জীবন দুর্বিষহ। তারপরই সে গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। রঙিন টোপের লোভ দেখিয়ে জুড়ে নিলো বিশ্বস্ত দু'-তিনজন গাদ্দার। কামিনীও পিছিয়ে রইলো না। সেও এসে যোগ দিলো এই নীল ষড়যন্ত্রে। পরিকল্পনা করলো, প্রথমে তারা রাতের অন্ধকারে কালো পোশাক পরে রাজপ্রাসাদের লোকদের ভয় দেখাবে। তারপর সুযোগ বুঝে, সবার অজান্তে রাজকুমারীকে তুলে নিয়ে আসবে। এ গুরু দায়িত্বের ভার দেয়া হলো মোহন সিংকে। রাজকুমারীকে তার শয়নকক্ষ থেকে তুলে আনা চাট্টিখানি কথা নয়। এ কাজের প্রতিটি পদক্ষেপে রয়েছে মৃত্যুর ভয়াল থাবার আশঙ্কা। রাজরোষে পড়ে যে কোনো সময় নির্মমভাবে নিহত হওয়ার হাজারো শংকা। তবুও মোহন সিং হৃদয় বাগানে পুষ্পিত প্রেম-কুসুমকে হাতের মুঠোয় পাওয়ার আশায় রাজি হলো। সেই কবে থেকে সে কামিনীর প্রেম-আগুনে জ্বলে মরছে। কিন্তু এ কথা মুখে আনারও সাহস হয়নি। যদি শিকদেব-এর এ গুরুদায়িত্ব সে পালন করতে পারে, তাহলে তার উপর চাপ সৃষ্টি করে কামিনীর পাণি গ্রহণের পথ উন্মুক্ত করবে। এ আশায় হৃষ্টচিত্তে মোহন সিং এ দায়িত্ব পালনে রাজি হয়ে যায়।

প্রথমে রাজপ্রাসাদে সংবাদ ছড়িয়ে দেয়া হয়, কয়েকজন দুর্ধর্ষ মুসলামন কেল্লায় আত্মগোপন করে আছে। রাতের অন্ধকারে তারা কালো পোশাকে আবৃত হয়ে ঘোরা-ফেরা করে। তারপর রাজকুমারী চন্দ্রামুখীকে তুলে নিয়ে যাওয়ার পর মহারাজাকে বুঝানো হলো, ম্লেচ্ছ মুসলামনরা তাকে তুলে নিয়ে গেছে। এর উদ্দেশ্য, কেল্লায় রাজকুমারীকে আর তালাশ করা হবে না। সবাই মুসলমানদের উপর আক্রমণ করবে। আর সুযোগ বুঝে এক ফাঁকে চন্দ্রামুখীকে কেল্লা থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া হবে।

কিন্তু নসিব মন্দ। বিধি বাম। রাজকুমারীকে কেল্লার বাইরে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। আর শিকদেব এ সুযোগের সন্ধানে হন্যে হয়ে ঘুরছে। এদিকে মোহন সিংও অস্থির হয়ে পড়েছে। সে ভাবলো, রাজকুমারীকে নিয়ে শিকদেব পালিয়ে যেতে পারলেই তার আশা -আকঙ্খা দুরাশায় পরিণত হবে। তাই মোহন সিং শিকদেব-এর নিকট তার অভিলাষের কথা ব্যক্ত করে এবং কামিনীকে আরো নিকটে- অতি নিকটে পাওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করতে থাকে।

মোহন সিং একজন সাধারণ মানুষ। নিম্ন শ্রেণীর লোক। তার কামিনীকে

পাওয়ার আশা মানেই বামনের চাঁদ ধরার নিষ্ফল প্রয়াস। তাই শিকদেব মোহন সিং-এর এ অভিলাষ বাস্তবায়িত হতে দিতে পারে না। কিন্তু শিকদেও জানে, মোহন সিং-এর একটি শব্দই তার জীবন নাশের জন্য যথেষ্ট। তাই সে অনেক ভেবে-চিন্তে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছলো, মোহন সিংকে দৃশ্যপট থেকে সরিয়ে দিলেই সব বাধা চুকে যাবে। মোহন সিংকে গোপনে হত্যা করতে হবে। বলবীর চন্দর শিকদেব-এর একান্ত বিশ্বস্ত ভৃত্য। সুঠাম দেহ, সাহসের অধিকারী। শিকদেব তাকেই একাজে উৎসাহিত করলো। বললো, মোহন সিংকে শীঘ্রই সুযোগ মতো গ্রেফতার করে বন্দি করে রাখবে। তারপর তাকে হত্যা করে ফেলবে।

এ দিকে বলবীর চন্দর মোহন সিং-এর সুন্দরী বোন চম্পার প্রেমে পাগলপারা। দীর্ঘদিন পেছনে পেছনে ঘুর ঘুর করেও তার মন পায়নি। তাছাড়া মোহন সিং-এর ভয়ও তাকে অন্য কিছু ভাবতে দিচ্ছে না। শিকদেব তাকে মোহন সিংকে হত্যার দায়িত্ব দিলে সে নানা চিন্তা করলো। ভাবলো, মোহন সিংকে হত্যা করতে পারলে এক গুলিতে দু'টি চিড়িয়া শিকার হবে। শিকদেব-এর আরো নৈকট্য লাভ হবে। ফলে সে আমার আব্দার পূরণ করতে সচেষ্ট হবে। আর ভাইয়ের ছত্র-ছায়া হারিয়ে চম্পা আমার দিকে ঝুঁকে পড়বে।

এ চিন্তার পর বলবীর চন্দর আর দেরি করেনি। মোহন সিংকে গ্রেফতার করে অন্ধকার প্রকোষ্ঠে বন্দি করে ফেললো। কিন্তু তাকে হত্যা করার সুযোগ পেলোনা। তার আগেই প্রহরীদের ফুসলিয়ে লোভনীয় টোপের আশা দিয়ে জিন্দানখানা থেকে পালিয়ে গেলো। দুর্ভাগ্যবশত সে আবার গিয়ে শিকদেব-এর হাতে পড়লো আর শিকদেব তাকে ভুলিয়ে কথার তালে তালে সমুদ্রের তীরে নিয়ে সমুদ্রে ফেলে দিলো।

রাজকুমারী চন্দ্রামুখীকে তুলে দিয়ে গোপন করে রাখার কাজে যারা অংশ নিয়েছে, তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্বার্থ উদ্ধারের জন্যই অংশ নিয়েছে। আর সবাই ছিলো প্রেমের আগুনে দগ্ধ। আসলে তাদের কারো মাঝেই সত্যিকারে প্রেম ছিলো না। সবাই ছিলো প্রবৃত্তির গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ।

কামিনীর চিন্তা হলো, রাজকুমারী চন্দ্রামুখীকে তার ভাই শিকদেব বিয়ে করলে হারুনকে পাওয়া তার সহজ হয়ে যাবে। মোহন সিং কামিনীর মিলন কামনায় অধীর-অস্থির হয়ে আছে। আর বলবীর চন্দর চম্পার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে।

কামিনীর একটি প্রস্তাব শিকদেব-এর নিকট খুব ভালো লেগেছে। সে বলেছিলো, যেভাবেই হোক চন্দ্রামুখীকে আমব্রেলীতে নিয়ে যাওয়া হোক। তাছাড়া আজকের যুদ্ধ শিকদেব-এর নিকট স্পষ্ট করে দিয়েছে, রাজপুতরা সহজে মুসলমানদের পরাজিত করতে বা বিতাড়িত করতে পারবে না। তাই শিকদেব আজই চন্দ্রামুখীকে কেল্লা থেকে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করলো।

এ চিন্তা করতে করতে শিকদেব নিজ কক্ষে গিয়ে দেখলো, দু'-তিনজন লোক তার অপেক্ষা করছে। তারা সোমনাথের বিশিষ্ট ও সম্মানিত অধিবাসী। শিকদেব তাদের প্রায়ই মহারাজার নিকট যাতায়াত করতে দেখেছে। এরা ইতিপূর্বে কখনো শিকদেব-এর নিকট আসেনি। তাই তার মনে খটকা লাগলো। সন্দেহ সৃষ্টি হলো। কিন্তু ভাবলো, মহারাজা তো তার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ করেন না। তাই মনের সন্দেহ দূর করে খোলা মনে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করে। অথচ শিকদেও এর জানা নেই, মহারাজা সব কিছুই জেনে ফেলেছেন এবং তাকে পর্যবেক্ষণ করার জন্যই মহারাজা তাদের নিয়োগ করেছেন।

লোকগুলো সহাস্যবদনে কুশলাদি বিনিময় করে বললো, আমরা আজকের যুদ্ধের পর কেমন জানি নিরাশ হয়ে পড়ছি। তাই আপনার সাথে যুদ্ধের কলা-কৌশল ও জটিল বিষয়াদি সম্পর্কে আলোচনা করতে এসেছি।

তারা বেশ কিছুক্ষণ যুদ্ধের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করলো। তারপর বিদায় নিয়ে চলে গেলো। শিকদেব এবার কিছুটা প্রশান্ত হয়ে বলবীর চন্দরকে ডেকে নিম্ন কণ্ঠে বললো, বলবীর! চন্দ্রামুখী কেমন আছে?

ঃ ভালো আছে।

ঃ সে কি সফর করতে পারবে?

ঃ স্বেচ্ছায় তো সে কোথাও যেতে চাইবে না।

ঃ কিন্তু যে কোনো উপায়েই হোক তাকে আজই কেল্লার বাইরে নিয়ে যেতে হবে।

ঃ কিন্তু আমার তো বুঝে আসছে না কীভাবে তাকে কেল্লার বাইরে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে।

ঃ তার মুখে কাপড় বেঁধে...।

বলবীর চন্দরের মুখে ভীতির আভাষ। বললো, কিন্তু যদি কেল্লার প্রহরীরা যাওয়ার সময় দেখে ফেলে!

ঃ আমরা তাকে গাড়িতে শুইয়ে দেবো।

বলবীর চন্দর ক্ষণকাল নীরব থেকে চিন্তা জগতের চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে এসে উপস্থিত হলো। বললো, আমার নিকট এর একটি বুদ্ধি আছে– বেশ চমৎকার বুদ্ধি।

ঃ কী বুদ্ধি?

ঃ যদি কামিনী ও চম্পা উভয়কে সাথে নেয়া যায়, তাহলে সহজেই যাওয়া সম্ভব হবে।

শিকদেও জানতো, মোহন সিং তার বোন কামিনীকে ভালোবাসে। কিন্তু তার জানা ছিলো না, বলবীর চন্দর চম্পাকে ভালবাসে। তাই বললো, কামিনী তো যাবে; কিন্তু চম্পা...। বলবীর চন্দর কথা শেষ করতে না দিয়েই বললো,

কামিনীই চম্পাকে উৎসাহিত করে রাজি করাবে। যদি তারা গাড়িতে থাকে আর চন্দ্রামুখীকে মুখ বেঁধে আড়াল করে নেয়া হয়, তাহলে প্রহরীরা উচ্চবাচ্য করতে সাহস পাবে না।

বলবীর চন্দরের কথায় শিকদেব-এর অন্তরের খটকা দূর হলো না। বললো, আমার ব্যাপারে তো কারো কোনো সন্দেহ নেই। আর গাড়িতে শুধু কামিনী থাকাই যথেষ্ঠ। চম্পার তো কোনো প্রয়োজন নেই।

ঃ আমাদের এ কাজে কিন্তু চম্পাও জড়িত। সে তার ভাইকে না পেয়ে আমাদের ব্যাপারে সন্দেহ করছে। তাই তাকেও সাথে নেয়া প্রয়োজন।

ঃ হ্যাঁ, তুমি সত্য বলেছো বলবীর! আমি ইতিপূর্বে এ বিষয়টি গভীরভাবে ভাবিনি।

ঃ আচ্ছা, আমি কামিনীকে ডেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী দিচ্ছি। তুমি গিয়ে চন্দ্রামুখীকে তৈরি করতে থাকো।

বলবীর চন্দরের চেহারায় বিজয় আনন্দের ছটা ছড়িয়ে পড়লো। বললো, বহুত আচ্ছা। আমি এখনই যাচ্ছি।

বলবীর চন্দর প্রস্থান করলো।

শিকদেব হাত তালি দিলে এক ভৃত্য এসে নতশিরে দাঁড়ায়। শিকদেব বললো, যাও, এক্ষুনি কামিনীকে ডেকে আনো।

অল্প কিছুক্ষণ পর কামিনী এসে হাজির হলো।

শিকদেব বললো, কামিনী! আমাদের এখনই আমব্রেলীতে চলে যেতে হবে।

কামিনী বললো, আমি তো অনেক আগেই এ পরামর্শ দিয়েছিলাম।

ঃ তোমাকেও কিন্তু যেতে হবে।

কামিনী চমকে ওঠলো। বললো, আমার যাওয়ার কী প্রয়োজন?

ঃ তুমি না গেলে আমরা কীভাবে চন্দ্রামুখীকে নিয়ে যাবো?

ঃ আমার সাথে চন্দ্রামুখীকে কীভাবে নিয়ে যাবে?

ঃ আমাদের পরিকল্পনা হলো, চন্দ্রামুখীর মুখে কাপড় বেঁধে গাড়িতে তুলে আড়াল করে রাখা হবে। তুমি সে গাড়িতে থাকবে। তোমার সাথে চম্পা থাকবে। তোমাদের দু'জনকে দেখলে কেল্লার ফটকের প্রহরীরা গাড়ি তল্লাশী করবে না। তারা ভাববে, আমি তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি।

কামিনী বললো, বেশ চমৎকার পরিকল্পনা। তবে চম্পাকেই নিয়ে যাও। কেল্লা ও রাজপ্রাসাদে আমার থাকার প্রয়োজন আছে। তাহলে তোমার চলে যাওয়ার পর এখানে কী ঘটে, জানতে পারবো। মহারাজার কী প্রতিক্রিয়া হয়, তাও দেখতে পারবো।

ঃ হ্যাঁ, তোমার এ কথাও যুক্তিযুক্ত। তবে তুমি এটা করতে পারো যে, কেল্লা থেকে বেরিয়ে কিছুদূর গিয়ে ফিরে আসবে।

ঃ হ্যাঁ, তা করা যায়। এতে উভয় কূলই রক্ষা হয়।

ঃ কিন্তু চম্পাকে উৎসাহিত করে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব তোমার।

ঃ সে রাজি হবে কি-না আমি তা এখনি বলতে পারবো না।

ঃ আমি তো জানি, সে তোমাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে। তোমাকে মান্য করে।

কামিনী শিকদেব-এর কথা শেষ করতে না দিয়েই বললো, হ্যাঁ, আগে তো এমনই ছিলো। কিন্তু ইদানিং দু'-তিনদিন থেকে সে কেমন যেনো সরে থাকতে চায়।

ঃ এটা তোমার ধারণা।

ঃ ধারণা নয়– নিশ্চিত। সে মোহন সিং-এর নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারটি আঁচ করতে পেরেছে। আমার ধারণা, সে তোমাদের কর্মকান্ড সম্পর্কে সন্দিহান।

ঃ কিন্তু সে অল্পবয়সী ও অদূরদর্শী। বুঝিয়ে বললে তোমার কথা মেনে নেবে।

ঃ আচ্ছা, আমি চেষ্টা করবো।

একথা বলে কামিনী চলে গেলো।

শিকদেব বলবীর চন্দর-এর আগমনের প্রত্যাশায় অস্থির। নানা ধরনের বিক্ষিপ্ত ধারণা বর্শার ফলার ন্যায় তার দিকে যেনো ছুটে আসে। এর মাঝেই বলবীর চন্দর ফিরে আসে। তার চেহারা মলিন। দুশ্চিন্তার কালো মেঘ যেনো তাতে তান্ডব শুরু করেছে। তার চেহারা দেখেই শিকদেব ঘাবড়ে যায়। বললো, কী খবর বলবীর! চন্দ্রামুখী কি প্রস্তুত?

বলবীর চন্দর বললো, কীভাবে তৈরি করবো? তাকে তো খুঁজেই পাচ্ছি না।

শিকদেব যেনো আকাশ থেকে পড়লো। উত্তেজনা আর উৎকণ্ঠায় তার কণ্ঠ রোধ হওয়ার পালা। বললো, সে, সে... তাহলে... কোথায়?

বলবীর চন্দর কাঁপা কণ্ঠে বললো, ঈশ্বরই জানেন।

ঃ কাউকে কি তার প্রহরায় নিযুক্ত করোনি?

ঃ সে তো পাতাল প্রকোষ্ঠে বন্দি ছিলো। সেখানে তো কোনো প্রহরী নিয়োগ করার প্রয়োজন ছিলো না।

শিকদেব-এর চেহারা মলিন হয়ে যায়। যেনো তার মাথায় বজ্রপাত হয়েছে। কিন্তু সে নিজেকে সংবরণ করে বললো, তুই একটা গাঁধা। গাঁধার মতোই কাজ করেছিস্।

বলবীর চন্দরের কণ্ঠ বিনয় ও নম্রতায় একেবারে শীতল। বললো, আপনিই তো আমাকে বলেছিলেন, এখন আর প্রহরার প্রয়োজন নেই।

শিকদেব নিজের ভুল বুঝতে পেরে অপ্রস্তুত হয়ে যায়। বললো, হ্যাঁ, আমি বলেছিলাম। ইদানিং আমার বুদ্ধি-সুদ্ধি যেনো তাল-গোল পাকিয়ে গেছে। কিন্তু তুমি কেনো দরজায় তালা লাগিয়ে রাখলে না?

বলবীর চন্দর বললো, আমি তো দরজায় তালা লাগিয়েই রেখেছিলাম। কিন্তু এখন গিয়ে দেখি, তালা খুলে পড়ে আছে আর রাজকুমারী উধাও।

শিকদেবকে আতঙ্ক আর অস্থিরতা চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে। বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললো, তা কীভাবে হতে পারে! চলো আমিও যাচ্ছি। দেখি কী ঘটলো।

উভয়ে চলতে লাগলো। ভূগর্ভস্থ গোপন কারাগারের নিস্তব্ধতা মাড়িয়ে প্রকোষ্ঠের পর প্রকোষ্ঠ পেরিয়ে তারা এক অন্ধকার প্রকোষ্ঠের মজবুত দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো। চারদিক তাকিয়ে দেখলো, না, কেউ তাদের দেখেনি। একটি মশাল জ্বালালো। তারপর এক অদৃশ্য বোতাম টিপতেই একটি ছোট দরজা খুলে গেলো। তারা তাতে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দিলো। একটু অগ্রসর হয়েই একটি সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেলো। এভাবে বেশ কয়েকটি প্রকোষ্ঠ পেরিয়ে একটি বিরাট কামরার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। কামরা বন্ধ। দরজায় একটি তালা ঝুলে আছে। বলবীর চন্দর চাবি ঘুরিয়ে তালা খুললো। তারপর উভয়ে কামরায় প্রবেশ করলো। কামরাটি খাঁ খাঁ করছে। জনমানবের কোনো চিহ্ন নেই। এক ভয়াল নীরবতায় ডুবে আছে কক্ষটি।

বিস্ময়ের আতিশয্যে শিকদেব একেবারে বিমূঢ় হয়ে গেলো। বিস্ফারিত নেত্রে এদিক-সেদিক তাকিয়ে বললো, সে... সে... এখান থেকে কোথায় গেলো? কীভাবে গেলো!

ঃ আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

ঃ যে করেই হোক তাকে খুঁজে বের করতে হবে। তা না হলে আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। তুমি ভূগর্ভস্থ কারাগারের সবগুলো কক্ষ তন্ন তন্ন করে খোঁজ দেখো। আমি উপরে যাচ্ছি। দেখি পরিস্থিতি কী?

ঃ আপনি যান। আমি তালাশ করছি।

শিকদেব ভূগর্ভস্থ প্রকোষ্ঠ থেকে বেরিয়ে নিজের কামরায় ফিরে এলো। দেখলো, কামিনী এসে তার জন্য অপেক্ষা করছে। বললো, ভাইয়া! চম্পা তৈরি হয়ে আসছে।

শিকদেব-এর কণ্ঠ ভয়াতুর। বললো, কিন্তু... কিন্তু কামিনী, চন্দ্রামুখীকে যে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না!

শুনেই কামিনী কাঁপতে লাগলো। বললো, তাহলে সে মহারাজার নিকট গিয়ে পৌছেনি তো?

ঃ যদি তা-ই হয়, তাহলে আমাদের আর রক্ষে নেই। তুমি কামরায় চলে যাও। আমি এক্ষুনি মহারাজার নিকট গিয়ে খবরা-খবর নিয়ে আসি।

ঃ যদি সে মহারাজার নিকট পৌছে যায়, তাহলে...।

ঃ তাহলে আমরা এখান থেকে দ্রুত পালানোর চেষ্টা করবো।

ঃ কিন্তু সে গেলো কোথায়?

ঃ হতে পারে আমরা তাকে যে প্রকোষ্ঠে বন্দি করে রেখেছিলাম, তার কোনো

গোপন দরজা ছিলো, যা আমরা জানতাম না। ঘটনাক্রমে সে সেই দরজা খোলার বোতাম পেয়ে তা টিপে অন্য কামরায় চলে গেছে। যদি এমন হয়, তাহলে নিশ্চয় সে ভূগর্ভস্থ কারাগারের কোনো কামরায়ই আছে– এখনো বেরুতে পারেনি।

বলবীর চন্দর তার সন্ধানে গেছে। আশা করা যায় তাকে সেখানেই পাওয়া যাবে। কামিনী তার কামরায় চলে গেলো আর শিকদেব মহরাজার সাক্ষাতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিতে লাগলো।

বায়ান্ন.

শিকদেব-এর চোখের তারায় রাজকুমারীকে ঘিরে কতো রঙিন স্বপ্ন ঝলমল করতো। কল্পনা করতে করতে মাঝে-মধ্যে মনে হতো, যেনো চন্দ্রামুখীকে নিয়ে সে স্বপ্নজগতের রঙিন মেঘমালার উপর দিয়ে ডানা মেলে উড়ে উড়ে যাচ্ছে। কতো সুখ-শান্তি আর মিলন-মধুর ছোঁয়ায় তার হৃদয় উৎফুল্ল ও বিমোহিত হয়ে ওঠতো। কিন্তু রাজকুমারী চন্দ্রামুখী নিখোঁজ হওয়ার সংবাদে তার সকল স্বপ্ন, সকল আশা-আকাঙ্খা ধুলায় মিশে গেছে। চারদিক থেকে যেনো ভয়-ভীতি আর বিভীষিকা তাকে তাড়িয়ে ফিরছে। সে ভেবে পায় না, রাজকুমারী গেলো কোথায়?

শাহী প্রাসাদের ভূগর্ভস্থ কারাগারের সেই প্রকোষ্ঠটি এমন জায়গায় তৈরি করা হয়েছে, যেখান থেকে অজানা ব্যক্তি তো দূরের কথা, জানা ব্যক্তিরাও সহজে বেরিয়ে আসতে পারে না।

এ চিন্তা শিকদেবকে আরো বেশি অস্থির ও পেরেশান করে তুললো, হয়তো চন্দ্রামুখী অন্ধকার হাতড়ে চলতে চলতে কোনো কিছু দেখে ভয় পেয়ে যেতে পারে। আরেকটি 'চিন্তা তার অন্তরে মাঝে-মধ্যে সূচের মত এসে বিদ্ধ করে। সে ভাবে, মোহন সিং জীবত আছে। সে রাজপ্রাসাদেই আছে। তাকে সে দু'বার হত্যা করার চেষ্টা করেছিলো। কিন্তু সফল হয়নি। তাই মোহন সিং তার দুশমন– প্রাণের শত্রু। তাকে ঘিরেও শিকদেব-এর ভীষণ ভয়। সুযোগ পেলে হয়তো সে-ই তাকে হত্যা করবে বা তার এ ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস করে দেবে। তাহলে আর তার রক্ষে নেই।

দুশ্চিন্তার দোলায় দুলতে দুলতে সে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছলো, যে করেই হোক দ্রুত তাকে সোমনাথ ছেড়ে পালাতে হবে। তবে তার আগে দেখা দরকার, চন্দ্রামুখী মহারাজার নিকট গিয়ে পৌঁছেছে কি-না বা মোহন সিং মহারাজাকে এ ষড়যন্ত্রের কথা বলে দিয়েছে কি-না।

শিকদেব হাঁটতে হাঁটতে মহারাজার খাস কামরার নিকট গিয়ে

পৌছলো। প্রহরীদের জিজ্ঞেস করে জানতে পারলো, মহারাজা আজ তাড়াতাড়ি শয্যা গ্রহণ করেছেন। কোন নারী বা পুরুষ তার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য ইতিমধ্যে আসেনি।

শিকদেব যখন তার কামরার দিকে যাচ্ছিলো, হঠাৎ মনে হলো, হতে পারে তারা উভয়ে বা তাদের কেউ মহারাণীর নিকট গিয়ে পৌছেছে। তাই সে মহারাণীর কামরার দিকে পা বাড়ায়। তখন বেশ রাত হয়ে গেছে। গিয়ে দাসীদের নিকট শুনলো, মহরাণীও আজ দ্রুত শয্যায় গিয়েছেন। আরো জানতে পারলো, ইতিমধ্যে কেউ মহারাণীর সাথে সাক্ষাৎ করতে আসেনি।

এবার শিকদেব-এর অন্তরে কিছুটা প্রশান্তি ফিরে এলো। সে তার কামরায় গিয়ে প্রথমে খাবার খেলো এবং বলবীর চন্দরের আগমনের অপেক্ষায় রইলো।

কিছুক্ষণ পর বলবীর চন্দর ফিরে এলো। তার চেহারায় ব্যর্থতার কালো ছায়া প্রকট হয়ে আছে। চেহারা দেখেই শিকদেব সব বুঝে ফেললো। তারপরও জিজ্ঞেস করলো, কোনো সন্ধান পেলে না?

বলবীর-এর কণ্ঠ অস্ফুট, ভয়-বিজড়িত। বললো, না, পাইনি...।

শিকদেব তাকে কথা শেষ করতে না দিয়েই বললো, যদি তোমার ধারণা হয়, সে এখনো ভূগর্ভস্থ কারাগারের কোথাও আছে...।

ঃ আফসোস, আমি বলতে পারছিনা সে কোথায় আছে। তবে আমি ভূগর্ভস্থ কারাগারে মোহন সিংকে দেখেছি।

শিকদেব বেচাইন ও অস্থির হয়ে বললো, তাহলে... তাহলে মোহন সিংও কি তাকে খুঁজে ফিরছে?

ঃ আমার তা-ই মনে হচ্ছে।

ঃ তাহলে এক্ষুনি চলো তাকে খুঁজে বের করে গ্রেফতার করতে হবে। তারপর সেখানেই হত্যা করে মাটিতে পুঁতে রাখতে হবে।

বলবীর চন্দর বললো, এর জন্যই তো আমি আপনার নিকট এসেছি।

ঃ চলো.. চলো আর দেরি নয়।

কোথায় যাচ্ছো ভাইয়া? কামিনীর কণ্ঠ ভেসে এলো।

শিকদেব ফিরে তাকালো। বললো, কামিনী! তুমি এখনো ঘুমাওনি?

ঃ না।

ঃ কেনো?

ঃ মোহন সিং-এর ভয়ে।

ঃ তাকে আর ভয় করো না। বলবীর চন্দর তাকে ভূগর্ভস্থ কারাগারে দেখেছে। আমরা তার সন্ধানেই যাচ্ছি। তুমি কোনো চিন্তা করো না। যাও, নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ো।

ঃ বিছানায় যেতেই ভয় লাগে।

ঃ আমি তো তোমাকে বার বার বলেছি, কয়েকজন দাসী তোমার কামরায় রাখো। তাদের কয়েকজন জেগে জেগে তোমাকে প্রহরা দেবে আর বাকিরা ঘুমাবে।

ঃ কিন্তু ভাইয়া! তাদের উপস্থিতিতেও তো আমার ঘুম হয় না।

ঃ তাহলে তাদের তোমারকে কামরার সামনের কামরায় থাকার নির্দেশ দাও। তাদের একদল ঘুমাবে, আরেক দল প্রহরা দেবে।

ঃ আচ্ছা... তবে ভাইয়া মোহন সিংকে ধরতে পারলে কিন্তু আমাকে অবশ্যই জানাবে।

ঃ ঠিক আছে, জানাবো।

শিকদেব ও বলবীর চন্দর রওনা হয়ে গেলো। কামিনী তার কামরায় ফিরে এলো। সে কয়েকজন দাসী নিয়ে শিকদেব-এর নিকট এসেছিলো। তখন তার কামরায় আট-দশজন দাসী প্রহরা দিচ্ছিলো।

কামিনী ভীতু নারী নয়। সে রাজকন্যা। রাজকন্যারা নির্ভীক ও দুঃসাহসী হয়। কিন্তু মোহন সিংকে দেখলেই কেনো জানি তার হৃদয় শুকিয়ে যায়। জিহ্বা কাঠ হয়ে যায়। শরীর থর থর করে কাঁপতে শুরু করে।

নিজ কামরায় পৌঁছে কামিনী বেশ কিছুক্ষণ দাসীদের সাথে হাসি-তামাশা করলো। আনন্দ-ফূর্তি করলো। অবশেষে ঘুম আসলে সে দাসীদেরকে সম্মুখের কামরায় চলে যেতে এবং সজাগ থেকে প্রহরা দিতে নির্দেশ দিলো। দাসীরা চলে গেলো। কামিনী শয়নের পোশাক পরে শুয়ে পড়লো। তার ডাগর চোখ দু'টি কামরার ছাদে আটকে রইলো। কিছুক্ষণ পর সে গভীর ঘুমের রাজ্যে হারিয়ে গেলো।

ঘুমের রাজ্যে কতোক্ষণ আগে হারিয়ে গেছে তা তার জানা নেই। তবে বেশ কিছুক্ষণ ঘুমানোর পর অকস্মাৎ তার মনে হলো, তার ওষ্ঠাধরে যেনো কিসের এক কোমল ছোঁয়া লাগছে। ঘুমের ঘোরেই তার চোখ খুলে গেলো। প্রবল ঘুমের কারণে সে কিছুই বুঝতে পারলো না। ঘুমের ভাব হালকা হলে চোখ মেলে তাকায়। অমনি তার পিলে চমকে ওঠে। দেখলো, মোহন সিং তার উপরে ঝুঁকে আছে। মনে হচ্ছে, সে তার ঠোঁটে চুমু খাওয়ার চেষ্টা করছে।

কামিনী ধড়মড়িয়ে উঠে বসলো। ভয়ে তার বিবস্ত্রপ্রায় শরীরটা কাঁপছে। মোহন সিং আবেগ মিশ্রিত রসালো কণ্ঠে অত্যন্ত নীচু গলায় বললো, শোনো প্রিয়া! যদি তোমার-আমার আর শিকদেব-এর কল্যাণ চাও, তাহলে শোরগোল করো না। আমি জানি, সামনের ঐ কামরায় তোমার দাসীরা তোমার নির্দেশের অপেক্ষায় আছে।

কামিনী অস্ফুট কণ্ঠে সাহসে ভর করে বললো, কিন্তু আমার কামরায় তোমার আসার দুঃসাহস কীভাবে হলো?

মোহন সিং-এর কণ্ঠে প্রেমের সুধা। বললো, কামিনী! কী করবো বলো? তুমি আমার দেবী। আমার মানসী। তোমার ভালোবাসা, তোমার প্রেম সর্বদা আমার শিরায়-শিরায় তরঙ্গ তুলে নেচে বেড়ায়। আমি তো তোমাকে ছাড়া বাঁচবো না প্রেয়সী!

কামিনীর কণ্ঠে তচ্ছিল্যের সুর। রূঢ়তার বিকাশ। বললো, শোনো মোহন সিং! এ অসম্ভব বিষয় থেকে তোমার দূরে থাকা উচিত।

মোহন সিং-এর কণ্ঠ ভারি হয়ে এলো। বললো, আমি তো বহু চেষ্টা করেছি। তোমার চিন্তা ছেড়ে দিতে বহুবার প্রতিজ্ঞা করেছি। কিন্তু আমি অক্ষম। আমি অপারগ। তাই আমার বক্তব্য তোমার সামনে তুলে ধরলাম। ভবিষ্যতের চিন্তা আমি করি না।

কামিনীর কণ্ঠ আরো কঠিন শুনালো। বললো, মোহন সিং! তুমি কি জানো আমি কে?

মোহন সিং-এর কণ্ঠে দৃঢ়তা। বললো, জানি, জানি তুমি আমব্রেলীর রাজকুমারী। আর আমি একজন সাধারাণ মানুষ। কিন্তু প্রেম-ভালোবাসা কখনো মানুষের মর্যাদা, ক্ষমতা আর ধন-সম্পদের দিকে তাকায় না। প্রেম অন্ধ। প্রেম মূক। প্রেম সর্ববিজয়ী।

ঃ তোমার ও আমার কল্যাণ এটাই যে, তুমি আমার কথা ভুলে যাও।

ঃ জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত আমি তোমাকে ভুলতে পারবো না। তুমি আমার হৃদয় মন্দিরে চিরকাল মহাদেবী হয়ে থাকবে। তুমি আমার রাধা আমি তোমার কৃষ্ণ।

কামিনীর কণ্ঠে ক্রোধের আভাষ। বললো, তুমি কি আমার ভাই শিকদেবকে ভয় করো না?

ঃ সে আমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। তবে আমি যখনই চাই, তাকে গ্রেফতার করাতে পারি। কিন্তু আমি তা করবো। কারণ, তাতে তুমি কষ্ট পাবে।

কামিনীর কণ্ঠে এবার বিনয়-নম্রতা ঝরে পড়ে। বললো, শোনো মোহন! আমি তোমার নিকট আবেদন করছি, তুমি আমার ভাইয়ার কোন ক্ষতি করো না।

ঃ আমি একেবারে নীরব থাকবো, যদি তোমরা আমার প্রতি সদয় হও।

কামিনী বললো, আফসোস! তুমি আমাদের হৃদয়ের অবস্থা কিছুই জানো না।

ঃ তবে আমার সন্দেহ হয়, তুমি হয়তো অন্য কারো প্রেমে মজে আছো।

ঃ তোমার সন্দেহ ভুল নয়।

ঃ সে ভাগ্যবান কে, তাকি আমি জানতে পারি?

ঃ এটা আমার গোপন বিষয়। এক গভীর রহস্য। আমি তা কারো নিকট কখনো বলব না।

ঠিক তখন বাইরের কামরায় যেন কারো আগমনের পদধ্বনি শোনা গেলো। মোহন সিং সচকিত হয়ে ওঠলো। তার প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চৌকান্না হয়ে ওঠলো। ব্যস্ত হয়ে বললো, মনে হচ্ছে কেউ আসছে! যদি শিকদেব আসে, তবে তাকে বলে দেবে, সে যেনো আমার পিছু না নেয়। আমি এবারও তাকে মাফ করে দিচ্ছি। কিন্তু এরপর আর মাফ...।

মোহন সিং-এর কথা শেষ হলো না। ইতিমধ্যে কামরার দরজা খুলে যায়। শিকদেব এসে কামরায় প্রবেশ করে। প্রথম দৃষ্টিতেই সে মোহন সিংকে চিনে ফেলে। তার চোখ থেকে যেনো লেলিহান অগ্নিশিখা ঠিক্‌রে বেরুচ্ছে। মোহন সিং-এর চোখেও ক্রোধের আগুন। শিকদেব ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে বললো, দুরাচার পাপিষ্ঠ, কমিনা। তুই এখানে কী চাস্‌! হারামজাদা কোথাকার!

মোহন সিং ধীরে ধীরে দেয়ালের সাথে মিশে দাঁড়ালো। তারপর বললো, তুমি আমাকে দু'বার হত্যা করতে চেয়েছিলে। কিন্তু পারোনি। আমি এখনো জীবিত। এতে তোমার বুঝা উচিৎ, পরমাত্মা চাচ্ছেন না, আমি তোমার হাতে মৃত্যুবরণ করি। তবে এটা হতে পারে যে, তুমি আমার হতে নিহত হবে। তাই তোমার উচিৎ, আমার থেকে দূরে থাকা আর আমার বিষয়ে নাক না গলানো।

শিকদেব ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে তরবারী উঁচিয়ে তাকে হত্যা করতে ছুটে যায়। মোহন সিং বললো, শিকদেব! ভবিষ্যতে যদি কোথাও তোমার আর আমার মিলন ঘটে, তাহলে সেদিন তোমার বা আমার জীবনের শেষ দিন হবে। এ কথা বলেই মোহন সিং দেয়ালের এক অদৃশ্য বোতামে টিপ দেয়। অমনি একটি দরজা খুলে যায়। মোহন সিং সে দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ামাত্রই নিমিষে তা বন্ধ হয়ে যায়।

শিকদেব ছুটে এসে ক্রোধে দেয়ালে প্রচণ্ড লাথি মারতে থাকে। তারপর গোপন বোতামটি খুঁজতে থাকে। কিন্তু পেলো না।

তেপ্পান্ন.

রাজ ঘোষকের গম্ভীর ও তেজোদীপ্ত কণ্ঠ শোনা গেলো সোমনাথ শহর ও কেল্লার অলিতে-গলিতে। বিঘোষিত হলো–

আগামীকাল সকালে সবাইকে অবশ্যই মন্দিরে গিয়ে সোমনাথ মূর্তির পূজা অনুষ্ঠানে যোগদান করতে হবে। রাজার আদেশ অমান্য হলে কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে।

সকালে গোটা সোমনাথে সাজ সাজ রব পড়ে যায়। পূজা অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য সবাই তৈরি হচ্ছে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ সামর্থ অনুযায়ী মন্দিরের সেবক ও গুরুদের জন্য নজর-নিয়াজ নিয়ে যাচ্ছে। সোমনাথ মূর্তির জন্য নিচ্ছে নানা রঙের ফুলের মালা।

যখন মন্দিরের ঘন্টা আর সিঙ্গা বাজতে শুরু করলো, দলে দলে লোক পূজায় শরিক হতে ছুটে চললো। বাজার, রাস্তাঘাট সবকিছু পূজারীদের দ্বারা ভরে গেলো। কোথাও তিল ধারনের ঠাঁই নেই। সাধারণ মানুষের সঙ্গে রাজা-মহারাজাগণও তাদের সৈন্য বাহিনী নিয়ে পূজায় অংশগ্রহণ করতে বেরিয়ে এলেন। মহারাজাও পূজায় অংশগ্রহণ করতে রওনা হলেন। তার সাথে সাথে শিকদেবও যাচ্ছে।

আজ মন্দির প্রাঙ্গণ লোকে লোকারণ্য। কোথাও একটুও ঠাঁই নেই। প্রত্যেকে মন্দির সেবক আর পূজারী-মহাপূজারীর জন্য সঙ্গে নিয়ে এসেছে উপঢৌকন, নযরানা। নানা ধরনের ফুলের মালা ও তোড়া। নযরানা আর উপঢৌকনে মন্দিরের কোষাগার কানায় কানায় ভরে ওঠলো।

পূজার কার্যক্রম শুরু হলো। মন্দিরের দাসীরা আজ অপূর্ব সাজে সজ্জিত। তাদের ইন্দ্রবিনিন্দিত চোখ ঝলসানো রূপ শিখায় যেনো চারদিক উজালা। প্রথমেই তাদের নৃত্যানুষ্ঠান শুরু হলো। নাচের তালে তালে ও বাদ্যযন্ত্রের ঝংকারে চারদিক মাতোয়ারা হয়ে ওঠলো। তারা সুরের মুর্চ্ছনায় অপূর্ব দেহলতা দুলিয়ে দুলিয়ে বারবার পূজার গান গেয়ে ছুটে গেলো সোমনাথ মূর্তির পদপ্রান্তে। মূর্তির আশির্বাদ নিয়ে যেনো তারা ধন্য হতে চায়। ধন্য হতে চায় গোটা সোমনাথবাসী। পরিত্রাণ পেতে চায় ম্লেচ্ছ মুসলমানদের নাপাক হামলা থেকে। উদ্যম নৃত্যের তালে তালে সুরের মুর্চ্ছনায় পূজার কার্যক্রম এগিয়ে চলেছে।

সূর্য বেশ উপরে উঠে এসেছে। উজ্জ্বল হাসির কিরণ মেখে তার মুখখানা আনন্দে ঝলমল। মুজাহিদ বাহিনী ফজরের নামায আদায় করে অস্ত্রসজ্জিত হচ্ছে। সুলতান মাহমুদ গজনবী আজ যোদ্ধা বেশে সজ্জিত হয়ে তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়েছেন। তাকে মূর্তিমান সিংহের মতো মনে হচ্ছে। রাতেই তিনি সকল সালারের নিকট সংবাদ পাঠিয়ে দিলেন, আগামীকাল সকাল সকাল সোমনাথ কেল্লায় আক্রমণ করা হবে।

সিপাহসালার আলতুনতাশ ও আমীর আলী একটি টিলার চূড়ায় দাঁড়িয়ে সুলতানের বাহিনীর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আছে। সুলতান তাঁর ঘোড়ায় আরোহণ করলে তারা পতাকা আকাশের দিকে তুলে ধরে। অমনি গগন-পবন কাঁপিয়ে বজ্রনির্ঘোষ কণ্ঠে মুজাহিদ বাহিনী তাকবীর ধ্বনি তুললো।

আলতুনতাশ ও আমীর আলী টিলার চূড়া থেকে নেমে এলো। তারা

অশ্বারোহণ করে বাহিনীকে কেল্লার অভিমুখে রওনা হওয়ার ইঙ্গিত করলো। মুজাহিদ বাহিনী আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিতে দিতে ক্ষুধার্ত শার্দূলের ন্যায় বীরবেশে অগ্রসর হতে লাগলো।

রাজপুতদের ধারণা ছিলো, বিগত দিনের যুদ্ধে মুসলমানরা অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অনেকে জখম হয়েছে। ক্লান্তি-শ্রান্তিতে হয়তো তাদের মনোবল ভেঙে পড়েছে। তাই আজ তারা বিশ্রাম করবে। শরীরকে একটু সতেজ ও চাঙ্গা করে নেবে।

কিন্তু রাজপুতরা যখন দেখলো, মুসলমানরা বীরবেশে কেল্লা আক্রমণ করতে এগিয়ে আসছে, তখন তারা বিস্ময়ে হতবাক্ এবং ভয়ে বিহ্বল হয়ে পড়লো। মুসলমানরা আরো কাছে এগিয়ে এলে তারা সচকিত হয়ে ওঠে এবং চিৎকার শুরু করে। সাথে সাথে কেল্লার উপর থেকে তীর ও পাথর নিক্ষেপ শুরু হয়।

মন্দিরে তখনও পূজা হচ্ছে। মন্দিরের ঘন্টার আওয়াজ, সিঙ্গার ফুৎকার আর বাদ্যের ঝংকারে কেল্লার লোকদের আওয়াজ মিলিয়ে যাচ্ছে। কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। অথচ কেল্লার পাঁচিলে অবস্থিত রাজপুতদের চিৎকারের এটাও উদ্দেশ্য যে, তাদের ডাক-চিৎকার শুনে যেনো মন্দির থেকে তাদের সাহায্যে যোদ্ধারা ছুটে আসে।

মুসলমানরা যেনো আজ মাথায় কাফন বেঁধে রণাঙ্গনে এসেছে। তারা রাজপুতদের ডাক-চিৎকার, মুষলধারায় তীরবর্ষণ আর প্রস্তর নিক্ষেপের কোনো পরোয়া করলো না। আগের মতোই তীরগুলো তীব্র গতিতে সামনে অগ্রসর হতে লাগলো। এদিকে রাজপুতরাও অত্যন্ত উদ্যমতার সাথে তীর আর প্রস্তর বর্ষণ করে মুসলমানদের অগ্রযাত্রা প্রতিহত করতে চেষ্টা করছে।

কিন্তু মুসলমান মুজাহিদরা আজ নিঃশংক-নির্ভীক। মৃত্যুর মধুর আলিঙ্গনের প্রত্যাশায় তারা সম্মুখে ধেয়ে চলেছে। তীর বা প্রস্তরাঘাতে কেউ আহত হয়ে পড়লে অন্যরা তাকে তুলে নিরাপদ স্থানে নিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করছে। কেউ কেউ তীরের আঘাতে শাহাদাতবরণ করছে।

রাজপুতরা যখন দেখলো, নির্ভীক মুসলমানরা কেল্লার পাঁচিলের একেবারে নিকটে এসে পড়েছে, তখন তারা বিস্ময়ে বিস্ফারিত নেত্রে মুসলমানদের দিকে তাকিয়ে রইলো। তারা হতবাক্ হয়ে যেনো তীর নিক্ষেপ বা প্রস্তর বর্ষণের কথা একেবারে ভুলে গেছে। তারা পাঁচিলের উপর থেকে ঝুঁকে উঁকি মেরে মুজাহিদদের দেখতে থাকে।

মুজাহিদ বাহিনীর যোদ্ধারা বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। তারা রাজপুতদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছে। তারা ক্রোধে অগ্নিশর্মা। কারণ, এ পর্যন্ত অনেক মুজাহিদ আহত হয়েছে, অনেকে শহীদ হয়েছে।

মুজাহিদ বাহিনীর একদল দক্ষ তীরন্দাজ হাতে ধনুক তুলে নিলো। তাতে তীর যোজনা করে পাঁচিলের উপর বিদ্যমান রাজপুতদের লক্ষ্য করে একই সাথে তীর ছুঁড়তে লাগলো। শাঁ শাঁ শব্দ তুলে বায়ু ভেদ করে তীরগুলো মুহূর্তে পাঁচিলের দিকে উড়ে গেলো।

যারা পাঁচিলের উপর থেকে ঝুঁকে মুসলমানদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছিলো, তারা উড়ে আসা তীরগুলো দেখতে পায়নি। কেউ দেখতে পেলেও সরে যাবার সুযোগ পায়নি। তীরগুলো এসে কারো কপালে, কারো মাথায়, কারো চোখে বিদ্ধ হতে লাগলো এবং আহত রাজপুতরা আর্তনাদ করে চিৎকার শুরু করলো। কেউ আত্মসংবরণ করতে না পেরে পাঁচিলের উপর থেকে নীচে পড়ে গেলো। অনেকেই পাঁচিলের উপর ছিটকে পড়ে হাউমাউ করে কেঁদে ফেললো, ছটফট করতে লাগলো। কেউ কেউ তীরের আঘাত সহ্য করতে না পেরে ছটফট করতে করতে মৃত্যুর কোলে লুটিয়ে পড়লো।

মুজাহিদরা আবার তীর নিক্ষেপ করে। এবারও বেশকিছু রাজপুত আহত হয়ে নীচে লুটিয়ে পড়ে। যারা পাঁচিলের ছিদ্র দিয়ে মুজাহিদদের পর্যবেক্ষণ করছিলো, তারা চিৎকার করে সতর্ক করতে লাগলো, ভাইয়েরা! মুসলমানরা তীর বর্ষণ শুরু করেছে। কেউ পাঁচিলের উপর দিয়ে উঁকি দেবে না। ঘোষণা শোনামাত্র রাজপুতরা ভয় পেয়ে যায়। কারো আর পাঁচিলের উপর মাথা তোলার সাহস হলো না।

মুজাহিদরা এতে নিরাপত্তা বোধ করে একেবারে পাঁচিলের গোড়ায় পৌঁছার জন্য সামনে অগ্রসর হতে থাকে। সেখানে পৌঁছেই তারা পাঁচিলে দড়ির সিঁড়ি আঁটকাতে লাগলো। বেশকিছু সিঁড়ি পাঁচিলে আটকে গেলো। মুজাহিদরা এবার সিঁড়ি বেয়ে পাঁচিলের উপর উঠতে লাগলো।

মুজাহিদরা একটা বুদ্ধির কাজ করলো। পাঁচিলে উঠার সময় সাথে করে প্রত্যেকে দু'-তিনটি করে সিঁড়ি নিয়ে নিলো। উপরে উঠেই তারা সে সিঁড়িগুলো পাঁচিলে ঝুলিয়ে দিলো।

এভাবে অল্প সময়ে বেশকিছু মুজাহিদ কেল্লার পাঁচিলে উঠতে সক্ষম হলো। যারা উঠে এসেছে, তারা অন্যদের উঠতে সাহায্য করতে লাগলো।

মুজাহিদরা যখন দেখলো, তারা আক্রমণ করার ক্ষমতা রাখে, তখন ঢাল-তলোয়ার হাতে তুলে নিয়ে অগ্রসর হলো। মুজাহিদদের এই অকল্পনীয় সাহসী অভিযান দেখতে পেয়ে রাজপুতরা কিংকর্তব্যবিমঢ় হয়ে গেলো। বিস্ময়ের আতিশয্যে একেবারে থ মেরে রইলো।

মুজাহিদরা তাদের এ অবস্থাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে ক্ষুধার্ত শার্দূলের ন্যায় তীব্রবেগে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

ছুয়ান্ন.

আজ রাজপুতরা অপ্রস্তুত, ভয়াতুর। সংখ্যায় অল্প। রাজপুতদের সালাররা অনেকেই সোমনাথের মহাদেবতার পূজায় অংশগ্রহণ করতে চলে গেছে। রাজা-মহারাজারাও সেখানে গেছেন। তাই সংখ্যায় তারা অল্প। কিন্তু অল্প হলে কী হবে, তারা এখনো মুসলমানদের চে' কয়েক গুণ বেশি। হঠাৎ কেল্লার পাঁচিলে বেশসংখ্যক মুজাহিদকে সিংহগর্জনে এগিয়ে আসতে দেখে তাদের পিলে চমকে ওঠলো।

তারা গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে লাগলো। সেই চিৎকারে কেল্লা কেঁপে ওঠলো। মুজাহিদদের তলোয়ার হস্তে অগ্রসর হতে দেখে রাজপুতরাও তলোয়ার নিয়ে এগিয়ে এলো। উভয় দল হুংকার দিয়ে একে অপরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। রাজপুতরা বিগত দিনের মতো চারদিকে মুজাহিদদের ঘিরে ধরে পাঁচিলের উপর থেকে ফেলে দেয়ার কৌশল অবলম্বন করে আর মুজাহিদরা রাজপুতদের হটিয়ে সামনে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করছে।

একদল আরেক দলের উপর মরণপণ আক্রমণ করলো। ফলে ক্ষণে ক্ষণে আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে রক্তের স্রোত বয়ে চললো। আহত ও নিহত হয়ে অনেকেই মাটিতে লুটিয়ে পড়তে লাগলো।

আজ মুজাহিদরাও একের পর এক পাঁচিলে উঠে আসছে। কারণ, দড়ির সিঁড়ির অভাব নেই। তাই দলে দলে মুজাহিদ লাফিয়ে উঠছে আর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করছে। মুজাহিদদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে যুদ্ধের বিস্তৃতিও বৃদ্ধি পেতে লাগলো আর রাজপুতরা পিছু হটতে লাগলো।

অত্যন্ত ভয়াবহ যুদ্ধ। রক্তক্ষয়ী এ যুদ্ধের যেনো কোনো তুলনা চলে না। রাজপুতরা কিছুতেই পিছু হটতে প্রস্তুত নয়। আর মুসলমানরা তাদের পিছু হটিয়ে সামনে অগ্রসর হতে বদ্ধপরিকর। এতোক্ষণ পর্যন্ত পাঁচিলের উপর মুজাহিদদের কোনো সালার পৌছেনি। নীচে থেকেই তারা মুজাহিদদের পরিচালনা করছিলো। কিন্তু ইতোমধ্যে বেশ কয়েকজন সালার পাঁচিলের উপর উঠে এসেছেন। তাদের পেয়ে মুজাহিদের উদ্যমতা তীব্র আকার ধারণ করলো। তাকবীর ধ্বনি দিতে দিতে তারা রাজপুতদের উপর এমন আক্রমণ করলো যে, রাজপুতরা পিছু হটতে হটতে একেবারে পাঁচিলের দেয়ালের সাথে গিয়ে ঠেকলো।

কিন্তু রাজপুতরাও কম নয়। তারাও মহাদেবেতার জয়ধ্বনি দিতে দিতে মারমুখি হয়ে রুখে দাঁড়ায়। প্রচণ্ড আক্রমণ করে বেশকিছু মুজাহিদকে ধরাশায়ী করে তাদের পিছু হটিয়ে দেয়।

মুজাহিদরা তাঁদের প্রতিহত করার আপ্রাণ চেষ্টা করলেও রাজপুতদের দুর্দমনীয় মনোভাবের সামনে তারা টিকে থাকতে পারলো না। ক্রমেই পিছু

হটতে লাগলো। পিছু হটতে হটতে বেশকিছু মুজাহিদ শহীদ হয়ে গেলো। অনেকে আহত হলো।

কিন্তু দ্রুত এ আহত ও শহীদ মুজাহিদদের স্থানে আরো নতুন মুজাহিদ এসে যোগ দিলো। তারা প্রাণপ্রাচুর্যে পরিপূর্ণ। শাহাদাতের স্পৃহায় তারা ব্যাঘ্র। তাদের পেয়ে মুজাহিদদের মাঝে আবার প্রাণশক্তি ফিরে এলো। তাকবীর দিতে দিতে তারা আবার রুখে দাঁড়ালো। তাকবীরে প্রচণ্ডতায় কেঁপে ওঠলো কেল্লার পাঁচিল। কেঁপে ওঠে রাজপুতদের অন্তরাত্মা। তারা থমকে দাঁড়াতেই মুজাহিদরা দুর্বার বেগে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বহু আহত রাজপুতকে তারা রণাঙ্গনে ফেলে পিছু হটতে থাকে। মুজাহিদরা তাদের নিঃশেষ করে দেয়। মুজাহিদদের তরবারীর আঘাতে বহু রাজপুত প্রাণ হারায়।

এভাবে আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণ, ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া চলতে থাকে। প্রতিবারই প্রচুর পরিমাণ রাজপুত নিহত হতে লাগলো। অবশেষে রাজপুতরা ভয় পেয়ে যায়। তারা চারদিকে অন্ধকার দেখতে পায়। বিজয়ের কোনো চিহ্নই তাদের সামনে পরিস্ফুটিত নয়। তাদের এতোদিনের সকল চেষ্টা-মেহনত নিষ্ফল গেছে। কয়েকজন রাজপুত কেল্লার পাঁচিল থেকে নেমে দৌড়ে মন্দিরের দিকে গেলো। সবাইকে সংবাদ জানানোর জন্য ছুটে গেলো।

এদিকে সিপাহসালার আলতুনতাশ ও আমীর আলীও পাঁচিলের উপর এসে উপস্থিত হলেন। তাদের দেখে মুজহিদদের শিরা-উপশিরায় উদ্যমতার বিদ্যুৎ তরঙ্গ বয়ে গেলো। চোখগুলো আনন্দে চক চক করে ওঠলো। মুজাহিদরা এবার তাকবীর ধ্বনি দিয়ে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে বীর বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ে রাজপুতদের উপর। সিপাহসালার আলতুনতাশ ও আমীর আলীও ঝাঁপিয়ে পড়েন। এবার নতুন মাত্রায় আক্রমণ শুরু হয়।

রাজপুতরা এ আক্রমণ প্রতিহত করতে অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগলো। শুধু প্রতিহতই নয়, বরং অগ্রসর হয়ে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগলো। কিন্তু মুজাহিদরা এবার যেনো অতীন্দ্রিয় শক্তিতে বলবান হয়ে যুদ্ধ করে যাচ্ছে। রাজপুতদের একেকটি ব্যূহ ভেদ করে অনায়াসে আরেকটি ব্যূহের উপর সিংহের ন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়ছে। এবারের যুদ্ধে বেশকিছু রাজপুত সালার ও খ্যাতিমান যোদ্ধা নিহত হলো।

সুলতান মাহমুদ গজনবীও ধীরে ধীরে কেল্লার দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। তাঁর অধীন বাহিনীর বিশেষ যোদ্ধারা দূর থেকে দেখছে, মুজাহিদরা অত্যন্ত উদ্যমতার সাথে কেল্লার পাঁচিলের উপর উঠছে আর রাজপুতদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। তবে তারা যুদ্ধের ভেতরের দৃশ্য কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। তবে তরবারী আর খড়গের আঘাতের তীব্র আওয়াজ ও ডাক-চিৎকার শুনছে আর উদ্বেলিত হচ্ছে।

অশ্বারোহী যোদ্ধারা, সালার-সিপাহসালারগণ এবং স্বয়ং সুলতানও এ দৃশ্য দেখে উদ্বেলিত হচ্ছেন। মন দেহ ফেলে উড়ে যেতে চাচ্ছে। পাঁচিলে উঠে রাজপুতদের যুদ্ধের স্বাদ মিটিয়ে দিতে চাচ্ছেন। কিন্তু পাঁচিল তো এখনো অনেক দূরে। সামনে রয়েছে মুজাহিদদের বিরাট সারি।

যেসব মুজাহিদ পাঁচিলের নীচ থেকে উপরে উঠে আসছে, তারা নীচ থেকে আরো দ্রুত আসার ইঙ্গিত করে যুদ্ধের জন্য লাফিয়ে পড়ছে। নীচ থেকে মুজাহিদরা দ্রুত দড়ির সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে। এভাবে প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর রাজপুতদের রক্তের নেশায় পাগলপারা মুজাহিদদের আক্রমণ অব্যাহত রইলো। যুদ্ধের পরিস্থিতি ক্রমেই তীব্র থেকে তীব্রতর হতে লাগলো।

রাজপুতরা পাঁচিলের প্রতিটি পথে মুসলমানদের প্রতিহত করে চললো। আর মুজাহিদরা বীরবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো।

কয়েক ঘন্টার যুদ্ধে প্রচুর রাজপুত নিহত হলো। স্থানে স্থানে রাজপুতদের লাশ পড়ে আছে। রক্তের স্রোত বয়ে চলছে চারদিকে। রক্তে রক্তে পথ পিচ্ছিল হয়ে গেছে।

যুদ্ধের এ ধারা তীব্র আকার ধারণ করেছে। ঠিক এমন সময় হঠাৎ শোর ওঠলো, সুলতান এসে পড়েছেন, সুলতান এসে পড়েছেন। আওয়াজটা মন্ত্রের মতো মুজাহিদদের শরীরে আগুন ধরিয়ে দিলো। তাকবীরের পর তাকবীর ধ্বনি উঠতে লাগলো। কেল্লার পাঁচিলে পাঁচিলে এ আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হলো। ভয়ে থর থর করে কেঁপে উঠলো রাজপুতদের অন্তরাত্মা। আতংকে তাদের চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। মুহূর্তে তাদের মনোবল ভেঙে পড়লো। যে যেভাবে পারলো ছুটে পালাতে লাগলো। তারা উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাচ্ছে। কেউ কারো দিকে ফিরে তাকাচ্ছে না।

মুজাহিদরা তাদের ধাওয়া করে নিয়ে যাচ্ছে আর পেছন থেকে আক্রমণ করে ধরাশায়ী করছে। রাজপুতরা পাঁচিল থেকে ছুটে পালিয়ে নীচে নমে এলো। মুজাহিদরাও তাদের পিছু পিছু নীচে নেমে এলো। চারদিকে চলছে খণ্ড খণ্ড যুদ্ধ।

কিছু দূরদর্শী মুজাহিদ একত্রে ছুটে গেলো ফটকের দিকে। তারা ফটকের রক্ষীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। প্রায় পাঁচ শতাধিক রক্ষী সেখানে নিয়োজিত। তারাও মুজাহিদদের উপর পাল্টা আক্রমণ করলো। মুজাহিদরা মনে-প্রাণে চাচ্ছে, যে করেই হোক রক্ষীদের পিছু হটিয়ে ফটকের নিকট পৌঁছতেই হবে। তাই মরণপণ আক্রমণ চালালো। ফটকের সামনে তীব্র যুদ্ধ হচ্ছে। তলোয়ারের ঘর্ষণ আর যোদ্ধাদের গর্জনে এক ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে।

হঠাৎ সিপাহসালার আলতুনতাশ একদল দুর্ধর্ষ মুজাহিদ নিয়ে সেখানে উপস্থিত হন। তারা এসেই প্রচণ্ড আক্রমণ করলো। রাজপুতদের ঘিরে ফেলে চারদিকে থেকে মারতে শুরু করলো। অধিকাংশ রাজপুত মৃত্যুবরণ করলে

অবশিষ্টরা পালাতে শুরু করে। মুজাহিদরা আর দেরি করলো না। অগ্রসর হয়ে ফটক খুলে দিলো।

উন্মুক্ত হয়ে গেলো সোমনাথ কেল্লার প্রাচীর ফটক। মুজাহিদরা এর অপেক্ষায় বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলো। সশস্ত্র অবস্থা। একেবারে মৃত্যুর পরোয়ানা হাতে নিয়ে। ফটক উন্মুক্ত হতেই মুজাহিদদের স্রোতধারা ছুটে চললো কেল্লার ভেতরে। অশ্বারোহী মুজাহিদরা ছুটে ছুটে রাজপুতদের হত্যা করতে লাগলো।

পঞ্চান্ন.

পূজানুষ্ঠান এই মাত্র শেষ হয়েছে। সবার চোখে-মুখে লেপ্টে আছে স্বর্গীয় আমেজ। মনে তাদের বিশ্বাস জন্মেছে, নিশ্চয়ই আজ তাদের প্রতি সোমনাথ মাহদেবের শুভাশীষ বর্ষিত হয়েছে। এবার তারা ম্লেচ্ছ মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিজয়ী হবেই হবে। ঠিক তখন মন্দিরের ফটকে হন্তদন্ত হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বেশ ক'জন সৈন্য গিয়ে পৌঁছলো। চোখে-মুখে ভীতির ছাপ। জন-জোয়ারের মাঝ দিয়ে দৌড়ে তারা মহারাজার সম্মুখে গিয়ে উপস্থিত হলো এবং কেল্লায় যা ঘটেছে, মহারাজার কাছে বর্ণনা করলো।

মহারাজা অত্যন্ত বিষন্ন ও ব্যথিত হলেন। তার চেহারা যেনো রক্তশূন্য হয়ে গেলো। তার আশপাশে যেসব রাজা ছিলেন, তাদের মাঝে আতংক ছড়িয়ে পড়লো। মহারাজা দৃষ্টি তুলে চারদিকে তাকালেন। মন্দিরজুড়ে শুধু মানুষ আর মানুষ। গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে আছে। সবার দৃষ্টি মহারাজার দিকে। তারা মহারাজা থেকে কিছু শুনতে চায়। কিছু দিক-নির্দেশনা পেতে চায়। তারপর মহারাজার বজ্রকঠিন কণ্ঠস্বর ইথারের বুকে প্রচণ্ড তরঙ্গ সৃষ্টি করে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে–

'আমার ভাইয়েরা! আমরা আজ এক কঠিন সময়ের মুখোমুখি। আজকেই আমাদের ফয়সালা করতে হবে, আমরা কি ইজ্জত ও মর্যাদার জীবনযাপন করবো, নাকি গোলামীর শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে লাঞ্ছনার জিন্দেগী যাপন করবো। এই মাত্র শুনতে পেলাম, ঐ ম্লেচ্ছরা আমাদের কেল্লায় আক্রমণ করেছে। তাদের বেশকিছু সৈন্য পাঁচিলের উপর উঠে পড়েছে। আমার মনে হচ্ছে, আজই যুদ্ধ শেষ পরিণতিতে গিয়ে পৌঁছবে।

আমার ভাইয়েরা! আজ দুশমনের মোকাবেলা করতে এবং হানাদারদের চরমভাবে শায়েস্তা করতে সোমনাথ মহাদেব আমাদের তাজা খুন চাইছেন। আপনারা কি পারবেন মহাদেবতার সেই আরজু পূরণ করতে?'

গগনবিদারী চিৎকার ধ্বনি ওঠলো, আমরা প্রস্তুত। আমরা প্রস্তুত। আমাদের হুকুম দিন। আমরা হুকুমের অপেক্ষায় আছি।

মহারাজার গুরুগম্ভীর কণ্ঠ আবার শোনা গেলো। বললেন–

'সোমনাথের প্রত্যেক যুবককে আজ যুদ্ধের আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। কমপক্ষে একজন ম্লেচ্ছকে হত্যা করে তবে মরতে হবে। আমরা আজ ম্লেচ্ছদের রক্তে সোমনাথ ধুয়ে-মুছে পাক করব। আজ সন্ধ্যার আগেই আমরা বিজয় পতাকা নিয়ে আবার মহাদেবতার নিকট ফিরে আসবো। এখনই আমরা এখান থেকে রণাঙ্গনে রওনা হবো। কেউ এদিক-সেদিক যাবে না। সোমনাথ মহাদেবতার জয় হোক! সোমনাথবাসীর জয় হোক!'

মহারাজার বক্তব্য সবার শিরা-উপশিরায় আগুন ধরিয়ে দেয়। যুদ্ধযাত্রার নেশায় সবাই ফেটে পড়ে। রাগ, ক্রোধ আর হিংসায় একেকজন যেনো ক্ষুধার্ত নেকড়ে। পূজায় উপস্থিত রাজপুতরা মহারাজার নির্দেশে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। প্রত্যেক রাজা তাদের অধীন সৈন্যদের নিয়ে এসে সারিতে দাঁড়ালো। তাদের পেছনে অস্ত্রসজ্জিত হয়ে দাঁড়ায় সাধারণ জনতা।

মন্দিরের গুদামে বেশকিছু অস্ত্র রক্ষিত ছিলো। মহাপূজারীর নির্দেশে সেসব জনগণের মাঝে বিতরণ করা হলো। সোমনাথ মন্দিরের প্রান্তর থেকে এক বিশাল বাহিনী রওনা হলো। সবার আগে রয়েছে মহারাজা ও অন্যান্য রাজাগণ। এ বিশাল বাহিনী সোমনাথ শহর অতিক্রম করে যখন কেল্লার অদূরে পৌঁছলো, তখন দেখলো, মুসলমান যোদ্ধারা খোলা ফটক দিয়ে কেল্লায় প্রবেশ করছে।

এ অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখে রাজপুতরা বিস্ময়তার প্রান্ত দেশে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগলো। মহারাজা এমন আঘাত পেলেন যে, তার দু'চোখ দিয়ে টপ টপ করে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগলো।

কিন্তু মুহূর্তেই আত্মনিয়ন্ত্রণ করে কর্তব্য স্থির করে ফেললেন। রেশমি রোমাল দিয়ে মুখ মুছে সুউচ্চ কণ্ঠে বললেন, হে রাজপুতরা! আজ তোমাদের বীরত্বের পরীক্ষা হবে। দেশ ও জাতির জন্য আজ তোমাদের লড়তে ও মরতে হবে। এছাড়া আর কোনো পথ নেই। যদি সামান্যতম ভীরুতা আজ তোমাদের স্পর্শ করে, তাহলে মুসলমানরা তোমাদের কচুকাটা করবে। তোমাদের বাড়িঘর ধন-সম্পদ ছিনিয়ে নেবে আর তোমাদের মা-বোনদের দাসি ও ছেলেদের দাস বানাবে। চির লাঞ্ছনার জিন্দেগি শুরু হবে।

এছাড়া তোমরা জানো, এই ম্লেচ্ছরা আমাদের দেব-দেবীদের শত্রু। তারা প্রথমেই আমাদের মন্দিরগুলো ভেঙে গুড়িয়ে দেবে আর দেব-দেবীদের ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। এ হৃদয়বিদারক অবস্থা দেখার পূর্বে নিজেরা মরে যাওয়া বা ম্লেচ্ছদের মেরে ফেলাই শ্রেয়। মহাদেবতা সোমনাথজী তোমাদের অবলোকন করছেন। তোমরাও সবেমাত্র তার পূজা শেষ করেছো। নিশ্চয়ই তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন।

সবাই সমস্বরে বললো, মহাদেবতা সোমনাথজ্বীর জয় হোক।

রাজপুতরা বীরদর্পে সামনে এগিয়ে চললো।

সবেমাত্র কিছু মুজাহিদ কেল্লায় প্রবেশ করেছে। অধিকাংশ মুজাহিদ এখনো কেল্লার বাইরে। মুজাহিদরা যখন হিন্দুদের এ বিশাল বাহিনীকে দেখতে পেলো, তখন কেল্লায় প্রবেশ না করে এদিকে এগিয়ে এলো। সুলতানও তার বাহিনী নিয়ে এদিকেই এগিয়ে এলেন। রাজপুতরা মুজাহিদ বাহিনীকে এগিয়ে আসতে দেখে ব্যূহ রচনা করে দাঁড়াতে লাগলো। কিন্তু মুজাহিদরা তাদের ব্যূহ রচনা করার কোনো অবকাশ দিলো না। ছুটে গিয়ে প্রচণ্ডবেগে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

রাজপুতদের হৃদয়ে জিঘাংসার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছিলো। তারাও উন্মুক্ত তরবারী হাতে বীর বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়লো। কোনো দল সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানোর সুযোগ পেলো না। তাই দ্রুত ব্যূহ ভেদ করে মুজাহিদরা রাজপুতদের মাঝে আর রাজপুতরা মুজাহিদদের মাঝে ঢুকে পড়ে। শুরু হলো মরণপণ যুদ্ধ। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। যুদ্ধের আগুন দ্রুত চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। মানুষের রক্তের হোলিখেলা শুরু হয়ে যায়। তলোয়ারের আঘাতে আঘাতে মানুষের মুণ্ডু ছিন্ন হয়ে ছিটকে পড়তে থাকে। ঝড়ে উপড়ে পড়া বৃক্ষের ন্যায় দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়তে লাগলো। চারদিকে রক্তের নদী বয়ে চলছে।

রাজপুতরা মুজাহিদদের পিষ্ট করতে চাচ্ছে আর মুজাহিদরা রাজপুতদের ধরাশায়ী করতে চাচ্ছে। মৃত্যুর পরোয়ানা যেনো সবার মাথার উপর ঘুরপাক খাচ্ছে। যে কেউ বিন্দুমাত্র অসতর্কতায় লুটিয়ে পড়ছে মৃত্যুর কোলে। মস্তক দ্বিখণ্ডিত হচ্ছে, কাঁধ থেকে বুক পর্যন্ত দু'ভাগ হয়ে যাচ্ছে, মস্তক সিটকে পড়ছে। আর্তনাদ, আহাজারি, চিৎকার আর গোঙ্গানীতে আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে এলো। উভয় দলের যোদ্ধারা যতোই মরছে, ততোই যুদ্ধ তীব্র আকার ধারণ করছে।

মুজাহিদরা সংখ্যায় কম হলেও অত্যন্ত বীরত্বের সাথে সচকিত হয়ে যুদ্ধ করছে। প্রত্যেক মুজাহিদের হাতে যেনো আজ গায়েবী শক্তি। রাজপুতরা তা দেখে বিস্মিত হচ্ছে। একেকজন মুজাহিদ একসাথে দশ-পনেরজন রাজপুতদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে আর একের পর এক ধরাশায়ী করে আরেকজনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

সুলতান মাহমুদ গজনবী যেনো আজ যৌবনের সেই বীরত্ব ফিরে পেয়েছেন। ফিরে পেয়েছেন যৌবনের মনোবল আর সাহসিকতা। তিনিও তরবারী হাতে ময়দানে নেমে এসেছেন। তার সাথে রয়েছে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নিজস্ব বাহিনী, যাদের দেখলেই পিলে চমকে যায়। হাত-পা শক্তি হারিয়ে অবশ হয়ে যায়। চিন্তাশক্তি লোপ পেয়ে যায়।

সুলতান যেদিকেই রাজপুতদের শক্তিমত্তা ও প্রভাব দেখছেন, সেদিকেই তার বাহিনী নিয়ে ছুটে যাচ্ছেন আর সারির পর সারি রাজপুতদের ধ্বংস করে সামনে এগিয়ে যাচ্ছেন। সুলতান ও তার বাহিনী যেনো রাজপুতদের হত্যায় পাগল হয়ে গেছেন। তলোয়ারের আঘাতে আঘাতে তাদের কচুকাটা করতে লাগলেন।

সুলতান ও তার বাহিনীর শক্তিমত্তা ও দাপট দেখে অন্যান্য মুজাহিদদের হৃদয়ে শক্তির জোয়ার বয়ে যায়। তারাও দ্বিগুণ শক্তিতে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকে। একেকজন মুজাহিদ দশ-পনেরজন রাজপুতকে হত্যা করে তারপর শাহাদতবরণ করছেন।

এ সবকিছু সত্ত্বেও কোনো পক্ষের যোদ্ধাদের মনোবল ভেঙে পড়ার কোনো আলামত পরিলক্ষিত হলো না। নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে বীরবিক্রমে উভয় দল যুদ্ধ করে যাচ্ছে আর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। যুদ্ধ তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। মানুষের লাশে লাশে চারদিক ভরে গেছে। রক্তের বন্যা বয়ে গেছে। ঘোড়ার হ্রেষারব, আহত মানুষের গোঙ্গানী, চিৎকার আর হুংকারে যেনো মহাপ্রলয় নেমে এসেছে।

এমনিভাবে দ্বিপ্রহর পেরিয়ে গেছে অনেক আগে। যুদ্ধের ভয়াবহতার মাত্রা যেনো বেড়েই চলছে। ঠিক তখন কেল্লার দিক থেকে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তাকবীর ধ্বনি ওঠলো। সিপাহসালার আলতুনতাশ ও আমীর আলীর নেতৃত্বে ধূলিঝড় উড়িয়ে আসছে বিশাল বাহিনী। তাদের তাকবীর ধ্বনি প্রতিধ্বনিতে থর থর করে কাঁপছে রণাঙ্গন। এদিকে লড়াইরত মুজাহিদরাও তাদের তাকবীর ধ্বনি শুনে পাল্টা তাকবীর ধ্বনি দিলো। ফলে তাকবীর ধ্বনি আর প্রতিধ্বনিতে গোটা রণাঙ্গন জুড়ে এক ভয়াবহ অবস্থা সৃষ্টি হলো। পিলে চমকে ওঠলো রাজপুতদের। ভয়ভীতি আর আতংকে চুপসে গেলো তাদের অন্তর। হৃদয়ের সাহসিকতা উবে গিয়ে সেখানে ভীরুতা এসে তোলপাড় শুরু করলো। হাতের তরবারী আর যেনো উত্থিত হতে চায় না। ভয়াতুর অন্তরে ইতিউতি এদিকে-সেদিক তাকাতে লাগলো। তারপরই এলো আত্মরক্ষার চিন্তা। তারপরই দে ছুট। কে কার আগে রণাঙ্গন ছেড়ে ছুটে পালাবে এবার তার প্রতিযোগিতা শুরু হলো।

মুজাহিদরাও তাদের ছেড়ে দিতে চাইলো না। পশ্চাদ্ধাবন করে তাদের হত্যা করতে লাগলো। সূর্য অস্তমিত হওয়া পর্যন্ত এভাবে তাদের হত্যা করে চললো।

পশ্চিমাকাশে ক্লান্ত সূর্য তখন ডুবি ডুবি করছে। আকাশজুড়ে লালিমার ছড়াছড়ি। সূর্য অস্তমিত হয়ে গেলো। মুজাহিদরা ফিরে এলো সোমনাথ কেল্লার অভ্যন্তরে। যে কেল্লাকে পদানত করা ছিলো স্বপ্নের ব্যাপার, আল্লাহর মদদে সহজেই তা পদানত হলো। মহারাজাকে সহায়তা করতে ভারতের দূর-দূরান্তের রাজারা স্বসৈন্যে এসেছিলেন। সোমনাথ রাজ্যে গড়ে তুলেছিলো অপরাজেয় এক শক্তি। আজ তারা পরাজিত হলো। তাই মুজাহিদ বাহিনী আজ আল্লাহর দরবারে বিনীত, কৃতজ্ঞ।

ছাপ্পান্ন.

চারদিকে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছে। শিকদেব মহারাজার পাশে নীরবে দাঁড়িয়ে যুদ্ধের পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে। মহারাজার দৃষ্টি লেগে আছে রণাঙ্গনে। বিভিন্ন অঞ্চলের যেসব রাজা সোমনাথ এসেছেন, তারা একের পর এক যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন। যুদ্ধের প্রচন্ডতায় রাজপুত ও স্বেচ্চাসেবী যোদ্ধারা একের পর এক লুটিয়ে পড়ছে। ছটফট করতে করতে চিরস্থির হয়ে যাচ্ছে। রাজারাও যুদ্ধের লেলিহান অগ্নিতে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন। তারাও যুদ্ধ করতে করতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ছেন। কোনো কোনো রাজা ভয়ে পালিয়ে গভীর বনে আশ্রয় নিয়েছেন। কেউ আবার ঘোড়া ছুটিয়ে কোথায় পালিয়ে গেছেন কেউ বলতে পারছে না।

অবস্থার ভয়াবহতা উপলব্ধি করতে পেরে রাজপুতরা থমকে দাঁড়ালো। তারপরই পালাতে শুরু করলো। মহারাজা দূরে দাঁড়িয়ে সব কিছু দেখছেন। ভয়-ভীতি-আক্ষেপ আর বিবেকের দংশনে তার চেহারা মলিন হয়ে আছে। শিকদেবকে বললেন, শিকদেব! ভাগ্যতারকা অস্তমিত হয়ে গেছে। সোমনাথ কেল্লা আমাদের হস্তচ্যুত হয়ে যাচ্ছে। রাজপুতরা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। হয়তো কিছুক্ষণ পরই কিংবা সকাল নাগাদ মুসলমানরা সোমনাথ শহর ও মন্দির দখল করে নেবে। এ পরাজয় আমার হৃদয় সহ্য করতে পারছে না। আমি আজ এমন কলঙ্কের তিলক ধারণ করলাম, যা যুগ যুগান্তরে মানুষ স্মরণ করবে আর ধিক্কার দেবে। তাই এখন আর এ জীবনের কোনো মূল্য নেই।

শিকদেব-এর দৃষ্টি মহারাজার চোখে-মুখে নিবদ্ধ। বললো, তাহলে... তাহলে কি মহারাজা আত্মদাহ করে জীবন লীলার পরিসমাপ্তি ঘটাতে চান?

মহারাজা দীর্ঘশ্বাস নিয়ে বললেন, আমি কী করবো বলতে পারছি না। তবে আমার জীবন নিরর্থক হয়ে গেছে। আহ্ আমি জীবনে কতো বড় ভুলই না করেছি! রাজপুতদের সংখ্যাধিক্য, বীরত্ব, আত্মমর্যাদাবোধ ইত্যাদির উপর ভরসা করে সন্ধির সকল আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেছি। হায়... হায়... যদি আমি চন্দ্রামুখীকে সমর্পণ করে দিতাম...! কিন্তু... কিন্তু এখন তো সে কথা বলে কোনো লাভ নেই। তাহলে এখন কোথায় যাবো!

শিকদেব-এর কণ্ঠ ভারাক্রান্ত। বললো, মহারাজার জানা আছে, কেল্লায় আমার বোন কামিনীও আছে।

মহারাজা বললেন, হ্যাঁ, তা আমার জানা আছে। আর আমি জানি, তুমি তাকে কেল্লার বাইরে নিয়ে যেতে আপ্রাণ চেষ্টা করবে। আর হ্যাঁ, কেল্লায় তো মহারাণীও রয়েছে। ঈশ্বর জানেন, তার কী হবে! সে যদি মুসলমানদের হাতে বন্দি হয়! মহারাজার দু'চোখ দিয়ে অশ্রুর ধারা গড়িয়ে পড়তে লাগলো। তারপর ভাঙা ভাঙা কণ্ঠে বললো, শোনো, শিকদেব! তুমি আমাকে প্রতিশ্রুতি দাও। কামিনীর মতো তুমি মহারাণীকেও হেফাজত করবে।

শিকদেব বললো, আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। কিন্তু... আপনি কেনো আমার সাথে কেল্লায় ফিরে যাবেন না?

মহারাজার কণ্ঠে দুঃখের দরিয়া। বললেন, শিকদেব! যদি আমি যাই আর মুসলমানরা আমাকে গ্রেফতার করতে পারে, তাহলে আমার দুর্নামের সীমা থাকবে না। আমি ইতিহাসের পাতায় চির কলঙ্কিত হয়ে থাকবো। তুমিই যাও, তাদের দু'জনকে উদ্ধার করে কেল্লার বাইরে নিয়ে আসো। অন্যান্য আরো যেসব মহিলা আছে, তাদেরও পারলে উদ্ধার করে নিয়ে আসো।

শিকদেব বললো, মহারাজা! আপনি চিন্তা করবেন না। আমি অবশ্যই চেষ্টা করবো।

মহারাজা বললেন, তাড়াতাড়ি যাও! মহাদেবতা সোমনাথজী তোমাকে সহায়তা করবেন।

একথা বলেই মহারাজা অশ্ব ঘুরিয়ে ছুটতে লাগলেন। শহরের দিকে কিছুটা এসে বনের দিকে ছুটে চললেন। শিকদেব বিস্ময়ে স্থানুর মতো স্থির দাঁড়িয়ে রইলো। তার দৃষ্টি মহারাজার গতির দিকে লেগে আছে। মহারাজা যখন শিকদেব-এর দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেলো, তখন অস্ফুট কণ্ঠে স্বগতোক্তি করে বললো, হায়রে সোমনাথ! তোর বদনসীব। মহারাজা আজ তোকে ছেড়ে গহিন বনে আশ্রয় নিতে যাচ্ছেন। কী বিস্ময়কর কথা! যার সামনে সবাই নতশিরে দাঁড়াতো, যার শক্তির প্রচন্ডতায় সবাই থর থর করে কাঁপতো, আজ তিনি অসহায়, নিঃসঙ্গ। একাকি গহিন বনে আশ্রয়ের জন্য যাচ্ছেন। ...কিন্তু আমি কেনো এসব প্রলাপ বকছি। এখনই তো আমার সুবর্ণ সুযোগ। জীবনের চরম ও পরম উদ্দেশ্য এখনই অর্জন করতে হবে।

মুসলমানরা এখনো রাজপুতদের পশ্চাদ্ধাবন করছে। এখনো তারা গোটা কেল্লা দখল করে নেয়নি। এখনই সুবর্ণ সুযোগ। এরই মাঝে আমি কামিনী ও অন্যান্যদের কেল্লা থেকে বের করে নিয়ে আসবো। হতে পারে, রাজকুমারী চন্দ্রামখীকেও পেয়ে যাবো।... যদি পেয়েই যাই, তাহলে তো আমার ভাগ্যই পাল্টে যাবে।

শিকদেব আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না। দ্রুত কেল্লার দিকে রওনা দিলো। সূর্য পশ্চিমাকাশে আত্মগোপন করছে। চারদিকে অন্ধকার নেমে এসেছে। মুসলমান মুজাহিদরা তখনো রাজপুতদের ধাওয়া করছে আর পথে পথে হত্যা করছে।

শিকদেব খুব সহজেই কেল্লায় এসে প্রবেশ করলো। কোনো মুসলমান মুজাহিদ তার সম্মুখে পড়লো না। সে কেল্লায় প্রবেশ করেই হতবাক্ হয়ে গেলো। গতকালও সে কেল্লার অলিতে-গলিতে শত শত রাজপুত যোদ্ধা সশস্ত্র অবস্থায় ঘোরাফেরা করতে দেখেছিলো। জায়গায় জায়গায় সমবেত হয়ে তারা

গল্পগুজব আর আড্ডা জমাতো। জীবন যুদ্ধের উত্তেজনায় যেখানে সর্বদা টানটান অবস্থা বিরাজ করতো, আজ সেখানে জনমানবের কোনো চিহ্ন নেই। চারদিক ভয়াতুর অবস্থা। নীরব-নিস্তব্ধ পরিবেশ। আলোর কোনো চিহ্ন নেই। রাজপুতদের কোনো পাত্তা নেই।

রাজপ্রাসাদে গিয়ে দেখলো, তা যেনো এক মায়াপুরী। রূপসী সুন্দরী যুবতীদের কলহাস্যে যে স্থান সর্বদা জীবন্ত-প্রাণবন্ত হয়ে থাকতো, তা যেনো আজ মৃত্যুপুরী।

রাত হয়ে গেছে। চারদিক অন্ধকার। কিছুই দেখা যায় না। হাতড়ে হাতড়ে শিকদেব তার কামরায় গিয়ে পৌঁছলো। তারপর অনেক কষ্ট করে একটি মশাল খুঁজে পেলো। তাতে আগুন ধরালো। কামরায় কামরায় দাসীদের খুঁজতে লাগলো। কিন্তু কারো কোনো পাত্তা পেলো না। মাঝে-মাঝে ভয়ে তার শরীর কেঁপে ওঠতে লাগলো। কিন্তু সে কিছুতেই পিছু হটতে রাজি নয়। মশাল হাতে নিয়ে কামরার পর কামরায় তালাশ করতে লাগলো। কোথায় রয়েছে তার বোন কামিনী। কোথায় আছেন মহারাণী। কোথায় রয়েছে দাসীরা।

হঠাৎ শিকদেব তার পশ্চাতে কার যেনো পদবিক্ষেপের ক্ষীণ আওয়াজ শুনতে পেলো। সাথে সাথে পশ্চাতে ফিরে দেখে শোবাদেবী দাঁড়িয়ে আছে। শিকদেব নমস্কার করে পদধূলি নিলো। বললো, মাতাজ্বী, আপনি এখানে!

শোবাদেবীর কণ্ঠ স্থির। বললো, হ্যাঁ, আমি এসেছি। আচ্ছা, শিকদেব! চন্দ্রামুখী কোথায়?

ঃ আমি বলতে পারবো না।

ঃ কিন্তু– কিন্তু তুমিই তো তাকে রাতের অন্ধকারে নিয়ে লুকিয়ে রেখেছিলে।

ঃ আপনি যেহেতু সব কথাই জানতে পারেন আর আপনার সামনে মিথ্যা বলে আমি কিছুতেই মুক্তি পাবো না, তাই আমি স্বীকার করছি, আমিই চন্দ্রামুখীকে নিয়ে ভূগর্ভস্থ প্রকোষ্ঠে লুকিয়ে রেখেছিলাম। কিন্তু সে সেখান থেকে উধাও হয়ে গেছে। আমি তাকে খুঁজছি; কিন্তু পাচ্ছি না।

শোবাদেবী বললো, হ্যাঁ, এ কথা আমি জানি। আর এটাও জানি যে, চন্দ্রামুখী এখনো ভূগর্ভস্থ প্রাসাদেরই কোনো প্রকোষ্ঠে আছে।

ঃ তাহলে আসুন তাকে খুঁজে বের করি।

ঃ কিন্তু এখন তো আরো কয়েকজনকে খোঁজা দরকার।

ঃ আপনি বোধহয় মহারাণী, কামিনী ও অন্যান্যদের কথা বলছেন।

ঃ হ্যাঁ, তুমি কি জানো তারা কোথায়?

ঃ না, জানি না।

ঃ তাহলে এসো। আমি তোমাকে তাদের সন্ধান দিচ্ছি।

শোবাদেবী চলতে লাগলো। শিকদেব তাকে অনুসরণ করে এগিয়ে যাচ্ছে। তারা কয়েকটি নীরব-নিস্তব্ধ কামরা অতিক্রম করে একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন ছোট কামরায় গিয়ে পৌঁছলো। এখানে কামিনী লুকিয়ে আছে। ভয়ে তার চোহারা ফ্যাকাশে হয়ে আছে। শিকদেবকে দেখেই সে ভাইয়া! বলে অস্ফুট কণ্ঠে চীৎকার করে ছুটে এলো। হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, এই তো কিছুক্ষণ আগে মোহন সিংকে দেখেছি। সে মশালের আলোতে কাকে যেনো খুঁজছে। মাতাজী আমাকে এখানে লুকিয়ে রেখে গিয়েছিলেন। আমি তো মোহন সিংকে দেখে ভয়ে ঘাবড়ে গিয়েছিলাম।

শিকদেও বললো, নিশ্চয় সে তোকেই খুঁজে ফিরছে। কিন্তু এখন আর চিন্তা করতে হবে না। আমার উপস্থিতিতে সে তোর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। কিন্তু কামিনী, তুই কি মহারাণীকে দেখেছিস্?

কামিনী বললো, না, আমি তাকে দেখিনি। কোনো দাসী বা রাজকুমারীর কোনো সঙ্গীনী কাউকে দেখেনি। হয়তো তারা কেল্লা থেকে বেরিয়ে কোথাও পালিয়ে গেছে।

ঃ না, তাদের কেউ কোথাও পালায়নি। তারা রাজপ্রাসাদেই কোথাও না কোথাও লুকিয়ে আছে। চলো তাদের খুঁজে বের করি।

ঃ চলুন। কিন্তু মুসলমানরা যদি রাজপ্রাসাদে এসে পৌঁছে, তাহলে বাঁচার কী উপায় হবে?

ঃ আমি খুব ভালো করে জানি, মুসলমান কখনো কোনো নারীর সাথে অসদাচরণ করে না। তারা নারীদের যথেষ্ট সম্মান করে। তাদের ইজ্জতের হেফাজত করে। কিন্তু এখন... এখন আলোচনা করে লাভ নেই। হয়তো আমরা মুসলমানদের কেল্লায় আসার আগেই সবাইকে খুঁজে বের করে পালিয়ে যেতে সক্ষম হবো।

ঃ তাহলে চলুন। দ্রুত চলুন।

তিনজনই চলতে লাগলো। তারা একেকটি কামরা তন্ন তন্ন করে খুঁজে সামনে অগ্রসর হতে লাগলো। এভাবে তালাশ করতে করতে সবগুলো কামরা তালাশ করলো। কিন্তু কারো কোনো সন্ধান পেলো না। শিকদেব বললো, মাতাজী শোবাদেবী! এখন আমরা কী করবো! কোথায় তালাশ করবো!

ঃ চলো, বাগানে গিয়ে দেখি। সেখানে কেউ লুকিয়ে থাকতে পারে।

কামিনী বললো, আরে, আমি তো মহারাণীকে বাগানের দিকেই পালাতে দেখেছিলাম।

শোবাদেবীর চেহারায় আনন্দের আভা ফুটে ওঠলো। বললো, তাহলে তো শীঘ্র বাগানের দিকেই যেতে হয়। তারা বাগানের দিকে চলতে লাগলো। নির্জন

নিস্তব্ধ বাগান। কোথাও কোনো আওয়াজ নেই। ফুল বাগানটি যেনো কবরস্তান। হাঁটতে হাঁটতে তারা বাগানের শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছলো, যেখানে লোহার রেলিং বিদ্যমান, যেখান থেকে শিকদেব মোহন শিংকে পানিতে ফেলে দিয়েছিলো। এখানে এসে তারা একজন দাসীকে পেলো। ফুল গাছের আড়ালে সে লুকিয়ে ছিলো। ভীতির প্রচন্ডতায় সে রীতিমত কাঁপছে। চেহারা ফ্যাকাশে-বিবর্ণ হয়ে গেছে। শোবাদেবী তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো, ভয় পেয়ো না! তুমি কি জানো মহারাণী কোথায় আছে?

ঃ তিনি সন্ধ্যার সময় নৌযানে করে পালিয়ে গেছেন। তার সাথে অনেক মহিলা গেছে।

ঃ তুমি কেনো তার সাথে গেলে না?

ঃ আমি ভয়ে লুকিয়ে ছিলাম। এখানে এসে দেখি, তারা সবাই নৌযানে চড়ে অনেক দূর চলে গেছেন। আমি চীৎকার করে তাদের ডাকলাম। কিন্তু দূরত্ব বেশি হওয়ার কারণে তারা আমার ডাক শুনতে পাননি। তখন থেকে আমি দিশেহারা অবস্থায় এখানে লুকিয়ে আছি।

আক্ষেপে শোবাদেবীর হৃদয় যেনো ফেটে যাওয়ার উপক্রম হলো। বললো, হায়! যদি মহারাণী না যেতেন, তাহলে আমি তার জন্য সবকিছুই করতাম। হায়! জানি না মহারাজার অবস্থাই বা কী?

শিকদেব বললো, তিনি তো গহীন বনে পালিয়ে গেছেন।

শোবাদেবী আফসোস করতে করতে বললো, তিনি এটা অত্যন্ত খারাপ কাজ করেছেন। মহারাজা আর মহারাণী উভয়ই সুলতানের ভয়ে পালিয়েছেন। তারা সুলতানকে চিনতে পারেননি। ...যাক, যা হবার হয়ে গেছে। আর যা এখনো হয়নি, তাও হবে। চলো এখন রাজকুমারী চন্দ্রামুখীকে খুঁজে বের করি।

এখন তারা চারজন। চারজনই রাজপ্রাসাদে ফিরে এলো। প্রতিটি কামরায় প্রবেশ করে অনুসন্ধান চালাতে লাগলো।

কয়েকটি কামরা অনুসন্ধান করার পর তারা যখন একটি বড় কামরায় এসে পৌঁছলো, ঠিক তখন শোবাদেবী তার পার্শ্ববর্তী একটি ছোট কামরায় আলোর ঝলক দেখতে পেলো। সাথে সাথে আলোর ঝলকের দিকে ইঙ্গিত করে সবাইকে নীরব থাকতে হুকুম দিলো এবং শিকদেবকে সাথে নিয়ে সে দিকে অগ্রসর হলো। তারা কিছুটা অগ্রসর হয়ে এগিয়ে গিয়ে কামরায় প্রবেশ করে মোহন সিংকে দেখতে পেলো। শিকদেব অত্যন্ত নিম্ন কণ্ঠে বললো, ঐ তো মোহন সিং।

শোবাদেবী নিম্ন কণ্ঠে বললো, মনে হচ্ছে, সেও কাউকে খুঁজে ফিরছে।

শিকদেব বললো, সে কামিনীর খোঁজে আছে।

ঃ এসো, তাকে ধাওয়া করি।

ঃ কিন্তু কামিনী তো একা।

ঃ সে চিন্তা করো না। ঈশ্বর তার হেফাজত করবেন। আমার ধারণা হচ্ছে, মোহন সিং রাজকুমারী চন্দ্রামুখীর সংবাদ জানে।

ঃ আচ্ছা, তাহলে তো অবশ্যই তাঁর পিছু নিতে হবে।

ঃ কিন্তু তার আগে কামিনীকে কোনো নিরাপদ স্থানে রেখে আসা দরকার।

ঃ তাহলে মোহন সিং লাপাত্তা হয়ে যেতে পারে।

ঃ হ্যাঁ, তা হতে পারে। তাহলে এসো কালবিলম্ব না করে এখনই তার পিছু নেই।

মোহন সিং অত্যন্ত সতর্কতার সাথে কামরা অতিক্রম করে অন্য কামরায় প্রবেশ করলো। এরা দু'জনও ধীরে পা ফেলে ফেলে সে কামরায় এসে প্রবেশ করলো। তারা দেখলো মোহন সিং দেয়ালের পাশে গিয়ে একটি বোতামে চাপ দিলো। একটি ছোট গোপন দরজা খুলে গেলো। সে দরজা দিয়ে সে প্রবেশ করলো। সাথে সাথে দরজাটি বন্ধ হয়ে গেলো। এরা দু'জন খুব সতর্কতার সাথে ছুটে সেই দেয়ালের নিকট এলো। শিকদেব হাতড়িয়ে দেখলো। একটি বোতামের উপর তার হাত পড়লো। সে বোতামে চাপ দিলো। সাথে সাথে দরজাটি খুলে গেলো। এরা দু'জনও দরজা দিয়ে প্রবেশ করলো।

সাতান্ন.

শোবাদেবী ও শিকদেব গোপন দরজা দিয়ে প্রবেশ করতেই ভূগর্ভস্থ প্রাসাদের সিঁড়ি পেলো। তারা বুঝে ফেললো, মোহন সিং ভূগর্ভস্থ প্রাসাদে প্রবেশ করেছে। তারা সিঁড়ি বেয়ে নেমে একটি কামরার সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ালো। এ কামরাটি চারদিক থেকে বন্ধ। শোবাদেবী বিস্মিত হয়ে বললো, আরে, সে গেলো কোথায়! কামরাটি তো চারদিক থেকেই বন্ধ। নেমে আসার সিঁড়ি ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

শিকদেব-এর কণ্ঠ শান্ত। বললো, আপনি হয়তো ইতিপূর্বে ভূগর্ভস্থ প্রাসাদে প্রবেশ করেননি।

ঃ হ্যাঁ, আমি কখনো ভূগর্ভস্থ প্রাসাদে প্রবেশ করিনি।

ঃ আমি এখানে অনেকবার এসেছি।

এ প্রাসাদটি অত্যন্ত নিপুণভাবে তৈরি। এখানে অপরিচিত কেউ এসেই দিশেহারা হয়ে যায়। এ কামরার দেয়ালে বোতাম রয়েছে, যাতে চাপ দিলে ঠিক আগের মতোই একটি সিঁড়ি বেরিয়ে আসবে। তা দিয়ে নামলে ঠিক এ কামরার মতোই কামরা দেখতে পাবেন। সে কামরায়ও কোনো জানালা বা দরজা নেই। চারদিক বন্ধ। ভূগর্ভস্থ এ প্রাসাদে এভাবে এক রহস্যের ঘোরে ঘুরপাক খেতে হয়। দেখুন, আমি গোপন দরজাটি তালাশ করছি। সে বাম

হাতে মশালটি ধরে ডান হাত দিয়ে দেয়ালে গোপন বোতাম তালাশ করতে লাগলো। শোবাদেবী এক পার্শ্বে দাঁড়িয়ে বিস্ময়-বিমোহিত দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলো। কিছুক্ষণ পরই সে গোপন বোতামের সন্ধান পেলো। তারপর তাতে চাপ দিতেই একটি দরজা খুলে গেলো।

ঃ অত্যন্ত নিপুণভাবে তৈরি করা হয়েছে।

ঃ হ্যাঁ, তাই। এর নির্মাতারা এ পরিকল্পনা করেই তা তৈরি করেছে, যদি কখনো কেল্লা শত্রুদের হাতে চলে যায়, তাহলে যেনো নিরাপদে এ ভূগর্ভস্থ প্রাসাদে লুকিয়ে থাকা যায়। কিন্তু...। শিকদেব-এর কণ্ঠ চিরে একটি শীতল দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। বললো, কিন্তু নির্মাতাদের সন্তান অর্থাৎ বর্তমানের মহারাজা যখন পরাজিত হলেন, তখন এ ভূগর্ভস্থ প্রাসাদ আর তার কোনো কাজে আসলো না।

শোবাদেবী গম্ভীর কণ্ঠে বললো, মানুষ নিরাপদে থাকার জন্য কতো কিছুই না করে। কিন্তু ঈশ্বর যখন ধ্বংস চান, তখন কেউ তাকে রক্ষা করতে পারে না।

ঃ এটাই আসল কথা। আচ্ছা, আসুন আমরা তাকে খুঁজে বের করি। মনে হচ্ছে, সে কারো ভয়ে লুকিয়ে আছে। তাই দরজা বন্ধ করে সামনে অগ্রসর হচ্ছে।

ঃ আমার মনে হচ্ছে, যদি আমরা তাকে খুঁজে পাই, তাহলে অবশ্যই রাজকুমারী চন্দ্রামুখীর সন্ধান পাবো।

ঃ আমি তাকে আগেও খুঁজেছি। কিন্তু পাইনি। ভাগ্যক্রমে এখন পেয়ে গেছি। তাই তাকে আর হাতছাড়া করবো না।

ঃ ঠিক বলেছো। তাড়াতাড়ি করো।

উভয়ে গোপন দরজা দিয়ে প্রবেশ করে আরেকটি কামরায় পৌঁছলো। এ কামরাটিও শিকদেব অজ্ঞাত বোতাম টিপে খুললো। কিন্তু এ কামরায়ও কোনো জনমানবের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। মোহন সিংকে খুঁজে পাওয়া গেলো না।

শিকদেব যেনো উন্মাদ হয়ে গেছে। যতোই তার ব্যর্থতা প্রকাশ পাচ্ছে, ততোই সে আরো বেশি উন্মাদ হয়ে যাচ্ছে। ক্রোধে সে বার বার দন্তরাজি পিষতে লাগলো। সে একটির পর একটি কামরা খুলে সামনে এগুচ্ছে; কিন্তু মোহন সিংকে পাচ্ছে না। ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে গালি দিতে লাগলো।

বেশ কিছু কামরা তালাশ করার পরও তারা মোহন সিং-এর কোনো পাত্তা পেলো না। তখন শোবাদেবী বললো, শিকদেব! আমরা কিন্তু ভুলেই গেছি, কামিনীকে নিরাপদ স্থানে রেখে আসিনি। বলা যায় না যদি তার উপর কোনো বিপদ এসে পড়ে!

শিকদেব মোহন সিং -এর তালাশ করতে করতে বিরক্ত হয়ে পড়েছে। সে বললো, আপনি ঠিক বলেছেন। আমরা মারাত্মক ভুল করে এসেছি। কামিনী আর ঐ দাসীকে সাথে নিয়ে আসা দরকার ছিলো।

ঃ যা হওয়ার হয়ে গেছে। তার জন্য আফসোস করে লাভ নেই। দ্রুত ফিরে যাওয়া দরকার।

ঃ যতোই দ্রুত করি না কেনো ফিরতে আমাদের বেশ সময় লাগবে।

ঃ আমার যেনো কেমন ভয় ভয় লাগছে। পরমাত্মা! তুমি কামিনীকে হেফাজত করো। কথা বলে সময় নষ্ট করো না। মুসলমানরা হয়তো ইতিমধ্যে কেল্লায় ঢুকে পড়েছে। হয়তো মোহন সিং অন্য কোনো দরজা দিয়ে উপরে চলে গেছে।

ঃ আপনার এ কথা শুনে আমার অন্তরও তো অস্থির-বেচাইন হয়ে গেছে। চলুন... দ্রুত চলুন। ...হায় আমি কতো বোকা! সাথে করে কামিনীকে নিয়ে এলাম না! এ কথা বলেই সে দ্রুত কামরার পর কামরা খুলে সামনে এগিয়ে যেতে লাগলো। পশ্চাতের দরজা বন্ধ করার কথাও ভুলে গেলো। শোবাদেবীও তার সাথে সাথে দ্রুত আসছে। অবশেষে তারা একটি সিঁড়ি পেলো। কোন চিন্তা ছাড়াই তারা সে সিঁড়িতে উঠে গেলো। এর গোপন দরজা খুলতেই দেখলো সামনে এক বিশাল কামরা।

শোবাদেবীর চোখে এক আকাশ বিস্ময়। বললো, আরে, এ তো দেখছি মহারাণীর তোষাখানা! মহারাণীর সবকিছুই এ কামরায় তালাবদ্ধ করে রাখা হয়েছে।

ঃ আপনি ঠিক বলেছেন। এই বড় বড় সিন্দুকগুলো দেখছেন। এর মধ্যেই রয়েছে মহারাণী ও রাজপরিবারের সকল হীরা-জহরত আর মহামূল্যবান অলঙ্কার ও রত্নসমূহ। মনে হচ্ছে, মহারাণী এর কিছুই সাথে নিয়ে যেতে পারেননি। আর কেউ এখনো এখানে এসে পৌঁছেনি। কারো হাতের ছোঁয়া লাগেনি।

ঃ তোমার ধারণা সত্য। তবে আমাদেরকে কামিনীকে খুঁজে বের করতে হবে।

ঃ আমরা যে দরজার সিঁড়ি দিয়ে ভূগর্ভস্থ প্রাসাদে প্রবেশ করেছিলাম, তা থেকে মনে হচ্ছে, আমরা অনেক দূরে চলে এসেছি। আর এর কামরাগুলো মানুষকে দিশেহারা করে ফেলে। কামরার পর কামরা, সিঁড়ির পর সিঁড়ি দিয়ে এভাবে বানানো হয়েছে যে, তা থেকে বের হওয়াও মুশকিল। এমনো হতে পারে, আমরা যে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসেছি, বর্তমানে আমরা তার উপরে চলে এসেছি।

শোবাদেবীর কণ্ঠে বিরক্তির আভাষ। বললো, তোমার এটা কেমন অভ্যাস। কথার লেজ ধরে কথা বলতেই থাক। সময়ের দিকে তাকাও না। প্রয়োজনের দিকে তাকাও না। আমি তো কামিনীর চিন্তায় অস্থির হয়ে আছি।

ঃ আমিও তো কামিনীর চিন্তায় অস্থির। কিন্তু ভূগর্ভস্থ প্রাসাদের এই...।

এবার শোবাদেবী ধমক দিয়ে তার হাত ধরে বললো, চুলোয় ফেলো তোমার এ প্রাসাদ। যদি বেঁচে থাকো, তাহলে এসব কথা বলার ও শোনার অনেক সময় পাবে।

ঃ আপনি সত্য বলেছেন। আসুন আগে তাদের খুঁজে বের করি। কামিনী হয়তো ভীষণ ভয়ে আছে।

তারা যে কামরা থেকে বেরিয়েছিলো, সে কামরার দরজা বন্ধ করে দিলো। তারপর দ্রুত সেই কামরায় ফিরে এলো, যেখানে কামিনী ও দাসীকে রেখে গিয়েছিলো। এসে দেখলো, তারা গাঢ় অন্ধকারে লুকিয়ে আছে। ভয়ে তাদের শরীর থর থর করে কাঁপছে।

শোবাদেবী আর শিকদেবকে দেখেই তাদের চেহারা উজ্জ্বল হয়ে ওঠলো। কামিনী কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বললো, ভাইয়া! অনেক দেরি করে ফেলেছো। আমরা তো ভয়ে মরেই যাচ্ছিলাম।

ঃ হ্যাঁ, দেরি হয়ে গেছে। আমরা তোমাদেরকে সাথে না নিয়ে ভুলই করেছি। তোমাদের কারণেই ফিরে আসতে হলো। শয়তানটাকে খুঁজে পেলাম না।

কামিনী বললো, আমরা তো সে শয়তানটার ভয়েই কাঁপছিলাম।

ঠিক তখন গনন-পবন কাঁপিয়ে 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি ওঠলো। সাথে সাথে ভয়ে কামিনী শোবাদেবীকে জড়িয়ে ধরলো।

শোবাদেবী বললো, আমার মনে হচ্ছে, মুসলমানরা রণাঙ্গন থেকে ফিরে এসেছে। রাজপুতদের দূর-দূরান্তে তাড়িয়ে দিয়ে এসেছে।

শিকদেব-এর কণ্ঠে ভীতি। বললো, এখন তো তাহলে কেল্লা থেকে বের হওয়া কঠিন হবে। আর এখনই আমাদের মোহন সিং ও চন্দ্রামুখীকে বের করতে হবে। আর এখানে থাকাও নিরাপদ নয়। হতে পারে রাতেই মুসলমানরা কেল্লা দখল করে এদিকে এগিয়ে আসবে।

শোবাদেবীর কণ্ঠে দৃঢ়তা। বললো, আমার মতে আমাদের কেল্লাতেই রাত কাটানো উচিত।

ঃ আপনি ঠিকই বলেছেন। তবে খাবার...।

কামিনী বললো, ভাইয়া! ক্ষুধা তেমন নেই। না খেলেও অনায়াসে রাত কাটাতে পারবো।

ঃ তারপরও কিছু না কিছু তো খেতেই হবে।

শোবাদেবীর কণ্ঠ আরো তীক্ষ্ম ও দৃঢ় মনে হলো। বললো, এর কোনো চিন্তা করো না। তুমি একটু দাঁড়াও, আমি খাবার নিয়ে আসছি। একথা বলেই সে অন্ধকারে মিশে গেলো। প্রায় এক ঘন্টা পর কিছু খাবার নিয়ে এলো। খাওয়া-দাওয়ার পর তারা মুসলমানদের ভয়ে আবার ভূগর্ভস্থ প্রাসাদে প্রবেশ করলো।

প্রাসাদের প্রত্যেক কামরায় শোয়ার ব্যবস্থা ছিলো। তারা বিশ্রামের জন্য বিছানায় গা এলিয়ে দিতেই গভীর ঘুমে হারিয়ে গেলো। ঘুম ভাঙলে তারা সময় নির্ধারণ করতে পারলো না। সূর্য উদিত হলো কি-না, কিছুই বুঝতে পারলো না। তবে ঘুম পূর্ণ হয়ে যাওয়ার কারণে তারা বিছানায় উঠে বসলো। হঠাৎ কিসের যেনো আওয়াজ শুনতে পেলো। সবাই শংকিত হয়ে ওঠলো।

আটান্ন.

কে যেনো গোপন দরজা খোলার চেষ্টা করছে। শিকদেব অত্যন্ত নীচু গলায় বললো, মনে হচ্ছে, মোহন সিং আসছে। সবাই এখানে বসে থাকো, আমি তাকে ধাওয়া করি।

সবাই নীরবে বসে রইলো। কোনো শব্দ নেই। কোনো আওয়াজ নেই। কয়েক মুহূর্ত পরই গোপন দরজা খুলে গেলো। কারো ভারী পদবিক্ষেপের আওয়াজ অনুভূত হলো। চারদিকে গাঢ় অন্ধকার। কোনো কিছুই দেখা যাচ্ছে না। আগন্তুক কামরায় প্রবেশ করলো। পরক্ষণেই তার পদধ্বনি দূরে সরে গেলো। দরজা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ হলো এবং বেরিয়ে গেলো। কিন্তু কামরায় যারা ছিলো, তাদের কাউকে দেখতে পেলো না। হঠাৎ তারা একটি কণ্ঠ শুনতে পেলো। বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলছে, দরজা খোলা মনে হচ্ছে! কে দরজা খুললো! মনে হচ্ছে, এটা শিকদেব-এর কাজ। কিন্তু হায়রে কপাল, এতগুলো দরজা খুললো আর একটা দরজা খুললো না। খুললেই তো সে তার হারানো মুক্তাকে পেতো। জীবন সাধনা তার ষোলকলায় পূর্ণ হতো।

শিকদেব কণ্ঠধ্বনিতে চিনে ফেললো, সে মোহন সিং। তার অন্তরে আনন্দের দোলা লাগলো। বুঝে ফেললো, রাজকুমারী চন্দ্রামুখী মোহন সিং-এর হাতে বন্দি।

মনে মনে ভাবলো, হায় যদি রাতে আর একটি কামরা খুলতাম, তাহলেই তো চন্দ্রামুখীকে পেয়ে যেতাম। হায় কি আনন্দের কথা, আমার আর আমার হৃদয় রাণীর মাঝে মাত্র একটি দেয়ালের দূরত্ব। এ শয়তানটা বেরিয়ে যাক। তারপরই আমি তাকে হাতের মুঠোয় পেয়ে যাবো। ইস্ আমি কী ভাগ্যবান!

শোবাদেবী নীচু কণ্ঠে বললো, বুঝতে পেরেছি। সব জেনে ফেলেছি। একটু অপেক্ষা করো। শয়তানটাকে একটু বেরিয়ে যেতে দাও...।

তারা আবার বাতাসে মোহন সিং-এর কণ্ঠ শুনলো। সে স্বগতোক্তি

করছে– হায়! কামিনীকে পেলাম না। জানি না সে এখন কোথায় আছে। মুসলমানদের হাতেই ধরা দিলো না·শিকদেব-এর সাথে নিরাপদে আছে। কিন্তু মুসলমানরা ভূগর্ভস্থ প্রাসাদের কোনো খবরই রাখে না। তাহলে আমি ভূতের আকৃতি ধারণ করে...।

ইতিমধ্যে মোহন সিং আরেকটি কামরায় প্রবেশ করেছে। তাই তার কণ্ঠ এখন একেবারে অস্পষ্ট হয়ে গেছে। দু'-একটি শব্দ শোনা যাচ্ছে। আবার দু'একটি শব্দ শোনা যাচ্ছে না।

শিকদেব এবার উঠে গেলো। যে কামরা অতিক্রম করে মোহন সিং চলে গেছে, সে কামরার দরজা আস্তে করে বন্ধ করে দিয়ে সবাইকে লক্ষ করে বললো, তোমরা সবাই এখানে বসে থাকো। আমি এই সমুখের কামরায় যাচ্ছি।

কামিনী বললো, ভাইয়া! আমাকেও সাথে নিয়ে চলো।

ঃ ভয় পাচ্ছিস্ বুঝি। মোহন সিং তোর তালাশে আছে তাই?

ঃ হ্যাঁ, আমি তার চেহারা দেখলেই ভয়ে কাঁপতে থাকি।

ঃ পাগলী! রাজকুমারী হয়ে এতো ভয়।

ঃ সে তো হিংস্র পশু, তাই...।

শোবাদেবী বললো, আর মুসলমানদের বুঝি ভয় করো না।

কামিনী বললো, তারা তো আরো বেশি ভয়ংকর।

ঃ না, না। তুমি ভুল চিন্তায় আছো। মুসলমানরা কোনো নারী বা শিশুর উপর নির্যাতন করে না। এক্ষেত্রে তাদের উদারতা আর মমতার শেষ নেই।

কামিনী বললো, সে যাই হোক ভাইয়া! আমি অবশ্যই তোমার সাথে যাবো।

শিকদেব বললো, তোমার সাথে মাতাজ্বী আছেন। আমি এখনই ফিরে আসছি। কোনো ভয় করিস্ না। এ কথা বলেই শিকদেব দেয়াল হাতড়িয়ে একটি গোপন বোতামে চাপ দিলো আর অমনি একটি দরজা খুলে গেলো। দরজা অতিক্রম করে কামরায় প্রবেশ করলো। কিন্তু এ কামরাও অন্ধকারে নিমজ্জিত। নীরবে দাঁড়িয়ে রইলো। বুঝতে চেষ্টা করছে, কোনো আওয়াজ ভেসে আসে কিনা। কোনো আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না। চারদিকে অশরীরী নিস্তব্ধতা। বুকের স্পন্দনেরও যেনো কোনো আওয়াজ হচ্ছে না।

ক্ষণকাল এভাবে দাঁড়িয়ে থেকে অস্ফুট কণ্ঠে বললো, রাজকুমারী!

কিন্তু কোনো উত্তর পেলো না। তারপর অন্ধকারে তালাশ করে কামরায় কাউকে পেলো না। রাগে-ক্রোধে তার শরীরে আগুন ধরে গেলো। মোহন সিংকে অশ্রাব্য ভাষায় গালি দিতে লাগলো। হঠাৎ তার মনে একটি ভাবনা

দোলা দিলো। ভাবলো, আচ্ছা! পাশের কামরায় হয়তো রাজকুমারী থাকতে পারে। সেখানে একটু তালাশ করে দেখা যাক।

দেয়াল হাতড়ে সে গোপন দরজার বোতাম খুঁজে পেলো। তারপর তাতে চাপ দিতেই দরজা খুলে গেলো। এক ঝলক আলো তা থেকে বেরিয়ে এলো। আনন্দে তার চেহারা উজ্জ্বল হয়ে গেলো। সে বুঝে ফেললো, তার মন-মানসী এখানেই আছে। তার হৃদয় মন্দিরের দেবী এখানেই আছে। সে ধীরে ধীরে কামরায় প্রবেশ করে দেখলো, কামরার এক পাশে একটি মশাল জ্বলছে। আর কামরার এক দুধ-সাদা বিছানায় তার মন-মানসী বসে আছে।

আনন্দে তার হৃদয় বাগবাগ হয়ে ওঠলো। সম্মুখে অগ্রসর হয়ে সে চন্দ্রামুখীর সামনে গিয়ে দাঁড়ালো।

চন্দ্রামুখীও তাকে দেখেছে। বন্য হরিণীর জোড়া আঁখি মেলে তাকে দেখছে। পাথরের ন্যায় স্থির অচঞ্চল তার দেহ বল্লরী।

শিকদেব-এর কাছে মনে হচ্ছে, রূপশিখায় যেনো কামরাটি উজ্জ্বল হয়ে আছে। তার চেহারা থেকে যেনো রূপের ঝলক ঠিকরে বেরুচ্ছে।

শিকদেব-এর কণ্ঠে বিনম্র বচন। চোখে চপল চাহনী। বললো, চন্দ্রামুখী! আমাকে ক্ষমা করে দাও। আমার কারণে তোমার অনেক কষ্ট হয়েছে।

রাগে, ক্ষোভে, আক্রোশে চন্দ্রামুখীর শরীরে আগুন ধরে গেলেও সে অসহায়। অবলা নারী। বন্দী-জীবনের রুক্ষতা তাকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। তাই বিষন্নতা ভরা কণ্ঠে বললো, তোমার তো কোনো অপরাধ নেই। আমার নসিবে যা লিখিত আছে, তা-ই একের পর এক ঘটে যাচ্ছে।

শিকদেব বললো, দুঃখের বিষয় যে, আমার লোকেরাই আমার সাথে গাদ্দারী করেছে। বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

চন্দ্রামুখীর কণ্ঠ তীক্ষ্ম। বললো, আর তুমিও তোমার কর্মের ফল ভোগ করছো। করতে থাকবে। ভূগর্ভস্থ প্রকোষ্ঠে বন্দি থাকা যদি রাজকুমারীর জন্য কষ্টদায়ক না হয়, তাহলে সে আমাকে কষ্ট দেয়নি।

ঃ এ শয়তানটা হাতে পড়লে কী করে?

ঃ যেভাবে তুমি আমাকে আমার শয়নকক্ষ থেকে তুলে নিয়ে এসেছিলে।

শিকদেব দাঁতে দাঁত পিষে বললো, হতভাগাকে হাতের কাছে পেলেই হলো। জীবনের শিক্ষা একবারেই দিয়ে ছাড়বো– তবেই না আমার নাম শিকদেব।

চন্দ্রামুখী বললো, তাহলে... তাহলে তুমিও কি আমাকে এখানে বন্দি করে রাখবে?

ঃ এখন যদিও তার প্রয়োজন নেই, তবে অপারগতা আছে।

চন্দ্রামুখীর কণ্ঠে বিস্ময়। বললো, কী অপারগতা?

ঃ তুমি বোধহয় জানো না ইতিমধ্যে সোমনাথের অবস্থা কী দাঁড়িয়েছে।

ঃ আমি বাইরের জগত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একাকি এখানে পড়ে আছি। সুতরাং কীভাবে তা অনুধাবন করতে পারবো?

ঃ মুসলমানরা কেল্লা দখল করে নিয়েছে।

দুঃখ-বেদনায় চন্দ্রামুখীর চোখে অশ্রু দেখা দিলো। রোষপ্রদীপ্ত লোচনে শিকদেব-এর দিকে তাকিয়ে বললো, তাহলে মহারাজার খবর কী?

ঃ তিনি বনের দিকে পালিয়ে গেছেন।

দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনায় ভারাক্রান্ত চন্দ্রামুখীর উত্তপ্ত মস্তিষ্কের শিরা-উপশিরায় যেনো অনল শিখা উদ্দাম চঞ্চল হয়ে ছুটতে লাগলো। বললো, আর আম্বিজান?

ঃ তিনি নৌযানে করে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন।

অসহ্য বেদনা আর দুঃখে তার হৃদয় ভরে গেলো। হৃদয় তন্ত্রীর সবগুলো তার যেনো এখনই ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। অশ্রুপ্লাবিত চোখে কাতর চাহনি মেলে জ্বলন্ত মশালের দিকে দীর্ঘক্ষণ চেয়ে রইলো। তারপর বিষাদ, হতাশা ও শোকার্ত কণ্ঠে বললো, হায় আফসোস! আমাদের পরিবারটি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো!

শিকদেও-এর কণ্ঠে সান্ত্বনার প্রলেপ। বললো, বিষণ্ন হয়ো না রাজকুমারী। দুঃশ্চিন্তা করো না। যা হয়ে গেছে তার চিন্তা করে আর সময় নষ্ট করো না। আমাদের সামর্থ থাকলে কিছুতেই এমন হতে দিতাম না। ঈশ্বরের যা ইচ্ছে, তাই তো হয়। পরমাত্মার দয়ার কথাই বেশি বেশি স্মরণ করো।

ঃ তা ঠিক! কিন্তু আমার কী হবে?

শিকদেব এমন একটি প্রশ্নের প্রত্যাশায়ই উৎকর্ণ হয়ে ছিলো। চন্দ্রামুখীর কণ্ঠে প্রশ্নটা শোনামাত্র তার হৃদয়ে আনন্দের উর্মীমালা তোলপাড় শুরু করলো। বললো, তোমার কল্যাণকামী হিতাকাঙ্ক্ষী যতোক্ষণ তোমার পাশে থাকবে, তোমাকে তার কোনো চিন্তা করতে দেবে না। আমি তোমার পাশে আছি। তোমার বান্ধবী কামিনী আছে। মাতাজ্বী শোবাদেবী আছেন। তোমার কোনো চিন্তার কারণ নেই।

শোবাদেবী নাম শুনে চন্দ্রামুখী চিত্তচাঞ্চল্য একটু কমে এলো। বললো, শোবাদেবী কোথায়?

ঃ এই তো পাশের কামরায় আছেন।

ঃ তাঁকে ডেকে আনো। তিনিই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি আমার দুঃখ-ভারাক্রান্ত শোকাতুর অন্তরে সান্ত্বনার বারি বর্ষণ করতে পারবেন।

ঃ আমি এক্ষুনি তাকে ডেকে আনছি। তবে আমার হৃদয়ের প্রশান্তির জন্য আমাকে শুধুমাত্র একটিবারের জন্য বল, তুমি আমার হবে।

ঃ এখন সেসব সিদ্ধান্তের সময় নয়।

ঃ আমি জানি, তোমার অন্তর এখন বিষাদক্লিষ্ট। দুঃখ-ভারাক্রান্ত। কিন্তু আমার অবস্থাও তো তাই। আমিও তো তোমার বিরহে ধুঁকে মরছিলাম। তোমার প্রেমের আগুনে আমার হৃদয় ধিক্ ধিক্ জ্বলছে। তাই তোমার মুখের একটি শব্দ আমার জীবনের বহু প্রয়োজন। অন্যথায়...।

ঃ এ বিষয়টি মাতাজ্বী শোবাদেবীর দায়িত্বে ছেড়ে দাও। তিনি যা ফয়সালা করবেন, তা-ই হবে।

শিকদেব-এর নিশ্চিত বিশ্বাস, সে যা বলবে শোবাদেবী তা-ই করবে। তাই সে আনন্দে বিমোহিত হয়ে গেলো। বললো, ব্যস্ ঠিক আছে। আমরা উভয়ে তার নির্দেশই মেনে চলবো। আমি এখনই তাকে ডেকে আনছি।

একথা বলেই উৎফুল্ল শিকদেব চলে গেলো। অল্পক্ষণ পরই সে শোবাদেবী, কামিনী আর দাসীকে নিয়ে উপস্থিত হলো। রাজকুমারী চন্দ্রামুখী দাঁড়িয়ে সন্নাসীনী শোবাদেবীর কদম স্পর্শ করলো। চন্দ্রামুখী আত্ম সংযম করতে চেষ্টা করলো। কিন্তু পারলো না। রোরুদ্য কণ্ঠে কাঁদতে কাঁদতে বললো, মাতাজ্বী! এসব কী হলো মাতাজ্বী!

শোবাদেবী তার মাথা আপন বুকে স্থাপন করে সান্ত্বনা দিতে দিতে বললো, দেবী! দুঃখিত হয়ো না। আফসোস করো না। ঈশ্বর যা করেন ভালোর জন্যই করেন। কিন্তু আমরা তা বুঝি না। তোমার এ দুঃখ-বেদনা শীঘ্রই আনন্দ-উল্লাসের রূপ ধারণ করবে। তুমি এমন আনন্দ উপভোগ করবে, যা জীবনে কখনো করোনি। একটু ধৈর্যধারণ করো।

রাজকুমারী চন্দ্রামুখী শোবাদেবীর কথায় এমন কিছু ইঙ্গিত পেলো, যার মর্ম সে বুঝতে পারলো না। তাই বললো, আমার সব দুঃখ-বেদনা দূর হয়ে যাবে মাতাজ্বী!

শোবাদেবীর কণ্ঠে এক আকাশ দৃঢ়তা। বললো, খোদার নিকট তো আমার এ-ই আশা, এ-ই তামান্না।

রাজকুমারী চন্দ্রামুখী 'খোদা' শব্দ শুনে সচকিত হয়ে ওঠলো। বললো, খোদা! সে আবার কী?

ঃ আরে! খোদা, ঈশ্বর, পরমাত্মা, প্রভু একই সত্তার নাম।

ঃ এখন আর এখানে বেশীক্ষণ থাকা উচিত নয়। হতে পারে, এরই মাঝে

মোহন সিং এসে উপস্থিত হবে। আর সে এলেই রক্ত ঝরবে। কারণ, সে হুমকি দিয়েছে, আবার যখন আমরা দু'জন মুখোমুখী হবো, সে দিন আমাদের দু'জনের একজনের শেষ দিন হবে।

ঃ তাহলে চলো।

কামিনী বললো, কিন্তু যাবো কোথায়?

শিকদেব বললো, আমার সাথে চলো। আমি অন্য পথ দিয়ে তোমাদের নিয়ে যাবো।

শোবাদেবী বললো, চলো।

শিকদেব অগ্রসর হলো। একটি গোপন দরজা খুলে অন্য কামরায় প্রবেশ করলো। এভাবে এক কামরার পর আরেক কামরা অতিক্রম করে সামনে অগ্রসর হতে লাগলো। এভাবে চলতে চলতে তারা একটি বিশাল কামরায় উপস্থিত হলো। তারা দরজা দিয়ে সে কামরায় প্রবেশ করামাত্র মোহন সিং তাতে প্রবেশ করলো।

একটি মশাল শিকদেব-এর হাতে আরেকটি মোহন সিং-এর হাতে। কামরাটি দুই মশালের আলোতে একেবারে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠলো। তারা একে অপরের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকালো। মোহন সিং বললো, অবশেষে আমাদের মিলন হলো। তাই আমাদের একজনকে অবশ্যই মরতে হবে।

বলেই সে মশালটি মাটিতে রেখে দিলো এবং উন্মুক্ত তলোয়ার হাতে এগিয়ে এলো। শিকদেবও মশালটি দাসীর হাতে দিয়ে তলোয়ার হাতে রুখে দাঁড়ালো।

শোবাদেবী বললো, যুদ্ধ ভালো নয় মোহন সিং!

ঃ আমিও ভালো মনে করি না। কিন্তু দুই দুইবার আমাকে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে। ঈশ্বরের অনুকম্পায় আমি বেঁচে গেছি। এখন আমার প্রতিশোধ নেয়ার পালা।

বলেই সে শিকদেব-এর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

ভয়াতুর কণ্ঠে কামিনী বললো, মোহন সিং! যুদ্ধ করো না।

মোহন সিং বললো, তোমার হুকুম অমান্য করা যায় না।

ঠিক সেই সময় শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতিতে কামরার ছাদের কিয়দাংশ ভেঙে পড়লো। ধূলি-বালি সড় সড় করে পড়তে পড়তে একটি বড় ছিদ্রের আকার ধারণ করলো। সে ছিদ্র পথে দিবসের আলো এসে কামরাটি আলোকিত করলো।

কামরার সবাই বিস্মিত হয়ে যখন এ অবস্থা দেখছে, ঠিক তখন সবাইকে চমকে দিলো মুসলমান মুজাহিদদের কণ্ঠস্বর। তারা তাদের

কথা শুনে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলো। ভীতি আর শংকায় ধক্ ধক্ করে হৃদকম্পন শুরু হলো।

উনষাট.

মুজাহিদরা বিরাট বিজয় অর্জন করলো। রাজপুতরা শোচনীয় পরাজয় বরণ করে রণাঙ্গন ছেড়ে পালিয়ে গেলো। মুজাহিদরা পলায়নপর রাজপুতদের সারাদিন পশ্চাদ্ধাবন করে হত্যা করলো। সূর্য অস্তমিত হয়ে চারদিকে হাল্কা অন্ধকার ছড়িয়ে পড়লে মুজাহিদরা রণাঙ্গন ছেড়ে ফিরে গেলো।

কয়েকজন মুজাহিদ তাড়াতাড়ি অযু করে মাগরিবের আযান দিলো। আযান শুনেই চারদিক থেকে মুজাহিদরা ছুটে এলো। জামাতের সাথে নামায আদায় করলো। নামাযের পর সুলতান মাহমুদ গজনবী আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে সেজদায় লুটিয়ে পড়লেন। কেঁদে কেঁদে আল্লাহর হাম্‌দ ও ছানা পাঠ করলেন। তার দু'চোখ দিয়ে দীর্ঘক্ষণ অশ্রুধারা বয়ে চললো।

তারপর সুলতান সুস্থ মুজাহিদদের নির্দেশ দিলেন। বললেন, আমার ভাইয়েরা! আমাদের অনেকে আহত হয়ে রণাঙ্গনে পড়ে আছে। মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে তারা বাঁচার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে। এখন আমাদেরকে সর্বপ্রথম তাদের খুঁজে খুঁজে রণাঙ্গন থেকে তুলে এনে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। তারপর রণাঙ্গনে ছড়িয়ে পড়ে থাকা ঢাল-তলোয়ার ও অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্রগুলো কুড়িয়ে আনতে হবে। যেসব ঘোড়া আরোহী ছাড়া ঘুরছে, সেগুলোও ধরে আনতে হবে।

সুলতানের নির্দেশ পাওয়ামাত্র শত শত মশাল জ্বলে উঠলো। ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে মুজাহিদরা রণাঙ্গনে ছড়িয়ে পড়লো। আহত মুজাহিদের তুলে এনে দ্রুত তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হলো। তারপর অস্ত্রশস্ত্র ঢাল-তালোয়ারসহ মূল্যবান অনেক গনীমতের মাল একত্রিত করা হলো। কিছু ঘোড়াও ধরে আনা হলো।

এ কাজে অনেক সময় অতিবাহিত হয়ে যায়। মুজাহিদরা এশার নামায রণাঙ্গনেই আদায় করে। যারা শহীদ হয়েছে, তাদের দাফনের ব্যবস্থা করা হলো। তারপর কেল্লায় ফিলে এলো। কেল্লার ফটকে পৌঁছে সুউচ্চ কণ্ঠে আল্লাহু আকবার তাকবীর ধ্বনি দিলো। শিকদেব, শোবাদেবী ও কামিনী এ তাকবীর ধ্বনি শুনেই ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় প্রাসাদে গিয়ে আত্মগোপন করেছিলো।

মুজাহিদরা কেল্লায় প্রবেশ করে কিছু কক্ষ খুলে খাবারের আয়োজন করলো। সারাদিন তারা খাওয়ার সময় পায়নি। সুলতানের খাবার তৈরি থাকলেও তিনি তা খেলেন না। বললেন, মুজাহিদদের ক্ষুধার্ত রেখে আমি খাবার গ্রহণ করতে পারি না। ইনশাআল্লাহ আমরা সবাই একসাথে খাবার গ্রহণ করবো।

মুজাহিদদের খাবার তৈরি হলে সবাই মিলে খাবার গ্রহণ করলো। আহারের পর ক্লান্ত-শ্রান্ত সুলতান প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী দিয়ে শয্যাগ্রহণ করলেন।

সেনাপতি আলতুনতাশ ও আমীর আলী এক হাজার মুজাহিদকে প্রহরায় নিযুক্ত করলেন। এরা ছাড়া সবাই ক্লান্ত দেহ টেনে নিয়ে বিছানায় এলিয়ে দেয়।

ভোরে– একেবারে কাকডাকা ভোরে কয়েকজন মুজাহিদ ঘুম থেকে উঠে আযান দিলো। আযানের আওয়াজ পাওয়ামাত্র মুজাহিদরা বিছানা ছেড়ে নামাযের প্রস্তুতি নিতে চলে গেলো। সুলতানও নামাযের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। ফজরের নামাযের পর সবাই কুরআন তিলাওয়াতে মশগুল হয়ে পড়েন।

সূর্য উদিত হলে সুলতান কেল্লা ও শাহী প্রাসাদের ধনসম্পদ একত্রিত করার নির্দেশ দিলেন এবং বলে দিলেন যদি লুকিয়ে থাকা কোনো পুরুষ পাওয়া যায়, তবে তাকে গ্রেফতার করে আমার সম্মুখে উপস্থিত করবে। আর নারী বা শিশু পেলে তাদেরও ধরে আনবে। তবে তাদের সাথে কোনো অসদাচরণ করবে না।

এরপরই মুজাহিদদের কয়েকটি দল কেল্লা ও রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করলো। ধন-সম্পদ একত্রিত করে এনে স্তূপ দিতে লাগলো।

রাজপ্রাসাদে বহু মূল্যবান সম্পদ পাওয়া গেলো। স্বর্ণের তৈরি বেশ কিছু মূর্তি, স্বর্ণের প্রলেপ দেয়া চেয়ার ও পালংক পাওয়া গেলো। স্বর্ণ ও মহামূল্যবান পাথরখচিত অপূর্ব বহু অলংকার পাওয়া গেলো। কোটি কোটি মুদ্রার আসবাবপত্র এনে মুজাহিদরা একত্রিত করলো।

মুজাহিদরা খুঁজতে খুঁজতে একটি ছোট কক্ষে মহামূল্যবান বেশ কিছু রাজমুকুট ও একটি সিংহাসন পেলো। স্বর্ণ, মুক্তা ও মহামূল্যবান পাথরখচিত মুকুট ও সিংহাসন দেখে সবাই বিস্মিত হলো। ভাবনার জগতে ঘুরপাক খেতে খেতে তাদের অধিনায়কের মনে হলো, হয়তো এ কক্ষে মাটির তলায় আরো বিস্ময়কর কিছু পাওয়া যাবে। এ চিন্তা মাথায় আসার সাথে সাথে তারা কক্ষের মাটি খুড়তে নির্দেশ দিলো। বেশি খুড়তে হলো

না। দেখলো, নিচে ফাঁকা জায়গা। মুজাহিদরা তা দেখে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেলো। বুঝে ফেললো, নিশ্চয় এটা ভূগর্ভস্থ কক্ষ।

একজন বললো, আরে এতো দেখছি ভূগর্ভ। অন্যজন বললো, তাই তো!

সে কক্ষের ধূলি-বালি ইট-পাথর চন্দ্রামুখী, শোবাদেবী আর কামিনীর পাশে গিয়ে পড়লো। মুজাহিদদের কথা শুনে তারা হতবুদ্ধি ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলো। ভূগর্ভস্থ কক্ষটি আবিষ্কৃত হওয়ার পর সুলতান মাহমুদ গজনবী সেখানে উপস্থিত হলেন। মুজাহিদরা তাকে ভূগর্ভস্থ কক্ষের সংবাদ দিলো।

এ সংবাদ শুনেই সুলতানের চেহারা যেনো আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। বললেন, আমার হৃদয় বলছে, এ ভূগর্ভস্থ কক্ষে রাজপরিবারের লোকেরা লুকিয়ে আছে। হতে পারে চন্দ্রামুখীও এখানেই আছে। যাও দ্রুত এই গোপন কক্ষে অবতরণ করো এবং অনুসন্ধান চালাও।

সুলতানের নির্দেশ পেয়ে বেশকিছু মুজাহিদ দ্রুত ভূগর্ভস্থ প্রাসাদে লাফিয়ে পড়ে। ফলে শিকদেব ও অন্যান্যরা পালাতে পারলো না। শিকদেব-এর হাতে একটি মশাল জ্বলছিলো। অদূরেই মাটিতে আরেকটি মশাল জ্বলছিলো। তাই মুজাহিদরা ভূগর্ভস্থ কক্ষে লাফিয়ে পড়ামাত্রই তাদের দেখে ফেললো।

শিকদেব ও মোহন সিং মুজাহিদের দেখেই কাঁপতে লাগলো। কামিনী ও রাজকুমারী চন্দ্রামুখী হতবাক্ ও কিংকর্তব্যবিমূঢ়। ভয়ে তাদের চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। কিন্তু শোবাদেবী নির্বিকার, নিশ্চিন্ত। বরং মনে হচ্ছে, উপচেপড়া উল্লাসের তরঙ্গমালা তার চেহারায় তরঙ্গায়িত হচ্ছে।

শিকদেব ও মোহন সিং-এর হাতে উদ্যত অস্ত্র দেখে মুজাহিদরা মনে করলো, তারা বুঝি আক্রমণ করবে। তাই মুজাহিদরা প্রচণ্ড আওয়াজে হুঁশিয়ার করে বললো, খবরদার! স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকো। একটুও নড়াচড়া করবে না। অন্যথায় দেহ থেকে শির বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। যার হাতে যা আছে ফেলে দাও।

মুজাহিদদের এই নির্দেশ অমান্য করার সাহস কারো ছিলো না। তাই নতশিরে তারা অস্ত্র ফেলে দিলো। মুজাহিদরা তাদের গ্রেফতার করে নিলো। তাদের দু'জনের অবস্থা দেখে রাজকুমারী চন্দ্রামুখী ও কামিনী ভয়ে কাঁপতে লাগলো। অবস্থা দেখে মুজাহিদরা নিশ্চিন্ত ও আশ্বস্ত করে বললো, আপনারা কোনো চিন্তা করবেন না। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবেন না। আমরা আপনাদের সাথে খারাপ আচরণ করবো না।

এরপর ভূগর্ভস্থ কক্ষের মুজাহিদরা উপরের মুজাহিদের বললো, এখানে

দু'জন পুরুষ ও চারজন নারী পাওয়া গেছে। ঝুলন্ত সিঁড়ি ফেলো, আমরা তাদের নিয়ে উপরে আসছি।

সাথে সাথে সিঁড়ি ঝুলিয়ে দেয়া হলো। প্রথমে মোহন সিং ও শিকদেবকে উপরে তুলে আনা হলো। তারপর চন্দ্রামুখী ও কামিনীকে। পরে শোবাদেবী ও দাসী মহিলাকে তুলে আনা হলো।

সুলতান কক্ষের বাইরে একটি কুরসীতে বসে আছেন। মুজাহিদরা তাদেরকে সুলতানের সম্মুখে উপস্থিত করলো। সুলতান কামিনী ও চন্দ্রামুখীকে দেখেই বলে ওঠলেন, মনে হচ্ছে এরা রাজপরিবারের সদস্য। আর এদের একজন চন্দ্রামুখী!

শোবাদেবী চন্দ্রামুখীর দিকে ইঙ্গিত করে বললো, মহামহিম সুলতান ঠিক বলেছেন। এ হলো চন্দ্রামুখী। এ হলো আপনার হারানো মুক্তা।

শুনে সুলতান যারপরনাই আনন্দিত হলেন। অথচ চন্দ্রামুখীর চেহারা ফ্যাকাশে বিবর্ণ হয়ে গেলো। শোবাদেবীর এ ভূমিকা তার মোটেই পছন্দ হলো না। সুলতান কুরসী ছেড়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। ধীর পদক্ষেপে চন্দ্রামুখীর নিকটে গেলেন। অত্যন্ত আদর ও স্নেহমাখা হাত তার মাথায় বুলিয়ে দিলেন। বললেন, ভয় করো না। আমরা তোমাকে উদ্ধার করার জন্যই এসেছি। আল্লাহর শুকরিয়া, আমরা তোমাকে পেয়ে গেছি। আমাদের প্রচেষ্টা-শ্রম স্বার্থক হয়েছে।

সুলতানের কথা শুনে চন্দ্রামুখী কিছুটা আশ্বস্ত হলো। ভয় ও অস্থিরতার কালো মেঘ তার হৃদয়াকাশ থেকে দূরীভূত হয়ে গেলো। চেহারার অপূর্ব লালীমা ফিরে এলো।

সুলতান কামিনীর দিকে ইঙ্গিত করে শোবাদেবীকে বললেন, আর এ মেয়েটি কে?

শোবাদেবী বললো, আমব্রেলীর মহারাজার কন্যা। তারপর শোবাদেবী শিকদেব ও মোহন সিং-এর পরিচয়ও সুলতানের নিকট তুলে ধরলো।

সুলতান শিকদেব ও মোহন সিংকে বন্দি করে রাখতে নির্দেশ দিয়ে শোবাদেবী, চন্দ্রামুখী, কামিনী ও দাসীকে সাথে নিয়ে নিজ কক্ষের দিকে গমন করলেন।

বাট

চলার পথে সুলতান বার বার রাজকুমারী চন্দ্রামুখীকে সান্ত্বনা দিলেন। অভয় প্রদান করলেন। সুলতানের উদার মন-মানসিকতা, চরিত্রের সুচিতা-হৃদ্যতায় চন্দ্রামুখীর হৃদয় আরো প্রশান্ত হলো।

কেল্লার ভেতর দিয়ে চলতে চলতে রাজকুমারী চন্দ্রামুখী ও কামিনীকে অন্যান্যরা দেখলো। কেল্লায় মুজাহিদ বাহিনী ছড়িয়ে আছে। তারা সুশৃংখলভাবে নিজ নিজ দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে।

সুলতান তাঁর কক্ষে পৌছে চন্দ্রামুখীকে বললেন, চন্দ্রামুখী! তুমি কিন্তু বন্দিনী নও। তুমি স্বাধীন, মুক্ত তোমার সত্ত্বার সাথে এক রহস্য ঘিরে আছে, যা অতি শীঘ্রই উন্মোচিত হবে। তখন তুমি নিশ্চিত হবে তুমি বন্দিনী ছিলে। অজ্ঞতার কারণে তাকে স্বাধীন জীবন মনে করতে। তুমি নিশ্চয় আমার কথা শুনে বিস্মিত হচ্ছো। অবাক্ হচ্ছো। এখনো আমার অনেক কাজ বাকি। তাই কিছু সময়ের জন্য তোমার থেকে বিদায় নিচ্ছি। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।

সুলতানের কথা শুনে চন্দ্রামুখী থ বনে গেলো। আমার জীবন ঘিরে এমন কী রহস্য আছে, যা সুলতান জানেন; অথচ আমি জানিনা! কিন্তু সুলতানের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও প্রভাবের কারণে রাজকুমারী তাকে কিছু জিজ্ঞেসও করতে পারলো না। তবে বুদ্‌বুদের ন্যায় হাজার প্রশ্ন তার হৃদয় সরোবরে একের পর এক ভাসতে লাগলো।

সুলতান শোবাদেবীকে বললেন, তুমি কি ধর্মপাল সম্পর্কে কিছু জানো?

শোবাদেবী বললো, মহামহিম সুলতান! এখনো পর্যন্ত তার কোনো সংবাদ পাইনি। তবে আমার বিশ্বাস, আজই আমি তাকে খুঁজে বের করতে পারবো। রাতে আবার আপনার সাথে সাক্ষাতের পর আমি তাকে বেশ খুঁজেছি। কিন্তু চারদিকের হট্টগোল আর বিশৃংখলায় তার কোনো সংবাদ সংগ্রহ করতে পারিনি।

চন্দ্রামুখী বুঝে ফেললো, শোবাদেবীর সাথে সুলতানের পূর্ব থেকেই যোগাযোগ রয়েছে। চন্দ্রামুখী বিস্মিত হলো। আরো বিস্মিত হলো, যখন বুঝলো, ধর্মপালের জন্য সুলতান খুবই চিন্তিত। কিন্তু হাজার চিন্তা করেও সে তার কোনো সমাধান পেলো না।

সুলতান যুদ্ধের পোশাক চেয়ে পাঠালেন। তাড়াতাড়ি যুদ্ধের পোশাক পরে ঢাল-তলোয়ার, তীর-ধনুক নিয়ে কক্ষ থেকে বেরিয়ে পড়লেন। সেনাপতি আলতুনতাশ, আমীর আলী ও অন্যান্য কয়েকজন উর্ধ্বতন মুজাহিদ কর্মকর্তা সুলতানের অপেক্ষায় বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন।

সুলতান বাইরে এলেন। ঠোঁট দু'টি তাঁর চাপা উল্লাসে ফেটে পড়তে চাইছে। বললেন, আলহামদুলিল্লাহ। হারানো মুক্তাটি খুঁজে পাওয়া গেছে। চন্দ্রামুখীকে পেয়ে গেছি। কিন্তু শহরে এবং মন্দিরে এখনো অসংখ্য রাজপুত সশস্ত্র অবস্থায় অবস্থান নিয়ে আছে। তাই দ্রুত সেগুলো পদানত করতে

হবে। আচ্ছা! তোমরা কি জানতে পেরেছো, মহারাজা কোথায় আছেন?

আলতুনতাশ বললেন, সুলতান! শুনেছি, মহারাজা পালিয়ে বনে আশ্রয় নিয়েছিলেন। কিন্তু রাজপুতরা তাকে ফিরিয়ে এনেছে। এখন তিনি মন্দিরে অবস্থান করছেন।

সুলতান বললেন, তাহলে তো অবশ্যই মন্দিরেও যুদ্ধ হবে।

সেনাপতি আমীর আলী বললেন, রাজপুতদের মাঝে যতোক্ষণ পর্যন্ত মহারাজা থাকবেন, ততোক্ষণ পর্যন্ত তারা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে।

সুলতান বললেন, কোনো পরোয়া নেই। আল্লাহ্ হেফাজত করবেন। তিনিই রক্ষা করবেন। মুজাহিদদের মন্দিরে ও শহরে আক্রমণের নির্দেশ দাও।

সেনাপতিরা নিজ নিজ বাহিনীর নিকট পৌঁছে গেলো। মুজাহিদ বাহিনী কেল্লা থেকে বেরিয়ে সোমনাথ শহরের দিকে অগ্রসর হলো। সুলতান তার নিজস্ব বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন। বিশাল মুজাহিদ বাহিনী শহরের অদূরে পৌঁছুলে শহরের গণ্যমান্য ও নেতৃস্থানীয় হিন্দুরা শহর থেকে বেরিয়ে এসে তাদের স্বাগত জানায়। শহরের প্রশাসক এগিয়ে এসে সুলতানের হাতে শহরের চাবি হস্তান্তর করেন। বললেন, আপনি যখন কেল্লা পদানত করে ফেলেছেন, তখন শহর পদানত করা মামুলি ব্যাপার। আমরা যুদ্ধ পছন্দ করি না, আর রক্তক্ষয় চাই না। আমরা শান্তি ও নিরাপত্তা চাই। এই নিন শহরের চাবি। আমরা শহরের অধিবাসীরা আপনার পদপ্রান্তে এই মিনতি রাখছি, আপনি কারো রক্তে শহরের মাটি রক্তাক্ত করবেন না। আমাদের উপর যতো কর আপনি ধার্য করবেন, আমরা তা আদায় করতে প্রস্তুত আছি।

সুলতানও যুদ্ধ, রক্তক্ষয় চান না। বললেন, আমরা অনেক চেষ্টা করেছি যেনো যুদ্ধ না হয়। কিন্তু সোমনাথ মহারাজাই যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়েছেন। মনে হচ্ছে, তার পরামর্শদাতারা তাকে সুপরামর্শ দেয়নি। আমাদের নীতি হলো, কেউ বশ্যতা মেনে নিলে আমরা তাকে ক্ষমা করে দেই। তুমি বেশ বুদ্ধিমানের কাজ করেছো। আমাদের হাতে শহরের চাবি তুলে দিয়েছো। আমরা শহর আক্রমণ করবো না। আমরা এখন মন্দিরের দিকে যাবো। দেখি সেখানে কী হয়। কিন্তু আমার একটি মাত্র নির্দেশ, শহরের কেউ যেনো শহর থেকে বের না হয়। আমার এ নির্দেশ অমান্য করলে পরিণতি ভয়াবহ হবে।

প্রশাসক বললেন, মহামান্য সুলতান! নিশ্চিন্ত থাকুন। আমরা আপনার নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করব।

সুলতান বললেন, তাহলে শহরের অধিবাসীদের নিরাপত্তার সংবাদ ঘোষণা করে দাও।

প্রশাসক ও অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিরা শহরে চলে গেলেন। মুজাহিদ বাহিনী মন্দিরের দিকে এগিয়ে গেলো।

সোমনাথ মন্দির। অত্যন্ত মজবুত তার অবস্থান। চারদিক উঁচু মজবুত দেয়ালঘেরা। মন্দির না বলে দুর্গ বললেও ভুল হবে না। মন্দিরের হেফাজতে চার হাজার দুর্ধর্ষ বীর রাজপুত নিয়োজিত। এ ছাড়াও রণাঙ্গন থেকে পালিয়ে যাওয়া হাজার হাজার রাজপুত যোদ্ধা মন্দিরে গিয়ে একত্রিত হয়েছে।

সোমনাথ দেবীর প্রতি রয়েছে রাজপুতদের অগাধ বিশ্বাস ও আস্থা। তাই নিস্তব্ধ রজনীতে তারা প্রতিজ্ঞা করলো, মৃত্যু পর্যন্ত তারা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। হিন্দুরা তুলসী পাতাকে অত্যন্ত বরকতময় মনে করে। তারা তুলসী পাতা চিবিয়ে এ প্রতিজ্ঞাকে আরো দৃঢ় করলো।

সকালের উদ্ভাসিত আলোয় মুজাহিদ বাহিনী মন্দিরের অদূরে পৌছতেই রাজপুতরা ডাক-চিৎকার শুরু করলো। সাথে সাথে তারা বৃষ্টির ন্যায় তীর নিক্ষেপ করতে লাগলো।

মুজাহিদরা ঢাল তুলে ধরে নিজেদের আড়াল করে সামনে অগ্রসর হতে লাগলো। রাজপুতরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে বর্শাও নিক্ষেপ করতে লাগলো।

মুজাহিদরা আজ নির্ভীক, নির্ভয়। মৃত্যুর জন্য আজ যেনো তারা পাগলপারা। তারা ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে লাগলো। অগ্রসর হতে হতে একেবারে মন্দিরের পাঁচিলের নিকট গিয়ে পৌছলো। কেল্লার মতো এ পাঁচিল ততো উঁচু নয়। তবে তার চারটি মজবুত ফটক রয়েছে।

মুজাহিদরা পাঁচিলের নিকট পৌছে ঘোড়ার পিঠে দাঁড়িয়ে ফটকের আংটা ধরে তাতে উঠতে লাগলো। রাজপুতরা তলোয়ার উঁচিয়ে এগিয়ে এলো। যারা ফটকের ভেতরে পৌছেছিলো, তারাও তলোয়ার নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো। মুজাহিদরা ফটকের উপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে ভেতরে পড়েই তরবারী নিয়ে রুখে দাঁড়াতে লাগলো আর রাজপুতরা ছুটে এসে আক্রমণ করতে লাগলো। যুদ্ধ শুরু হলো। প্রচণ্ড যুদ্ধ। ক্ষণিকের ব্যবধানে চারদিক রক্তে ভেসে গেলো।

ফটকের ভেতরে অল্প কিছু মুজাহিদ পৌছলেও তারা শাহাদাতের অমীয় শরাবের প্রত্যাশায় পাগলপারা হয়ে বীরবিক্রমে লড়তে লাগলো। মুজাহিদরা চাচ্ছে, রাজপুতদের হটিয়ে দিয়ে মুজাহিদদের ফটকের উপর দিয়ে আসার পথ সুগম করতে। আর রাজপুতরা চাচ্ছে, যারা ফটকের ভেতরে এসে পৌছেছে, তাদের হত্যা করে অন্যান্য মুসলমানের আগমন পথ রুদ্ধ করে দিতে।

উভয় দল আপ্রাণ যুদ্ধ করে যাচ্ছে। কিন্তু মুজাহিদদের পিছুহটার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। তারা হুঙ্কার দিয়ে রাজপুতদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে আর হত্যা করে করে পিছু হটিয়ে দিচ্ছে। মুজাহিদরা রাজপুতদের হত্যা করতে করতে ফটক থেকে বেশ দূরে নিয়ে গেলো। আর মুজাহিদরা নির্বিঘ্নে ফটক টপকে পাঁচিলের ভেতর সমবেত হতে লাগলো।

রাজপুতরাও আজ ভয়ঙ্কর ও মারমুখী। তারাও প্রচণ্ড আক্রমণ করে বহু মুজাহিদকে আহত করলো। অনেককে শহীদ করলো। কিন্তু মুজাহিদরা এতো দ্রুত আসতে লাগলো যে, একজন শহীদ হলে দু'জন এসে তার স্থান পূরণ করছে।

মুজাহিদদের এই যুদ্ধংদেহী অবস্থা দেখে রাজপুতদের অন্তরে নিরাশার আর্তনাদ শুরু হলো। তারা পিছু হটতে শুরু করলো। মুজাহিদরা সামনে অগ্রসর হয়ে আক্রমণ করতে লাগলো। রাজপুতদের মাঝে ভীতি ছড়িয়ে পড়লো। তারা বাঁচার উপায় তালাশ করতে লাগলো। ইতিমধ্যে বেশ কিছু রাজপুত রণে ভঙ্গ দিয়ে পালালো। আর তখনই রাজপুতদের মাঝে চরম বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়লো। যে যেভাবে পারলো পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতে ছুটতে লাগলো। রাজপুতরা মন্দিরের পাঁচিল ছেড়ে মন্দির প্রাঙ্গনে সমবেত হলো। মুজাহিদরাও তাদের হত্যা করতে করতে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলো এবং নির্বিচারে তাদের হত্যা করতে লাগলো।

এদিকে মুজাহিদরা মন্দিরের ফটক খুলে দিলো আর মুজাহিদ বাহিনী দলে দলে মন্দিরে প্রবশ করলো। মুজাহিদদের অগ্রসর হতে দেখে রাজপুতরা দৌড়ে মন্দিরের পশ্চাতে যেতে লাগলো। মন্দিরের পশ্চাতে সাগরবক্ষে বেশ কিছু নৌযান নোঙর করা ছিলো। তারা ছুটে গিয়ে তাতে আরোহণ করে সাগরে ভাসিয়ে দিলো।

মহারাজাও একদল অনুচর নিয়ে দৌড়ে পালিয়ে যেতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু একদল মুজাহিদ তাদের আক্রমণ করলো। তারা রাজপুত ও রাজার অনুচরদের নির্বিচারে হত্যা করলো। সবার অজ্ঞাতে মহারাজাও তাদের সাথে নিহত হলেন।

নৌযানে করে যেসব রাজপুত পালিয়ে যেতে চাচ্ছিলো, তারা কিছুদূর যাওয়ার পরই দেখতে পেলো, তাদের নৌযানগুলোকে লক্ষ্য করে বেশ কিছু বিশাল বিশাল নৌযান এগিয়ে আসছে। দ্রুত নৌযানগুলো এগিয়ে এসে তাদের পথ রোধ করলো। রাজপুতরা যখন দেখলো, এসব নৌযানগুলোতে মুজাহিদরা অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত হয়ে আছে, তখন তাদের হৃদয় চুপসে গেলো। তাদের চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। আতঙ্কে তাদের হৃদপিণ্ড পিট পিট করতে করতে স্থির হয়ে যেতে চাইলো।

একষট্টি.

যেদিন সুলতান সোমনাথ শহর ও মন্দির আক্রমণ করলেন, ঠিক সেদিনই বুরহান ও হারুন সোমনাথ বন্দর আক্রমণ করে। রাজপুতরা সমুদ্রোপকূলে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে প্রতিরোধ করতে থাকে। তারা মুষলধারায় এমনভাবে তীর বর্ষণ করতে লাগলো যে, মুজাহিদরা সামনে অগ্রসর হতে পারছিলো না। এমনকি পিছুহটার উপক্রম হয়ে পড়েছিলো।

মুজাহিদ বাহিনীর সবার সামনে অগ্রসর হচ্ছিলো হারুন ও বুরহান। তারা ঢালের আড়ালে থেকে থেকে অত্যন্ত ধীরে সামনে অগ্রসর হচ্ছে। তাদের অনুসরণ করে পশ্চাতে এগিয়ে আসছে মুজাহিদ বাহিনী। আজ তারা ঢাল দ্বারা রাজপুতদের হাত থেকে আত্মরক্ষা করে চলছে। রাজপুতদের তীর উড়ে এসে ঢালে আঘাত খেয়ে ছিটকে পড়ছে। কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর হারুন বললো, আমরা রাজপুতদের উপর তীর নিক্ষেপ না করলে তাদের তীর আক্রমণ বন্ধ হবে না।

বুরহান বললো, তোমার চিন্তা সঠিক। তবে একথাও তো ভাবতে করতে হবে যে, রাজপুতরা যেভাবে তীর নিক্ষেপ করছে, তাতে আত্মরক্ষা করাই মুশকিল। এ অবস্থায় তীর নিক্ষেপের সুযোগ কোথায়?

ঃ তাদের এ আক্রমণের প্রচণ্ডতা ততোক্ষণ থাকবে, যতোক্ষণ না আমরা তাদের উপর পাল্টা আক্রমণ করবো। আমরা পাল্টা আক্রমণ করলে তারা আত্মরক্ষার চেষ্টা করবে এবং আক্রমণে শিথিলতা দেখা দেবে।

ঃ তাহলে তো কিছুক্ষণের জন্য আমাদের ঢাল ত্যাগ করতে হবে।

ঃ তুমি কী বলতে চাচ্ছো?

ঃ আমরা যদি ঢাল সরিয়ে না ফেলি, তাহলে ধনুক দিয়ে কীভাবে তাদের উপর তীর ছুঁড়ে মারবো?

ঃ তাহলে কি তুমি বলতে চাচ্ছো, আমরা যারা সম্মুখ সারিতে আছি আমাদের ঢাল সরিয়ে ফেলবো?

ঃ এ ছাড়া আর কী উপায় থাকতে পারে?

ঃ তুমি ভুল বুঝেছো। আমরা যদি ঢালটি একটু সরিয়ে নেই, তবে তীরের আঘাতে নিশ্চিত লুটিয়ে পড়বো। আমাদের আর কেউ বাঁচতে পারবে না।

ঃ তাহলে আমাদের কী করতে হবে?

ঃ পেছনের সারির দিকে ইঙ্গিত করো। তারা এগিয়ে এসে ঢালের আড়াল থেকে তীর নিক্ষেপ করুক।

বুরহান আনন্দিত হয়ে বললো, চমৎকার কৌশল তো। রাজপুতরা

নির্দ্বিধায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তীর ছুঁড়ছে। আমাদের তীরের আঘাতে নিশ্চয়ই তাদের প্রথম সারি লুটিয়ে পড়বে।

ঃ তারা যখন আত্মরক্ষায় ব্যস্ত হয়ে পড়বে, তখন আমরা ঢাল সরিয়ে রেখে তীরবর্ষণ শুরু করবো।

ঃ তুমি ঠিক বলেছ।

বুরহান একটু পেছনে সরে গিয়ে পেছনের সারির মুজাহিদদের কৌশলটি বুঝিয়ে দিলো। সাথে সাথে পেছনের সারির মুজাহিদরা অগ্রসর হয়ে প্রথম সারির সাথে মিলিত হলো। প্রথম সারির মুজাহিদদের ঢালের পশ্চাতে আশ্রয় নিয়ে ধনুক তুলে ধরলো এবং তীর সংযোজন করে নিক্ষেপ করলো। একই সাথে মুজাহিদদের সারি থেকে শত শত তীর শাঁ শাঁ করে রাজপুতদের দিকে উড়ে গেলো।

রাজপুতরা স্বপ্নেও ভাবেনি মুসলমানরা তাদের উপর তীর নিক্ষেপ করার সুযোগ পাবে। তারা বুক উঁচিয়ে তীর নিক্ষেপ বারলো। হঠাৎ প্রথম সারির রাজপুতরা তীর বিদ্ধ হয়ে লুটিয়ে পড়লো। আর্তনাদ শুরু করলো। কেউ কেউ হুমড়ি খেয়ে দ্বিতীয় সারিতে গিয়ে পড়লো। দ্বিতীয় সারির রাজপুতরা আত্মরক্ষার প্রস্তুতি নিতে না নিতেই শাঁ শাঁ করে আর এক ঝাঁক তীর তাদের উপর এসে পতিত হলো। এবার রাজপুতরা তীর নিক্ষেপ ছেড়ে দিয়ে আত্মরক্ষায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

হারুন এ অবস্থা দেখে আনন্দে আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিয়ে ওঠলো। এ তাকবির ধ্বনি শুনে প্রথম সারির মুজাহিদরাও ঢাল সরিয়ে তীর নিক্ষেপ শুরু করলো এবং দ্রুত সম্মুখে অগ্রসর হতে লাগলো।

বহুসংখ্যক রাজপুত তীরের আঘাতে আহত হলো। অনেকে লুটিয়ে আর্তনাত করতে করতে ঠাণ্ডা হয়ে গেলো। যারা রক্ষা পেলো, তারা উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গিয়ে কিছু নৌযান আর জাহাজে আরোহণ করে দ্রুত পালানোর আয়োজন করতে লাগলো। মুজাহিদরা পলায়নপর রাজপুতদের পশ্চদ্ধাবন করতে করতে উপকূলে এসে দেখলো, তারা কিছু নৌকা ও জাহাজে আরোহণ করে পালিয়ে যাচ্ছে। মুজাহিদরা উপকূলে এসে বন্দর দখল করে নিলো। অতঃপর উপকূলে ভাসমান কিছু নৌযান নিয়ে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলো। একটি নৌযানে হারুন এবং আরেকটিতে বুরহান আরোহণ করলো। এভাবে বেশকিছু নৌযান নিয়ে তারা তাদের পেছনে ছুটতে লাগলো। একেকটি নৌযানে দশ-পনেরজন আরোহণ করলো। মুজাহিদরা দ্রুত নৌযান চালিয়ে রাজপুতদের নৌযানের নিকট পৌছা মাত্রই তীর নিক্ষেপ শুরু করলো। তীরের আঘাত থেকে বাঁচার জন্য তারা

নৌযানের এদিক-সেদিক দুলতে লাগলো। এভাবে রাজপুতদের কয়েকটি নৌযান একত্রিত হয়ে দুলতে দুলতে ভারসাম্য হারিয়ে উল্টে গেলো। আর এই নৌযানের রাজপুদের পানিতে পড়ে হাবুডুবু খেতে খেতে সলিল সমাধি ঘটলো। রাজপুতদের কয়েকটি নৌযান পানিতে পড়ে যাওয়া রাজপুতদের উদ্ধার করতে এলে হাবুডুবু খাওয়া রাজপুতরা নৌযান পেয়ে তার পার্শ্ব ধরে উঠতে চেষ্টা করতে লাগলো। কেউ বা আবার তাদের হাত ধরে টেনে তুলতে চেষ্টা করলো। তাড়াহুড়ার কারণে এই নৌযানগুলোও নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডুবে গেলো। এভাবে অনেক নৌযান ডুবে গেলো এবং শত শত রাজপুতের সলিল সমাধি রচিত হলো।

মুজাহিদরা সমুদ্রের বেশ গভীর পর্যন্ত তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে নিয়ে গেলো। তারপর সোমনাথ বন্দরে ফিরে এলো।

বাষট্টি.

যেসব রাজপুত যোদ্ধা সোমনাথ মন্দির থেকে পালিয়ে নৌযানে আরোহণ করে পালাচ্ছিলো, তারা মুজাহিদদেরকে নৌযান নিয়ে ছুটে আসতে দেখে হতভম্ব হয়ে গেলো। বিস্ফারিত নেত্রে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। ভূত দেখার ন্যায় ভয়ে কাঁপতে লাগলো। ভেবেছিলো, সমুদ্রে পালিয়ে গেলে হয়তো মুসলমানদের হাত থেকে রক্ষা পাবে। কিন্তু তা আর হলো না। এ পথেও যেনো মৃত্যু লোমশ থাবা নিয়ে তাদের দিকে এগিয়ে আসছে।

তারা দূর থেকে মুজাহিদদের নৌযানের মাস্তুল দেখতে পেলো। ভয়ে তাদের চেহারা রক্তশূন্য হয়ে গেলো। একে অপরের দিকে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে তাকাতে লাগলো।

হারুন, বুরহান ও তাদের অধীন যোদ্ধারা নৌযান নিয়ে দ্রুত ছুটে আসছে। তারা নৌযান চালনায় পূর্ণ অভিজ্ঞ নয়। ফলে তাদের বেশ বেগ পেতে হচ্ছে।

তাদের নৌযানগুলো যতোই রাজপুতদের নৌযানের নিকটবর্তী হতে লাগলো, রাজপুতদের আতঙ্ক ততোই বেড়ে যেতে লাগলো। ভয়ে তাদের প্রাণ দেহ ছেড়ে যেনো উড়ে যেতে চাচ্ছে।

মানুষ ভয় আর ক্রোধে পাগল হয়ে যায়। হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। তখন নিজেই আত্মঘাতি কাজ করে বসে। রাজপুতদের ঠিক এমনই দশা হলো। তারা মুজাহিদদের অশ্রাব্য ভাষায় গালমন্দ করতে লাগলো। সাধারণ মুজাহিদরা তাদের কথা কিছুই বুঝলো না। তবে হারুন ও বুরহান

কিছুটা আঁচ করতে পারলো। তারা কোনো প্রতিক্রিয়া দেখালো না। তারা নীরব রইলো। অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় রাজপুতদের নৌযানের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো।

সমুদ্রের বুক চিরে মুজাহিদদের নৌযানগুলো সোজা রাজপুতদের নৌযানের একেবারে নিকটে পৌঁছতেই মুজাহিদরা লাফিয়ে লাফিয়ে রাজপুতদের নৌযানে চড়ে তালোয়ার চালনা শুরু করলো।

রাজপুতদের এবার চেতনা ফিরে এলো। বাঁচার শেষ প্রচেষ্টা হিসেবে তারাও তলোয়ার ও ঢাল নিয়ে আক্রমণ করলো। রাজপুত আর মুজাহিদদের নৌযানগুলোতে যুদ্ধের আগুন ছড়িয়ে পড়লো। মুজাহিদরা আজ দারুণ দুর্দান্ত-দুর্বার। তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে রাজপুতদের নির্বিচারে হত্যা করতে লাগলো। রাজপুতদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে। তাই তারাও অত্যন্ত ভয়ংকর ও মারমুখী হয়ে ওঠেছে। কিন্তু ভয়াতুর হৃদয় কতোটুকু আর দুর্দান্ত ও দুঃসাহসী হয়ে ওঠতে পারে! তাই রাজপুতরা একের পর এক আহত হয়ে সমুদ্রের পানিতে লুটিয়ে পড়তে লাগলো। নিহতের রক্তে পানি লাল হয়ে যেতে লাগলো।

রাজপুতরা ভয়ে গলা ফাঁটিয়ে চিৎকার করতে লাগলো। কিন্তু মুজাহিদরা নির্বিকার। অত্যন্ত স্থিরচিত্তে রাজপুতদের হত্যা করতে লাগলো। প্রত্যেক নৌযানের মুজাহিদরা চাচ্ছে তারা অন্য মুজাহিদদের আগে রাজপুতদের হত্যা করে শেষ করবে। তাই তারা অত্যন্ত উৎসাহের সাথে রাজপুতদের হত্যা করতে লাগলো। রাজপুতরাও মুজাহিদদের হত্যা করতে লাগলো।

আহত রাজপুতরা চির প্রশান্তি লাভের আশায় সমুদ্রের শীতল পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে পড়ে তলিয়ে যেতে লাগলো। দ্রুত রাজপুতদের সংখ্যা কমে আসতে লাগলো।

সমুদ্রবক্ষে এই যুদ্ধেও রাজপুতদের সংখ্যা মুজাহিদদের দ্বিগুণ। রাজপুতরা যদি ধীরস্থিরভাবে ঠাণ্ডা মাথায় দুঃসাহসিকতার সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যেতো, তাহলে হয়তো তারা মুজাহিদদের তাড়িয়ে দিতে পারতো। কিন্তু তাদের ভয়াতুর ও আতংকিত অবস্থাই তাদের জন্য পরাজয় ডেকে আনলো। তারা যখন দেখলো, বাঁচার আর কোনো উপায় নেই, তখন তারা সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে সলিল সমাধি বরণ করতে লাগলো।

মুজাহিদরা অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে দেখতে লাগলো, রাজপুতরা সমুদ্রের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে দু'একবার শির উঁচু করে শ্বাস নেয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে তলিয়ে যাচ্ছে। তবুও তারা আত্মসমর্পণ করছে না। জীবন ভিক্ষা চাচ্ছে না।

সমুদ্রের বুকে রাজপুতদের অস্তিত্ব শেষ হয়ে গেলে বিজয়-উল্লাসে উদ্বেলিত হয়ে মুজাহিদরা আল্লাহু আকবার ধ্বনি তুললো। তাকবীর ধ্বনি গুঞ্জরিত হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। সমুদ্রের বুক যেনো তার স্রষ্টার নাম এই প্রথম শুনে হতচকিত হলো।

এরপর মুজাহিদ বাহিনী নৌযান নিয়ে মন্দির প্রাচীরের দিকে ছুটে চললো। ইতোমধ্যে মন্দিরসহ চারদিক মুসলমানরা পদানত করে নেয়ার কারণে তারা কোনো বাধার সম্মুখীন হলো না। নির্বিঘ্নে সোমনাথ মন্দিরের পাঁচিলের নিকট গিয়ে পৌছলো। মন্দিরের পশ্চাত থেকে দীর্ঘ সিঁড়ি ধাপ কেটে কেটে সমুদ্রে গিয়ে পৌছেছে। এ সিঁড়ি ভেঙেই পূজারীরা প্রত্যহ সমুদ্রের পানিতে গোসল করে।

মুজাহিদ বাহিনীর নৌযানগুলো এসে মন্দিরের সিঁড়িতে থামলো। নৌযান থেকে নেমে তারা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এলো।

মুজাহিদরা ধারণা করেছিলো, এখনো মন্দিরে যুদ্ধ চলছে। রাজপুতরা অবশ্যই মন্দিরে প্রবেশে বাধা প্রদান করবে। তাই তাদের প্রত্যেকের হাতে নাঙ্গা তরবারী। কিন্তু মুজাহিদরা সিঁড়ি অতিক্রম করে মন্দিরে প্রবেশ করে দেখলো, মন্দির একেবারে নীরব। মুজাহিদ বাহিনী মন্দির চত্বরের এখানে সেখানে অবস্থান নিয়ে আছে।

মুজাহিদরা দেখল, মন্দিরের একদিকে সুলতান দাঁড়িয়ে আছেন। তাকে ঘিরে আছে একদল পূজারী। তারা সুলতানের দিকে এগিয়ে যায়।

তেষট্টি.

হারুন ও বুরহান সুলতানের নিকট গিয়ে দেখলো, প্রায় শ'খানেক হিন্দু পণ্ডিত ও সন্ন্যাসী সুলতানের চারপাশ ঘিরে আছে। সুলতান তাদের দেখেই সহাস্যবদনে বললেন, আরে, তোমরাও এসে গেছো। তাহলে কি বন্দর পদানত হয়ে গেছে?

হারুন নতশিরে বললো, হ্যাঁ, মহামান্য সুলতান! বন্দর বিজয় হয়ে গেছে।

সুলতানের চোহরায় তখন আনন্দ যেনো দল বেঁধে নেচে বেড়াচ্ছে। তিনি বললেন, এটা একমাত্র আল্লাহরই মহা-অনুগ্রহ, অনুদান। হারুন! আরেকটি সুসংবাদ কি তুমি পেয়েছো? আমরা রাজকুমারী চন্দ্রামুখীকেও খুঁজে পেয়েছি।

এ সংবাদ শুনে হারুনের হৃদয় বাগানে যেনো হাজার হাজার গোলাপ ফুটে আনন্দে দুলতে লাগলো। তার হৃদয় বিমোহিত-বিমুগ্ধ হয়ে উঠলো।

খুশির পায়রাগুলো আনন্দে বিমল আকাশে ডিগবাজি খেতে লাগলো। তবে সুলতানের সামনে শুধু এতোটুকু বললো, আল্লাহর হাজার হাজার শুকরিয়া। হযরতের মেহনত-মুজাহাদা সফল হয়েছে।

ঃ হ্যাঁ, সব শুকরিয়া আল্লাহরই। আচ্ছা হারুন, তুমি কি এই ছোট মন্দিরটি দেখেছো? এ কথা বলে সুলতান অদূরের এক ছোট মন্দিরের দিকে ইঙ্গিত করলেন।

ঃ না, দেখিনি।

ঃ দেখোনি। এর এক বিস্ময়কর বিষয় হলো, এর মূর্তিটি শূন্যে দাঁড়িয়ে আছে। কোনো কিছুর সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। সে এক বিস্ময়কর ব্যাপার। শত শত বছর ধরে এভাবে দাঁড়িয়ে আছে। এটাই তার অলৌকিক কাণ্ড। চলো, আমি তোমাকে সব দেখাচ্ছি।

এ কথা বলে সুলতান হারুনকে নিয়ে মন্দিরের দিকে অগ্রসর হলেন। হারুন ও বুরহান সুলতানের পিছু পিছু যেতে লাগলো। সুলতান বাহিনীর কয়েকজন দুর্ধর্ষ মুজাহিদও সুলতানের পিছু পিছু অগ্রসর হলো। কয়েকজন সন্ন্যাসীও সাথে সাথে গেলো।

হারুন মন্দিরের ভেতরে প্রবেশ করে দেখলো, একটি জমকালো মূর্তি মন্দিরের একেবারে মাঝে শূন্যেয় দাঁড়িয়ে আছে। মন্দিরের দেয়াল ও ছাদের কালো রং চকচক করছে।

হারুন ও বুরহানের চোখে রাজ্যের বিস্ময়। তারা অত্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে মন্দিরের দেয়াল, ছাদ ও মেঝে দেখলো। না, মন্দিরের সথে মূর্তির কোনো সংযোগ খুঁজে পাওয়া গেলো না।

সুলতান তাদের দিকে গভীর দৃষ্টি মেলে তাকালেন। বললেন, দেখলে তো হারুন?

ঃ জ্বি আলমপনা!

ঃ বিষয়টি বিস্ময়কর নয় কি?

হারুন বললো, তাই তো। বুদ্ধি যেনো খেই হারিয়ে ফেলেছে। আমার বুঝে আসছে না, আসলে ব্যাপারটা কী? এর মাঝে কী রহস্য লুকিয়ে আছে!

ঃ বেশ কিছুক্ষণ ধরে চিন্তা করছি; কিন্তু কোনো সমাধান পাচ্ছি না। যদি আজ পাশে ধর্মপাল থাকতো, তাহলে নিশ্চয়ই এর সমাধান পাওয়া যেতো।

ঃ হ্যাঁ, ধর্মপাল বলতে পারতে। কিন্তু তিনি তো বন্দি।

সুলতানের কণ্ঠে বিস্ময়। বললেন, এখনো বন্দি?

ঃ সে কোথায় আছেন এখনো তার কোনো সংবাদ পাওয়া যায়নি।

ঃ এ পর্যন্ত নিশ্চিন্তে বসার এক মুহূর্ত সময় পাইনি। তাই তার অনুসন্ধান

করা সম্ভব হয়নি। আমি এখনই তার সন্ধানের ব্যবস্থা করছি।

ঃ সুলতান, মহারাজার কী হলো?

ঃ শুনেছি, সে যুদ্ধে নিহত হয়েছে। আফসোস, নিজের কঠোর মনোভাবের কারণে বা অন্যের প্ররোচনায় পড়ে লোকটি সন্ধিও করলো না। যদি সন্ধি করে নিতো, তাহলে সোমনাথের এই সকরুণ পরিণতি হয়তো ঘটতো না। মহারাজাও নিহত হতো না। কিন্তু আল্লাহর যা ইচ্ছে করেন, তা-ই হয়।

ঃ তারা তাদের সৈন্যসংখ্যার আধিক্যে প্রবঞ্চনায় পড়েছিলো। অহংকারে বিভোর হয়েছিলো। আল্লাহ অহংকারীকে পছন্দ করেন না। তাই তাদের এ পরিণতি ঘটেছে।

ঃ অহংকার আল্লাহর চাদর। যে অহংকার করে, আল্লাহ্ তার প্রতি রুষ্ট হন। ফলে তাকে এ পরিণতিই ভোগ করতে হয়। কিন্তু আমরা আলোচনার বিষয় থেকে দূরে চলে এসেছি। এ ঝুলন্ত মূর্তির রহস্য উন্মোচন করতে হবে।

ঃ নিশ্চয়ই জাহাপনা! আমরা বেশ দূরে চলে এসেছি। আচ্ছা, আমি একটু দেখে আসি, কোনো সূক্ষ্ম তার বা অন্য কিছুর কারণে মূর্তিটি দাঁড়িয়ে আছে কিনা?

ঃ যাও, দেখে আসো।

হারুন অগ্রসর হয়ে মূর্তির পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। কোষ থেকে ঝলমলে তরবারীটি বের করে মূর্তিটির চারপাশে ঘুরালো। উপরে, নীচে, ডানে, বামে। কিন্তু কিছুই তো তলোয়ারে বাঁধলো না। হারুন ধারণা করেছিলো, মূর্তিটি কোনো কালো তারের সংযোগের কারণে শূন্যে দাঁড়িয়ে আছে। আর চারদিক কালো রং হওয়ায় তা দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু যখন সে দেখলো, সত্যই মূর্তিটি কোনো কিছুর সাথে ঝুলে নেই, তখন তার আর বিস্ময়ের অবধি রইলো না। হারুন হতবাক্ হয়ে গেলো।

সুলতান তার অবস্থা দেখে মৃদু হেসে বললেন, তোমার পরীক্ষা কি শেষ হলো হারুন?

ঃ হ্যাঁ, শেষ হয়েছে। ব্যাপারটা খুবই বিস্ময়কর মনে হচ্ছে।

ঃ এখন তুমি হিন্দুদের এ বিশ্বাস কীভাবে ভঙ্গ করবে যে, মূর্তিটি নিজ ক্ষমতায় অলৌকিকভাবে শূন্যে দাঁড়িয়ে আছে?

ঃ আমি তাদের এ কথা বিশ্বাস করি না।

ঃ তাহলে তোমার দাবির পক্ষে প্রমাণ দাও।

ঃ প্রথম কথা হলো, যদি এ মূর্তির মাঝে অলৌকিক কোনো ক্ষমতা

থাকতো, তাহলে আমি যখন তার চারপাশে তরবারী ঘুরিয়েছি, তখন সে ক্রুদ্ধ ও ক্ষীপ্ত হয়ে আমাকে শাস্তি প্রদান করতো।

ঃ তুমি সত্যই বলেছো। তবে রহস্যটা অবশ্যই উদঘাটন করতে হবে।

ঃ আমার ধারণা, সাধারণ পূজারীরা না জানলেও বর্ষীয়ান বিশেষ বিশেষ সন্নাসীরা অবশ্যই এর রহস্য জানে।

ঃ তাহলে তাদের জিজ্ঞেস করো।

ঃ তারা সহজে এর রহস্য বলবে না।

ঃ তাহলে তুমি কী করতে চাও?

ঃ জাহাপনা। এ মন্দিরের সব পূজারীকে গ্রেফতারের নির্দেশ দিন।

সুলতান বললেন, হারুন, বুরহান ও অন্যান্য সকলে মন্দির থেকে বাইরে চলে এসো। তারপর সন্নাসীদের বললেন, এ মন্দিরের সন্নাসীরা পৃথকভাবে দাঁড়াও।

সুলতানের নির্দেশে সন্নাসীরা পৃথক হয়ে দাঁড়ালো। সংখ্যায় তারা প্রায় ষাট-সত্তরজন। সুলতান বললেন, কেউ কি বাকি আছে?

একজন বৃদ্ধ সন্নাসী বললো, না কেউ বাকি নেই।

সুলতানের কণ্ঠ এবার অত্যন্ত তীক্ষ্ণ শোনা গেলো। তিনি মুজাহিদ বাহিনীকে লক্ষ্য করে বললেন, এদের সবাইকে গ্রেফতার করো। মুজাহিদ বাহিনী এগিয়ে এলে সন্নাসীরা ভয়ে কাঁপতে লাগলো।

হারুন বন্দি সন্নাসীদের নিকট এলো। হাল্কা অনুসন্ধানী দৃষ্টি তার চোখের তারায়। দেখলো, এক বৃদ্ধ সন্নাসী তার দিকে অপলক নেত্রে তাকিয়ে আছে। যেনো একটি প্রশ্ন তার চোখ থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসতে চাচ্ছে।

হারুন জিজ্ঞেস করলো, কিছু বলবেন কি?

সন্নাসীর কণ্ঠ বিনয়ে ভরা। বললেন, জ্বি।

হারুন বললো, আমার পিছু পিছু চলে আসুন।

মুজাহিদ বাহিনী তাকে ছেড়ে দিলো। তিনি হারুনের পিছু পিছু হাঁটতে হাঁটতে মন্দিরের দরজায় পৌঁছলেন।

হারুন বললো, কী জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছেন, বলুন।

সন্নাসী বললেন, আমরা শুনেছি, মুসলমান রাজা-বাদশাহরা ধর্মনেতাদের কোনো প্রকার শাস্তি ও কষ্ট দেয় না।

ঃ সত্য শুনেছেন। তবে আপনাদের সাথে এখন যে রূঢ় আচরণ করা হচ্ছে, তার কারণ আপনারা যে মূর্তির পূজা করেন, যা শূন্যে ঝুলে আছে আর আপনারা মনে করেন এটা এ মূর্তির মোজেজা, এর রহস্য আপনাদেরকে বলে দিতে হবে। সুলতান এ রহস্য চানতে চাচ্ছেন।

ঃ আমি যদি এর রহস্য বলে দেই...।

ঃ তাহলে আপনাকে এখনই ছেড়ে দেয়া হবে। হতে পারে আপনাকে পুরস্কৃতও করা হবে।

ঃ আর আমার ছেলে-মেয়ে- স্ত্রীকে...।

ঃ তাদেরও নিরাপত্তা প্রদান করা হবে।

ঃ হ্যাঁ, আমি এর রহস্য উন্মোচনের দায়িত্ব নিলাম।

ঃ তাহলে শুনুন, এ মূর্তিটি লোহায় গড়া।

ঃ মূর্তিটি দেখলে সহজেই বুঝা যায়, এটা লোহার গড়া।

ঃ আমাকে বলতে দিন। এ মন্দিরের চতুর্পার্শ্বের দেয়াল, ছাদ এবং মেঝেতে চুম্বক লোহা এমনভাবে বসানো হয়েছে যে, চারদিক থেকে সমান আকর্ষণে এগুলো মূর্তিটিকে টানছে। চুম্বকের এ আকর্ষণের কারণে মূর্তিটি শূন্যে দাঁড়িয়ে আছে।

সাথে সাথে হারুনের বিস্ময়ভাব দূর হয়ে যায়। সে রহস্যটা সহজেই অনুধাবন করতে পারে। সাথে সাথে সুলতানের নিকট এসে তাঁকে তা বর্ণনা করে শোনায়।

সুলতান বললেন, যদি ব্যাপারটি এমনই হয়, তাহলে মন্দিরের কোনো এক দিকের দেয়াল ভেঙে দিলেই তো মূর্তিটি পড়ে যাবে।

ঃ অবশ্যই।

ঃ তাহলে তা করা হোক।

হারুন কয়েকজন মুজাহিদকে মন্দিরের পূর্ব পার্শ্বের দেয়াল ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিলো। হিন্দুদের নিকট তা অসহনীয় হলেও কিছু করার নেই। তারা তো এখন পরাজিত, অসহায়, ক্ষমতাহীন। পরাজিতের কিছুই করার থাকে না। তাই তারা হট্টগোল করলো না। প্রতিবাদ করলো না। নীরবে তা মেনে নিলো।

কয়েকজন মুজাহিদ মন্দিরের পূর্বপার্শ্বের দেয়ালে আঘাত করতে লাগলো। অল্পক্ষণের মধ্যে দেয়াল ভেঙে গেলো।

দেয়াল ভাঙার সাথে সাথে মূর্তিটি উপুড় হয়ে পড়ে গেলো। মুজাহিদরা আনন্দের আতিশয্যে আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিলো।

যেসব হিন্দু মূর্তি রহস্যের ব্যাপারটি জানতো না, তারা এ দৃশ্য দেখে বিস্মিত ও বিচলিত হলো।

সুলতান বললেন, দেখেছো, এই হিন্দু সন্ন্যাসীরা কতো চালাক, কতো ঠকবাজ, ধোঁকাবাজ। এরা ধর্ম ব্যবসা চাঙ্গা রাখার জন্য কেমন জাল পেতে বসেছিলো! অথচ সাধারণ হিন্দুরা এ মূর্তি সম্পর্কে কী উঁচু ধারণা পোষণ করে!

ঃ এখন এদের অবস্থা তো বলাই বাহুল্য।

ঃ নিশ্চয়ই। তবে এ রহস্য উন্মোচিত হওয়ার পরও কি হিন্দুদের বিশ্বাসে চিড় ধরবে না?

ঃ এরা দুর্বল। এরা নির্বোধ। এরা দেবতাদের নামে পাগল। এরা দেবতাদের এমন ভয় করে, তারা তাদের বিশ্বাস থেকে বিন্দুমাত্রও সরে আসবে না। সুলতানে আলা! আমি তো এ সন্নাসীকে মুক্তির প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। তাই ইনি এ রহস্য উন্মোচিত করে দিয়েছেন।

ঃ শুধু তাকেই নয়, বরং উপস্থিত সবাইকে মুক্ত করে দাও।

ঃ আমি তো তাকে পুরস্কৃত করার আশ্বাসও দিয়েছিলাম।

ঃ তাহলে তাকে পুরস্কৃতও করো। এখন চলো আমরা সোমনাথ মন্দিরে যাই।

ঃ চলুন।

তারা সোমনাথ মন্দিরের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করলো।

চৌষট্টি.

সুলতান সোমনাথ মন্দিরে পৌছে দেখলেন, মন্দিরের সকল সন্নাসী আর পূজারী সেখানে উপস্থিত। সবার মাঝে আতংকভাব বিরাজমান। সবার শির অবনত। সুলতানকে দেখেই তারা প্রায় রুকু করার মতো অবনত হয় এবং জোড় করা হাত দুটো উপরে তুলে ধরে। হিন্দুরা এভাবেই রাজা-মহারাজাদের সম্মান প্রদর্শন করে থাকে।

সুলতান তাদের অতিক্রম করে মন্দিরের সিঁড়ি বেয়ে ফটকে গিয়ে পৌছলেন। সেনাপতি আলতুনতাশ, আমীর আলী, হারুন, বুরহানসহ আরো কিছু নেতৃস্থানীয় সামরিক অফিসার সুলতানের পিছু পিছু যাচ্ছেন। তাদের পেছনে যাচ্ছে পূজারী সন্নাসীর দল।

হিন্দুরা অন্য ধর্মের লোকদের অপবিত্র মনে করে। পরাজিত না হলে তারা কিছুতেই কোন মুসলমানকে এখানে প্রবেশ করতে দিতো না। কিন্তু আজ তারা পরাজিত, শক্তিহীন। তাই তারা নির্বাক্।

মন্দিরের বিস্ময়কর অট্টালিকায় সুলতান প্রবেশ করলেন। দেখলেন, বিশাল বিশাল কক্ষগুলো মণি-মুক্তা, প্রবাল আর মূল্যবান দুর্লভ পাথরে সজ্জিত। তিনি বিস্মিত হলেন। মন্দিরের ভেতরের ছাপ্পান্নটি স্তম্ভ এমন মূল্যবান পাথরে সজ্জিত যে, তা থেকে সর্বদা আলোকমালা বিচ্ছুরিত হয়ে মন্দিরের কক্ষগুলোকে আলোকিত করে রাখে।

সুলতান ও তার সঙ্গী মুজাহিদরা একটির পর একটি কক্ষ অতিক্রম করে

সামনে অগ্রসর হচ্ছেন। একটি বিরাট কক্ষে গিয়ে দেখলেন, সেখানে বেশকিছু উদ্ভিন্ন যৌবনা সুন্দরী যুবতী আকর্ষণীয় পোশাক-অলংকারে সজ্জিত হয়ে বসে আছে। তারা ভয়ে জড়ো হয়ে আছে। তাদের চেহারা ফ্যাকাশে, রক্তশূন্য।

সুলতানের চেহারায় বিস্ময়। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এরা কারা? এখানে এরা কী করে?

মহাপূজারী অগ্রসর হয়ে বললেন, অন্নদাতা! এরা মন্দিরের দাসী।

সুলতান বিষয়টি বুঝতে পারলেন না। তাই বিস্মতি কণ্ঠে বললেন, মন্দিরের দাসী? এদের কাজ কী?

মহাপূজারী বললেন, এরা পবিত্র নর্তকী। এরা মহাদেবতার পূজা ও গোছলের সময় নাচে, গান গায়।

সুলতানের চেহারায় মৃদু হাসির রেখা ফুটে ওঠলো। বললেন, উহু, তোমরাই তাহলে তোমাদের প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণের জন্য এদের এনে বন্দি করেছো। শোনো, আজ থেকে এরা মুক্ত।

এরপর সুলতান আরো সামনে অগ্রসর হয়ে সেই কক্ষে পৌঁছলেন, যেখানে স্বর্ণের বিশাল এক শিকল বিদ্যমান, যার ওজন প্রায় দু'শ মণ। যে শিকলে বহু ঘন্টি ঝুলে আছে। পূজার সময় যে ঘন্টিগুলোর গুঞ্জরণে চারদিক মোহিত হয়ে ওঠে। সুলতান দেখলেন, এ শিকলের সাথে প্রত্যেক কক্ষে দশ-বারটি করে ঘন্টি ঝুলছে। শিকল টানলেই ঘন্টিগুলো একসাথে বেজে ওঠে এক মোহময় অবস্থার সৃষ্টি করে।

সুলতান জিজ্ঞেস করলেন, এ ঘন্টিগুলো কখন বাজানো হয়?

মহাপূজারী বললেন, মহাদেবতা সোমনাথজীর পূজা আর স্নানের সময়।

ঃ অন্য সময় তো বাজানো হয় না।

ঃ না, বাজানো হয় না।

ঃ এর আওয়াজ কেমন শোনায়?

ঃ অত্যন্ত উঁচু ও ভাবগম্ভীর।

ঃ আচ্ছা, বাজাও দেখি, কেমন শোনায় শুনি।

মহাপূজারী কোনো আপত্তি করলেন না। তিনি মন্দিরের বেশ কয়েকজন পরিচারককে ঘন্টি বাজানোর নির্দেশ দিলেন। তারা গিয়ে পূর্ণ শক্তিতে ঘন্টি বাজানো শুরু করলো। ঘন্টিগুলোর গুরুগম্ভীর আওয়াজে চারদিক গুঞ্জরিত হয়ে ওঠলো। গুঞ্জনের তীব্রতায় সুলতানসহ সবাই কানে হাত দিয়ে স্বস্তির শ্বাস ফেললো। এবার তিনি ঘন্টির আওয়াজ বন্ধ করার ইঙ্গিত দিলেন।

সুলতান মহাপূজারীকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি বলেছিলে শুধু

সোমনাথ দেবতার পূজা ও স্নানের সময় এ ঘন্টি বাজানো হয়। তাহলে এখন তা কীভাবে বাজালো?

মহাপূজারীর কণ্ঠে বিনয়। বললেন, সুলতান মহোদয়ের নির্দেশে বাজিয়েছি।

সুলতান বললেন, ধর্মের বিধানের বিপরীত কারো নির্দেশ গ্রহণযোগ্য নয়। যদি আমার নির্দেশের কারণেই ঘন্টিগুলো বাজিয়ে থাকো, তাহলে বলবো তোমরা সোমনাথ দেবতার তুলনায় আমাকে বেশি সম্মান করো। এতে তোমাদের বুঝতে হবে, সোমনাথ দেবতা একটি পাথরে গড়া নিষ্প্রাণ নির্জীব মূর্তি ছাড়া কিছু নয়। যদি তার মাঝে কোনো শক্তি-সামর্থ থাকতো, যদি সে উপকার বা অপকারের ক্ষমতা রাখতো, তাহলে অবশ্যই আমাদের ধ্বংস করে দিতো। আর তোমরা আমার নির্দেশে ধর্মের বিধানের বিপরীত ঘন্টি বাজানোর কারণে তোমাদেরও ধ্বংস করে দিতো। সে তোমাদের উপর গজব আপতিত করতো। শুনে রাখো, এ মূর্তিটি একটি পাথরখণ্ড ছাড়া আর কিছুই নয়। তাকে যেখানে রাখবে, সেখানেই বসে থাকবে। যেখানে ফেলে দেবে সেখানেই পড়ে থাকবে। তাই তার পূজা করায় কোনো উপকার নেই।

মহাপূজারী বললেন, মহান সুলতান! সম্মানিত অন্নদাতা! আমরাও তা জানি। তবে তার আকৃতি মহাদেবতার আকৃতির সাথে সাদৃশ্য রাখে। তাই আমরা একে মহাদেবতা মনে করে পূজা-অর্চনা করি এবং এর মাঝেই মহাদেবতার সন্তুষ্টি কামনা করি।

সুলতান বললেন, এটা এক মারাত্মক ভুল। কল্পনার রঙ-তুলি দিয়ে একটি মূর্তি বানিয়ে বললে, এটা মহাদেবতার সাদৃশ্য, তারপর তার পূজা শুরু করলে– এটা কিছুতেই বুদ্ধিমান মানুষের কাজ নয়। ধর্ম তো এমন হবে, যার মৌলিক বিষয়সমূহ হবে সত্য ও মজবুত। অথচ তোমরা তোমাদের ধর্মকে হাস্যাস্পদ বানিয়ে ফেলেছো।

বলতে বলতে সুলতান সামনে অগ্রসর হলেন এবং একটি বিশাল চত্বরে গিয়ে দাঁড়ালেন। চত্বরের এক পার্শ্বে বেদী। বেদীর উপর মহাদেবতার মূর্তি।

সুলতানের নিষ্পলক দৃষ্টি মূর্তিটির উপর গিয়ে পড়লো। সুলতান বললেন, এ মূর্তির মর্যাদা ও ইজ্জত ভারতবর্ষের হিন্দুদের হৃদয়-গভীরে প্রোথিত হয়ে আছে। এ মূর্তিপূজার উদ্দেশ্যে সুদূর বিদেশ থেকেও বহু রাজা-মহারাজা ছুটে আসে। এর মর্যাদা রক্ষায় জীবন দিয়ে যুদ্ধ করে। কিন্তু এ মূর্তি তাদের কোনোই সাহায্য-সহায়তা করতে পারে না। আজ তার কল্পিত ইজ্জত-মর্যাদার অবসান ঘটবে। কালের গভীরে সে হারিয়ে যাবে। শীঘ্র একটি কুঠার নিয়ে এসো।

সুলতানের বক্তব্য শুনে মহাপূজারীর শরীর কেঁপে ওঠলো। তিনি যখন অন্যান্য পূজারী আর সন্ন্যাসীদের বিষয়টি বললেন, তারাও কেঁপে ওঠলো। তাদের চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। মহাপূজারী সামনে অগ্রসর হয়ে সুলতানের পা ধরেন। কাঁদো কাঁদো কণ্ঠ বললেন, মহারাজ! শাহানশাহে আলম! এমনটি করবেন না। এতে ভারতবর্ষের হিন্দুদের হৃদয় ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। হিন্দু জাতি দারুণ ব্যথিত হবে।

সুলতানের কণ্ঠ জোরালো। বললেন, মহাপূজারী! আমি তোমার সাথে একমত নই। বরং এতে ভারতবর্ষের হিন্দুরা বুঝতে পারবে সোমনাথ দেবতা একখণ্ড পাথর ছিলো মাত্র। তার কোনো শক্তি ছিলো না। ভালো-মন্দ কিছু করার ক্ষমতা তার ছিলো না। তারা এতোদিন ধোঁকায় নিপতিত ছিলো। এবার তাদের চোখ খুলে যাবে। তাদের অন্তরের মিথ্যা ভয়ভীতি বিদূরিত হয়ে যাবে। এরপর আর কখনো তারা কোনো মূর্তির পূজা করবে না।

মহাপূজারী বললেন, কিন্তু সুলতান! মনে হয় আপনার অজানা নয় যে, ভারতবর্ষের হিন্দুরা ভূত-প্রেত, নদ-নদী, গাছাপালা, পশু-পাখি, চাঁদ-সূর্য-তারকা ইত্যাদির পূজা করে।

সুলতান বললেন, আমি তা জানি। তাদের বোধ ও বুদ্ধির বিষয়টি নিয়ে আফসোস করি। হিন্দু জাতি ভীতু ও কল্পনা পূজারী। যাকেই ভয় পায় তাকেই উপাস্য বানিয়ে তার পূজা শুরু করে। বসন্ত একটি রোগ। কখনো তা মহামারি আকার ধারণ করে। তাই ভীত হয়ে তারা তার পূজা করে। তাকে মাতা বলে ডাকে। এভাবে একের পর এক উপাস্যের সংখ্যা তাদের বেড়েই চলেছে। আমি গভীরভাবে চিন্তা করে দেখেছি, হিন্দু জাতি প্রকৃত উপাস্য আর নির্ভেজাল ও খাঁটি ধর্মের সন্ধানে আছে। তাই তারা যাকে মনে করে সে তাদের ক্ষতি করতে পারে, তারই পূজা-অর্চনা শুরু করে দেয়।

শোনো মহাপূজারী ও সন্ন্যাসীরা! তোমরা হিন্দুদের বলে দাও তোমাদের হৃদয়ে প্রশান্তি ইসলাম ধর্ম গ্রহণের মাঝেই নিহিত রয়েছে। মুসলমানদের উপাস্য, রব সর্বদা-সর্বত্র বিদ্যমান। তিনি মহাশক্তিশালী। সকল ক্ষমতার আধার। অত্যন্ত দয়ালু, দয়াময়। যে তার সামনে শির অবনত করে, তিনি তার প্রতি দয়া করেন। আর যে বিমুখ হয়, তার উপর অসন্তুষ্ট হন। তিনিই জীবিতকে মৃত আর মৃতকে জীবিত করেন। তার নূরের রশ্মি এতো তীব্র ও সূক্ষ্ম যে, মানবচক্ষু তা ধারণ করতে অক্ষম। তাই মানবজাতির উচিত তারই উপাসনা করা, তারই সামনে শির নত করা। তাহলে তিনি তাদের অনুগ্রহ করবেন এবং একটি শক্তিশালী জাতিতে পরিণত করবেন।

ঠিক তখন আলতুনতাশ একটি কুঠার নিয়ে এলেন। সুলতান কুঠারটি হাতে নিয়ে বেদীতে উঠে দাঁড়ালেন। উচ্চস্বরে বলতে লাগলেন, হে হিন্দুরা! তোমরা দেখো, আমি তোমাদের উপাস্যকে, তোমাদের দেবতাকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলছি। তোমরা তোমাদের উপাস্যকে বলো, যদি তার শক্তি থাকে, তাহলে সে যেনো আমাকে তাড়িয়ে দেয় বা ধ্বংস করে।

পূজারী ও সন্ন্যাসীর দল দারুণ বিষন্ন, অত্যন্ত বেধনাবিধুর। আতংকে তাদের চেহারা বিবর্ণ-ফ্যাকাশে। তাদের দৃষ্টি সুলতানের উপর আটকে আছে। ঠিক তখন মহাপূজারী সুলতানের পদচুম্বন করে হাতজোড় করে বিনীত নিবেদন করে বললেন, অন্নদাতা সুলতান! আমাদের উপাস্যকে ভেঙে আমাদের হৃদয় চুরমার করবেন না। আমরা শুনেছি, আপনি এ মন্দিরের ধন-সম্পদের কথা শুনে তা সংগ্রহ করতে এসেছেন। আমরা মন্দিরের সব দৌলত আপনার পদপ্রান্তে উপস্থিত করছি। এই মহাদেবতার সমপরিমাণ স্বর্ণ আপনার সামনে উপস্থিত করছি। আমাদের নিবেদন, আপনি মহাদেবতার এ প্রতিকৃতি ভাঙবেন না।

সুলতানের চোখ বিস্ফারিত। ক্রোধে শরীর কম্পমান। বললেন, মহাপূজারী! তুমি ভুল শুনেছো। আমি সম্পদের লালসায় আসিনি। আমার আসার কারণ তোমাদের মহারাজা জানতো। আমি দূত পাঠিয়ে তাকে সতর্ক করে দিয়েছিলাম। কিন্তু সে আমার কথায় কর্ণপাত করেনি। আমি ধন-সম্পদ চাইনি। সম্পদের প্রতি আমার কোনো লালসা নেই। আমি তোমাদের কাছে কিছুই চাই না। তোমরা মূর্তিপূজা থেকে তওবা করো। আমি এখনই ফিরে যাবো।

মহাপূজারীর কণ্ঠ নমনীয়। বললেন, কিন্তু সুলতান! আমাদের পিতা, পিতামহ ও পূর্বপুরুষরা যাদের পূজা-অর্চনা করে এসেছেন, আমরা কীভাবে তাদের ত্যাগ করবো!

সুলতান বললেন, তাহলে তোমরা তোমাদের উপাস্যের ধ্বংস স্বচক্ষে অবলোকন করো। শিক্ষা গ্রহণ করো।

একথা বলেই সুলতান কুঠার তুললেন। তখন সকল সন্ন্যাসী, পূজারী আর মন্দিরের সেবকরা সুলতানের পায়ে পড়ে কাঁদতে লাগলো। বিনীত কণ্ঠে অশ্রুসজল নয়নে কাঁদছে আর বলছে, মহারাজা! মহান সুলতান! আমাদের প্রতি দয়া করুন। রহম করুন। আমাদের উপাস্যকে ভাঙবেন না। এর পরিবর্তে আপনি আমাদের থেকে সোনা-দানা-অলংকার যা চান নিয়ে নিন।

সুলতান উদ্বেলিত। লাখ লাখ মানবসন্তান যে মূর্তির পূজা করে চির

জাহান্নামী হচ্ছে, তাকে কিছুতেই ধরাপৃষ্ঠে থাকতে দেয়া যায় না। একে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে। এর নাম-নিশানা চিরতরে মুছে ফেলতে হবে। বললেন, তোমরা কি তাহলে আমাকে মূর্তি বিক্রয়কারী বানাতে চাচ্ছো। কোনো কিছুর বিনিময়ে আমি মূর্তি ভাঙা থেকে বিরত থাকবো না। আমি মূর্তি বিনাশী হিসেবে পরিচিত হতে চাই।

মহাপূজারীর বিনীত কণ্ঠ আবার ধ্বনিত হলো। বললেন, সুলতান! একটু দয়া করুন। এ মূর্তির সমপরিমাণ স্বর্ণ-সামগ্রী বা যা চান তাই প্রদান করবো। তবুও...।

সুলতান বললেন, যদি তুমি এ মন্দিরের সবগুলো কক্ষও স্বর্ণালংকার দ্বারা ভরে দাও, তবুও আমি মূর্তি ভাঙা থেকে বিরত থাকবো না। আমি কিছুতেই মূর্তির বিনিময়ে কিছু গ্রহণ করতে পারবো না। তোমরা এ মূর্তিকে স্রষ্টার আসনে বসিয়েছো, শিরকে লিপ্ত হয়েছো। মুসলমান কিছুতেই শির্‌ক সহ্য করতে পারে না।

সুলতান আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিলেন এবং কুঠার তুলে সর্বশক্তি দিয়ে সোমনাথের মহাদেবতার মাথায় আঘাত করলেন। কুঠারের আঘাতে মাথাটির কয়েক টুকরো হয়ে ছিটকে পড়লো। মূর্তির ভেতরটা ছিলো ফাঁকা। তাই কয়েক আঘাতেই তার বুক পর্যন্ত ক্ষয়ে গেলো। উপল খণ্ডগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়লো চারপাশে।

মূর্তির পেটে যখন আঘাত করলেন, দেখলেন হীরা-পান্না-চুন্নি, মণি-মুক্তায় পরিপূর্ণ তার পেট।

সুলতান ও মুজাহিদরা তা দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। কোটি কোটি টাকার মহামূল্যবান ধাতুর ঔজ্জ্বল্যে চারদিক আলোকিত হয়ে ওঠলো। এ দৃশ্য দেখে সুলতানসহ সবাই তাকবীর ধ্বনি দিলেন। সুলতান আনন্দিত হয়ে মহাপূজারীকে বললেন, দেখো আমার রবের মাহাত্ম। তোমরা আমাকে যে পরিমাণ ধন-সম্পদ দিতে চেয়েছিলো, তার চেয়ে শতগুণ বেশি সম্পদ এখন মূর্তির পেট থেকে বেরিয়ে এসেছে।

সুলতান সব হীরা-জহরত ও স্বর্ণালংকার জমা করার নির্দেশ দিলেন। স্বর্ণের শিকলগুলোও খুলে জমা করার নির্দেশ দিলেন। ঝাড়-বাতিগুলো, দেয়ালে অংকিত স্বর্ণের ছবিগুলো এবং ভূগর্ভস্থ কক্ষের সম্পদ সবকিছু জমা করা হলো।

সকল সম্পদ যখন এক জায়গায় জমা করা হলো, তখন সুলতান মাহমুদ গজনবী হতবাক হলেন। তিনি ভাবতে পারেননি, কোনো মন্দিরে এতো সম্পদ থাকতে পারে।

পয়ষট্টি.

সুলতান এই মণি-মুক্তা আর মহামূল্যবান অলংকারগুলো কেল্লায় নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। সুলতানের নির্দেশ পাওয়ামাত্র মুজাহিদরা সেগুলো নিয়ে যাওয়া শুরু করলো। মহাপূজারীর চোখে তখন আক্ষেপ আর বেদনার দৃষ্টি। অশ্রু ছল্ ছল্ পলকহীন দৃষ্টিতে শুধু দেখতে লাগলেন।

সুলতান সেনাপতি আলতুনতাশকে মন্দিরে রেখে আমীর আলী, হারুন, বুরহান ও আরো কয়েকজন সেনাপতিকে সাথে নিয়ে কেল্লায় ফিরে এলেন।

সুলতান যে কক্ষে অবস্থান করছিলেন, তার পার্শ্ববর্তী এক কক্ষে এনে সম্পদগুলো থরে থরে সাজিয়ে রাখা হলো। সুলতান সেনাপতি আমীর আলীকে নির্দেশ দিলেন, সব সম্পদ জমা করার পর কক্ষটি তালাবদ্ধ করে দেবে। মজবুত প্রহরার ব্যবস্থা করে বিশ্রাম করতে যাবে। হারুন ও বুরহান বিশ্রামের জন্য অনুমতি প্রার্থণা করলে সুলতান বললেন, না, ...আজ তোমরা দু'জন আমার সাথেই খাবে।

সুলতানের এ কথা শুনে তারা একেবারে অপ্রস্তুত হয়ে গেলো। বিস্ময়তার দোলায় দোল খেয়ে সুলতানের শুকরিয়া আদায় করলো। সুলতানকে অনুসরণ করে চলতে লাগলো।

সুলতান তার কক্ষে এসেই দেখলেন, ধর্মপাল বসে আছে। রাজকুমারী চন্দ্রামুখী, শোবাদেবী, কামিনীও এক পার্শ্বে উপবিষ্ট। তারা সুলতানকে দেখেই দাঁড়িয়ে গেলো। ধর্মপাল সুলতানকে আস্সালামু আলাইকুম বলে সালাম করলেন।

সুলতান সালামের উত্তর দিয়ে ধর্মপালের দিকে এগিয়ে গেলেন এবং উষ্ণ আবেগে বুকে জড়িয়ে আলিঙ্গন করলেন।

তাদের এই উষ্ণ আবেগ আর আলিঙ্গনের মধুর দৃশ্য দেখে কক্ষের সবাই বিস্মিত হয়ে গেলো।

সুলতান তার সামনে গিয়ে বসলেন। হারুন ও বুরহান তাঁর সামনে বসলো। চন্দ্রামুখী, কামিনী ও শোবাদেবী সুলতানের ডান পার্শ্বে বসলো।

সুলতান ধর্মপালকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি মুক্তি পেলে কীভাবে?

ধর্মপাল শোবাদেবীর দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসতে হাসতে বললো, এই দেবীর সহায়তায়।

সুলতান শোবাদেবীর দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন। শোবাদেবীও মৃদু হেসে মাথানত করে নিলো। এ দৃশ্য সবাই দেখলো ও বিস্মিত হলো।

ইতিমধ্যে খাবার এসে গেলো। একজন পরিবেশক এসে অদূরে

দাঁড়ালো। সুলতান বললেন, চন্দ্রামুখী! তুমি কি আমাদের সাথে খাবে?

ধর্মপাল বললেন, সুলতান! এখনই তাকে নিয়ে এক সাথে বসে খাওয়া ঠিক হবে না।

সুলতান বললেন, আচ্ছা... কিন্তু তুমি আর শোবাদেবী?

ধর্মপাল বললো, অবশ্যই ...আমরা এক সাথে বসবো।

চন্দ্রামুখী ও কামিনী সুলতান আর ধর্মপালের কথাবার্তায় চকিত হয়ে ওঠলো। উভয়ের চোখে বিস্ময়ভরা দৃষ্টি। ধর্মপাল আর শোবাদেবীকে তারা অশ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখতে লাগলো।

ধর্মপাল বুঝে ফেললেন, তারা তাদের পূর্বেকার শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলেছে। তাদের চোখে এখন তুচ্ছতায় ভরা দৃষ্টি। তারা মনে মনে তাদের তিরস্কার করছে। তাই বললেন, তোমরা বুঝি বিস্মিত হচ্ছো। তোমরা বোধ হয় জানো না, সাধু আর সন্নাসীদের ধর্মতত্ত্ব কী...।

সুলতান বললেন, খাওয়া-দাওয়ার পর সব আলোচনা হবে। তারপর পরিবেশকদের দিকে ফিরে বললেন, এই মেয়ে দু'টির জন্য কি খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে?

পরিবেশক বললো, হ্যাঁ, সুলতান! একেবারে প্রস্তুত।

সুলতান বললেন, যাও... এক্ষুনি তাদের নিয়ে যাও।

পরিবেশক তাদের নিয়ে গেলো। একটু দূরেই তাদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। তারা সেখানে গিয়ে বসে খেতে শুরু করলো। ধর্মপাল, শোবাদেবী আর সুলতান একসঙ্গে খেতে শুরু করলেন।

খাবার শেষে সুলতান ধর্মপালকে বললেন, আজকের দিনটি অত্যন্ত বরকতময়। সোমনাথ বিজয় হলো। অজস্র ধন-সম্পদ হস্তগত হলো। চন্দ্রামুখী আর শোবাদেবীকেও পাওয়া গেলো। এতোদিন পর আজ সেই রহস্য উন্মোচিত করার সময় এসেছে।

ধর্মপাল বললেন, বেশ ভালো কথা। তা হলে কি বিষয়টি আমাকেই বর্ণনা করতে হবে?

সুলতান বললেন, তোমার চেয়ে বেশি ভালো করে কেউ বলতে পারবে না।

ধর্মপাল সবার দিকে ফিরে বললেন, আমার প্রিয় সন্তানরা! আজ আমি তোমাদের এক ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণনা করবো। এটা কোনো কল্পকাহিনী নয়। বরং একটি হৃদয় বিদারক সত্য ঘটনা। এর প্রত্যেকটি শব্দ খুব মনোযোগের সাথে শুনবে।

ধর্মপাল সুলতানের দিকে তাকিয়ে বললেন, সুলতান কি আমাকে সেই রহস্যময় কাহিনী বর্ণনা করার অনুমতি দিচ্ছেন?

সুলতান বললেন, হ্যাঁ, তুমি বর্ণনা করো। তবে খুব সংক্ষেপে বর্ণনা করবে। এখন বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরার দরকার নেই।

ধর্মপাল বললেন, আচ্ছা, সংক্ষেপেই বর্ণনা করবো।

ধর্মপাল বর্ণনা শুরু করলেন।

আমার প্রিয় সন্তানরা! ৩৯০ হিজরীর ঘটনা বলছি। তখন মুলতানের শাসক আবুল ফাতাহ দাউদ কারামতি। কারামতি ভ্রষ্ট দলের অনুসারী ছিলো। তাই সে তার নতুন ধর্মমতের প্রচার শুরু করলো। মুলতানের মুসলমানদের উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করলো। কেউ কেউ চাপের মুখে তার মতাদর্শ মেনে নিলো। কেউ আবার তা অস্বীকার করলো। আবুল ফাতাহ দাউদ তাদেরকে শত্রু মনে করে তাদের উপর জুলুম অত্যাচার শুরু করলো। তার এই জুলুম-অত্যাচারের কাহিনী সুলতান মাহমুদ গজনবী শুনতে পেলেন। তিনি মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে তাকে শায়েস্তা করতে রওনা হলেন। কিন্তু বর্ষা মওসুম এসে যাওয়ার কারণে প্রচুর বৃষ্টিপাত শুরু হলো। নদী-নালা, খাল-বিল পানিতে থৈ থৈ করতে লাগলো। চারদিকে শুধু পানি আর পানি। পানির এই বিশাল পথ অতিক্রম করে তার মুলতানে পৌঁছা এক অকল্পনীয় বিষয় হয়ে দাঁড়ালো।

সে সময় পেশোয়ার থেকে লাহোর পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের শাসক ছিলো আনন্দ পাল। সুলতান আনন্দ পালের নিকট আবেদন করলেন, যেনো তাকে তার সৈন্য নিয়ে তার রাজ্য অতিক্রম করার সুযোগ দেয়। কিন্তু আনন্দ পালের অন্তর ছিলো দারুণ কুৎসিত। সে সুলতানকে তো অনুমতি দিলোই না; বরং দুরভিসন্ধি করলো যে, সুলতান এখন ক্লান্ত। তাই তাকে সহজেই পরাজিত করে মুলতান দখল করে নেয়া যাবে। সে গোপনে তার বাহিনীকে প্রস্তুত করতে লাগলো।

দূরদর্শী ও চৌকস সুলতানের নিকট তা অজ্ঞাত রইলো না। তবুও সুলতান তাঁর ইচ্ছায় অনড় রইলেন। সুলতান প্রথমে আনন্দ পালের সাথে যুদ্ধ করার ইচ্ছে করলেন।

সুলতান অত্যন্ত বীর বিক্রমে আনন্দ পালের উপর আক্রমণ করলেন। হিন্দু যোদ্ধারা সুলতানকে প্রতিহত করতে পারলো না। রণেভঙ্গ দিয়ে পলায়ন করলো। সুলতান তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলেন। দিশেহারা রাজা প্রাণের মায়ায় নিবিড় এক অরণ্যে গিয়ে আত্মগোপণ করলো। সুলতান ন্যাছোড়বান্দা। তিনি বনের গাছ কেটে ফেলতে ও অরণ্যে আগুন জ্বালাতে বললেন। আনন্দ পাল এতে দারুণ ভয় পেয়ে সুলতানের দয়া ও অনুগ্রহ প্রার্থণা করলো।

সুলতান আনন্দ পালের ব্যাপারে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত নেননি। ইতিমধ্যে শুনতে পেলেন, আবুল ফাতাহ দাউদ সরন্দীপে পালিয়ে যাচ্ছে। নিরীহ মুসলমানের উপর নির্যাতনকারী এই আবুল ফাতাহকে সুলতান ক্ষমা করতে চাইলেন না। তিনি আনন্দ পালকে ছেড়ে মুলতানের দিকে ছুটে গেলেন। তাকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেললেন। আবুল ফাতাহ দাউদ অবরুদ্ধ হয়ে পড়লো। মাত্র সাত দিনের অবরোধে আবুল ফাতাহ দাউদ বুঝতে পারলো, শীঘ্র দুর্গের পতন ঘটবে। তাই সে অত্যন্ত অনুনয়-বিনয়ের সাথে সুলতানের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা চাইলো। সুলতান তাকে ক্ষমা করে দিলেন। এটা ছিলো আমাদের মহান সুলতানের ভারত বর্ষে চতুর্থ আক্রমণ।

৩৯৮ সালে সুলতান এক বিশাল বাহিনী তৈরি করলেন। তিনি আনন্দ পালকে শায়েস্তা করার জন্য ছুটে গেলেন। আনন্দ পাল সুলতানের আগমনের সংবাদ শুনেই ভারত বর্ষের সকল হিন্দু রাজা-বাদশাহদের সংবাদ দিলেন। পত্রে লিখলেন, সুলতান মাহমুদ ভারতবর্ষ থেকে হিন্দুদের তাড়িয়ে দিতে চায়। হিন্দু ধর্মকে দিতে চায়। হিন্দু জাতিকে শির উঁচু করে থাকতে হলে আমার সাহায্যে এগিয়ে আসা দরকার। ঈশ্বর না করুন, যদি কেউ আমাকে সাহায্য না করে আর আমার পরাজয় ঘটে, তাহলে সুলতানের হাতে ভারতবর্ষের কর্তৃত্ব এসে যাবে। এরপর কোনো রাজা-মহারাজাই আর নিরাপদ থাকবে না।

আনন্দ পালের এই চিঠি রাজা-মহারাজাদের অন্তরে দারুণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করলো। আজিল, কানজর, কুনূজ, দিল্লী, আজমীর ইত্যাদি অঞ্চলের রাজারা আনন্দ পালের রাজত্ব রক্ষার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দুর্ধর্ষ সৈন্য প্রেরণ করলো।

এ যুদ্ধ সাধারণ হিন্দু নর-নারীর মাঝে এমন প্রতিক্রিয়া ও আলোড়ন সৃষ্টি করলো যে, স্বচ্ছল হিন্দু নারীরা তাদের অলঙ্কার দিয়ে আর সাধারণ গরীব অস্বচ্ছল হিন্দুরা চরকিতে সুতা কেটে তার অর্থ দিয়ে এ যুদ্ধের তহবিলকে স্ফিত করে তুললো।

ফলে আনন্দ পালের নেতৃত্বে এক বিশাল সৈন্য বাহিনী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলো, যারা সুলতান মাহমুদের বাহিনীর মত পাঁচ বাহিনীর সাথে যুগপৎ যুদ্ধ করতে যথেষ্ট। পেশোয়ারের বিস্তৃত প্রান্তরে সুলতান মাহমুদের মুজাহিদ বাহিনী অবস্থান গ্রহণ করেছিলো। আনন্দ পাল তার বিশাল বাহিনী নিয়ে সেখানে পৌঁছলো। চল্লিশ দিন পর্যন্ত উভয় বাহিনী মুখোমুখী অবস্থান করে রইলো। কেউ কারো উপর আক্রমণ করলো না। আসলে আনন্দ পাল

আরো সৈন্য আগমনের প্রত্যাশায় ছিলো। তার সাহায্যে প্রতিদিনই দলে দলে সৈন্য আসছিলো।

এ সময়ে আনন্দ পাল গুর্খা বাহিনীকে তার সৈন্য দলের অন্তর্ভুক্ত করে নিলো। এরা ছিলো সাহসী ও অত্যন্ত দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। বিশ হাজার গুর্খা সৈন্য আনন্দ পালের বাহিনীতে এসে যোগ দিলো। আনন্দ পালের সাহস এবার বেড়ে গেলো। সে গুর্খা বাহিনীকে সামনে অগ্রসর হওয়ার নিদের্শক দিলো এবং অন্যান্য সকল যোদ্ধাদের নিয়ে সে পেছনে পেছনে অগ্রসর হতে লাগলো।

সুলতান মাহমুদ গজনবী তার বাহিনীকে বিন্যস্ত করে যুদ্ধের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলেন। তিনিও এগিয়ে এলেন। কিন্তু গুর্খা বাহিনীকে বেশিক্ষণ দমন করে রাখতে পারলেন না। তারা মুজাহিদ বাহিনীর ভেতরে প্রবেশ করলো। মুজাহিদদের শহীদ করতে লাগলো।

মুজাহিদ বাহিনীও প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তুলতে লাগলো। কিন্তু তারা দুই দিক থেকে আক্রান্ত হলো। একদিকে গুর্খা বাহিনী, অপর দিকে আনন্দ পালের বাহিনী। এ বিশাল বাহিনীর সাথে লড়তে মুজাহিদ বাহিনীকে বেশ বেগ পেতে হলো। প্রায় তিন বা সাড়ে তিন হাজার মুজাহিদ চোখের পলকে শহীদ হয়ে গেলো। তবে মুজাহিদরাও প্রায় পাঁচ হাজার হিন্দু যোদ্ধাকে হত্যা করতে সমর্থ হলো। যুদ্ধ হিন্দুদের অনুকূলেই হচ্ছিলো। তবে গুর্খা বাহিনী এক হৃদয়বিদারক কান্ড করে বসলো। তারা নারী ও শিশুদের তাঁবুতে আক্রমণ করে বসলো। সেকেব আরসালান তাদের নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলো। পূর্ণ শক্তিতে সে তাদের প্রতিহত করতে চেষ্টা করলো এবং তাদের মেরে সেখান থেকে তাড়িয়ে দিলো। তারা পালিয়ে যাওয়ার সময় সেকেব আরসালানের শিশু কন্যা নওশাবাকে তুলে নিয়ে গেলো।

নওশাবার বয়স তখন মাত্র এক বৎসর। অত্যন্ত সুশ্রী, সুন্দরী। একেবারে চাঁদের মতো ফুটফুটে। তাকে দেখলেই যে কেউ আদর করতে বাধ্য। হয়তো গুর্খা বাহিনীর পছন্দ হয়েছিলো তাই নিয়ে গেছে। এতে তার মা সেতারা বেগম ব্যথিত ও দুঃখভরাক্রান্ত হয়ে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললো।

সেকেব আরসালান যখন গুর্খা বাহিনীকে পরাজিত করছিলো, তখন আনন্দ পালের বিশাল বাহিনীর সাথে সুলতান মাহমুদ গজনবী যুদ্ধ করে যাচ্ছেন। অত্যন্ত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হচ্ছিলো। যদিও মুজাহিদ বাহিনী প্রাণপণ যুদ্ধ করে যাচ্ছে। মৃত্যুর নেশায় পাগল হয়ে আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে; কিন্তু তারপরও মনে হচ্ছিলো, মুজাহিদ বাহিনী বুঝি রণতরঙ্গে হারিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আল্লাহ মুজাহিদ বাহিনীকে সাহায্য করলেন। হঠাৎ আনন্দ পালের

হাতিটি ক্ষেপে ওঠলো। হাতিটি উদ্ভ্রান্তের ন্যায় আনন্দ পালকে নিয়ে ছুটতে লাগলো। হাতি আনন্দ পালকে নিয়ে ছুটে যেতে দেখে হিন্দুরা মনে করলো, আনন্দ পালের পরাজয় হয়েছে। তাই সে রণাঙ্গন ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। ব্যস্ এরপর আর দেরি হলো না। হিন্দু যোদ্ধারাও পঙ্গপালের মতো রণাঙ্গন ছেড়ে পালাতে লাগলো।

মুজাহিদ বাহিনী পশ্চাদ্ধাবন করে তাদের হত্যা করতে লাগলো। সেকেব আরসালান তার বাহিনী নিয়ে দশ হাজার হিন্দু যোদ্ধাকে তাড়িয়ে নিয়ে গেলো এবং আট হাজার যোদ্ধাকে হত্যা করে ফিরে এলো। অন্যান্য মুজাহিদরাও বহু হিন্দু যোদ্ধাকে হত্যা করলো। এভাবে মুজাহিদরা বিরাট বিজয় লাভ করলো। এটা সুলতান মাহমুদের ষষ্ঠবার ভারতবর্ষে আক্রমণ।

এ যুদ্ধে ভারতবর্ষের বড় বড় রাজা-মহারাজারা যোগ দিয়েছিলেন। অগণিত অসংখ্য যোদ্ধা জড়ো হয়েছিলো। কিন্তু আল্লাহ তাদের পরাজিত করেছিলেন আর মুজাহিদ বাহিনী বিরাট বিজয় লাভ করেছিলো। তবে এ যুদ্ধে এক অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছিলো। তাহলো, নওশাবাকে হিন্দু বাহিনী তুলে নিয়ে গেছে। ফলে মনের দুঃখে সেকেব আরসালান মুজাহিদ বাহিনী থেকে অব্যাহতি নিলেন।

সুলতান মাহমুদ গজনবী নওশাবাকে ফিরিয়ে আনার অনেক চেষ্টা-তদবীর করলেন। কিন্তু কোনো কাজ হলো না। বরং একথাও জানা গেলো না, গুর্খা বাহিনী তাকে কোথায় নিয়ে গেছে, তাকে কার কাছে সমর্পণ করেছে।

এতোটুকু বলার পর ধর্মপাল বক্তব্য বন্ধ করে দিলেন। তার চেহারায় তখন একটি উদাস ভাব ছড়িয়ে আছে। একটি জমাটবাধা বেদনা যেনো গলতে শুরু করেছে।

ছেষট্টি.

ধর্মপালের ঐতিহাসিক উপাখ্যান সবাই খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছিলো। ধর্মপাল ইতিমধ্যে সুলতান মাহমুদ গজনবীর ভারতবর্ষের আক্রমণের দু'টি কাহিনী বর্ণনা করলেন।

তিনি আবার বলতে লাগলেন, আমি একটি কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। সেকেব আসালান আর আলেপ আরসালান দুই ভাই ছিলো। তারা উভয়ে সুলতান মাহমুদ গজনবীর মুজাহিদ বাহিনীর অত্যন্ত খ্যাতিমান দুই সেনাপতি ছিলো। সুলতান এ ভ্রাতৃদ্বয়কে অত্যন্ত বিশ্বাস করতেন। তাদের প্রতি সুলতানের অনুগ্রহ-অনুকম্পার শেষ ছিলো না।

আমি সুলতানের ভারতবর্ষে আক্রমণের যে ষষ্ঠ যুদ্ধের আলোচনা করলাম, এতে সেকেব আরসালান তার প্রাণপ্রিয় হৃদয়ের টুকরো এক বৎসরের কন্যা নওশাবাকে হারানো ছাড়া আরো একটি অসহনীয় ব্যাথায় আক্রান্ত হয়। এ যুদ্ধে তার ভাই আলেপ আরসালান শাহাদাতবরণ করে। আলেপ আরসালান তার স্মৃতি স্বরূপ তিন বছরের একটি ফুটফুটে ছেলেকে রেখে যায়। তার স্ত্রী পূর্বেই ইন্তেকাল করেছিলো।

সেকেব আরসালান ও আলেপ আরসালান দুই ভাইয়ের মাঝে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিলো। তাই শৈশবেই তারা তাদের ছেলে ও মেয়ের বিয়ের বাগদান কার্য সম্পাদন করে রেখেছিলো। ভেবেছিলো, পরিণত বয়সে তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করবে। শিশু দু'টি ছিলো ভারি চমৎকার। অত্যন্ত ফুটফুটে। একবার কেউ তাদের দেখলে আবার ফিরে এসে তাদের দেখতে হতো।

দু'ভাইয়ের অন্তরে ছিলো আনন্দের উত্তাল তরঙ্গ। তারা তাদের বিয়ের বয়সের পৌছার অপেক্ষায় ছিলো। কিন্তু তারা তাদের ভাগ্যের কথা কিছুই জানতো না।

সেকেব আরসালান তার ভাই ও মেয়েকে হারিয়ে পাগলের মতো হয়ে গেলো। অবশেষে সুলতান মাহমুদের কাছে অনুমতি নিয়ে মেয়ের সন্ধান করার জন্য সস্ত্রীক পেশোয়ারে রয়ে গেলো। বেশ কিছু মুসলমান পেশোয়ারে থাকতো। তারা হিন্দুদের ভাষা বুঝতো। তাদের সাথে কথাবার্তা বলতো।

সেকেব আরসালান প্রথমে মুসলমানদের থেকে হিন্দুদের আঞ্চলিক ভাষা শিখলো। এরপর সে সংস্কৃত ভাষা শিখতে শুরু করলো। কিন্তু হিন্দুরা সহজে তাকে সংস্কৃত ভাষা শেখাতে রাজি হলো না। অনেক প্রলোভন এবং এই প্রতিশ্রুতি পর যে, সে কাউকে তা বলবে না– তারা সংস্কৃত ভাষা শেখাতে রাজি হলো।

সেকেব আরসালান নিজেও চাচ্ছিলো না, তার সংস্কৃত ভাষা শেখার বিষয়টি কেউ জানুক। তাই সে অত্যন্ত গোপনে সংস্কৃত ভাষা শিখতে লাগলো। চার-পাঁচ বৎসরেই আরসালান তার স্ত্রীকেও সংস্কৃত ভাষা শেখালো।

এদিকে সেকেব আরসালান বসে নেই। নওশাবার সন্ধানও চালাতে লাগলো। পেশোয়ার ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় যে গুর্খারা থাকতো, তাদের সাথে ভাব জমিয়ে ফেললো। তারাও নওশাবার সন্ধান করতে লাগলো।

তবে একটি বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, সেকেব আরসালান ও তার স্ত্রী নওশাবার কথা যতোই ভুলে যাওয়ার ইচ্ছে করতো, ততোই তার কথা ও

স্মৃতি তাদের অস্থির করে তুলতো। পাঁচ বৎসর কেটে যাওয়ার পরও তারা তার কথা ভুলতে পারেনি। তাদের মনে হতো, এ হৃদয় বিদারক ঘটনাটি মাত্র গতকাল ঘটেছে।

একদিন ঘটনাক্রমে এক গুর্খা এসে সেকের আরসালানকে জানালো, যে লোকটি নওশাবাকে তুলে নিয়েছিলো, সে এসেছে। সে নওশাবার খরব জানে।

তখনই সেকেব আরসালান তার সঙ্গে ছুটে গেলো। পেশোয়ারের বাইরে এক কুটিরে জনৈক সন্ন্যাসী বাস করতো। এক বৃদ্ধ গুর্খা তার মেহমান হয়েছিলো। তারা দু'জন সেই মেহমানের নিকট গিয়ে পৌঁছলো। আলাপচারিতায় জানালো, সে-ই নওশাবাকে তুলে নিয়ে গিয়েছিলো। ফুটফুটে নওশাবার প্রতি তার এতো মমতা হয়েছিলো যে, মুসলমানরা তাকে তার থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়ার ভয়ে সে তাকে নিয়ে আজমীর চলে গিয়েছিলো। ঘটনাক্রমে আজমীরের মহারাজা তাকে প্রতিপালনের আগ্রহ প্রকাশ করলেন। গুর্খা লোকটি তাকে দিতে অস্বীকার করলো। মহারাজার নিকট ফুটফুটে মেয়েটি এতো ভালো লেগেছিলো যে, জোর করে তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন। ফলে ব্যর্থ হয়ে মেয়েটিকে মহারাজার নিকট সমপর্ণ করতে হয়েছিলো। মহারাজা মেয়েটিকে নিয়ে মহারাণীকে উপহার দিলেন।

মহারাণী পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় ফুটফুটে মেয়েকে পেয়ে আনন্দে বাগবাগ হয়ে যান। তাকে নিজ তত্ত্বাবধানে প্রতিপালন করতে থাকেন। ইতিমধ্যে ঘটনাক্রমে আজমীরে সোমনাথের মহারাজা আসেন। সোমনাথের মহারাজা তাকে দেখেই অভিভূত হয়ে ওঠলেন। সোমনাথ মহারাজার কোনো সন্তান ছিলো না। সন্তানের জন্য তার হৃদয় সর্বদা খাঁ খাঁ করতো। জীবনটাকেই অপূর্ণ মনে হতো। পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় ফুটফুটে সৌম্যসুন্দর মেয়েটিকে দেখে সোমনাথ মাহারাজার হৃদয় মরুতে মমতার ঝড় ওঠলো। খোঁজ-খবর নিয়ে মেয়েটির জীবন কাহিনী শুনলেন। এরপর আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না। মেয়েটির প্রতিপালনের দায়িত্ব নেয়ার বিনীত অনুরোধ পেশ করলেন। আজমীরের মহারাজা এ আবেদন উপেক্ষা করতে পারলেন না। সোমনাথ মহারাজা মেয়েটিকে নিয়ে সোমনাথ চলে গেলেন। নিরাশ ও বেদনাবিধুর হৃদয় নিয়ে গুর্খা লোকটি আবার পেশোয়ারে ফিরে এলো।

এঘটনা শুনে সেকেব আরসালান অত্যন্ত আনন্দিত হলো। স্ত্রীকে সব ঘটনা শুনালো। স্ত্রীও অত্যন্ত আনন্দিত হলো। কিন্তু সোমনাথ সে তো বহু দূর। সমুদ্রের উপকূলে অবস্থিত এক দেশ। আর এটাও অসম্ভব যে,

সুলতান মাহমুদকে বিষয়টি জানালে তিনি এখনি সসৈন্যে সোমনাথ আক্রমণ করবেন।

অবশেষে সেকেব আরসালান ও তার স্ত্রী সোমনাথ যাওয়ার জন্য গোপনে গোপনে তৈরি হতে লাগলো। তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো, তারা মুসলমানদের পোশাক পরে সেখানে যাবে না। গেলে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া দক্ষিণাঞ্চলের হিন্দুরা মুসলমানদের দেখলেই হত্যা করতে তেড়ে আসে।

তারা হিন্দু সাধু-সন্যাসীর পোশাক পরে আজমীরের পথে রওনা হয়ে গেলো। তারা শুধু হিন্দুদের আঞ্চলিক ভাষায়ই নয়– বরং সংস্কৃত ভাষায়ও দারুণ পারদর্শী ছিলো। তাই কেউ তাদের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ করলো না। বরং তাদের দুনিয়া বিরাগ সন্যাসী মনে করে যথেষ্ঠ ইজ্জত ও সম্মান করতে লাগলো। তাদের সেবায় প্রাণপাত করতে তারা প্রতিযোগিতায় নেমে পড়লো।

তারা হিন্দুদের মাঝে এ খবর ছড়িয়ে দিলো যে, তারা সোমনাথ যাচ্ছে। সংস্কৃত ভাষা জানা থাকার কারণে হিন্দুরা তাদের মহাপণ্ডিত পূজারী মনে করছে। ফলে তাদের পৌছার পূর্বেই তাদের খ্যাতির সংবাদ সোমনাথে গিয়ে পৌছে।

একদিন সত্যই তারা সোমনাথ পৌছলো। তবে শহরে না গিয়ে নির্জন বনের ধারে একটি কুটির তৈরি করে সেখানে বাস করতে লাগলো।

তাদের দিন-রাত একই চিন্তা, কীভাবে মহারাজার সাথে সাক্ষাৎ করবে, নওশাবাকে দেখতে পাবে। কীভাবে পিতৃ-মাতৃ হৃদয়ের আগুন শীতল করতে পারবে।

এক কান দু'কান হয়ে অবশেষে সোমনাথের মহারাজাও তাদের সুনাম-সুখ্যাতির কথা শুনে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য তাদের কুটিরে এলেন। প্রথম সাক্ষাতেই মহারাজা সন্যাসীর কথাবার্তা ও জ্ঞান গভীরতায় মুগ্ধ হয়ে তার ভক্ত হয়ে গেলো।

মহারাজা সন্যাসীকে প্রস্তাব দিলেন, সে কি তার কন্যা রাজকুমারী চন্দ্রামুখীকে শিক্ষা-দীক্ষার দায়িত্ব নেবে?

সেকেব আরসালান মহারাজার প্রস্তাব মেনে নিলো। তার পরদিনই রাজকুমারী চন্দ্রামুখী তার বেশ কিছু সখী নিয়ে নির্জন বনে সন্যাসীর সাক্ষাতে এলো। সে তখন সাত-আট বৎসরের কিশোরী। সেকেব আরসালান ও তার স্ত্রী দেখামাত্রই তাকে চিনে ফেললো যে, সে-ই নওশাবা– তাদের হৃদয়ের টুকরো, চোখের মণি।

উভয়ের হৃদয়ে প্রচন্ড ঝড় শুরু হলো। হৃদয় খুলে দিয়ে তাকে আদর করতে, মমতা করতে, কোলে টেনে নিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে মন চাইলো। আর বলে দিতে যে, তারা তার পিতামাতা। কিন্তু এ কথা বললে জীবননাশের আশঙ্কা রয়েছে। তারা ধৈর্যধারণ করে রইলো এবং তার শিক্ষা- দীক্ষার কার্যক্রম শুরু করলো।

এতটুকু কাহিনী শুনার পর চন্দ্রামুখীর চোখে এক সমুদ্র বিস্ময় জেগে ওঠলো। চোখ দু'টিতে অশ্রু ছল্ ছল্ করে ওঠলো। ঠোঁট দু'টি আবেগের গমকে কেঁপে ওঠলো। বললো, তাহলে কি আমার নাম নওশাবা!

ধর্মপালের কণ্ঠও আবেগঘন। বললেন, হ্যাঁ, তোমার নাম নওশাবা। তুমিই সেই নওশাবা। তুমি এক তুর্কী নারী। তুর্কী আমীর ও সুলতান মাহমুদ গজনবীর সেনাবাহিনীর বিখ্যাত সেনাপতি সেকেব আরসালানের কন্যা।

চন্দ্রামুখী কান্না বিজড়িত কণ্ঠে বললো, তাহলে... তাহলে... আমার পিতা-মাতা কোথায়?

ধর্মপালের কণ্ঠও কান্নাবিজড়িত। বললেন, বেটী! একটু ধৈর্যধারণ করো। সবকিছুই জানতে পারবে।

সেকেব আরসালান তাকে মনোযোগ দিয়ে শিক্ষাদীক্ষা দিতে লাগলো। বেশ কিছু দিন গড়ালো। মহারাজা প্রায়ই এসে সেই সন্যাসীর সাথে সাক্ষাৎ করতো। তার সাথে কথাবার্তা বলতো। তাই মহারাজা তাকে শুধুমাত্র সন্যাসীই মনে করতেন না, বরং সে যে একজন অত্যন্ত জ্ঞানী, দূরদর্শী, রাজনীতিবিদ, আচার-আচরণে মার্জিত তাও বুঝে ফেললেন। তাই গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল বিষয়সমূহে তার সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিতে শুরু করেন।

এর মাঝে চন্দ্রামুখী বা নওশাবা কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে উপনীত হলো। তার ঝলমলে দেহলাবণ্য ও অপূর্ব সৌন্দর্যের কথা ভারতবর্ষে চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো।

সেকেব আরসালান তাকে সেখান থেকে নিয়ে যাওয়ার অনেক চেষ্টা করলো। কিন্তু সফল হলো না। সবচে' বড় বাঁধা ছিলো, চন্দ্রামুখী জানতো না সে কে। আর বললেও তার বিশ্বাস হতো না।

অবশেষে সেকেব আরসালান সুলতান মাহমুদ গজনবীর নিকট একটি পত্র লেখেন এবং বিষয়টি খুলে বর্ণনা করেন। চিঠি পাওয়ার পরই সুলতান আক্রমণের প্রস্তুতি শুরু করেন।

এ আক্রমণের ফলাফল কী হয়েছিলো তা আমরা সবাই জানি।

চন্দ্রামুখী তুমি তো জেনে গিয়েছো, তুমিই সেই নওশাবা। সেকেব আরসালানের কন্যা। আর সেকেব আরসালান হলো ধর্মপাল। আমি তোমার গুরুজ্বী ধর্মপাল।

হঠাৎ চন্দ্রামুখীর চোখের উপর থেকে অজ্ঞতার অন্ধকারের আবরণ দূর হয়ে গেলো। রোরুদ্য কণ্ঠে দাঁড়িয়ে সেকেব আরসালানের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে কাঁদতে শুরু করলো। আহ্! আপনি আমার পিতা! পিতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত আমি এক হতভাগ্য তুর্কী কন্যা! এক মুসলিম নারী! আপনি যখন আমাকে শিক্ষা দিতেন, তখন আমার হৃদয় আপনার দিকে তীব্র আকর্ষণ অনুভব করতো। আমি মনে করতাম, আপনি আমার দীক্ষাগুরু। তাই আপনার দিকে আমার হৃদয়ের এ টান। হায়! আমি তো জানতাম না এটা রক্তের টান! এটা রক্ত ধারার আকর্ষণ! আচ্ছা আব্বা! আমার আম্মাজান কোথায়? তাকে কি আমি দু'চোখে দেখতে পাবো না?

সেকেব আরসালানের কণ্ঠ কান্নাবিজড়িত। তির তির করে কাঁপছে তার ওষ্ঠাধর। বলতে চাইলেও কান্নার গমকে বলতে পারছেন না। অবশেষে বললেন, শোবাদেবী তোমার মাতা।

চন্দ্রামুখী দারুণ বিস্মিত হলো। সে পিতার কোল ছেড়ে মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়লো। শোবাদেবী তাকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে আদর করতে লাগলো। চোখ দিয়ে তার দর দর করে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। যেনো জীবনের সব কষ্ট তার হৃদয় নিংড়ে তরল হয়ে চোখ ছেপে উপচে পড়ছে। শোবাদেবীর মাতৃ-হৃদয়ের শূন্যতা পূরণ হলো।

মা-বাবা ও মেয়ের অপূর্ব মিলনদৃশ্যে উপস্থিত সবার চোখ অশ্রু ছল্ ছল্ হয়ে উঠলো। কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে গেলো।

কিছুক্ষণ পর চন্দ্রামুখী উঠে বসলো। সেকেব আরসালান বললেন, এখন আমার বলার আর মাত্র একটি কথা বাকি রয়ে গেছে। তাও বলতে হবে। তাহলো, হারুন আমার ভাতিজা। সে-ই আমার ভাইয়ের স্মৃতি বহন করে আছে। যাকে আমি তার শৈশবকালে সুলতানের নিকট সোপর্দ করেছিলাম।

একথা শুনে হারুন আনন্দ ও বিস্ময়ের দোলায় দোল খেতে খেতে উল্লসিত কণ্ঠে বললো, আল্লাহর লাখ শুকরিয়া হে চাচাজান! দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর তিনি আজ আবার আমাদের অভূতপূর্ব মিলন ঘটিয়েছেন।

সেকেব আরসালান বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহর লাখ শুকরিয়া। বহু বছর পর তিনি আবার আমাদের মাঝে আনন্দ ফিরিয়ে দিয়েছেন। যদি সুলতান আমার পত্র পেয়ে না আসতেন, তাহলে...।

সুলতান বললেন, আমি কেনো আসবো না। আমি কীভাবে মেনে নিতে পারি, কাফেরের হাতে এক মুসলিম নারী বন্দি হয়ে থাকবে! আমি মুসলমান। মুসলমান কখনো তা মেনে নিতে পারে না।

হারুন সুলতানের দিকে ফিরে তাকালো। সুলতান বললেন, হারুন! তুমি কয়েকবার আমাকে একটি পত্র পড়তে দেখেছিলে। আমি তোমার চেহারা দেখে বুঝেছিলাম, তুমি সেই পুরাতন ছেঁড়া পত্রটি পড়তে দেখে বিস্মিত হতে। কয়েকবার আমি তোমাকে তার রহস্য বর্ণনা করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু এ চিন্তা করে বলিনি, নিশ্চয় তা একদিন তোমার নিকট উন্মোচিত হবে। আজ তুমি অবশ্যই বুঝতে পেরেছো, তা ছিলো তোমার চাচা সেকেব আরসালানের পত্র।

হারুন বললো, মহান সুলতান! আমি বুঝেছি।

সুলতান বললেন, আমি তোমাকে তোমার চাচার নিকট এজন্য দূত বানিয়ে পাঠিয়েছিলাম, যেনো তোমার চাচা তোমাকে দেখে নেন। আর সম্ভব হলে তুমি তোমার চাচাতো বোনকেও দেখে নেবে। মহান আল্লাহ সে ব্যবস্থাই করলেন। তুমি শুধু তাকে দেখলেই না বরং ডাকাতদের হাত থেকে তাকে উদ্ধারও করলে।

নওশাবা বিস্ময় বিমোহিত দৃষ্টিতে হারুনের দিকে তাকিয়ে আছে। হারুনের দৃষ্টিও তার দিকে লুটিয়ে পড়ছে। ক্ষণিকের তরে চার চোখের মিলন ঘটলো। পাশে বসে কামিনীও হারুনকে দেখছিলো। তবে তার দৃষ্টিতে ছিলো আক্ষেপ আর আফসোসের আস্ফালন।

সুলতান বললেন, আমরা সবাই অত্যন্ত ক্লান্ত। সকলের বিশ্রামের প্রয়োজন। বলেই সুলতান বিশ্রামের জন্য উঠে চলে গেলেন। সাথে সাথে অন্যান্য সবাই উঠে বিশ্রামের জন্য পাশের কক্ষগুলোতে চলে গেলো।

সাতষট্টি

সেই শুভদিনের বিকালে, যেদিন সোমনাথ মন্দির পদানত হলো। মন্দিরে অগণিত হীরা-জওহর, মণি-মুক্তা সুলতানের হস্তগত হলো। যেদিন ঐ রহস্য উন্মোচিত হলো, যা চন্দ্রামুখীকে ঘিরে দীর্ঘদিন যাবৎ আবর্তিত হচ্ছিলো। যেদিন চন্দ্রামুখী জানতে পারলো, সে চন্দ্রামুখী নয়–নওশাবা। ধর্মপাল হলেন সেকেব আরসালান আর শোবাদেবী সেকেব আরসালানের স্ত্রী।

সেদিন বিকালে আসরের নামায পড়ে হারুন পায়চারি করতে বাগানে গেলো। রাজপ্রাসাদের সেই সজীব মোহনীয় বাগান আজ নির্জীব-নিষ্প্রাণ

পড়ে আছে। পাখির কলতানে আজ তা মুখরিত নয়। সুন্দরী নারীকূলের গমনাগমনে আজ তা প্রাণবন্ত নয়। চপলা যুবতীদের কলকণ্ঠে আজ তা গুঞ্জরিত নয়।

হারুন পায়ে পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে। চারদিকের কোথাও তার খেয়াল নেই। কী এক অজানা চিন্তায় ঘুরপাক খাচ্ছে। হঠাৎ অনুভব করলো, হালকা পদবিক্ষেপে কে যেনো এগিয়ে আসছে। তার চেহারায় আনন্দের আভা ছড়িয়ে পড়লো। অধর কোণে মৃদু হাসি উঁকি দিয়ে মিলিয়ে গেলো। সে ঘুরে দাঁড়ালো। সন্ধানী দৃষ্টি ফেলে চারদিক তাকালো। দেখলো, কামিনী এগিয়ে আসছে। তৎক্ষণাৎ তার চেহারা থেকে আনন্দের আভা দূর হয়ে গেলো। ঠোঁটের কোণে আর হাসির রেখা উদ্ভাসিত হলো না।

কামিনীর দৃষ্টি অত্যন্ত প্রখর। কারো চেহারা দেখেই মনের অবস্থা বুঝতে সক্ষম। হারুনের মনের অবস্থা বুঝে ফেললো এবং মুহূর্তেই তার চেহারায় বিষন্নতার হালকা কালিমা ছড়িয়ে পড়লো। হারুন দাঁড়িয়ে রইলো। কামিনী হারুনের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। লজ্জা বিজড়িত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো, আমাকে বুঝি চন্দ্রামুখী মনে করেছিলে!

হারুনের হৃদয় পরিষ্কার। কণ্ঠ তার স্পষ্ট। বললো, হ্যাঁ, নিঃসন্দেহে। তবে চন্দ্রামুখী নয়– নওশাবা।

কামিনী বললো, হ্যাঁ, নওশাবা... তাই বুঝি এতো উল্লসিত হয়েছিলে। আর আমাকে দেখেই তোমার হৃদয়ে কষ্ট শুরু হয়েছে!

হারুনের কণ্ঠ দৃপ্ত। বললো, এ ধরনের অবস্থায় এমনই হয়ে থাকে। কারো আগমনের প্রত্যাশায় থাকলে অন্য কেউ এসে পড়লে হৃদয় বিষন্ন ও নিরানন্দ হয়ে পড়ে।

কামিনীর কণ্ঠ বেদনার্ত। বললো, নওশাবা বুঝি আপনার বাগদত্তা!

ঃ সে কথা তো আজই আমি জানতে পেরেছি।

ঃ কিন্তু তার পূর্ব থেকেই তো তাকে ভালোবাসতে!

ঃ আচ্ছা, তুমি কি সে ভালোবাসার উত্তর চাচ্ছিলেন?

ঃ হ্যাঁ, চাচ্ছিলাম।

কামিনীর কণ্ঠ হতাশায় ভরা। বললো, হায় আফসোস! তুমি তো তৃপ্ত ব্যক্তিকে পান করাতে চাচ্ছিলে। পাথরের গায়ে কোমলতা খুঁজে ফিরছিলে। লোহাকে তরল করার চিন্তায় হাবুডুবু খাচ্ছিলে। লেলিহান অগ্নিতে পানির সন্ধান করছিলে।

কামিনীর কথায় হারুন অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে বললো, তাহলে কি সে পাষাণ হৃদয়ের মানুষ!

কামিনী বললো, আমি তো তাকে এমনই মনে করি।

কামিনী বিষন্নতায় ভরা দৃষ্টি মেলে হারুনের দিকে তাকালো। কামিনীর কাজল কালো ডাগর চোখ দু'টি আজ অসহায়, নিঃসঙ্গ। দুঃখ-বেদনার অশ্রু ছল্ ছল্ করছে তার আঁখি যুগলে।

হারুনের কণ্ঠ কোমল। বললো, কামিনী! তুমি যা বলতে চাচ্ছো, বলো।

ঃ তোমার এ হৃদয়ে কি অন্য কাউকে জায়গা দেয়ার সুযোগ আছে?

ঃ তুমি জানো, মানুষের হৃদয় একটিই। তাই মানুষ একজনকেই ভালোবাসতে পারে।

কামিনীর কণ্ঠস্বরে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। বললো, আমি কি কখনো তোমার উপর অনুগ্রহ করেছিলাম?

ঃ হ্যাঁ, আমার তা বেশ মনে আছে।

ঃ আজ আমি তার বিনিময় চাই।

ঃ বলো, তুমি তার কী বিনিময় চাও।

ঃ এখনো তুমি আমার মনের অবস্থা, মনের তামান্না বুঝতে পারছো না?

ঃ আচ্ছা কামিনী! তুমি কি একটি বিষন্ন হৃদয় আর দুঃখভারাক্রান্ত অন্তর নিয়ে আনন্দিত হবে?

ঃ না, আমি আনন্দ চাই। বিষণ্নতা আর দুঃখের বোঝা অনেক বয়েছি। এখন আর তা বইতে সক্ষম নই।

ঃ তাহলে তুমি তা আমার কাছে পাবে না। পাবে একটি ভগ্নহৃদয়। নিষ্প্রাণ কাঠামো। মমতা আর ভালবাসাহীন একটি মানব।

কামিনীর কণ্ঠে দুঃখের ঝড়। বললো, হারুন...তাহলে তুমি কেনো আমার জীবনে এসেছিলে। আমার আনন্দ-উল্লাসের দুনিয়াকে কেনো তুমি বিষণ্নতায় ভরে দিলে? আমার মনের লাগাম নিয়ে কেনো তুমি খেলতে গেলে? ...এসব কিছু তুমি কেনো করলে? ...কেনো করলে...।

কামিনী কাঁদতে লাগলো। দু'হাত দিয়ে উজ্জ্বল চেহারা আবৃত করে কাঁদতে লাগলো। কান্নার গমকে তার শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছিলো।

কামিনীর কান্নার অবস্থা দেখে হারুন থমকে গেলো। সান্ত্বনা দেয়ার লক্ষ্যে বললো, কামিনী! এতে আমার অপরাধ কী? নিয়তি আমাকে টেনে নিয়ে আমার সামনে উপস্থিত করেছে। অপারগ হয়ে তোমার সামনে উপস্থিত হয়েছিলাম। কিন্তু... তুমি তোমার স্বপ্নের দুনিয়া রচনা করেছিলে। তুমি তোমার হৃদয়ের লাগাম কেনো আকড়ে ধরলে না।

কামিনী তার চেহারা থেকে হাত সরিয়ে বিগলিত অশ্রু মুছে বললো, হ্যাঁ, তা আমি নির্বুদ্ধিতার কারণে করেছিলাম।

ঃ তাহলে এখন বুদ্ধির আলোকে কাজ করো।

ঃ হ্যাঁ, তা-ই করবো। তবে আমাকে ভুলে যেয়ো না। তোমার হৃদয়ের মণিকোঠায় আমার নামটি লিখে রেখো। কামিনী বিষণ্ণতায় ভরা ভারাক্রান্ত দৃষ্টি মেলে হারুনের দিকে তাকালো এবং কাঁদতে কাঁদতে চলে গেলো।

ফোয়ারার পাশে বসে কামিনী দীর্ঘক্ষণ কাঁদলো। কাঁদতে কাঁদতে হৃদয়ের চাপা বেদনা হাল্‌কা হলে উঠে গেলো। আক্ষেপ করতে করতে বললো, আমি কেনো আমার স্বপ্নের এই দুনিয়া রচনা করেছিলাম? কেনো আমার হৃদয়ের লাগামকে অন্যের হাতে তুলে দিয়েছিলাম।... ভুল করেছি। অনেক ভুল করেছি...। আচ্ছা যা হবার হয়ে গেছে। এখন শিকদেবকে নিয়ে এখান থেকে পালাতে হবে। কষ্ট হবে। অসহনীয় কষ্ট হবে... কিন্তু একদিন হয়তো এ কষ্টও মন থেকে দূর হয়ে যাবে।

সূর্য তখন পশ্চিমাকাশে ডুবি-ডুবি করছে। চারদিকে রাতের অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ছে। কামিনী বাগান থেকে বেরিয়ে রাজপ্রাসাদের দিকে অগ্রসর হলো। কামিনী জানে, শিকদেব রাজপ্রাসাদের কোনো কামরায় আবদ্ধ আছে। সে রাজপ্রাসাদের অধিকাংশ গোপন দরজাগুলো খুলতে জানে। সে একটি মশাল নিয়ে অগ্রসর হলো। যে কামরায় শিকদেবকে বন্দি করে রাখা হয়েছে, তার দূরবর্তী এক কামরায় গিয়ে সে প্রবেশ করলো। তারপর গোপন দরজাগুলো একটার পর একটা খুলে অভিষ্ট কামরার দিকে অগ্রসর হতে লাগলো।

কামিনী দারুণ চিন্তিত। অত্যন্ত দুঃখভারাক্রান্ত। তার হৃদয় ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। হতাশার কালো ছায়া তার চেহারাকে আচ্ছন্ন করে আছে। সে একের পর এক গোপন দরজা খুলে সামনে অগ্রসর হচ্ছে। একটি কামরা খুলতেই হঠাৎ দেখলো, তাতে এক ব্যক্তি বসে আছে। দুঃখ-বেদনা আর হতাশায় তার চোখের আলো নিষ্প্রভ। কামিনী মনে করলো, সে শিকদেব। তাই সে অস্ফুট কণ্ঠে বললো, এসো।

কামিনীর কথা শেষ হতে না হতেই উপবিষ্ট ব্যক্তি দাঁড়িয়ে গেলো। তার দিকে অগ্রসর হতে হতে উল্লসিত কণ্ঠে বললো, বাহবা... আমার প্রেয়সী কামিনী যে...এ সময়ে কি আমার কথা মনে পড়লো! এই হতাশাচ্ছন্ন প্রেমিককে উদ্ধার করতে বুঝি এলে!

কামিনী দেখলো, সে মোহন সিং। ভয়ে তার চেহারা ফ্যাকাশে বর্ণ ধারণ করলো। হৃদয় আঁৎকে ওঠলো। মুহূর্তে নিজেকে শক্ত করে কর্তব্য স্থির করে নিলো। অত্যন্ত মিষ্টি কণ্ঠে বললো, একটু দাঁড়াও।

মোহন সিং কেনো জানি দাঁড়িয়ে গেলো। অগ্রসর হলো না। চোখের

পলকে কামিনী ঘুরেই গোপন দরজা খুলে অন্য কামরায় গিয়েই তা বন্ধ করে দিলো। ভয়াতুরা কামিনী কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে প্রশান্ত হলো। বললো, পরমাত্মা রক্ষা করেছেন। নইলে এবার মরণ হতো। তারপর কামিনী পাশের আরেকটি কামরা খুলে দেখলো, তাতে শিকদেব মাথা ঝুঁকিয়ে বিষণ্ন হৃদয়ে বসে আছে। কামিনী তাকে ভালোভাবে দেখলো। তারপর বললো, ভাইয়া...।

শিকদেব হতচকিত হয়ে উঠে দাঁড়ালো। কামিনীকে দেখে আনন্দিত হলো। বললো, কামিনী! তুমি কি আমাকে উদ্ধার করতে এসেছো?

কামিনী বললো, হ্যাঁ ভাইয়া! আস্তে কথা বলুন। কামরার বাইরে প্রহরীরা সতর্ক প্রহরা দিচ্ছে।

ঃ চলো, যে রাস্তা দিয়ে এসেছো, সে রাস্তা দিয়েই আমাকে নিয়ে চলো।

ঃ এসো।

উভয়ে চলতে লাগলো। কামরার পর কামরা অতিক্রম করে বাগানে গিয়ে পৌছলো। বাগানের গোপন দরজা খুলে সমুদ্রোপকূলে পৌছলো। সেখান থেকে পদব্রজে আমব্রেলীর পথে রওনা দিলো। তারা রাতের অন্ধকারে হারিয়ে গেলো।

আটষট্টি

চন্দ্রামুখী তার পিতামাতাকে পেয়ে যারপরনাই আনন্দিত হলো এবং নিজেকে মুসলিম নারী ভেবে অত্যন্ত বিস্মিত হলো। শৈশবকাল থেকেই সে কুফর-শিরকের পরিবেশে প্রতিপালিত হয়েছে। যারা তাকে আদর-সোহাগ করে প্রতিপালিত করেছে, তারা ছিলো মূর্তিপূজক। যারা তাকে কোলে-কাঁখে নিয়েছে, তারাও মুর্তিপূজা করতো। যে সখীদের নিয়ে হই-হুল্লোড় করতো, আমোদ-প্রমোদ ও উল্লাসে ডুবে থাকতো, তারাও মূর্তি পূজা করতো।

তাই শৈশব থেকে সে মূর্তি পূজায় বিশ্বাসী হয়ে পড়েছিলো। কিন্তু সে যখন আত্মপরিচয় জানিতে পারলো এবং বুঝলো, সে একজন মুসলিম নারী, তখন তার হৃদয়ে এক নতুন চিন্তার উন্মেষ ঘটলো।

নওশাবা সোমনাথের মহারাজাকে পিতাজ্বী আর মহারাণীকে মাতাজ্বী বলে সম্বোধন করতো। তারা তাকে সন্তানের মতো অপরিসীম আদর-সোহাগ আর মমতা দিয়ে ঘিরে রাখতো। হৃদয় দিয়ে স্নেহ করতো, ভালবাসতো। সেও তাদের হৃদয় দিয়ে শ্রদ্ধা করতো, ভালোবাসতো। তাই মহারাজার মৃত্যু এবং মহারাণীর পলায়নের সংবাদে চন্দ্রামুখী অত্যন্ত

দুঃখিত হলো। খুব অস্থির হলো। যদি সে পারতো, তাহলে মহারাণীকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে বের করে আনতো এবং আগের মতোই তাকে ইজ্জত ও সম্মান করতো।

মহারাজা-মহারাণীর স্মৃতি তার মনের পর্দায় ভেসে ওঠলেই সে বিষণ্ন ও ম্লান হয়ে পড়তো। চেহারা থেকে আনন্দের দ্যুতি হারিয়ে যেতো। সেকেব আরসালান ও তার স্ত্রী-কন্যার এ অবস্থা অনুধাবন করে তাকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করলেন। সেকেব আরসালানের স্ত্রী তাকে নির্জনে ডেকে বললেন, মা! তুমি মহারাজা-মহারাণীর চিন্তায় বারবার বিমর্ষ হয়ে পড়ছো। তুমি হয়তো জানো না, তোমার পিতা সেকেব আসালান আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন, যেনো মহারাজা সুলতান মাহমুদের সাথে সন্ধি করে নেন। কারণ, তারা তোমাকে আদর-সোহাগ দিয়ে প্রতিপালন করেছেন। তোমাকে রাজকুমারীর মর্যাদায় ভূষিত করেছেন। তোমার সব চাওয়া-পাওয়া তারা পূরণ করেছেন। এ অনুগ্রহ মূলত তোমার উপর ছিলো না। কারণ, তুমি তা জানতে না। বরং তা ছিলো আমাদের উপর। তাই আমরা তার বিনিময় দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু মহারাজা তা কবুল করেননি। মেনে নেননি।

হয়তো আল্লাহর এই সিদ্ধান্ত ছিলো যে, সোমনাথ পদানত হবে। মহারাজা নিহত হবেন আর মহারাণী পালিয়ে যাবেন। তাই এখন তোমার-আমার বিষণ্ন হয়ে কোনো লাভ হবে না।

ঃ কিন্তু তাদের দয়া-অনুগ্রহ, মমতা-ভালোবাসার কথা মনে পড়লেই আমার মনটা বিমর্ষ ও চিন্তিত হয়ে পড়ে। তবে আম্মিজান! আমার এ অবস্থা ধীরে ধীরে দূর হয়ে যাবে।

ঃ আমি তা জানি। তুমি এ চিন্তা দূর করার চেষ্টা করতে থাকো। তোমার জন্য এ সংবাদ কি আনন্দদায়ক নয় যে, তুমি তোমার প্রকৃত পিতামাতার কোলে ফিরে এসেছো?

ঃ সত্যই এটা আমার জন্য আনন্দদায়ক।... কিন্তু আমি তো আম্মিজান আজ পর্যন্ত মূর্তিপূজা করে আসছি।

আমি তা জানি। আর এজন্যই তো তোমার হৃদয়ে মূর্তির প্রতি শ্রদ্ধা রয়ে গেছে।

ঃ হ্যাঁ, সত্য বলেছেন।

ঃ আসলে এমনই হয়ে থাকে। যে যার পূজা করে, তা সে সহজে ছাড়তে পারে না। এক সময় তো গোটা পৃথিবীই কুফ্র ও শিরকে নিমজ্জিত ছিলো। পৃথিবীর প্রায় সব লোক কোনো না কোনোভাবে মূর্তিপূজা করতো।

আরবের প্রতিটি ঘরে মূর্তিপূজা হতো। এমনকি কাবা ঘরেও তিনশ ষাটটি মূর্তি ছিলো। প্রত্যেক কবিলার পৃথক পৃথক দেবতা ছিলো। আল্লাহ তা'আলা এসব শিরক নির্মূল করতে চাইলেন। মূর্তিপূজকদের মধ্য থেকেই একজন মহান ব্যক্তিকে তাওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্য মনোনীত করলেন। তিনি হলেন হযরত মুহাম্মদ (সা.)। তিনি তাঁকে নবুওত দান করলেন। তিনি উচ্চকণ্ঠে লোকদের আহ্বান জানালেন। বললেন, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ– আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। কোনো মাবুদ নেই।

তাঁর পূর্ববর্তী উম্মতরা, ইহুদী ও খৃস্টানরা তাদের নবী উযাইর ও ঈসাকে (আ.) আল্লাহর পুত্র বলে বিশ্বাস করতো। তাই মুহাম্মদ (সা.) আহ্বান জানালেন, মুহাম্মাদুর রাসূলাল্লাহ অর্থাৎ মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। তিনি আল্লাহর পুত্র নন। বরং তিনি তাঁর বান্দা। তাঁর বার্তাবাহক। তাঁর আহ্বান গোটা জাতিকে জাগ্রত করে তুললো। তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে বললেন, মূর্তিকে তো তোমরা নিজ হাতে তৈরি করেছো। এরা পাথরের তৈরি। তাদের এ শক্তিটুকু নেই যে, তাদের শরীর থেকে তারা মশাটিও তাড়াবে। তারপরও একথা ভেবে বিস্মিত হই যে, তোমরা এখনো তার পূজা করছো।

মেয়ে আমার! রাসূলের এ আহ্বান শুনতে পেয়ে আরবের লোকেরা জাগ্রত হলো। তারা মূর্তিপূজা ছেড়ে দিলো। তারা পাথরের তৈরি মূর্তিগুলো ভেঙে ভাগাড়ে নিক্ষেপ করলো আর আল্লাহর ইবাদত করতে লাগলো।

বেটী আমার! তুমি আমার চোখের আলো। হৃদয়ের শীতলতা। তোমাকে আল্লাহ অনেক জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়েছেন। অনেক বিদ্যা তুমি অর্জন করেছো। তুমি একটু চিন্তা করে দেখো, একটু ভেবে দেখো, যারা সোমনাথ মূর্তির পূজা করতো, তাদের অন্তরে তার ইজ্জত ছিলো। তারা তাকে তাদের ঈশ্বর মানতো। তাই মুসলমানদের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য তারা কীভাবে দলে দলে তার পদপ্রান্তে সমবেত হলো এবং কেঁদে কেঁদে তার নিকট সাহায্যের নিবেদন পেশ করলো। কিন্তু পাথরে গড়া মূর্তি কি তা শুনতে পেয়েছে? নিশ্চয় পায়নি। আর আল্লাহ চেয়েছেন তাঁর বড়ত্ব ও তাঁর শক্তির বিকাশ ঘটাবেন। তাই মূর্তিপূজকদের পদানত করলেন আর মুসলমানদের বিজয় দান করলেন।

বেটী আমার! নিশ্চয় তুমি দেখেছো, সুলতান মাহমুদ কীভাবে নিজ হাতে সোমনাথ মূর্তিকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিয়েছেন। যদি সোমনাথ খোদা হতো, তাহলে সে ধ্বংস হতো না, কেউ তাকে ধ্বংস করতে পারতো না। বরং সুলতানকে ধ্বংস করে দিতো। সকল মূর্তির ঠিক একই অবস্থা। মূর্তি কখনো খোদা হতে পারে না। বরং খোদা তো ঐ মহান সত্ত্বা, যাকে

কেউ আজ পর্যন্ত দেখতে পায়নি।

খোদা হলেন নূর। যে নূরকে কেউ চর্ম চোখে দেখতে পারবে না। তিনি সর্বদা, সর্বস্থানে বিদ্যমান। তিনি নিদ্রা যান না। শয়ন করেন না। বিশ্রাম করেন না। এসব কিছুর তার প্রয়োজনও দেখা দেয় না। তিনিই একমাত্র ইবাদতের যোগ্য। মুসলমানরা তারই ইবাদত করে।

নওশাবা অত্যন্ত মনোযোগের সাথে কথাগুলো শুনছিলো। বললো, আমি বুঝেছি। আমার চোখ থেকে এখন অজ্ঞতার পর্দা দূর হয়ে গেছে। আমি ভাবছি, এসব ইতিপূর্বে কেনো আমার বুঝে আসেনি।

ঃ কারণ, তোমাকে কেউ তা বুঝায়নি। তুমি তো তাদের স্নেহে লালিত-পালিত হয়েছো, যাদের জ্ঞান-বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও তারা ছিলো অজ্ঞ। চোখ থাকতেও ছিলো অন্ধ। তাই তারা কুফরী ও শিরকে ডুবে ছিলো। এটা কোনো দোষ নয়। এটাই মানুষের প্রকৃতি। যে যে অবস্থায় থাকে, সে অন্যকেও তেমনি দেখতে চায়।

ঃ কিন্তু আমি তো এখনো মূর্তি পূজাই করে আসছি।

ঃ এটাও ইসলামের এক বিশেষ সৌন্দর্য যে, তওবার দরজা সর্বদা উন্মুক্ত। আল্লাহ তা'আলা বলেন, যখন তার বান্দা তওবা করে, মনে-প্রাণে বলে, আর কখনো পাপ করবো না, তখন আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। আর কোনো অমুসলিম মুসলমান হলে আল্লাহ তার বিগত সকল পাপ মাফ করে দেন। সে নবজাত শিশুর মতো নিষ্পাপ হয়ে যায়।

ঃ হিন্দুদের কি কোনো শাস্তি হয় না?

ঃ হিন্দুদের বিশ্বাস, মানুষ মৃত্যুর পর তার কাজের বিনিময় পায়। তার কায়া পরিবর্তন হয়। অর্থাৎ পাপের কারণে কখনো কুকুর হয়, কখনো বিড়াল হয়, কখনো শূকর হয়। কখনো সাপ হয়, কখনো বিচ্ছু হয়। এভাবেই মানুষের কায়া পরিবর্তন হতে থাকে এবং এভাবে সে পাপের শাস্তি পেয়ে থাকে। কিন্তু ইসলাম বলে , জান্নাত ও জাহান্নাম নামে দু'টি স্থান আছে। যারা আল্লাহর অবাধ্য হয়নি, পাপ কাজ করেনি, আল্লাহকে মেনে নিয়েছে, নামায আদায় করেছে। রোযা রেখেছে, তারা জান্নাতে যাবে। জান্নাত হলো চির সুখের স্থান। সেখানে মানুষের বসবাসের জন্য উঁচু উঁচু প্রাসাদ থাকবে। বাগবাগিচা থাকবে। সুগন্ধিতে চারদিকে মোহিত থাকবে। অত্যন্ত সুস্বাদু ফলমূল আর খাবার সর্বদা পরিবেশিত হবে। মিষ্টি পানির নির্ঝরমালা প্রবাহিত হতে থাকবে। তারা অচিন্তনীয় সুখ শান্তিতে রেশমি পোশাকে সুসজ্জিত হয়ে থাকবে।

আর যারা পাপ কাজ করবে, আল্লাহর কথা শুনবে না, তাদেরকে

দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। জাহান্নাম এক বিশাল অগ্নিকুন্ডের নাম। যেখানে লেলিহান অগ্নিশিখা লক লক করতে থাকবে। তারা সেখানে আগুনের মাঝে থাকবে। আগুনে উত্তপ্ত ফুটন্ত পানি পান করবে। নানা ধরনের শাস্তি তাদের দেয়া হবে। জাহান্নাম অত্যন্ত ভয়াবহ ও কষ্টদায়ক স্থান।

ভয়ে নওশাবার শরীর কেঁপে ওঠলো। বললো, তাহলে আম্মিজান! আমাকে মুসলমান বানিয়ে নিন।

মেয়ের কথা শুনে মা আনন্দিত হলেন। তার চোখ থেকে দু'ফোঁটা আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়লো। তিনি কালিমা-শাহাদাৎ পাঠ করিয়ে মেয়েকে মুসলমান বানিয়ে নিলেন।

উনসত্তর

চন্দ্রামুখী এখন একজন মুসলিম নারী। নাম, ধাম, পোশাক-পরিচ্ছদ সবকিছু পাল্টে গেছে। তুর্কী যুবতীদের সাজে সে এখন সজ্জিত। তার জীবনে এসেছে আমূল পরিবর্তন।

সকালে কোমল শীতল স্নিগ্ধ বায়ু যখন চারদিকে ছুটাছুটি শুরু করলো, পাখিরা দল বেঁধে কলতানে চারদিক মুখরিত করে তুললো, নিষ্প্রভ সূর্য হাসিমুখে পূর্ব আকাশে উঁকি-ঝুকি দিচ্ছে; ঠিক তখন চন্দ্রামুখী বায়ু সেবনের জন্য বাগানের দিকে পা বাড়ালো।

আজকের এই নওশাবাকে দেখে যে কেউ থমকে দাঁড়াবে। এ যে গতকালের চন্দ্রামুখী তা বুঝা কঠিন। নওশাবা হাঁটছে। সদ্য প্রস্ফুটিত সুভাসিত ফুলের পাশ কেটে কেটে এগিয়ে যাচ্ছে। সূর্যের কাঁচা কিরণের ছোঁয়ায় বাগানের ঘাসের ডগায়, ফুল গাছের পাতায় আর ফুলের গায়ে জমে থাকা শিশির বিন্দুগুলো মুক্তার মতো ঝলমল করছে।

নওশাবা ফোয়ারার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। হঠাৎ তার কানে মিষ্টি কণ্ঠের আওয়াজ পৌঁছতেই থমকে দাঁড়ালো। উৎকর্ণ হলো। কুরআন তিলাওয়াতের মধুর আওয়াজ শুনতে পেলো। হারুনের কণ্ঠ। চমৎকার কণ্ঠ। কী মধুর তিলাওয়াত!

নওশাবা থমকে দাঁড়ালো। চিন্তার জগত থেকে একটু ঘুরে এলো। তারপর পশ্চাদ্দিক থেকে হারুনের দিকে এগিয়ে গেলো। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে নিঃশব্দে এগিয়ে গেলো। একটি গাছের সাথে হেলান দিয়ে আত্মহারা হয়ে হারুনের কুরআন তিলাওয়াত শুনতে লাগলো।

হারুন যতোক্ষণ তিলাওয়াত করলো, ততোক্ষণই মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায়

নওশাবা তা শুনলো। হারুন তিলাওয়াত বন্ধ করামাত্র নওশাবা সেখান থেকে সরে পড়লো। একটু ঘুরে অন্য পথ ধরে ফোয়ারার দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো। যেনো দর্শক দেখে বুঝে, এই মাত্র নওশাবা বাগানে এসেছে।

দু'আর পর হারুন ফোয়ারার বিন্দু বিন্দু পানির দিকে বিমোহিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। যেনো নতুন কিছু আবিষ্কারের নেশায় আত্মহারা হয়ে আছে। হঠাৎ কারো পদধ্বনিতে তার দৃষ্টি ধ্বনির দিকে ছুটে গেলো। দেখলো, নওশাবা এগিয়ে আসছে।

হারুনের চেহারায় আনন্দের দ্যুতি ছড়িয়ে পড়লো। সে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। কিন্তু নওশাবা তাকে দেখেও না দেখার ভান করে অন্য দিকে তাকিয়ে রইলো।

হারুনের হৃদয়টা পিট পিট করছে। এ মুহূর্তে কী করবে ভাবছে। সে কি এগিয়ে গিয়ে কথা বলবে, না এখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে! মনে ভয়, যদি নওশাবা তার এগিয়ে যাওয়াকে অপছন্দ করে!

নারীর অপার সৌন্দর্যের প্রভাব এতো প্রতিক্রিয়াশীল, যা বীর পুরুষ, রাজা মহারাজাকেও পরাজিত করে। নারীর সামনে তারা নতি স্বীকার করে।

ক্ষণকাল কী যেনো চিন্তা করে ধীর পদক্ষেপে সতর্কতার সাথে সামনে অগ্রসর হতে লাগলো। নওশাবার নিকট পৌঁছে বিনয়-নম্র কণ্ঠে বললো, আমি ভুল করে ফেললাম না তো?

নওশাবা যেনো চমকে ওঠলো। যেনো হারুনকে দেখেইনি। বললো, কে...। তারপর বললো, উহু আপনি!

নওশাবার 'কে' উচ্চারণে হারুনের হৃদয় কেঁপে ওঠলো। কিন্তু তারপরই যখন বললো, 'উহুঁ আপনি', তখন যেনো প্রাণ ফিরে পেলো। বললো, ক্ষমা চাই। আমি তোমার একাকিত্বে বিঘ্ন সৃষ্টি করলাম!

নওশাবার কণ্ঠ গম্ভীর। বললো, আপনি বুঝি পায়চারি করতে বেরিয়েছিলেন?

ঃ ফজরের নামায পড়েই এখানে এসেছিলাম। তিলাওয়াত করছিলাম। সৌভাগ্য যে তোমার সাথে দেখা হয়ে গেলো।

ঃ আপনি কী তিলাওয়াত করছিলেন?

অনিচ্ছকৃতভাবে নওশাবার মুখ থেকে প্রশ্নটা বেরিয়ে গেলো। তাই সাথে সাথে সতর্ক হয়ে গেলো।

ঃ আমি কুরআন পাঠ করছিলাম। তুমি কি তা শুনেছো!

নওশাবা আরো সতর্ক হয়ে গেলো। বললো, আমি আওয়াজ শুনতে পেয়েছি।

ঃ তাহলে তো তুমি বেশ আগে বাগানে এসেছো?

ঃ না, তেমন বেশি সময় হয়নি।

ঃ আচ্ছা বলো তো গতকালটা কেমন আনন্দের ছিলো?

নওশাবা তার ডাগর চোখ দু'টিতে বিস্ময়ভাব টেনে এনে বললো, কেনো?

হারুন হতবুদ্ধি হয়ে গেলো। কী বলবে কিছুই যেনো খুঁজে পাচ্ছে না। ক্ষণকাল পর বললো, কারণ, দীর্ঘদিনের গোপন রহস্যটি প্রকাশিত হয়েছে, যা তোমাকে নিয়ে ঘুরপাক খাচ্ছিলো।

নওশাবা এক চিলতে মধুর হাসি উপহার দিয়ে বললো, আপনি আমার আত্মীয় হয়েছেন।

ঃ এটা আমার সৌভাগ্য। কিন্তু সে আত্মীয়তা কি তোমার পছন্দ!

হারুনের কথা শেষ করতে না দিয়েই নওশাবা কৃত্রিম উষ্মা প্রকাশ করে বললো, কোন্ আত্মীয়তা?

হারুন অপ্রস্তুত হয়ে গেলো। ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টিতে নওশাবার দিকে তাকিয়ে রইলো।

হারুনের অবস্থা দেখে নওশাবার অধর কোণে মৃদু হাসির রেখা উঁকি দিয়েই হারিয়ে গেলো। এ দৃশ্যে হারুন হৃদয়ে প্রাণ ফিরে এলো। কিছুটা সাহস অনুভব করলো। বললো, নওশাবা! ঐ আত্মীয়তা, যা তোমার-আমার পূর্ব পুরুষরা স্থাপিত করেছেন।

ঃ মনে হচ্ছে, আপনি আপনার সেই ক্ষমতা প্রকাশ করার জন্যই আমার পিছু পিছু বাগানে এসেছেন।

ঃ সে ক্ষমতা প্রয়োগ করার সুযোগ নেই। আর আমি জানি, তুমি রাজকুমারী নও। তা সত্ত্বেও তোমার মর্যাদা আমার চেয়ে অনেক গুণ বেশি।

বলেই হারুন ভারাক্রান্ত হয়ে শির নত করে ফেললো। নওশাবা সহমর্মী দৃষ্টিতে তাকে দেখতে লাগলো। হারুন নওশাবার দিকে না তাকিয়েই বলতে লাগলো, আমি আগেই বুঝেছিলাম। কিন্তু... না, কিছু নয়। সব কিছুই আমার নির্বুদ্ধিতা। আমাকে সর্বাগ্রে আমার প্রকৃত অবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার ছিলো।

তারপর নওশাবার দিকে তাকিয়েই সাথে সাথে একটি ফুলের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলো। বলতে লাগলো, আমাকে ক্ষমা করে দাও। আমি বেশি সাহসিকতা দেখিয়ে অপরাধ করে ফেলেছি। তুমি তুমি-ই। আমি হলাম এক তুচ্ছ ব্যক্তি। কালের ঝাপটায় দিশেহারা উদ্ভ্রান্ত একজন মানুষ। আমি

আর কখনো এ ধরনের সাহসিকতা দেখাবো না। হারুন ফিরে যাওয়ার উদ্যোগ নিলো।

নওশাবার চিত্তে চাঞ্চল্য শুরু হয়ে গেলো। বললো, আপনি বুঝি রেগে গেলেন?

হারুন দাঁড়িয়ে নওশাবার দিকে তাকিয়ে বললো, আমি কি রাগ করতে পারি?

ঃ তাহলে আপনি চলে যাচ্ছেন কেনো?

ঃ এ কারণে যে, তুমি তোমার ভবিষ্যৎ নিয়ে এখনো সন্দেহের দোলায় দোল খাচ্ছো।

হারুন দেখলো, তার চোখের তারায় দুষ্টুমীর আলো পিট পিট করে জ্বলছে। সাথে সাথে তার ভয়, আশঙ্কা, হৃদয়ের বেদনা দূর হয়ে গেলো। নওশাবার কাছে গিয়ে বললো, আমি বুঝতেই পারিনি যে, তুমি হেয়ালীপনা করছো। আমাকে একটু বাজিয়ে নিচ্ছো। দুষ্টু মেয়ে!

ঃ আচ্ছা, তাহলে আপনি...।

ঃ আমি আর কেমন? যতো পার আমাকে বাজিয়ে নাও।

ঃ কিন্তু এখন তো আর কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে না?

ঃ না।

ঃ কেনো?

ঃ কারণ, তোমার ডাগর চোখ দু'টি আমাকে তোমার মনের ঐ গোপন কথাটি বলে দিয়েছে, যা আমি দীর্ঘদিন যাবৎ খুঁজে ফিরছিলাম। আমি তা পেয়ে গেছি। নওশাবা! আমি তো সে সময় থেকেই...।

নওশাবা হারুনকে বলতে না দিয়ে বললো, ভেবে দেখো। পাগল হয়ো না কিন্তু।

ঃ তোমার মনভোলানো ঐ আঁখি দু'টি আমি যেদিন দেখেছি, সেদিন থেকেই পাগল হয়ে গেছি। তোমার প্রেমে বিভোর হয়ে আছি।

হারুনের কথা শুনে নওশাবা লজ্জায় মাথা নত করে ফেললো। হারুন বললো, নওশাবা! তুমি তো স্বপ্নজগতে আমার নিকট আসতে। তুমি আমাকে একেবারে দেওয়ানা বানিয়েছিলে। আমার শান্তি, আমার স্বস্তি...।

নওশাবা লজ্জায় একেবারে ছোট্ট হয়ে বললো, ব্যস্, আর বলতে হবে না। আমি এ ধরনের কথা আর শুনতে চাই না।

ঃ তাহলে আমি আর তা বলবো না। যা বলার ছিলো বলে ফেলেছি। আচ্ছা, নওশাবা! আমি কি তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?

ঃ স্বাচ্ছন্দে পারো।

ঃ তোমাকে কে লুকিয়ে রেখেছিলো?

সহসা নওশাবা হেসে ফেললো। বললো, লুকায়নি বরং বন্দি করেছিলো।

হাসিতে নওশাবার সুপুষ্ট গোলাপী গন্ডদেশে এক চমৎকার টোল পড়ে চেহারাটাকে আরো আকর্ষণীয় করে তুললো আর মুক্তার মতো দন্তরাজি বিকশিত হয়ে আলোর আভা ছড়িয়ে দিলো।

ঃ কোন্ পামর এ কাজ করতে সাহস করেছিলো?

ঃ শিকদেব। কিন্তু কয়েকদিন যেতে না যেতেই মোহন সিং শিকদেব থেকে আমাকে ছিনিয়ে নিলো। সেও আমাকে বন্দি করেই রাখলো। মনে হয় সে আমাকে এজন্য বন্দি করেছিলো, যেনো তার বোন কামিনীকে তার সাথে বিয়ে দেয়।

ঃ মনে হয় মোহন সিং কামিনীকে ভালবাসতো।

ঃ এছাড়া তো আর কিছু বুঝে আসে না।

ঃ ইনশাআল্লাহ, তাদের থেকে প্রতিশোধ নেয়া হবে। তারা তাদের কর্মের ফল অবশ্যই ভোগ করবে।

ঃ কিন্তু কামিনী মোহন সিংকে ঘৃণা করতো। মনে হয় সে অন্য কাউকে ভালবাসতো।

ঃ যে যাকেই ভালবাসুক তা নিয়ে কোনো চিন্তা করতে হবে না।

হারুনের কথা শেষ না হতেই নওশাবা বললো, আমার ধারণা, তার ভালোবাসার মানুষটি আর কেউ নয়– আপনি।

ঃ শোন নওশাবা! গতকাল সন্ধ্যায় তার সাথে আমার দেখা হয়েছিলো। সে তার ভালোবাসার কথা ব্যক্তও করেছিলো। কিন্তু আমার উত্তরে সে নিরাশ হয়ে চলে গেলো।

ঃ আমারো এ সন্দেহ ছিলো।

হারুন মৃদু হাসির ঝলক তুলে বললো, তাহলে দেখছি, প্রেম-যুদ্ধে তুমিই বিজয়িনী।

হারুনের কথায় লজ্জা পেয়ে নওশাবা শির অবনত করে ফেললো।

নওশাবা ধীরে ধীরে মাথা তুলে প্রেমভরা দৃষ্টিতে হারুনের দিকে তাকালো। মৃদু হাসির লহরী খেলে গেলো তার অধর প্রান্তে। হারুনের অধরেও মৃদু হাসির ঝিলিক ঝিলমিল করে ওঠলো। চার চোখের মিলন ঘটলো। অদূরে এক জোড়া কপোত-কপোতির পাখা ঝাপটানির আওয়াজ ভেসে এলো।

অজানা একটা পাখি আনন্দে শিষ দিতে দিতে তাদের মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেলো।

সত্তর

সোমনাথ বিজয়ে সুলতান মাহমুদ গজনবী আনন্দিত হলেন। আনন্দিত হলো মুজাহিদ বাহিনীর সবাই। জান্নাতসদৃশ্য ফুলে-ফলে ছাওয়া, অনন্ত সবুজ-শ্যামলিমায় এদেশটি তাদের হৃদয়কে বেশ প্রভাবিত করলো। যে দিকেই চোখ যায়, সবুজ-শ্যামল কোমল ঘাসের কার্পেট নজরে পড়ে। মাঝে-মাঝে রঙ-বেরংয়ের ফুলের সমাহার। ফুলের সৌরভে চারদিক সদা বিমোহিত।

এমাটির পদচুম্বন করে কল কল রব তুলে চলে গেছে বিশাল সমুদ্র। সফেদ ফেনার তাজ মাথায় পরে তরঙ্গমালারা সেখানে সর্বদা নেচে বেড়ায়। সূর্যের রশ্মির ছোঁয়ায় তা ঝিলমিল করতে থাকে। সুলতান মাহমুদ গজনবী ও মুজাহিদরা এ সব কিছুতে নিজেদের স্থির রাখতে পারেন না। নৌযান নিয়ে ছুটে যান সমুদ্রের কোলে। আহারে-বিহারে হৃদয়কে মাতিয়ে তোলেন। আল্লাহর সৃষ্টিলীলার সৌন্দর্যে বিস্মিত হয়ে আল্লাহর গুণগানে লিপ্ত হন।

সুলতান শুনতে পেলেন, অদূরে অবস্থিত লংকা দ্বীপটি সোমনাথের চেয়ে ঐশ্বর্যমন্ডিত ও চিত্তাকর্ষী। ঘাসে ঘাসে ভরা সবুজ তার পৃষ্ঠ। ধন-দৌলত আর অপরিমিত সম্পদে ভরা সে দেশ।

সোমনাথ ও তার প্রাকৃতিক শোভা-সৌন্দর্য সুলতান মাহমুদ গজনবীর হৃদয়কে ব্যাকুল করে তুললো। তিনি সোমনাথকেই দারুল খেলাফত বানানোর ইচ্ছে করলেন। ভাবলেন, নৌ-বহর তৈরি করে পার্শ্ববর্তী দ্বীপগুলো পদানত করে নেবেন। কিন্তু সুলতানের পরামর্শদাতারা এ কথা শুনে শিউরে ওঠলেন। বললেন, খোরাসান আর গজনী ত্যাগ করে সোমনাথকে দারুল খেলাফত বানানো ঠিক হবে না। তারা এর লাভ ও ক্ষতির দিকগুলোও তুলে ধরলেন। সুলতান তাদের মতামত মেনে নিলেন। তিনি ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতির নির্দেশ দিলেন।

কিন্তু সোমনাথের সিংহাসন শূন্য। কাকে তার রাজা বানাবে? তাই সুলতান সোমনাথের নেতৃস্থানীয় হিন্দুদের ডেকে পাঠালেন। তারা বললো, বর্তমানে সোমনাথে রাজ্যে দারসেলীম অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত, শিক্ষিত, ভদ্র ও যোগ্য ব্যক্তি। তাকে সোমনাথের মহারাজা বানালে সবাই সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেবে। সুলতান তা-ই করলেন। দারসেলীমকে ডেকে পাঠালেন এবং সোমনাথের রাজা বানিয়ে দিলেন।

সোমনাথ ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় সুলতান মাহমুদ গজনবী সোমনাথ মূর্তির চারটি বড় বড় খন্ড সাথে নিয়ে নেন। তার দু'টি টুকরা মদীনায়

পাঠিয়ে দিলেন এবং বাকি দুই টুকরা গজনীতে নিয়ে গেলেন। একটি টুকরা স্মৃতিস্বরূপ জামে মসজিদের সামনে রাখলেন এবং অপর টুকরাটি প্রধান বিচারালয়ের সামনে রেখে দিলেন।

সুলতান বাহিনীতে সেকেব আরসালানকে ঐ পদটিই দেয়া হলো, যে পদে তিনি পূর্বে ছিলেন। হারুনের পদোন্নতি হলো। সে সুলতানের অন্যতম উপদেষ্টা নির্বাচিত হলো।

আলতুনতাশ, আমীর আলী ও হাজের আলীর পদমর্যাদা বৃদ্ধি পেলো। সোমনাথ অভিযানে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য অফিসারদেরও পদোন্নতি দেয়া হলো। যারা অত্যন্ত সাহসিকতা ও বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছিলো, তাদেরকে অফিসারের পদে উন্নতি দেয়া হলো। সবাইকে গনীমতের সম্পদ থেকে অংশ দেয়া হলো। প্রত্যেকে এতো পরিমাণ গনীমত পেলো যে, সবাই সম্পদশালী হয়ে গেলো।

সোমনাথ থেকে চলে আসার পূর্বেই সুলতান সেকেব আরসালানের নিকট প্রস্তাব রাখলেন, যেনো হারুনের সাথে নওশাবার বিয়ে দেয়া হয়। সেকেব আরসালান তাদের ভালোবাসার কথা জানতেন। তাই তিনি তাতে রাজি হয়ে গেলেন। বিয়ের তারিখও নির্ধারিত হয়ে গেলো।

এদিকে হারুন সুলতানের নিকট গিয়ে আবেদন করলো, যেনো বুরহানের সাথে আনীসার বিয়ের ব্যবস্থা করা হয়। সুলতান মাহমুদ গজনবী আলতুনতাশকে ডেকে এনে আনীসার বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। আলতুনতাশ বুরহানকে ভালোভাবেই চিনতেন। তার যোগ্যতা ও উন্নত চরিত্রের কথা তার জানা ছিলো। তাই হৃষ্টচিত্তে আলতুনতাশ এ প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। তাদেরও বিয়ের দিন নির্ধারিত হয়ে গেলো।

সোমনাথ থেকে ফিরে আসার পূর্বেই হারুন-নওশাবা এবং বুরহান-আনীসার বিয়ে হয়ে গেলো। সুলতান এ বিয়েতে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। নওশাবা ও আনীসাকে অত্যন্ত মূল্যবান অলংকার উপহার দিলেন।

বিয়ের দিন যখন নওশাবাকে সাজানো হলো, রেশমি পোশাক ও অলংকারসমূহ পরিধান করানো হলো; তখন নওশাবা যেনো পরীর রূপ ধারণ করলো। অলংকারের সৌন্দর্যে তার চেহারা ঝলমল করতে লাগলো। কাজলকালো ডাগর চোখ দু'টি মোহময় হয়ে ওঠলো।

হারুন নওশাবাকে দেখে বিমোহিত হয়ে গেলো। নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো।

নওশাবা লজ্জাভরা দৃষ্টিতে হারুনের দিকে তাকিয়ে বললো, কী দেখছো?

হারুন সচকিত হয়ে ওঠলো। বললো, আল্লাহর সৃষ্টির অপার সৌন্দর্য দেখছি।

নওশাবার চেহারা লজ্জায় লাল হয়ে ওঠলো। অধর কোণে মিষ্টি হাসির ঢেউ তুলে বললো, তুমি তো দেখছি মূর্তিপূজা শুরু করেছো।

হারুন বললো, মূর্তিপূজা করছি না। তবে সৌন্দর্যের পাগল হয়েছি। নওশাবা! আমার ভয় হচ্ছে, পাছে তোমার উপর কারো কুনজর না পড়ে। পারলে তোমাকে আমার চোখের তারায় লুকিয়ে রাখতাম। না আমি দেখতাম, না অন্য কাউকে দেখতে দিতাম।

হারুনের বিয়ের তিনদিন পর বুরহানের বিয়ে হলো। অত্যন্ত ধুমধাম ও আনন্দ -উল্লাসের মাঝে তাদের বিয়ে অনুষ্ঠিত হলো।

আমব্রেলীর রাজা পরমদেব এ যুদ্ধে সোমনাথ মহারাজাকে সাহায্য করেছিলেন। তাই ফেরার পথে সুলতান আমব্রেলী আক্রমণ করলেন। রাজা পরমদেব রণেভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে গেলেন। সুলতান হারুন ও সেকেব আরসালানকে পশ্চাদ্ধাবন করতে পাঠালেন। তারা তার কোন সন্ধান পেলো না।

এদিকে বর্ষা শুরু হয়ে গেছে। তাই সুলতান আমব্রেলীতেই থাকার ইচ্ছে করলেন। প্রতিদিনই বৃষ্টি হচ্ছিলো। নদ-নদী, খাল-বিল পানিতে ভরে গেলো। বর্ষা মৌসুম শেষ হলে চারদিকের পানি শুকিয়ে গেলো। সুলতানের বাহিনীতে সাজসাজ রব পড়ে গেলো। তারা সবকিছু গুটিয়ে নিলো। তারা গজনীর পথে রওনা হয়ে গেলো।

[সমাপ্ত]

ইতিহাসের পাতায় মুক্তাখচিত স্বর্ণোজ্জ্বল একটি নাম সুলতান মাহমুদ গজনবী। একের পর এক ষোলবার ভারত আক্রমণ করেছেন তিনি। আঁধারের বাঁধ ভেঙ্গে বিশাল শত্রু বাহিনীকে পরাজিত ও পদদলিত করে প্রতিবার বিজয়মাল্য ছিনিয়ে আনেন। কিন্তু কেনো তাঁর এই ভারত অভিযান? কে এই রাজকুমারী চন্দ্রামুখী, যাকে উদ্ধারের জন্য তিনি সোমনাথ আক্রমণ করলেন? হারুন নামের মুসলিম যুবকটি কীভাবে তার জীবনে তোলপাড় সৃষ্টি করলো? সন্ন্যাসিনী শোবাদেবীর আসল পরিচয় কী? এইসব নিয়ে হাজারো রহস্যঘেরা এক ঐতিহাসিক উপন্যাস **'ভারত অভিযান'**

ISBN. 984-8754-00-8

মূল্য ঃ ১৮০ টাকা